উপক্রমণিকা

মহান দেশনায়ক সুভাষচন্দ্র বসুর নামাঙ্কিত এই মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনে আপনাকে স্বাগত। সম্প্রতি এই প্রতিষ্ঠান দেশের সর্বপ্রথম রাজ্য সরকারি মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে ন্যাক (NAAC) মূল্যায়নে 'এ' গ্রেড প্রাপ্ত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশন প্রকাশিত নির্দেশনামায় স্নাতক শিক্ষাক্রমকে পাঁচটি পৃথক প্রকরণে বিন্যস্ত করার কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল—'কোর কোর্স', 'ডিসিপ্লিন স্পেসিফিক ইলেকটিভ', 'জেনেরিক ইলেকটিভ' এবং 'স্কিল' / 'এবিলিটি এনহ্যান্সমেন্ট কোর্স'। ক্রেডিট পদ্ধতির ওপর ভিত্তি করে বিন্যস্ত এই পাঠক্রম শিক্ষার্থীর কাছে নির্বাচনত্মক পাঠক্রমে পাঠ গ্রহণের সুবিধে এনে দেবে। এরই সঙ্গে যুক্ত হয়েছে যান্মাষিক মূল্যায়ন ব্যবস্থা এবং ক্রেডিট ট্রান্সফারের সুযোগ। শিক্ষার্থী কেন্দ্রিক এই ব্যবস্থা মূলত গ্রেড-ভিত্তিক যা অবিচ্ছিন্ন আভ্যন্তরীণ মূল্যায়নের মধ্য দিয়ে সার্বিক মূল্যায়নের দিকে এগোবে এবং শিক্ষার্থীকে বিষয় নির্বাচনের ক্ষেত্রে যথোপযুক্ত সুবিধা দেবে। শিক্ষাক্রমের প্রসারিত পরিসরে বিবিধ বিষয় চয়নের সক্ষমতা শিক্ষার্থীকে দেশের অন্যান্য উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের আন্তঃব্যবস্থায় অর্জিত ক্রেডিট স্থানান্তরে সাহায্য করবে। শিক্ষার্থীর অভিযোজন ও পরিগ্রহণ ক্ষমতা অনুযায়ী পাঠক্রমের বিন্যাসই এই নতুন শিক্ষাক্রমের লক্ষ্য।

UGC (Open and Distance Learning Programmes and Online Programmes) Regulations, 2020 অনুযায়ী সকল উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের স্নাতক পাঠক্রমে এই সি.বি.সি.এস. পাঠক্রম পদ্ধতি কার্যকরী করা বাধ্যতামূলক—উচ্চশিক্ষার পরিসরে এই পদ্ধতি এক বৈকল্পিক পরিবর্তনের সূচনা করেছে। আগামী ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষ থেকে স্নাতক স্তরে এই নির্বাচনভিত্তিক পাঠক্রম কার্যকরী করা হবে, এই মর্মে নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয় সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে। বর্তমান পাঠক্রমগুলি উচ্চশিক্ষা ক্ষেত্রের নির্ণায়ক কৃত্যকের যথাবিহিত প্রস্তাবনা ও নির্দেশাবলী অনুসারে রচিত ও বিন্যস্ত হয়েছে। বিশেষ গুরুত্বারোপ করা হয়েছে সেইসব দিকগুলির প্রতি যা ইউ.জি.সি কর্তৃক চিহ্নিত ও নির্দেশিত।

মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্ষেত্রে স্ব-শিক্ষা পাঠ-উপকরণ শিক্ষার্থী সহায়ক পরিষেবার একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ। সি.বি.সি.এস পাঠক্রমের এই পাঠ-উপকরণ মূলত বাংলা ও ইংরেজিতে লিখিত হয়েছে। শিক্ষার্থীদের সুবিধের কথা মাথায় রেখে আমরা ইংরেজি পাঠ-উপকরণের বাংলা অনুবাদের কাজেও এগিয়েছি। বিশ্ববিদ্যালয়ের আভ্যন্তরীণ শিক্ষকরাই মূলত পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা নিয়েছেন—যদিও পূর্বের মতই অন্যান্য বিদ্যায়তনিক প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সংযুক্ত অভিজ্ঞ বিশেষজ্ঞ শিক্ষকদের সাহায্য আমরা অকুণ্ঠচিত্তে গ্রহণ করেছি। তাঁদের এই সাহায্য পাঠ-উপকরণের মানোন্নয়নে সহায়ক হবে বলেই আমার বিশ্বাস। নির্ভরযোগ্য ও মূল্যবান বিদ্যায়তনিক সাহায্যের জন্য আমি তাঁদের আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এই পাঠ-উপকরণ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষণ পদ্ধতি-প্রকরণে নিঃসন্দেহে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেবে। উন্মুক্ত শিক্ষাঙ্গনের পঠন প্রক্রিয়ায় সংযুক্ত সকল শিক্ষকের সদর্থক ও গঠনমূলক মতামত আমাদের আরও সমৃদ্ধ করবে। মুক্তশিক্ষাক্রমে উৎকর্ষের প্রশ্নে আমরা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ।

পাঠ-উপকরণ প্রস্তুতির সঙ্গে সংশ্লিষ্ট সকলকে আমি আন্তরিক অভিনন্দন জানাই এবং এই উদ্যোগের সর্বাঙ্গীণ সাফল্য কামনা করি।

অধ্যাপক (ড.) শুভ শঙ্কর সরকার
উপাচার্য

Under Graduate Degree Programme
Choice Based Credit System (CBCS)
নির্বাচনভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা
বিষয় : সাম্মানিক ইতিহাস
(Subject : Honours in History)
Course Code : CC-HI-01
ভারতের ইতিহাস -১

প্রথম মুদ্রণ : জুলাই, 2021
First Print : July, 2021

বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরি কমিশনের দূরশিক্ষা ব্যুরোর বিধি অনুযায়ী মুদ্রিত।
Printed in accordance with the regulations of the Distance Education Bureau of the University Grants Commission.

Under Graduate Degree Programme

Choice Based Credit System (CBCS)

নির্বাচনভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা

বিষয় : সাম্মানিক ইতিহাস

(Subject : Honours in History)

Course Code : CC-HI-01

ভারতের ইতিহাস -১

: বিষয় সমিতি :

চন্দন বসু
Professor of History
NSOU and Chairperson, BoS

বলাই চন্দ্র বাড়ুই
Professor (Former) of History
University of Kalyani

সৌমিত্র শ্রীমানী
Associate Professor of History
NSOU

রূপ কুমার বর্মণ
Professor of History
Jadavpur University

ঋতু মাথুর (মিত্র)
Associate Professor of History
NSOU

বিশ্বজিৎ ব্রহ্মচারী
Associate Professor of History
Shyamsundar College

মনোশান্ত বিশ্বাস
Assistant Professor of History
NSOU

রচনা

প্রসেনজিৎ মুখোপাধ্যায়
Assistant Professor of History
Sankrail Anil Biswas Smriti
Mahavidyalaya

সম্পাদনা
চন্দন বসু
Professor of History
NSOU

বিন্যাস সম্পাদনা
চন্দন বসু
Professor of History
NSOU

প্রজ্ঞাপন

এই পাঠ-সংকলনের সমুদয় স্বত্ব নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের দ্বারা সংরক্ষিত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের লিখিত অনুমতি ছাড়া এর কোনো অংশের পুনর্মুদ্রণ বা কোনোভাবে উদ্ধৃতি সম্পূর্ণ নিষিদ্ধ।

কিশোর সেনগুপ্ত
নিবন্ধক

নেতাজি সুভাষ মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়

পাঠক্রম : CC-HI-01

(Choice Based Credit System)

(নির্বাচনভিত্তিক মূল্যমান ব্যবস্থা)

ভারতের ইতিহাস - ১

পর্যায় - ১

একক -১	◻	ইতিহাস সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় ধারণা (Reconstructing Ancient Indian History)	9-20
একক ২	◻	ইতিহাস রচনার সূত্র ও উপাদান (Sources and tools of Historical Reconstruction)	21-36
একক ৩	◻	ইতিহাসের ব্যাখ্যা (লিঙ্গ, পরিবেশ, প্রযুক্তি এবং আঞ্চলিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব সহ) (Historical interpretations (with special reference to gender–environment–technology and regions)	37-52

পর্যায় - ২

একক ৪	◻	পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতি ঃ পর্যায় এবং কালক্রম (Paleolithic cultures sequence and distribution)	55-64
একক-৫	◻	প্রস্তরায়ুধ নির্মাণ এবং প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশলের বিকাশ (Stone industries and technological developments)	65-76
একক ৬	◻	মধ্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি — আঞ্চলিক এবং কালানুক্রমিক বিস্তৃতি (Mesolithic cultures-regional and chronological distribution)	77-82
একক ৭	◻	প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা; গুহাচিত্র ও শিল্পকলা (New Developments in Technology and Economy— Rock Art)	83-92

পর্যায় - ৩

একক ৮	◻	নব্য প্রস্তর যুগ এবং খাদ্য উৎপাদনের সূচনা (The Neolithic Age and the Beginnings of Food Production)	95-106

একক ৯ ◻ নব্যপ্রস্তর ও তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির আঞ্চলিক এবং কালানুক্রমিক বিস্তার সম্পর্কে ধারণা (Understanding the regional and chronological distribution of the Neolithic and Chalcolithic cultures) 107-116

একক ১০ ◻ জীবনধারণ এবং বিনিময়ের ধাঁচ (Subsistence and patterns of exchange) 117-126

পর্যায় - ৪

একক ১১ ◻ হরপ্পা সভ্যতা—উৎস, বসতি বিস্তার এবং নগর পরিকল্পনা (The Harappan Civilization— Origins, settlement pattern and town planning) 127-139

একক ১২ ◻ কৃষিজ ভিত্তি—কারিগরি শিল্প (Agrarian base— Craft productions) 140-147

একক ১৩ ◻ বাণিজ্য (Trade) 148-155

একক ১৪ ◻ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন 156-163

একক ১৫ ◻ ধর্ম বিশ্বাস ও আচার; শিল্পসৃজন (Religious beliefs and practices—art) 164-173

একক ১৬ ◻ নাগরিক পর্বের পতন (The problem of urban decline) 174-181

একক ১৭ ◻ পরবর্তী হরপ্পা সংস্কৃতি (The late/post-Harappan traditions) 182-190

পর্যায় - ৫

একক ১৮ ◻ উত্তর ভারত, ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব — ৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব (North India– Circa 1500 BCE—300 BCE) 193-249

একক ১৯ ◻ মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্য, খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০— খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ (Central India and Deccan– Circa 1000 BCE— Circa 300 BCE) 250-262

একক ২০ ◻ তামিল অঞ্চল, খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০-৩০০ খ্রীষ্টাব্দ (Tamilakam– circa 300 BCE to CE 300) 263-273

পরিশিষ্ট

মানচিত্র/ছবি 275-286

পর্যায় ১

প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের পুনর্গঠন

Module I

Reconstructing Ancient Indian History

একক -১ ◻ ইতিহাস সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় ধারণা (Reconstructing Ancient Indian History)

গঠন

১.০ উদ্দেশ্য

১.১ সূচনা

১.২ ইতিহাস ও 'হিস্ট্রি'র তুলনা

১.৩ প্রাচীন ভারত ইতিহাসের তাৎপর্য

১.৪ প্রাচীন ভারতীয়দের ইতিহাস চেতনা

১.৫ প্রাচীন ভারত ইতিহাসের ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যা

১.৬ প্রাচীন ভারতের জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা

১.৭ প্রাচীন ভারত ইতিহাসের মার্কসীয় ব্যাখ্যা

১.৮ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক ঘরানা

১.৯ উপসংহার

১.১০ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১.০ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠের উদ্দেশ্য হল প্রাচীন ভারতবর্ষে ইতিহাস সম্পর্কে কী জাতীয় ধারণা পোষণ করা হত তা অনুধাবন করা।
- আমরা সকলেই জানি যে ভারতবর্ষের ইতিহাস সুপ্রাচীন। প্রাচীন ভারতে শুধু কৃষি, নগর বা বাণিজ্যের বিস্তার ঘটেছিল তাই নয়; রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক বিকাশ ব্যতীত প্রাচীন ভারতীয়রা বৌদ্ধিক ও সাংস্কৃতিক বিভিন্ন দিকেও তাদের প্রতিভার সাক্ষর রেখেছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিল দর্শন, কাব্য, ন্যায়, গণিত, জ্যোতির্বিজ্ঞান ইত্যাদি।
- অতীত চর্চা সম্পর্কেও বিশেষ ধরনের দৃষ্টিভঙ্গি ভারতীয়দের মধ্যে ছিল যা সর্বদা পাশ্চাত্যের অনুসারী নয়। জীবন সম্পর্কে একটি বিশেষ বোধ প্রাচীন ভারতে ছিল বলে বহু ঐতিহাসিক মনে করেন যা এই সময়কার অতীত চর্চাকে অনেকটাই প্রভাবিত করেছিল।
- মনে রাখা দরকার জীবন সম্পর্কে এই বিশেষ দৃষ্টিভঙ্গির সবসময় কোনও একরৈখিক গড়ন ছিল না; এমনকি তা অনড় অচল গতিহীন চিরস্থায়ীও ছিল না।

১.১ সূচনা

ইতিহাস হল অতীতকালের মানুষের কর্মকাণ্ডের, জীবনচর্চার ও অভিজ্ঞতার বিশ্লেষণ। ইতিহাসের উপজীব্য এই অতীত, বহুকাল আগের হতে পারে আবার সাম্প্রতিক কালেরও হতে পারে। 'ইতি-হ-আস' এই তিন পদের সমন্বয়ে গঠিত ইতিহাস কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল ''এই রূপই ছিল' অর্থাৎ যেমন হয়ে এসেছে। আবার ইংরেজিতে 'হিস্ট্রি' কথাটি এসেছে গ্রীক শব্দ 'হিস্টোরিয়া' থেকে যার অর্থ হল অনুসন্ধান বা গবেষণা। স্বাভাবিকভাবেই প্রশ্ন আসে রাজা মহারাজা থেকে সাধারণ মানুষের অতীত অভিজ্ঞতার এই বিশ্লেষণের প্রয়োজন কী? এর উত্তরে আমরা বলব যে ইতিহাস অতীতকে ব্যক্ত করে বর্তমানকে বোঝার জন্য, অতীতকে না জানলে তা কখনও সম্ভব নয়। আবার বর্তমানের সঠিক বিশ্লেষণের মধ্যেই ভবিষ্যতের বীজ নিহিত রয়েছে অর্থাৎ ভবিষ্যৎ গতিপ্রকৃতির কিছুটা আভাস বর্তমানকে বোঝার মধ্যেই রয়েছে।

১.২ ইতিহাস ও 'হিস্ট্রি'র তুলনা

ইতিহাস সম্পর্কে আলোচনা করতে গেলে ইংরাজি হিস্ট্রি শব্দটির প্রসঙ্গ ওঠা স্বাভাবিক। সাধারণভাবে আমরা ইংরাজি শব্দ 'হিস্ট্রি' অর্থে ইতিহাস শব্দটি ব্যবহার করি। উল্লেখ্য গ্রিক ঐতিহাসিক হেরোডোটাস 'হিস্ট্রি' শব্দটি প্রথম ব্যবহার করেছিলেন এবং তারপর ধীরে ধীরে এর বহুল ব্যবহার শুরু হয়। ইংরাজি 'হিস্ট্রি' শব্দের মত ইতিহাস শব্দটিও বহু প্রাচীন। ঐ শব্দটির প্রথম উল্লেখ পাওয়া যায় অথর্ববেদে। সেখানে ইতিহাসকে অথর্ব বেদের সাথে একত্রে উল্লেখ করা হয়েছে এইভাবে- অথর্ববেদেতিহাসবেদৌ চ বেদাঃ'। এখানে অবশ্য মনে রাখা দরকার যে, সেই সুপ্রাচীনকালের ইতিহাস সম্পর্কিত ধারণা ও দৃষ্টিভঙ্গীর সঙ্গে বর্তমানকালের হিস্ট্রি বা ইতিহাসের সাদৃশ্য খুব বেশি নেই। কারণ প্রাচীনপর্বে ইতিহাস ছিল পুরাণাশ্রয়ী। রোমিলা থাপার একেই ইতিহাস- পুরাণ' ঐতিহ্য বলেছেন। এই ইতিহাস -পুরাণকে অনুসরণ করেই মানব সমাজের উদ্ভব সংক্রান্ত প্রাচীন ভারতীয় ধারণার কিছুটা আভাস মেলে।

এবার সরাসরি আসা যাক হিস্ট্রি ও ইতিহাসের তুলনায়। একথা সর্বজনবিদিত যে, অতীতের কোনো বিষয় বা ঘটনা তা সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, ধর্মীয়, সাংস্কৃতিক যাই হোক না কেন সে সম্পর্কে আলোচনা ও চর্চার জন্য যে বিদ্যা আমরা অধ্যয়ন করি তা ভারতে বাংলা ও অন্যান্য কয়েকটি ভাষায় ইতিহাস নামে পরিচিত। ইতিহাস নামক এই বিদ্যাটি ইংরাজি হিস্ট্রি নামক বিদ্যাটির সঙ্গে অভিন্ন বলেই ধরা হয়। কারণ এই দুই বিদ্যার উদ্দেশ্য ও চর্চার ধারা প্রায় এক। এখানে অবশ্য উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, ইংরাজি হিস্ট্রি শব্দটির নিছক অনুবাদ ইতিহাস নয়। প্রাচীনকালে ভারতে অতীত তথা ইতিহাস সম্পর্কে মানুষের যে ধারণা ছিল তা আধুনিককালের হিস্ট্রির সঙ্গে অভিন্ন নয়। এখানে প্রাচীন ভারতের পুরাণ নির্ভর ইতিহাস অধ্যয়নের সঙ্গে ঔপনিবেশিক আমলে ভারতবর্ষে শুরু হওয়া পাশ্চাত্য ধারায় অতীত ঘটনার বিচার ও রীতিনীতির পার্থক্যকে বুঝতে হবে।

১.৩ প্রাচীন ভারত ইতিহাসের তাৎপর্য

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চা নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি কখন কীভাবে আমাদের পূর্বপুরুষেরা প্রাচীনতম সংস্কৃতি-সভ্যতা গড়ে তুলেছিল। কীভাবে তারা কৃষিব্যবস্থা ও পশুপালনের মাধ্যমে নিজেদের জীবনকে স্থিতিশীল ও নিরাপদ করেছিল। আমরা জানতে পারি- প্রাচীন ভারতীয়রা কীভাবে প্রাকৃতিক সম্পদের আবিষ্কার

ও ব্যবহার করে তাদের জীবনযাত্রা নির্বাহ করত। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চা থেকেই আমরা ধারণা করি কীভাবে প্রাচীন ভারতীয়রা খাদ্যের সংস্থান, বাসস্থান ও পরিবহণ ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল। চাষবাস, বস্ত্রবয়ন ধাতুর ব্যবহার সম্পর্কে সম্যক জ্ঞান আহরণ করে তারা বনজঙ্গল সাফ করে গ্রাম, জনপদ, নগর এমনকি বিশাল রাজ্য গড়ে তুলেছিল। প্রাচীন ভারতীয়রা যে লিখনশৈলী আবিষ্কার করেছিল, যে ভাষা তারা ব্যবহার করত তার থেকেই আমাদের বর্তমান লিখনশৈলী ও ভাষা গড়ে উঠেছিল। প্রাচীন ভারতীয়দের এই ঐতিহ্যই আমরা বহন করে চলেছি।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস আমাদের কাছে খুবই চিত্তকর্ষক কারণ এই বিশাল দেশের যেমন ভৌগোলিক বৈচিত্র্য রয়েছে তেমনি রয়েছে ভাষা, ধর্ম, জাতি ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্য। এই বৈচিত্রের মধ্যেও প্রাচীনকাল থেকে আমরা অদৃশ্য এক ঐক্যের বন্ধনে আবদ্ধ। আর্য-অনার্য, শক, হুন, পাঠান, মোগল--সব জাতি একাত্ম হয়ে মিলেছে এই পবিত্র ভারতভূমিতে। প্রাচীন ভারতীয় সংস্কৃতির এক উল্লেখযোগ্য দিক হল উত্তর-দক্ষিণ পূর্ব-পশ্চিমের সব সংস্কৃতির উপাদান এসে মিলেছে এক সর্বজনীন ধারায়। এই সর্বজনীন ধারাই ভারতের অন্তরাত্মার প্রতীক। প্রাচীনকালে অনেক সময় ভারতে রাজনৈতিক ঐক্যের অভাব দেখা দিলেও সমগ্র ভারতব্যাপী এক সত্তা বিরাজ করত। বিজেতারা ও সাংস্কৃতিক চেতনার পুরোধারা মনে মনে ভৌগোলিক দিক থেকে এক অখণ্ড ভারতের কল্পনা করতেন।

আমাদের দেশের প্রাচীন কবি, দার্শনিক ও লেখকেরা ভারতকে এক অখণ্ড একক ভাবতেন। তাঁরা হিমালয় থেকে সমুদ্র পর্যন্ত প্রসারিত এক বিশাল ভূখণ্ডকে এক ক্ষেত্র ভাবতেন, যার শাসককে বলা হত 'রাজ চক্রবর্তী'। মৌর্য ও গুপ্ত শাসকদের আমরা এই রূপে দেখতে পাই। বিদেশীদের চোখেও ভারতের এই ঐক্যের সন্ধান মেলে। তারা সিন্ধুনদের তীরে বসবাসকারী মানুষের সংস্পর্শে এলে গোটা দেশকেই এই নামে অভিহিত করত। 'হিন্দু' শব্দটি সংস্কৃত কথা সিন্ধু থেকেই উদ্ভূত। এই একই শব্দের উপর ভিত্তি করে গ্রীকরা ভারতকে 'ইন্ডিয়া' নামে অভিহিত করেছে। কুষাণ-পরবর্তীকালে ইরাণ বা পারস্যের শাসকরা সিন্ধু জয় করলে তারা এই দেশের নাম দেন হিন্দুস্তান।

প্রাচীনকাল থেকেই সমগ্র ভারতভূমি ও তার অধিবাসীদের মধ্যে যে সাংস্কৃতিক ঐক্যের ফল্গুধারা বহমান ছিল তা বোঝা যায় যখন আমরা দেখি আমাদের দেশের দুই মহাকাব্য রামায়ণ ও মহাভারত আর্যাবর্ত ও দাক্ষিণাত্যে সমান উৎসাহ, আবেগ ও ভক্তি নিয়ে পাঠ হয়। প্রাচীন ভারতীয় লেখকেরা যেমন এই উপমহাদেশের বিশাল অখণ্ডতার কথা ভাবতেন তেমনই এর বিশালত্ব ও আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে সচেতন ছিলেন, যাতে একের মধ্যে বহুত্বের সমাহার লক্ষ করা যায়।

১.৪ প্রাচীন ভারতীয়দের ইতিহাস চেতনা

প্রাচীন ভারতীয়দের ইতিহাস চেতনা বা ইতিহাস সম্পর্কিত ধারণা নিয়ে ইউরোপীয়দের তাচ্ছিল্য বা অবজ্ঞার মনোভাব প্রকাশ পায় তাদের মন্তব্যে। ভারতীয় সভ্যতা সংস্কৃতির গভীরে না গিয়ে তাঁরা বলেন 'India has had some episodes– but no history'। অন্যান্য দেশে বিশেষ করে প্রাচীন গ্রীসের হেরোডোটাস, থুকিডিডিসেরা, কিংবা ইতালির লিভি, ট্যাসিটাসেরা যেমন ইতিহাস গ্রন্থ রচনা করেছেন তেমন ইতিহাস গ্রন্থ আমরা প্রাচীন ভারতে খুঁজে পাই না। শুধু তাই নয় প্রামান্য উপাদানের স্বল্পতা উল্লেখ করে কর্ণেল টড মন্তব্য করেছেন, "Much disappointment has been felt at the sterility of the historical muse of Hindustan". ইউরোপীয় পন্ডিতেরা ভারতের ইতিহাস খুঁজতে গিয়ে ইউরোপের সমতুল্য যথার্থ ইতিহাস

খুঁজে পাননি, কারণ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি ইওরোপের জ্ঞানালোকের দ্বারা প্রভাবিত। ভারতে যথার্থ ইতিহাস গ্রন্থ রচনা হয়নি তা কিন্তু ঠিক নয়। দ্বাদশ শতকের মধ্যভাগে কাশ্মীরি ব্রাহ্মণ কলহনের লেখা 'রাজতরঙ্গিনী' এ বিষয়ে একটি ব্যতিক্রমী গ্রন্থ। এই গ্রন্থে কাশ্মীরের ইতিহাস বিধৃত হয়েছে, যেখানে লেখক ইতিহাসের মূলনীতি অনুসরণ করে লেখ, সনদ ও ভূমিদান বিষয়ক উপাদানের সদ্ব্যবহার করে নিরপেক্ষভাবে ঐতিহাসিক ঘটনার বিবরণ দিয়েছেন। সভাকবিদের রচনায় যে পক্ষপাতিত্ব ও অতিশয়োক্তি লক্ষ করা যায় কাশ্মীরের শাসক ও রাজবংশের মূল্যায়নে তিনি তা করেননি।

এই প্রেক্ষিতেই আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কলহনের পূর্বে এই ধরনের ইতিহাস গ্রন্থ লেখার উদ্যোগ নেওয়া হয়নি কেন? প্রাচীন ভারতীদের কি ঐতিহাসিক চেতনা বা বৈজ্ঞানিক দৃষ্টিভঙ্গির অভাব ছিল? ফ্লিট এই চরম মত পোষণ করেন যে, প্রাচীন ভারতীয়দের ইতিহাস চেতনার অভাব ছিল, তাই তারা বিজ্ঞানসম্মত ইতিহাস রচনা করতে পারেনি। আধুনিক গবেষণায় অবশ্য দেখা যায় ফ্লিটের এই মত ঠিক নয়। ভারতীয়দের ইতিহাস চেতনা বা বিজ্ঞানসম্মত দৃষ্টিভঙ্গির যথেষ্ট প্রমাণ মেলে। আমাদের দেশে আর্যভট্ট, ব্রহ্মগুপ্ত ও বরাহ মিহিরের মতো বিজ্ঞানী জন্ম গ্রহণ করেছেন। কিন্তু প্রাচীন ভারতীয়দের বিজ্ঞানচর্চা, সাহিত্যচর্চা, আধ্যাত্মিক সাধনায় যতটা মগ্ন থাকতে দেখা যায় ইহজাগতিক বিষয়ে তাঁরা ততটাই উদাসীন থেকেছেন। তবে প্রাচীন ভারতীয়রা ইহজাগতিক বিষয়ে একেবারে উদাসীন ছিলেন একথা বলা যাবে না। কারণ গুপ্তযুগে কামসূত্রের মতো পার্থিব বিলাসের গ্রন্থ আমরা পাই।

ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদারের মতে প্রাচীন ভারতীদের মধ্যে ইতিহাস-চেতনার কোনও অভাব ছিল না। অভাব ছিল তথ্যভিত্তিক সাহিত্যগুণসম্পন্ন ইতিহাস রচনার উৎসাহের ও ইচ্ছার। শিক্ষিত ভারতীয়রা ঐতিহ্যগত ইতিহাসের ধারা বজায় রেখেছেন মহাকাব্য, পুরাণ, আধা-জীবনীমূলক গ্রন্থ রচনার মাধ্যমে। বহু যুগ ধরে বহির্বিশ্বের কাছে ভারত হল বিপুল সম্পদের দেশ ও অতিন্দ্রিয় এতিহ্য ও রহস্যময়তার অধিকারী। বহু শতাব্দী ধরে গ্রীক ও রোমান সাহিত্যে বিক্ষিপ্তভাবে ভারতের উল্লেখ থেকেই বাকি পৃথিবীর মানুষ তাকে জেনেছে। অষ্টাদশ শতকে কতিপয় জেসুইট যাজক উপদ্বীপীয় ভারতে এসে ভারতের মানুষের জীবনকে সঠিকভাবে বোঝার চেষ্টা করে। তবে প্রাচীন ভারতকে নিয়ে আধুনিক গবেষণার কাজটা শুরু হয় অষ্টাদশ শতকের দ্বিতীয় ভাগে ব্রিটিশ উপনিবেশিক শাসকদের প্রশাসনিক প্রয়োজন মেটাতে।

১৭৬৫ খ্রীষ্টাব্দে দেওয়ানী লাভের পরে ইংরেজ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির প্রশাসকদের বাংলা ও বিহারকে শাসন করার প্রয়োজনে তাদের হিন্দু উত্তরাধিকার আইন জানতে হয়। এই প্রয়োজন থেকেই ১৭৭৬ খ্রীষ্টাব্দে মনুস্মৃতির ইংরেজি অনুবাদ 'A Code of Gentoo Laws' প্রকাশিত হয়। ব্রিটিশ বিচারকেরা হিন্দু পন্ডিত ও মুসলিম মৌলভীদের সাহায্য নিয়ে বিচারকার্য পরিচালনা করতেন। প্রাচীন ভারতের আইন ও প্রথা জানার এই প্রারম্ভিক প্রয়াস পূর্ণতা পায় ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে কলকাতায় এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গল প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে। এর প্রতিষ্ঠাতা হলেন ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানির সিভিল সার্ভেন্ট উইলিয়াম জোন্স (১৭৪৬-৯৪)। তিনি-ই প্রথম বলেন যে সংস্কৃত, ল্যাটিন ও গ্রীক এক ভাষা গোষ্ঠীভুক্ত। ১৭৮৯ খৃষ্টাব্দে তিনি মহাকবি কালিদাসের বিখ্যাত নাটক 'অভিজ্ঞান শকুন্তলম্' ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এরপর ১৭৮৫ খ্রীষ্টাব্দে উইলকিন্স হিন্দু ধর্মীয় গ্রন্থ 'ভাগবতগীতার' ইংরেজি অনুবাদ প্রকাশ করেন। প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার এই আগ্রহ থেকেই তিনি ১৭৮৭ খ্রীষ্টাব্দে নারায়ণ রচিত দ্বাদশ শতকের বাংলার জনপ্রিয় গল্প সংকলন 'হিতোপদেশ' ইংরেজিতে অনুবাদ করেন। এইচ টি কোলব্রুক এই সময় তিরহুতে রাজস্ব সংগ্রহের কাজে যুক্ত থাকার সুবাদে সংস্কৃত আয়ত্ত করেন এবং সময়

সম্পর্কে ভারতীয়দের ধারণা, তাদের ধর্মীয় রীতিনীতি, প্রথা ও ভারতীয় সংস্কৃতির নানা দিক নিয়ে নিবিড় পাঠ করে বিস্তর লেখালেখি শুরু করেন। ঔপনিবেশিক শাসকদের প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার এই ধারা অব্যাহত থাকে। ১৮০৪ খ্রীষ্টাব্দে বোম্বে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হয় এবং ১৮২৩ সালে লন্ডনে এশিয়াটিক সোসাইটি অব লন্ডন প্রতিষ্ঠিত হয়।

প্রাচ্য বিদ্যাচর্চার জোয়ার আসে লন্ডনে প্রতিষ্ঠিত জার্মান পন্ডিত ম্যাক্সমুলার (১৮২৩-১৯০২)-এর হাত ধরে। শ্রেষ্ঠ প্রাচ্যতত্ত্ববিদ ও ভারতবিশারদ হিসেবে বন্দিত এই জার্মান পণ্ডিত কখনো ভারতে আসেননি, জীবনের সিংহভাগ তিনি কাটিয়েছেন ইংলন্ডে। সংস্কৃতের সঙ্গে বেশকিছু ইওরোপীয় ভাষার সাদৃশ্য ও নৈকট্যের বিষয়টির উপর তিনি জোর দেন। এর ফলে ভারতের বিষয়ে ইওরোপীয়দের আগ্রহ জন্মে। ঔপনিবেশিক সরকার ও প্রশাসকদের স্বার্থরক্ষার প্রয়োজনে এই প্রাচ্য বিদ্যাচর্চা শুরু হয়। বিশেষ করে ১৮৫৭ খ্রীষ্টাব্দের মহাবিদ্রোহে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত কেঁপে উঠলে তারা বুঝতে পারেন ভারতীয়দের সমাজব্যবস্থা, ধর্মবিশ্বাস, প্রথা ও ঐতিহ্য সম্পর্কে গভীর জ্ঞান আহরণ না করে ভারতীয়দের শাসন করা যাবে না। এই প্রয়োজন মেটাতেই ম্যাক্সমুলারের সম্পাদনায় ভারতের প্রাচীন ধর্মশাস্ত্রের অনুবাদ শুরু হয়। ভারতের মধ্যে তাঁরা তাঁদের কল্পিত সত্ত্বা খুঁজে পান। ম্যাক্সমুলার তাই তাঁর সংস্কৃত নাম দেন মোক্ষমুলক। অন্যদিকে খ্রিস্টান মিশনারীগণ ভারতে খ্রিস্ট ধর্ম প্রচারের উদ্দেশ্যে হিন্দুধর্মের দুর্বলতার দিকগুলি খুঁজে বের করার চেষ্টা করেন। ম্যাক্সমুলারের ভারত নিয়ে বাড়াবাড়ি, খ্রিস্টান মিশনারীদের পছন্দ ছিল না। তার অনেক ধারণার বিকৃত ব্যাখ্যা দিয়ে তারা প্রচার করেন যে, ভারতীয়রা যেহেতু অতি লৌকিক জগৎ নিয়ে ব্যস্ত তাই তারা স্বশাসনের উপযুক্ত নয়। ঊনবিংশ শতকের ইংল্যান্ডের বুদ্ধিজীবী মহল খ্রিষ্টান যাজকদের আদর্শে প্রভাবিত ছিল যার পুরোভাগে ছিলেন যথাক্রমে চার্লস গ্রান্ট ও জেমস মিল। মিল তাঁর হিস্ট্রি অব ব্রিটিশ ইন্ডিয়া' গ্রন্থে (১৮১৭) ভারতের ইতিহাস হিন্দু, মুসলিম ও ব্রিটিশ এই তিন ভাগে ভাগ করেন। ধর্মের ভিত্তিতে এই কাল বিভাজন ভারত ও ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির প্রতি তাঁর বিরূপ মনোভাবের প্রতিফলন। ভারতের ইতিহাসকে হিন্দু ও মুসলিম যুগে ভাগ করলেও শেব পর্বের ইতিহাসকে খ্রিষ্টান যুগ আখ্যা না দিয়ে ব্রিটিশ যুগ আখ্যা দেওয়ার মধ্যে তাঁর সাম্রাজ্যবাদী মনোভাবের প্রতিফলন ঘটেছে। ভারতকে সঠিকভাবে জানার জন্য প্রাচীন ভারতের হিন্দু ধর্মশাস্ত্রের ইংরেজি অনুবাদের প্রয়োজন দেখা দেয়। এই সময়ে ''স্যাকরেড বুক অব দি ইস্ট' নাম দিয়ে প্রায় ৫০ খণ্ডের ধর্মীয় পুস্তকের অনুবাদ সিরিজ বের হয়। প্রাচ্যের এই পবিত্র গ্রন্থের সিরিজে কিছু চৈনিক ও ইরানীয় গ্রন্থ থাকলেও প্রাচীন ভারতীয় গ্রন্থই ছিল প্রধান।

১.৫ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ঔপনিবেশিক বা সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যা

ব্রিটিশ প্রশাসক ও বেশ কিছু পাশ্চাত্য পণ্ডিত প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সমাজ নিয়ে যে সামান্যীকরণের প্রয়াস নেন বা ভারতীয় সমাজের সামগ্রিক বৈশিষ্ট্য দানের চেষ্টা করেন তা সাম্রাজ্যবাদী ব্যাখ্যা (Imperialist view) নামে পরিচিত। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সমাজ সম্পর্কে জেমস মিল, ম্যাক্সমুলার ও চার্লস গ্রান্ট বিরূপ মন্তব্য করেন।

জেমস মিলের ধর্মের ভিত্তিতে ভারতের ইতিহাসের কাল বিভাজন উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। এইভাবে তিনি সাম্প্রদায়িক ইতিহাস চর্চার বীজ বপন করেন। তাঁর উদ্দেশ্য সম্পর্কে সন্দিহান হয়ে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের

সংস্কৃতের অধ্যাপক বলেন, "Its tendency was evil"। মিল সমকালীন ও প্রাচীন ভারতকে বর্বর ও যুক্তিবিরোধী আখ্যা দেন। তাঁর মতে ভারতীয় সভ্যতায় রাজনৈতিক মূল্যবোধের কোনো স্থান নেই এবং ভারতীয়রা বংশ পরম্পরায় স্বৈর শাসকদের দ্বারা শাসিত হয়ে এসেছে। শুরু থেকেই অনড়, অচল, ভারতীয় সমাজ প্রগতি-বিরোধী। মিল তাই বদ্ধ এই ভারতীয় সমাজকে ব্রিটিশ আইন প্রণয়নের মাধ্যমে পরিবর্তন করতে চেয়েছেন।

ম্যাক্সমুলার ও অন্যান্য প্রাচ্যবিদরা বলেন প্রাচীন ভারতীয়দের ইতিহাস চেতনার অভাব রয়েছে, বিশেষ করে সময় ও ঘটনাক্রম নিয়ে। তারা ভারতের গ্রামীণ সমাজকে অনড় আখ্যা দিয়েছেন। ভারতবর্ষকে তাঁরা দার্শনিকদের দেশ আখ্যা দেন, যারা অধিবিদ্যা বা অতিলৌকিক বিষয়ে নিজেদের নিমগ্ন রাখেন এবং জাগতিক ব্যাখ্যায় তারা উদাসীন। ভারতীয় সমাজকে তারা উদ্বেগহীন বা সামাজিক বিবাদ-মুক্ত অনাবিল গোষ্ঠী রূপে চিত্রিত করেছেন। এই পাশ্চাত্য পণ্ডিতেরা আরও বলেন যে, ভারতীয়রা স্বৈরশাসনে অভ্যস্ত। আধ্যাত্মিক চিন্তায় নিমগ্ন ভাবতীয়রা পার্থিব জগতের সমস্যা নিয়ে ভাবিত হন। তাঁরা আরও জোর দিয়ে বলেন যে, ভারতীয়দের যেমন মহাজাতিত্ব-র কোনও অভিজ্ঞতা নেই, তেমনই-নেই কোনও স্বায়ত্তশাসনের অভিজ্ঞতা।

চার্লস গ্রান্ট ও জেমস মিলের পর সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস চর্চার আরেক অন্যতম পুরোধা হলেন ভিনসেন্ট আর্থার স্মিথ(১৮৪৩-১৯২০)। তিনি ইন্ডিয়ান সিভিল সার্ভিসের অন্যতম সদস্য হিসেবে ১৮৬৯ খ্রিষ্টাব্দে ভারতে আসেন এবং ১৯০০ সাল পর্যন্ত ঐ পদে বহাল থাকেন।

তিনি তাঁর ১৯০৪ সালে লেখা 'আর্লি হিস্ট্রি অব ইন্ডিয়া'তে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সমাজ নিয়ে উপরোক্ত সাধারণ ধারণাগুলির অনেকটাই উল্লেখ করেছেন। মিলের মতো ভারতীয় সমাজ সভ্যতার কঠোর সমালোচক না হলেও স্মিথ বিশ্বাস করেন যে, ব্রিটিশ শাসনের মাধ্যমেই ভারতে অত্যাচারী স্বৈরশাসনের দীর্ঘ পরম্পরার অবসান ঘটে এবং রাজনৈতিক ঐক্য আসে। এই বক্তব্যের নিহিতার্থ-ই হল ভারতীয়রা স্বশাসনের উপযুক্ত নয়। ব্রিটিশ শাসনের একনিষ্ঠ ভক্ত এই সিভিল সার্ভেন্ট প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে বিদেশীদের ভূমিকার উপর বেশি গুরুত্ব আরোপ করেন। তাঁর লেখা গ্রন্থের প্রায় এক-তৃতীয়াংশ জুড়ে আলেকজেন্ডারের ভারত আক্রমণের বিবরণ দেওয়া হয়েছে। তবে স্মিথ আলেকজেন্ডার ছাড়াও অশোক, দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্ত এবং আকবরকেও যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। তাঁর লেখায় প্রকট হয়ে উঠেছে প্রাচীন ভারতীয় শাসকদের নির্মমতা। অর্থশাস্ত্রে বর্ণিত শাসন-পদ্ধতিকে তিনি সাম্রাজ্যবাদী জার্মানীর সঙ্গে তুলনা টানেন, যার সঙ্গে ব্রিটেনের যুদ্ধ চলছিল। তিনি কৌটিল্যের দণ্ডবিধিকে 'ferociously severe' আখ্যা দেন। প্রাচীন ভারতের স্বৈরতন্ত্রকে চিত্রিত করতে গিয়ে তিনি মন্তব্য করেন, "Autocracy is substantially the only form of government with which the historian of Indian is concerned"। সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ লেখক ও পন্ডিতদের ভারতীয় ইতিহাস ও সমাজের এই ব্যাখ্যা উদ্দেশ্যপ্রণোদিত ছিল। ব্রিটিশ রাজকে সমর্থন ও ভারতীয় সম্পদ শোষণের সপক্ষে ঐতিহাসিক সমর্থন আদায়-ই এর প্রধান লক্ষ্য ছিল। হিন্দু, মুসলিম, ব্রিটিশ তিন স্তরে জেমস মিলের এই কালবিন্যাস শুধু ত্রুটিপূর্ণই ছিল না, অসৎ উদ্দেশ্যপূর্ণ ছিল। শাসকের ধর্মই শাসিতের ধর্ম হবে —এই ধারা ভারতের ইতিহাসে কখনও ছিল না। তাই প্রাচীন ভারতকে হিন্দুযুগ আখ্যা দেওয়া যায় না। প্রাচীন ভারতের এক বিরাট অংশ জুড়ে বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের বিস্তার ঘটে এবং অনেক শাসক এই ধর্মের পৃষ্ঠপোষকতা করেন। তাছাড়া শুধু ধর্মই বা কেন হবে যুগ বিভাজনের মানদণ্ড? মিল যে মুসলিম যুগের কথা বলেছেন তখন মুসলিমরা শাসন ক্ষমতায় থাকলেও সংখ্যাগরিষ্ঠ প্রজারাই ছিলেন অমুসলিম। কেন তিনি ভারত ইতিহাসের

তৃতীয় পর্যায়ে 'খ্রিস্টান' যুগ আখ্যা না দিয়ে ব্রিটিশ যুগ আখ্যা দেন? ব্রিটিশ শাসনের মহিমা কীর্তন-ই এর প্রধান লক্ষ ছিল। স্বৈর শাসনে অভ্যস্ত ভারতীয়রা ইহজাগতিক বিষয়ে ধ্যান না দিয়ে পরলোক চর্চা করলে আখেরে ব্রিটিশ শাসকদেরই সুবিধা হবে ভারত শাসন করতে। এইভাবে স্বশাসনে অনভ্যস্ত ভারতে ব্রিটিশ শাসন স্থায়ী হবে।

১.৬ প্রাচীন ভারতের জাতীয়তাবাদী ব্যাখ্যা

ব্রিটিশ তথা পাশ্চাত্য পণ্ডিতদের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস ও সমাজের বিকৃত ব্যাখ্যার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ পাশ্চাত্য শিক্ষিত জাতীয়তাবাদীরা ভারতের ইতিহাসের প্রকৃত স্বরূপ উদ্ঘাটনের যে প্রয়াস নেন তা জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চা নামে খ্যাত। ব্রিটিশ প্রশাসক ও পণ্ডিতদের ভারতের ইতিহাসের একপেশে ও বিকৃত ব্যাখ্যায় ভারতের শিক্ষিত সমাজ আহত হয়। একই সঙ্গে তারা লক্ষ করেন ব্রিটেনের প্রগতিশীল পুঁজিবাদী সমাজ এবং ভারতের পচনশীল সামন্ত সমাজের মধ্যে বিরাট বৈপরীত্য। এই অবস্থায় একদল ভারতীয় পণ্ডিত ভারতীয় সমাজের সংস্কারে ব্রতী হন। কারণ তারা বুঝতে পারেন যে সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস চর্চায় ভারতীয় ইতিহাস ও সমাজের বিকৃত ব্যাখ্যা দেওয়া হলেও তাদের বক্তব্যে কিছুটা বৈধতা আছে। ইতিহাসের ঘটনাক্রম সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয়দের চেতনা চৈনিক ও মুসলিমদের চেয়ে কম একথা অস্বীকার করার উপায়.নেই। তবে গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুর পর ভারতের ইতিহাসের সব গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা তার ভিত্তিতে স্থির করা হত। তাছাড়া ভারতীয় সমাজের বর্ণ ও জাতি বিভাজন যে আমাদের বড় দুর্বলতা একথাও জাতীয়তাবাদীরা জানতেন। তাই তারা ভারতীয় সমাজের সংস্কারের কাজে এগিয়ে আসেন। জাতীয়তাবাদীরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা করতে গিয়ে হিন্দু ভাবাদর্শের পুনরুত্থান ঘটান। জাতীয়তাবাদীদের মধ্যে একদল প্রাচীন ভারতের যুক্তিবাদী ব্যাখ্যা দেন। যুক্তিবাদী জাতীয়তাবাদী গোষ্ঠীর অন্যতম হলেন রাজেন্দ্রলাল মিত্র (১৮২২-৯১) রামকৃষ্ণ গোপাল ভান্ডারকার (১৮৩৭-১৯২৫), বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজওয়াড়ে (১৮৬৯-১৯২৬), দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভান্ডারকার, হেমচন্দ্র রায় চৌধুরী (১৮৯২-১৯৫৭) রমেশচন্দ্র মজুমদার, নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী, কে. পি জয়সওল প্রমুখ।

জাতীয়তাবাদী এতিহাসিককেরা প্রাচীন পুঁথি, লেখ, মুদ্রা ও অন্যান্য প্রামাণ্য উপাদানের উপর ভিত্তি করে সযত্নে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা করেন। প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা এবিষয়ে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। দক্ষিণ ভারতকে এই ইতিহাসের অঙ্গীভূত করা হয় এবং আঞ্চলিক রাজনৈতিক ক্ষেত্রেও উল্লেখযোগ্য প্রগতি ঘটে। যুক্তিবাদী জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক রাজেন্দ্রলাল মিত্র বেশ কিছু বৈদিক পুস্তিকা এবং "ইন্দো এরিয়ানস" শীর্ষক গ্রন্থ রচনা করেন। প্রাচীন ঐতিহ্যের অনুরাগী মিত্র ভারতের প্রাচীন সমাজ সম্পর্কে যুক্তিপূর্ণ দৃষ্টিভঙ্গি গ্রহণ করেন। তিনি তাঁর এক রচনায় ঘোষণা করেন যে প্রাচীন ভারতীয়রা গোমাংস খেত। মহারাষ্ট্রে রামকৃষ্ণ গোপাল ভান্ডারকার (১৮৩৭-১৯২৫) এবং বিশ্বনাথ কাশীনাথ রাজওয়াড়ে নামের দুই জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিক আবির্ভূত হন। ভান্ডারকার দাক্ষিণাত্যের সাতবাহনদের ইতিহাস ও বৈষ্ণবধর্ম ও অন্যান্য ধর্মীয় গোষ্ঠীর ইতিহাস রচনা করেন। সামাজিক সংস্কারক হিসেবে তিনি বিধবা বিবাহ প্রথাকে সর্মথন করেন এবং জাতিভেদ প্রথা ও বাল্য বিবাহের তীব্র সমালোচনা করেন। প্রাচীন ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন করে তিনি এই কুপ্রথার বিরুদ্ধে শাণিত আক্রমণ করেন। অন্যদিকে রাজওয়াড়ে মহারাষ্ট্রের গ্রামে গ্রামে ঘুরে সংস্কৃত পান্ডুলিপি এবং মারাঠা ইতিহাসের উপাদান গ্রহণ করেন। ১৯২৬ সালে তিনি মারাঠি ভাষায় বিবাহ প্রথার ইতিহাস শীর্ষক অনবদ্য ধ্রুপদী গ্রন্থ রচনা করেন। এই গ্রন্থের মাধমে ভারতের বিবাহ প্রথার বিবর্তনের ইতিহাস তিনি তুলে ধরেন তাতে তাঁর অন্তরের দৃষ্টি ফুটে

ওঠে। বিখ্যাত সংস্কৃতজ্ঞ পাণ্ডুরঙ্গ বামন কানে (১৮৮০-১৯৭২) সামাজিক সংস্কারের এই ধারাকে এগিয়ে নিয়ে যান। তাঁর পাঁচ খণ্ডে প্রকাশিত 'হিস্টি অব দা ধর্মশাস্ত্র'কে এক কথায় বলা যেতে পারে প্রাচীন আইন ও প্রথার বিশ্বকোষ, যা আমাদের প্রাচীন ভারতের সামাজিক প্রক্রিয়াকে জানতে সাহায্য করে।

ভারতের জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চা প্রারম্ভিকভাবে সংস্কার দিয়ে শুরু হলেও কালক্রমে তা সাম্রাজ্যবাদ-বিরোধী রূপ নেয়। ১৯০৫ সালে বঙ্গভঙ্গ-বিরোধী আন্দোলন চরম রূপ নিলে ভারতীয় রাজনীতিতেও চরমতা প্রকাশ পায় এবং সংগ্রামশীল জাতীয়তাবাদের বিকাশ ঘটে। এর ফলে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চায় ভারতের ইতিহাসের নবরূপ দানের চেষ্টা করা হয়। কিছুটা সাম্রাজ্যবাদী ইতিহাস চর্চার প্রতিক্রিয়াস্বরূপ এবং কিছুটা জাতীয় মর্যাদা বৃদ্ধি ঘটাবার পদক্ষেপ হিসেবে ভারতীয় ঐতিহাসিকেরা নব উদ্যমে ভারতীয় অতীতের ভাবমূর্তি উদ্ধারে সচেষ্ট হন। হিন্দু সংস্কৃতিকে তাই এশীয় সংস্কৃতির পূর্বসূরী আখ্যা দেওয়া হয়। জেমস মিলের কাল বিভাজনে প্রাচীন ভারতকে যেভাবে 'হিন্দুযুগ' আখ্যা দেওয়া হয়, সেই যুগকেই জাতীয়তাবাদীরা সমৃদ্ধি ও সন্তোষের যুগ হিসেবে চিহ্নিত করেন। ভারতীয় সমাজের অসাম্য আড়াল করে একে সামাজিক ঐক্য ও শান্তির এক আদর্শ মডেল রূপে চিত্রিত করা হয়। প্রাচীন ভারতের গুপ্ত যুগকে তই 'স্বর্ণযুগ' আখ্যা দেওয়া হয়।

জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকদের একদল কঠোর পরিশ্রম করে ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস লিপিবদ্ধ করতে উদ্যোগী হন। এ বিষয়ে যাঁরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন তারা হলেন দেবদত্ত রামকৃষ্ণ ভান্ডারকার (১৮৭৫-১৯৫০), হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী (১৮৯২-১৯৫৭), ও রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৪-১৯৮০)। শিলালিপি বিশারদ ডি.আর.ভান্ডারকার অশোক ও প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের উপর গ্রন্থ রচনা করেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে আরও গুরত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী। তিনি মহাভারতের যুদ্ধের পর পরীক্ষিতের সিংহাসনে আরোহণ থেকে গুপ্ত যুগ পর্যন্ত বিস্তৃত সময়ের রাজনৈতিক ইতিহাস রচনা করেন। 'পলিটিক্যাল হিস্ট্রি অব অ্যানসিয়েন্ট ইন্ডিয়া'-শীর্ষক এই গ্রন্থ ১৯২৩ সালে প্রথম প্রকাশিত হয়। ইউরোপীয় ইতিহাসের একজন শিক্ষক হিসেবে তিনি কিছু পদ্ধতি ও তাঁর অন্তর্দৃষ্টি এই গ্রন্থ রচনায় কাজে লাগান। যদিও তিনি ইতিহাসের কাল বিভাজন নিয়ে আলোচনা করেননি। তাঁর রাজনৈতিক ইতিবৃত্ত খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতক পর্যন্ত প্রসারিত। অধ্যাপক রায়চৌধুরী তার গ্রন্থে ভি.এ.স্মিথের অবদানকে স্বীকার করলেও অনেক বিষয়ে তাঁর সমালোচনা করেন। তাঁর লেখার বিশেষত্ব হল তিনি প্রাচীন ভারতের আকর উপাদান (বৌদ্ধ-জৈন উপাদানসহ) ব্যবহার করে যে তথ্যনিষ্ঠ ইতিহাস রচনা করেন তাতে তার পাণ্ডিত্যের পরিচয় পাওয়া যায়। কিন্তু একই সঙ্গে অশোকের অহিংসা ও শান্তি নীতি সমালোচনার মধ্যে তার সক্রিয় ব্রাহ্মণ্যবাদী মনোভাবের প্রকাশ ঘটে। বিখ্যাত ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার (১৮৮৪-১৯৮০) জাতীয়তাবাদী এতিহাসিকদের মধ্যে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। তিনি ইতিহাসের নানা শাখায় অবাধ বিচরণ করে প্রচুর গ্রন্থ রচনা করেছেন। তবে তার লেখায় হিন্দু পুনরুত্থানবাদী উপাদান স্পষ্ট। ভারতীয় বিদ্যাভবন থেকে 'হিষ্ট্রি অ্যান্ড কালচার অব দ্য ইন্ডিয়ান পিপল' শিরোনামে প্রকাশিত বহুখণ্ডের ভারতের ইতিহাসের তিনি সাধারণ সম্পাদক। প্রাচীন ভারতের বেশির ভাগ লেখকই তাদের আলোচনায় দক্ষিণ ভারতকে বিশেষ গুরুত্ব দেননি। কে. এ. নীলকণ্ঠ শাস্ত্রী (১৮৯২-১৯৭৫) তাঁর 'A History of South India' গ্রন্থে দক্ষিণ ভারতের উপর আলোকপাত করেন। তবে দক্ষিণ ভারতের রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস নিয়ে তাঁর সাধারণ মন্তব্যের উপর অনেক পণ্ডিত প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁর রচনায় ব্রাহ্মণদের সাংস্কৃতিক আধিপত্যের বিষয়টি ফুটে উঠেছে এবং প্রাচীন ভারতীয় সমাজের ঐক্যের কথা তিনি বলেছেন।

জাতীয়তাবাদীদের ইতিহাস চর্চায় প্রাচীন ভারতের ব্যক্তিত্ব ও প্রতিষ্ঠান নিয়ে মাত্রাতিরিক্ত দাবি করা হয়, বিশেষ করে ১৯০৫ সালে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র আবিষ্কৃত হওয়ার পর। ১৯০৯ সালে কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র প্রকাশিত হবার পর তাঁর সঙ্গে বিসমার্কের সামাজিক ও অর্থনৈতিক নীতিগুলির তুলনা টানা হয়। অর্থশাস্ত্রে উল্লিখিত কৌটিল্যের মন্ত্রীপরিষদকে ব্রিটেনের প্রিভি কাউন্সিলের সঙ্গে তুলনা করা হয় এবং কৌটিল্যের নরপতিত্বের আদর্শকে বলা হয় সাংবিধানিক রাজতন্ত্রের সমতুল্য। কে পি জয়সওয়াল তাঁর রচনায় ভারতীয় স্বৈরতন্ত্রের অতিকথাকে দূর করেন। ১৯১০-১৯১১ সাল নাগাদ তিনি প্রমাণ করার চেষ্টা করেন যে প্রাচীন ভারতে গণরাজ্য ছিল। তাঁর গবেষণা পূর্ণতা পায় ১৯২৪ সালে হিন্দু পলিটি' শীর্ষক গ্রন্থ প্রকাশের মাধ্যমে। এ এস আলতেকর (১৮৯৮ — ১৯৫৯) শক ও কুষাণ শাসন থেকে ভারতকে মুক্ত করার ব্যাপারে দেশীয় শাসকদের ভূমিকাকে গুরুত্ব দেন। তিনি ভুলে যান যে, মধ্য এশীয়ার মানুষের জীবন ভারতের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিল। আর প্রাচীন ভারতের গণরাজ্যগুলিকে এথেনীয় গণতন্ত্রের সমতুল্য আখ্যা দেওয়া হয়। এই ধরণের তুলনামূলক আলোচনার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদীরা প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন ভারতের দীর্ঘ গণতান্ত্রিক ঐতিহ্যের কথা, যা আদায়ের জন্য এখন তারা ব্রিটিশ সরকারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে রত। এইভাবে কে. পি. জয়সওয়ালের মতো ঐতিহাসিকেরা ভারতের স্বাধীনতা আন্দোলনের আদর্শগত পটভূমি রচনা করেছিলেন।

ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে দেখা যাবে জাতীয়তাবাদীর প্রাচীন ভারতের অতীত গৌরবের কথা বলতে গিয়ে হিন্দু জাতীয়তাবাদকে জোর দিয়েছেন, যা পরবর্তীকালে ভারতের সাম্প্রদায়িক ইতিহাস চর্চার জন্ম দেয়। হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আদর্শকে মেনে নিলে প্রকারান্তরে মিলের কাল বিভাজনকে মেনে নিতে হয়, যা ভ্রান্ত ধারণার উপর প্রতিষ্ঠিত। একথা তো ঠিক যে ১২০০ খ্রিস্টাব্দ পর্যন্ত প্রাচীন ভারতীয় রাজারা সকলে হিন্দু ছিলেন না। উপরোক্ত যুগের শাসক বংশের মধ্যে ইন্দো-গ্রীক, শক .কুষাণ রাজারা কেউই হিন্দু ছিলেন না। এমনকি মৌর্য শাসকদের অনেকেই হিন্দু ছিলেন না। তাই অতীত গৌরবের নামান্তর হিন্দুত্ববাদ হতে পারে না। তাই তাঁদের ইতিহাস চর্চায় ভারতের মিশ্র সংস্কৃতি ও বহু স্বরের আদর্শ উপেক্ষিত হয়েছে।

১.৭ প্রাচীন ভারত ইতিহাসের মার্কসীয় ব্যাখ্যা

বিংশ শতকের পঞ্চাশের দশকে ভারতে মার্কসীয় ইতিহাস চর্চার উদয় হয়। প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগের ভারতের ইতিহাস রচনায় এই ব্যাখ্যা এক নতুন দিগন্ত উন্মোচিত করে। এই ইতিহাস চর্চার প্রধান সদর্থক দিক হল-এর মাধ্যমে মার্কসীয় তথা বামপন্থী ঐতিহাসিকেরা ঘটনাবহুল রাজনৈতিক ইতিহাস থেকে আমাদের দৃষ্টি সামাজিক ও অর্থনৈতিক কাঠামো ও প্রক্রিয়া বিশেষত উৎপাদন প্রক্রিয়া, স্তর-বিন্যস্ত শ্রেণি ও কৃষি সম্পর্কের দিকে ঘুরিয়ে দেন। মার্কসীয় ইতিহাস চর্চার আরেকটি প্রধান দিক হল সম্ভ্রান্ত শ্রেণির কথা না বলে এতাবৎকাল অবহেলিত শতাব্দীর পর শতাব্দী শোষিত ও নিপীড়িত সাধারণ মানুষের কথা বলা। ভারতে মার্কসীয় ইতিহাস চর্চা শুরু হয় দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী (১৯০৭-১৯৬৬)-র হাত ধরে। তিনি কার্ল মার্কসের অনুসৃত পদ্ধতিতে ভারতের ইতিহাসের বস্তুগত বিশ্লেষণ করেন। তিনিই প্রথম ভারতে বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ইতিহাস বিশ্লেষণ করে গবেষণার নতুন ক্ষেত্র উন্মুক্ত করেন। তিনিই প্রথম মনে করেন প্রথাগত কাল বিভাজন না করে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের কাল বিভাজনের মানদণ্ড হওয়া উচিত সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ ঘটনা যা সাধারণ মানুষের জীবনের মোড় ঘুরিয়ে দিয়েছিল। তিনি সেই সমস্ত দিক-পরিবর্তনকারী ঘটনাগুলি চিহ্নিত করার কথা বলেন। এ বিষয়ে তার লেখা 'An Introduction to the Study of Indian History (1957)' এবং 'Culture and

civilization of Ancient India in Historical Outline (1965)' ধ্রুপদী গ্রন্থের মর্যাদা পায়। কোশাম্বীর মতে সমাজ, অর্থনীতি ও সংস্কৃতির ইতিহাস হল উৎপাদন সম্পর্ক ও শক্তি বিকাশের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ যা ইতিহাসের যুগ বিভাজনকে যুক্তিগ্রাহ্য ভিত্তি দান করতে সক্ষম। সাময়িকভাবে হলেও এই বিষয়ে অনেকে সহমত পোষণ করেন। কোশাম্বীর এই ব্যাখ্যার উপর ভিত্তি করেই বলা যায় ভারতের ইতিহাসে মধ্যযুগীয়তা আর ইসলামের আবির্ভাব একই সঙ্গে ঘটেনি বরং ষষ্ঠ শতকের শেষ পর্বে গুপ্তযুগের অবসান ভারতে গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। গুপ্তবংশের পতনের পর ভারতে বেশ কিছু সামন্ত ক্ষেত্রের উদ্ভব ঘটে এবং এই সময় ব্যবসা-বাণিজ্যেও অবনতি লক্ষ করা যায়। এর ফলে বদ্ধ গ্রামীণ অর্থনীতির বিকাশ ঘটে যা ভূমিদাস প্রথা ও সামন্ততান্ত্রিক কৃষি কাঠামো গড়ে ওঠার অনুকূল পটভূমি রচনা করে। এই পরিবেশেই আঞ্চলিক ভাষা, শিল্প স্থাপতোর বিকাশ ঘটে। এইসব দিক বিবেচনা করেই খ্রীষ্টিয় ষষ্ঠ শতকের শেষ ও সপ্তম শতকের সূচনা-কালকে প্রাচীন ও মধ্যযুগের মধ্যে জলবিভাজিকা হিসেবে চিহিত করা যেতে পারে।

মার্কসীয় ইতিহাস চর্চা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখলেও এর বেশকিছু সীমাবদ্ধতা চোখে পড়ে। প্রথমেই বলতে হয় মার্কসীয় রচনা প্রায়শই ইতিহাসের একরৈখিক বিশ্লেষণেই সীমাবদ্ধ থাকে যা পাশ্চাত্য ঐতিহাসিক ও নৃতাত্ত্বিক রচনা থেকে অনুপ্রাণিত। এছাড়া মার্কসীয় ঐতিহাসিকেরা শ্রেণি-সম্পর্কের উপর বেশি গুরুত্ব দেওয়ায় সামাজিক স্তরবিন্যাসের অন্যান্য ভিত্তিগুলি (যেমন জাতি, লিঙ্গ ইত্যাদি) অবহেলিত হয়েছে। ধর্ম ও সংস্কৃতিকে বিশেষ গুরুত্ব না দিয়ে মার্কবাদী ঐতিহাসিকেরা প্রায়শই তাকে আর্থ-সামাজিক কাঠামোর প্রতিফলন হিসেবে দেখেছেন। এইসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও মার্কসীয় ইতিহাস চর্চা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় এক গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিসেবে পরিগণিত হয়ে আসছে।

১.৮ প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে ধর্মীয় ও সাম্প্রদায়িক ঘরানা

ব্রিটিশ পণ্ডিতদের প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ব্যাখ্যার প্রতিবাদ স্বরূপ ভারতীয় পণ্ডিত ও গবেষকরা অনেকেই হিন্দু সংস্কারবাদীদের আদর্শের দারা প্রভাবিত হয়েছিলেন। ভারতে জাতীয়তাবাদ ও রাজনৈতিক চেতনার বিকাশও তাঁদের প্রভাবিত করেছিল। রামকৃষ্ণ, বিবেকানন্দ ও স্বামী দয়ানন্দের আদর্শ নিঃসন্দেহে হিন্দুধর্ম সংস্কার আন্দোলনের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল যাকে হিন্দু পুনরুত্থানবাদী আন্দোলন আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। রামকৃষ্ণের "যত মত তত পথ" আদর্শের মধ্যে সকল ধর্মমতের সহাবস্থান লক্ষ করা যায়। তিনি ঘোষণা করেন হিন্দুধর্মের ছাত্রছায়ায় সকল ধর্ম সাদরে গৃহীত হয়েছে। তাঁর শিষ্য বিবেকানন্দ এবং পরবর্তীকালে অ্যানি বেসান্ত হিন্দুধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রমাণ করতে চেয়েছিলেন। বঙ্কিমচন্দ্র প্রচার করেন জাতি (nation) হিসেবে ভারতের বিকাশের জন্য হিন্দুধর্মের পুনরুত্থান বিশেষ প্রয়োজন। আর্যসমাজের প্রতিষ্ঠাতা দয়ানন্দ সরস্বতী "বেদের যুগে' ফিরে যাওয়ার ডাক দেন। উপরোক্ত সংস্কারক ও তাত্ত্বিক নেতাদের প্রভাবে ভারতীয় পণ্ডিতেরা হিন্দুধর্মের সুরক্ষায় এগিয়ে আসেন এবং বেদকে সকল জ্ঞান ও যুক্তিবাদী চিন্তার আধার মনে করেন। আদি প্রাচ্যবিদরা সংস্কৃতের সঙ্গে ইওরোপীয় ভাষাগুলির সাদৃশ্য উল্লেখ করায় হিন্দুত্ববাদী ভারতীয় পন্ডিতেরা উৎসাহিত হন। ভারতীয় পন্ডিতেরা এখন ইন্দো-ইউরোপীয়দের মানব সভ্যতার স্রষ্টা আখ্যা দেন এবং ভারতকে আর্যদের আদি বাসস্থান হিসেবে প্রচার করেন। এরই অনিবার্য ফলশ্রুতিরূপে তাঁরা ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্বকে আরও পিছিয়ে দেন। জাতীয়তাবাদী নেতা বালগঙ্গাধর তিলক বৈদিক সাহিত্যকে খ্রীষ্টপূর্ব তিন সহস্রাব্দের সাহিত্য আখ্যা দেন। যদিও তাঁদের এই দাবি ১৯২৩-২৪ খ্রীষ্টাব্দে হরপ্পা সভ্যতা আবিষ্কারের পর ভ্রান্ত প্রমাণিত

হয়। তবুও ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনত্ব বিশেষত বেদের শুদ্ধতা, শ্রেষ্ঠত্ব ও প্রাচীনত্ব নিয়ে তাদের বাড়াবাড়ি চলতেই থাকে। এর ফলে ভারতীয় রাজনীতিতে হিন্দুত্ববাদী ভাবধারা উদয় হয়।

১৯৩০ ও ১৯৪০-এর দশকে জাতীয়তাবাদী ইতিহাস চর্চায় হিন্দুত্ববাদের পুরোধা বিনায়ক দামোদর সাভারকারের আদর্শ গুরুত্ব পায়। তিনি হিন্দুত্ববাদ ও হিন্দুরাষ্ট্রের আদর্শ প্রচার করেন। তিনি সকল রাজনীতিকে হিন্দু রাজনীতিতে পরিণত করার আহ্বান জানান এবং হিন্দুদের সামরিকীকরণের কথা বলেন। তাঁর এই হিন্দুত্বের শ্লোগান ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির জন্ম দেয়।

সাভারকারের অনুপ্রেরণায় ১৯২৫ খ্রীষ্টাব্দে নাগপুরে কে. ডি. হেডগাওয়রের নেতৃত্বে হিন্দুত্ববাদী প্রতিষ্ঠান প্রতিষ্ঠান রাষ্ট্রীয় স্বয়ংসেবক সংঘ (R.S.S) প্রতিষ্ঠিত হয়। আর এস এস-এর কট্টর হিন্দুত্ববাদ ভারতীয় রাজনীতিতে সাম্প্রদায়িকতার কুপ্রভাব ফেলে। এরই ফলশ্রুতি স্বরূপ জাতির জনক মহাত্মা গান্ধীকে প্রাণ দিতে হয়।

১৯৮০-র দশকে কিছু ভারতীয় লেখক ও তাদের পাশ্চাত্য অনুগামীরা প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চায় আক্রমণাত্মক ও অযৌক্তিক উপাদান আমদানি করেন। হিন্দুত্বের সঙ্গে একাত্মতাই তাদের মূল লক্ষ্য ছিল। ব্রিটিশ শাসনকালে ঔপনিবেশিক ইতিহাস চর্চায় যেমন ইচ্ছে করে ভারতের কৃতিত্ব ও মহত্বকে খাটো করা হত এবং ভারতীয় সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ দিকগুলিকে পাশ্চাত্য প্রভাবের ফল হিসেবে বর্ণনা করা হত তেমনি এইসব ভারতীয় ঐতিহাসিকরা বিশ্বসংস্কৃতিতে ভারতের অবদানকে তুলে ধরার চেষ্টা করেন। এইভাবে ভারতের ইতিহাসের ব্যাখ্যায় ঔপনিবেশিকতাবাদ ও জাতীয়তাবাদের মধ্য দ্বন্দ্ব শুরু হয়। এখন এই অবস্থার পরিবর্তন ঘটে। ঔপনিবেশিকতা বনাম জাতীয়তাবাদের এই সংগ্রাম পাল্টে গিয়ে হয় অযৌক্তিকতাবাদ বনাম যৌক্তিকতাবাদ ও পেশাদারিত্বের সংগ্রাম। যদিও সাম্প্রতিক কালের বেশির ভাগ লেখক-ই তাঁদের যুক্তিবাদী চিন্তা ও পেশাদারি মনোভাবের পরিচয় দেন। কিছু লেখক কল্পকথা ও অযৌক্তিক চিন্তা ও আবেগকে বেশি প্রাধান্য দেন। সাম্প্রদায়িক ইতিহাস চর্চায় তাই ঐতিহাসিক সভ্যতা অনেকাংশে উপেক্ষিত হয়। এই সীমাবদ্ধতা মেনে নিয়েও একে ভারতের ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ ধারা হিসাবে গণ্য করা হয়।

১.৯ উপসংহার

ইতিহাস চিন্তন ও চর্চার পদ্ধতিগুলি সদা পরিবর্তনশীল। সেই কারণেই অতীতচর্চা প্রাণবন্ত হয়ে ওঠে, তা কেবলমাত্র স্মৃতিরোমন্থন বা অতীত গৌরব পুনরুদ্ধারে সীমাবদ্ধ থাকে না। প্রাচীন ভারতীয়দের ইতিহাস চেতনার অনুসন্ধানেও সেকথা আমাদের মনে রাখা জরুরি। রণবীর চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন, কালগত পারম্পর্য মেনে অতীতকে বিচার করার নির্দিষ্ট রীতিনীতি প্রাচীন ভারতীয় চিন্তায় সর্বত্র দেখা যাবে না। কিন্তু তার অর্থ এই নয় যে, প্রাচীন আমলে ভারতের মানুষ অতীত সম্পর্কে অবহিত ছিলেন না বা অনীহা পোষণ করতেন। বরং তাঁদের অতীত সম্বন্ধে ধারণা এবং দৃষ্টিভঙ্গী আধুনিক হিস্ট্রির থেকে ভিন্ন। ইতিহাস-পুরাণাশ্রয়ী এই পথেই জগতের সৃষ্টি, মানুষের উদ্ভব, মানবসমাজের উন্মেষ এই বিষয়গুলি সম্পর্কে প্রাচীন ভারতীয় ধারণার কিছুটা পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাথমিক পর্বে ভারতীয়দের ইতিহাস চিন্তার গতিধারার এই অনুসন্ধান ঔপনিবেশিক শাসকদের তত্ত্বাবধানেই শুরু হলেও ক্রমে জাতীয়তাবাদী ও মার্কসবাদী ভাষ্যের উন্মেষ এই প্রচেষ্টাকে আরো প্রাণবন্তকর চরিত্র প্রদান করেছে। যুক্ত হয়েছে নিত্য নতুন মাত্রা ও উস্কে দিয়েছে নয়া বিতর্ক। সব মিলিয়ে সমৃদ্ধ হয়েছে ইতিহাসচর্চা।

১.১০ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. ইতিহাস ও 'হিস্ট্রি'র তফাৎ কী?

২. "প্রাচীন ভারতীয়দের ইতিহাস সম্পর্কে কোনো ধারণাই ছিল না"— তুমি কী এই মত সমর্থন করো?

৩. প্রাচীন ভারতীয়দের ইতিহাস সম্পর্কে সাম্রাজ্যবাদী ধারণা কেমন ছিল?

৪. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় মার্কসবাদী ব্যাখ্যা কী কোন নতুন দিক উন্মোচিত করেছিল?

৫. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাস সম্পর্কে সাম্প্রদায়িক ব্যাখ্যা কতদূর গ্রহণীয়?

১.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

অশীন দাশগুপ্ত, ইতিহাস ও সাহিত্য, কলকাতা, আনন্দ, ১৯৮৯।

রণবীর চক্রবর্তী, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব(প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ), প্রথম খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

ড. রতন কুমার বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (আদিপর্ব), প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, কলকাতা, ২০১৯।

Romila Thapar– Early India- From The Origins to Circa A.D. 1300, London– 2002.

Upinder Singh– A History of Ancient and Early Medieval India, Pearson– 2009.

R.S. Sharma– India's Ancient Past, OUP, New Delhi– 2005.

একক ২ ◻ ইতিহাস রচনার সূত্র ও উপাদান (Sources and tools of Historical Reconstruction)

গঠন

২.০ উদ্দেশ্য

২.১ সূচনা

২.২ উপাদানের প্রকারভেদ

২.৩ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান

২.৩.১ লেখ-র গুরুত্ব

২.৩.১.১ প্রাক-মৌর্য পর্বের লেখ

২.৩.১.২ মৌর্য-পর্বের লেখসমূহ

২.৩.১.৩ মৌর্য-পরবর্তীপর্বের লেখ

২.৩.১.৪ লেখ-র সীমাবদ্ধতা

২.৪ মুদ্রার ভূমিকা

২.৪.১ অভিজ্ঞান মুদ্রা

২.৪.২ সতর্কতা

২.৫ স্থাপত্য-ভাস্কর্য

২.৬ সাহিত্যিক উপাদান

২.৬.১ বেদ ও বৈদিক সাহিত্য

২.৬.২ পুঁথি

২.৬.৩ রামায়ণ ও মহাভারত

২.৬.৪ পুরাণ

২.৬.৫ বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থ সমূহ

২.৬.৬ অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ

২.৬.৭ মৌর্য ও গুপ্ত পর্বের গ্রন্থসমূহ

২.৬.৮ গুপ্তোত্তর পর্বের সাহিত্য

২.৬.৯ স্থানীয় ইতিবৃত্ত

২.৬.১০ কৃষিবিষয়ক গ্রন্থ

২.৬.১১ সঙ্গম সাহিত্য

২.৬.১২ বিদেশী সাহিত্য

২.৭ উপসংহার

২.৮ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

২.৯ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

২.০ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠের উদ্দেশ্য হল প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় কী জাতীয় সূত্র ও উপাদানের ব্যবহার করা হয় এবং এই উপাদানসমূহের শ্রেণিকরণ বা বর্গীকরণ কী ধরনের হতে পারে তা উপলব্ধি করা।
- উপাদানের প্রকারভেদ-
  - ➢ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান
  - ➢ সাহিত্যিক উপাদান

২.১ সূচনা

অতীত সম্পর্কে মানুষের জানার আগ্রহ বরাবরের, আর অতীত ঘটনাই হল ইতিহাসের বিষয়বস্তু। যদিও সব অতীতই ইতিহাস নয়। তাই ইতিহাস লিখতে গেলে ঐতিহাসিককে অতীতের কারবারী হতেই হয়। অমলেশ ত্রিপাঠীর কথায় "কবি নিরবধিকাল 'বিপুলা পৃথ্বীর' কথা ভেবে অপেক্ষা করতে পারেন, কিন্তু ঐতিহাসিক নৈবচ"। কালের ইতিহাস রচনায় তাকে সাহায্য নিতে হয় প্রধানত প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উপাদানের উপর। তবে একটা কথা মনে রাখা দরকার যে কোন একটি বিশেষ তথ্যের উপর নির্ভর করে কোন বিষয়ের ভিন্ন ভিন্ন ব্যাখ্যা দেন বিভিন্ন ঐতিহাসিক। কারণ তাঁদের দৃষ্টিভঙ্গি বিভিন্ন, কোন নির্দিষ্টকালে তাঁর গবেষণা, শিক্ষা, রচনা সীমাবদ্ধ। বলা বাহুল্য, এটাই হল ইতিহাসের বড় আকর্ষণ। রণবীর চক্রবর্তী লিখেছেন যে, অতীত সম্বন্ধে ঐতিহাসিকের মনগড়া সিদ্ধান্ত ইতিহাসচর্চায় গ্রাহ্য হয় না। বহুল পরিচিত ঘটনার বিবরণ দেওয়ার ক্ষেত্রে মূল তথ্য সূত্রের উল্লেখ না করা হলেও, সুদূর অতীত সম্বন্ধে যেহেতু আমাদের জ্ঞান সীমাবদ্ধ, তাই প্রাচীন আমল সম্পর্কে মূল্যায়ন করতে গেলে ঐতিহাসিককে দর্শাতেই হয় যে কিসের ভিত্তিতে তিনি তাঁর সিদ্ধান্তে উপনীত হলেন। আবার একথাও ঠিক যে, প্রাচীন তথ্যসূত্র অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অসম্পূর্ণ, ভগ্ন ও বিক্ষিপ্ত। প্রাচীন তথ্যসূত্র যে বিষয়ে নীরব, সে বিষয়ে ঐতিহাসিকের মনগড়া বক্তব্য কোন মান্যতা পায় না। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, প্রাচীনকাল সম্পর্কে যেহেতু আমাদের ধারণা ও পরিচিতি গড়ে ওঠে অতীতের তথ্যসূত্রের আলোকে, সেহেতু নতুন তথ্যসূত্রের আবিষ্কার দীর্ঘকাল অজ্ঞাত অতীতকে আলোকিত করে তোলে। তাঁর ফলে এতদিন পর্যন্ত ঐতিহাসিক যে মতামত পোষণ করতেন, তাতে পরিবর্তন আসতে বাধ্য। সম্প্রতি, প্রাচীন ভারতের সমাজ-ইতিহাস বোঝার ক্ষেত্রে শাস্ত্রগ্রন্থের সাক্ষ্যের পাশাপাশি ঐতিহাসিকরা নজর দিচ্ছেন ভাস্কর্যশিল্প ও চিত্রকলা থেকে

আহৃত চাক্ষুষ তথ্যের দিকে। তাই বলা যায় প্রাচীন ইতিহাসচর্চার আকর তথ্যসূত্রের বৈচিত্র্য ও তাদের বিবিধ উপযোগিতা সম্বন্ধে ঐতিহাসিককে সচেতন থাকতেই হয়।

২.২ উপাদানের প্রকারভেদ

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের উপাদানকে মূলতঃ দুটি ভাগে ভাগ করা যায়— প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান ও সাহিত্যিক উপাদান।

২.৩ প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান

মধ্য ও আধুনিক ভারতবর্ষের তুলনায় প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনা করার কাজ অপেক্ষাকৃত কঠিন। তার অন্যতম কারণ হল ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাব। প্রাচীন ভারতে সাহিত্যিক উপাদানের যথেষ্ঠ অভাব আছে, কারণ ভারতে প্রাচীন গ্রীস বা ইটালীর ন্যায় কোন হেরোডোটাস, থুকিডিডিস, লিভি বা ট্যাকিটাস কেউ জন্মান নি। প্রথম যে গ্রন্থটিকে প্রাচীনপর্বের ইতিহাস গ্রন্থের মর্যাদা দেওয়া হয় তা হল কলহনের 'রাজতরঙ্গিণী', যা রচিত হয়েছিল খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে। সাহিত্যিক উপাদানের এই অপ্রতুলতার জন্য প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার জন্য ঐতিহাসিকদের একান্তভাবেই নির্ভর করতে হয় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের উপর। সেই কারণে ঐতিহাসিকরা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের প্রধান উপাদান বলেছেন, এগুলির সাহায্যে প্রাচীন ভারত ইতিহাসের বহু অন্ধকারময় দিক আলোকিত করা সম্ভবপর হয়েছে। প্রাচীনকালের মানবসভ্যতার ক্ষেত্রে কতটা অগ্রগতি হয়েছিল তা জানতে গেলে অনেকসময় সম্পূর্ণভাবে এই নিদর্শনগুলির উপর নির্ভর করতে হয়। প্রত্নতত্ত্বের সাহায্যে যে ইতিহাস রচিত হয় তা বিজ্ঞানভিত্তিক। তাছাড়া অন্যান্য সূত্র থেকে প্রাপ্ত উপাদান গুলি থেকেও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনগুলি যাচাই করা যায়। সে কারণে এগুলি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। এককথায় প্রত্নতত্ত্ব হল মানুষের কাজের নীরব সাক্ষী।

প্রত্নতত্ত্বের সংজ্ঞা সম্পর্কে সাধারণভাবে বলা যায়, পুরাতন বস্তুরাজি হল প্রত্নতত্ত্বের বিষয়বস্তু। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অনুসন্ধান ও খননকার্যের ফলে আবিষ্কৃত এবং মাটির তলা থেকে প্রাপ্ত বস্তু, এমনকি এখনও ব্যবহৃত হয় এমন স্থাপত্যরাজি প্রত্নতত্ত্বের আওতাভুক্ত। তবে খননকার্য ছাড়াও কৃষিকার্যকালীন সময়ে অথবা অন্যান্য কাজের সময় মাটি খুঁড়তে গিয়েও প্রত্নবস্তুর সন্ধানপ্রাপ্তি বিরল নয়।

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান গুলিকে মূলতঃ তিন ভাগে ভাগ করা যায় — ১) লেখ ২) মুদ্রা ও ৩) স্থাপত্য ভাস্কর্য। ১৯০৩ খ্রীঃ ভারতে প্রত্নতত্ত্ববিভাগের প্রতিষ্ঠা হয় লর্ড কার্জনের আমলে। এর প্রথম অধ্যক্ষ ছিলেন স্যার জন মার্শাল। তিনি ছাড়াও বুকানন, হ্যামিল্টন, কানিংহাম, রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় প্রমুখ প্রত্নতত্ত্ববিদদের নিরলস প্রয়াসে ভারতের নানা স্থান থেকে বহু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের রচনায় সেগুলি বিশেষভাবে সাহায্য করেছে। কারণ প্রত্নতাত্ত্বিকের কাজ হল প্রত্নবস্তু সংক্রান্ত তথ্য সংগ্রহ করে ঐতিহাসিককে সরবরাহ করা। সেই তথ্যের ভিত্তিতেই গড়ে ওঠে ইতিহাসের সৌধ। কেননা ইতিহাস আর কিছুই না — তা হল মানুষ ও তাঁর কর্মকান্ড। এই কর্মকান্ড জানার হাতিয়ার হল প্রত্নবস্তু।

২.৩.১ লেখর গুরুত্ব

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান গুলির মধ্যে প্রথমেই লেখর স্থান। লেখর অনুমোদন ছাড়া কোন তথ্য এবং তারিখই সত্যের মর্যাদা পায় না, প্রকৃতপক্ষে অন্য উপাদান থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদিকে লেখ নিয়ন্ত্রণ করে। প্রাচীন ভারতের লুপ্ত ইতিহাস যতটা উদ্ধার করা হয়েছে তার বেশীরভাগটার জন্য আমরা লেখর কাছে ঋণী। ভিনসেন্ট স্মিথের মতে "Inscriptions have been given the first place in the list because they are, on the whole, the most important and trustworthy source of our knowledge". প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার জন্য শিলালেখ, স্তম্ভলেখ, তাম্রলেখ গুলির গুরুত্ব অপরিসীম। প্রাচীন কালে পাথরের ফলকের উপর লেখগুলিকে খোদাই করা হত। অথবা তামা ব্রোঞ্জ এমনকি পোড়া মাটির ফলকের উপরেও লেখগুলি খোদাই করা হত। অনেকসময় মন্দির গাত্রেও লেখগুলিকে উৎকীর্ণ করা হয়েছে। তাই লেখগুলিতে যে বিবরণ আছে তাকে বিকৃত করা সম্ভব হয় নি, সেখানে সাহিত্যিক উপাদানগুলি যুগে যুগে বিকৃত হয়েছে। তাই লেখগুলির গুরুত্ব অনেকটাই বৃদ্ধি পেয়েছে। এছাড়া লেখগুলির রচনা কালও অনেকটাই সুনিশ্চিত। শিলালেখগুলিতে ও অন্যান্য লেখগুলিতে সন, তারিখ, রাজার নাম, রাজবংশের নাম, অনুশাসনের বিবরণ রয়েছে। তাই এর সাহায্যে ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়েছে। লেখগুলির প্রাপ্তিস্থান থেকে সাম্রাজ্যের সীমা নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। প্রশাসনিক লেখ গুলি থেকে একটি বিশেষ পর্যায়ের প্রশাসনিক রাজনীতি সম্পর্কে নানাবিধ তথ্য লাভ করি। এ প্রসঙ্গে সম্রাট অশোকের প্রধান ও অপ্রধান শিলালেখগুলির কথা উল্লেখ করা যায়।

২.৩.১.১ প্রাকমৌর্য পর্বের লেখ

প্রাকমৌর্য যুগে প্রাচীনভারতের ইতিহাসের সূত্র হিসেবে বহু উপাদান পাওয়া গেছে। শিলালেখ গুলি প্রধানতঃ পাওয়া গেছে ভারতের বাইরে। আর্যদের সম্পর্কে বহু তথ্য বোঘজকোই শিলালেখ থেকে জানা সম্ভব হয়েছে। এছাড়া 'টেল এল আমারনা' এবং 'নকস-ই-রুস্তম' শিলালেখ থেকে ভারতের সঙ্গে প্রাচীনকালে পারস্যের কী রকম সম্পর্ক ছিল তা জানা যায়। তবে কাল অনুসারে হরপ্পীয় লেখ সবচেয়ে প্রাচীন। কিন্তু দুর্ভাগ্যের বিষয় হল এগুলির পাঠোদ্ধার করা আজ আজ পর্যন্ত সম্ভব হয় নি। যেই কারণে ভারতীয় সভ্যতার সম্পর্কে সুস্পষ্ট বিবরণ লাভ আমাদের পক্ষে এখনো জানা সম্ভব হয় নি। এছাড়া বৈদেশিক লেখ হিসাবে এশিয়া মাইনরের আনাতোলিয়ায় প্রাপ্ত লেখ এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায় (আনুমানিক খ্রীঃপূর্ব ১৪০০ অব্দে)। এই লেখটি আর্যনামের রাজাদের এবং তাদের সন্ধির উল্লেখ পাওয়া যায়।

২.৩.১.২ মৌর্য পর্বের লেখসমূহ

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের ক্ষেত্রে মৌর্যদের ইতিহাস রচনার পক্ষে সহায়ক বহু লেখ আবিষ্কৃত হয়েছে। অশোকের আমলের লেখগুলি এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ। ১৮৩৭ সালে কলকাতার টাকশালের কর্মী এবং এশিয়াটিক সোসাইটি অব বেঙ্গলের সম্পাদক জেমস প্রিন্সেপ অশোক লেখর পাঠোদ্ধার করেন। এগুলি ছিল তিন প্রকার — শিলালেখ, যা শিলাখণ্ডে পাওয়া যায়, গুহালেখ, যা গিরিগুহায় এবং স্তম্ভলেখ, যা স্তম্ভগাত্রে পাওয়া গেছে। অশোকের গুহালেখ গুলি গয়া জেলার অন্তর্গত বারবার পাহাড়ে পাওয়া গেছে। তাঁর শিলালেখ এবং স্তম্ভলেখগুলিকে প্রধান ও অপ্রধান দুটি শ্রেণিতে ভাগ করা যায়। প্রধান লেখগুলি সারিবদ্ধভাবে সজ্জিত এবং সেগুলি সাম্রাজ্যের সীমান্ত অঞ্চলেই বেশি পাওয়া গেছে। শিলালেখ গুলি পরস্পরে থেকে বিচ্ছিন্ন। অশোক সর্বত্র সাধারণভাবে

ব্রাহ্মীলেখ ব্যবহার করেছেন, শুধুমাত্র উত্তর-পশ্চিম ভারতে জনসাধারণের সুবিধার্থে খরোষ্ঠী লেখ ব্যবহার করা হয়েছে।

অশোক তাঁর নিজের লেখতে নিজেকে "দেবনাং পিয় প্রিয়দর্শী" বলে উল্লেখ করেছেন। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে অশোকের আগে ও পরে অনেক রাজাই নিজেকে অনুরূপভাবে অভিহিত করেছিলেন। তাই মৌর্য সম্রাটের রচিত লেখগুলি সম্পর্কে ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটি সন্দেহের সৃষ্টি হয়েছিল। কিন্তু একদা হায়দ্রাবাদের অন্তর্গত মাসকিতে প্রাপ্ত একটি লেখ এ বিষয়ে সকল সন্দেহের অবসান ঘটিয়েছে কেননা সেখানে "দেবনাং পিয়ম অশোকম"-শব্দ পাশাপাশি পাওয়া গেছে।

প্রাচীন ভারত ইতিহাসে অশোক লেখর গুরুত্ব খুব বেশী। এগুলির সাহায্যে অশোকের আমলের শাসন পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়। তাঁর আমলে মৌর্য শাসনব্যবস্থায় কতটা উৎকর্ষতা দেখা দিয়েছিল সে ব্যাপারে ধারণালাভ করা যায়, তাছাড়া তাঁর জনহিতকর কার্যাবলী, ধর্মীয়নীতি, প্রজাদের ধর্মের পথে রাখার প্রয়াস। এই সব কিছুরই উপাদান আমরা তাঁর লেখগুলি থেকে পাই। তাঁর লেখ গুলির প্রাপ্তিস্থান থেকেই তাঁর সাম্রাজ্যের সীমা নির্ণয় করা সম্ভব হয়েছে। তাছাড়া ইতিহাস প্রসিদ্ধ কলিঙ্গযুদ্ধ সম্বন্ধে আমরা তাঁর অপ্রধান লেখ গুলি থেকে জানতে পারি। ঐতিহাসিক রমেশচন্দ্র মজুমদার অশোকের শিলালেখগুলির গুরুত্ব স্বীকার করে বলেছেন — "দীর্ঘ বাইশ শতকের ব্যবধানকে অতিক্রম করে এই লেখগুলি সম্রাট অশোকের ন্যায় একজন মহান ব্যক্তিত্বের আদর্শ ও ধ্যানধারনাকে আমাদের সম্মুখে উপস্থিত করে। কান পাতলে এগুলির মধ্যে আমরা আজও যেন অশোকের নিঃশ্বাসের শব্দ শুনতে পাই"।

২.৩.১.৩ মৌর্য-পরবর্তীপর্বের লেখ

মৌর্য পরবর্তীপর্বের লেখগুলি থেকেও প্রাচীন ভারত ইতিহাস রচনার বহু উপাদান পাওয়া গেছে। যেমন নাসিক শিলালেখ থেকে সাতবাহনদের ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়েছে, কলিঙ্গ রাজ খারবেলের হস্তিগুম্ফা লেখ থেকে এবং রুদ্রদামনের জুনাগড় লেখ থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের নানা উপাদান সংগৃহীত হয়েছে। গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্তের সভাকবি হরিষেন এলাহাবাদ প্রশস্তি রচনা করেছেন। তেত্রিশ লাইনের এই দলিলটি সমুদ্রগুপ্তের জন্য বিশেষভাবে অতি গুরুত্বপূর্ণ। ডি ডি কোশাম্বী এই লেখর সঙ্গে অশোক লেখর তুলনা করে বলেছেন যে অশোক লেখ সহজ নম্র এবং প্রাকৃত ভাষায় রচিত আর হরিষেণ প্রশস্তি অতি অলঙ্কৃত সংস্কৃততে, এই তারতম্যের জন্য উভয় সাম্রাজ্যের চরিত্রগত পার্থক্য ধরা পড়ে।

এছাড়া মথুরা ও পেশোয়ার লেখ থেকে কণিষ্কের রাজত্বকালের ঘটনাবলী জানা সম্ভব হয়েছে। হর্ষবর্ধনের নালন্দা লেখ, চালুক্যরাজ দ্বিতীয় পুলকেশীর আইহোল শিলালেখ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার জন্য বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে।

প্রাচীনকালের বেশ কিছু ভূমিদান সম্পর্কিত যে দলিল পাওয়া গেছে তা থেকে প্রাচীন ভারতের শাসনতন্ত্রের অস্তিত্বের কথা মনে আসে। অনেক সময় বেসরকারী সূত্র থেকেও নানা কৌতুহলদীপ্ত তথ্য পাওয়া যায়, যেমন — গুপ্ত পূর্ববর্তী লেখগুলির বেশীরভাগই ছিল প্রাকৃত ভাষায় লেখা ও সেগুলি বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মসংক্রান্ত, কিন্তু গুপ্ত পরবর্তী পর্বের লেখগুলির বেশীরভাগ সংস্কৃত ভাষায় রচিত ও ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিষয়ক। এর থেকে বোঝা যায় গুপ্তপর্বের ভাষা ও ধর্মের ক্ষেত্রে মৌলিক পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। তবে সাম্প্রতিক কালে প্রাপ্ত দুটি গুরুত্বপূর্ণ

লেখ আমাদের চমকে দিয়েছে। একটি হল মধ্যপ্রদেশের মান্দাসোরের নিকটবর্তী রিস্থালে প্রাপ্ত ঔলিকার বংশীয় প্রকাশধর্মনের শিলালেখ এবং অপরটি হল মালদহ জেলার জগজীবনপুর তাম্রশাসন। মান্দাসোর শিলা লেখ থেকে জানা গেছে মালবরাজ যশোধর্মণের আগের কোন শাসক ছিলেন প্রকাশধর্মণ। অধ্যাপক দীনেশচন্দ্র সরকার লেখটি বিশ্লেষণ করে এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে প্রকাশধর্মন হুণ শাসক তোরমানের হাত রিস্থাল তথা মান্দাসোর বা পশ্চিম মালবের একাংশকে রক্ষার জন্য চেষ্টা চালিয়েছিলেন এবং সফল হয়েছিলেন। অপরদিকে জগজীবনপুর তাম্রশাসন আমাদের জানিয়েছে যে দেবপালের পর সিংহাসনে বসেছিলেন প্রথম বিগ্রহপাল নয়, দেবপালের পুত্র মহেন্দ্রপাল দেব এবং পাল রাজারা যে বৌদ্ধ ধর্মের পৃষ্ঠপোষক ছিলেন তাও এই তাম্রশাসনটি থেকে প্রমাণিত হয়।

২.৩.১.৪ লেখক্ষ্ম-র সীমাবদ্ধতা

প্রাচীন লেখগুলির নানা উপযোগিতা থাকলেও আকর তথ্যসূত্র হিসাবে তাদের সীমাবদ্ধতাও রয়েছে। অজ্ঞাত বা দুষ্পাঠ্য অক্ষরে উৎকীর্ণ হলে ঐ লেখ-র পাঠোদ্ধার কঠিন হয়ে পড়ে। সন-তারিখের স্পষ্ট উল্লেখ না থাকলে লেখটির কাল নির্ণয়ে বিভ্রান্তি সৃষ্টি হয়। বেশিরভাগ লেখ-ই শাসকের আদেশে উৎকীর্ণ হওয়ায় প্রথাগত দরবারী প্রশস্তিসুলভ বিবরণ তাতে স্থান পায় যারবাস্তব ভিত্তি সামন্যই। সভাকবিদের অতিরঞ্জনও এতে মিশে থাকে। সর্বোপরি, লেখমালায় সমগ্র সমাজের পরিচয় ধরা পড়ে না। সে সম্পর্কেও আমাদের সজাগ থাকা উচিত।

২.৪ মুদ্রার ভূমিকা

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় মুদ্রার গুরুত্ব অপরিসীম। ১৯২৪ খ্রীঃ তক্ষশিলার ভীরমাউন্ডে প্রাপ্ত ছাপযুক্ত মুদ্রা গুলিকেই সর্বপ্রাচীন ভারতীয় মুদ্রা বলে অনুমান করা হয়। ড.পরমেশ্বরী লাল গুপ্তা, ডি.ডি.কোশাম্বী প্রমুখ ঐতিহাসিকগণ মনে করেন ভারত ইতিহাস রচনায় মুদ্রার সমর্থন ছাড়া কোন মত সত্যের মর্যাদা পায় না। পরমেশ্বরী লাল গুপ্তা বলেছেন ইতিহাসে এরা শুধুমাত্র উদাহরণ যোগায় না, ইতিহাসের জালবোনা হয় এদেরকে ঘিরে। এমন অনেক উদাহরণ রয়েছে যেসব তথ্য শুধুমাত্র মুদ্রা থেকে পাওয়া গেছে। যেমন খ্রীঃপূর্ব দুই শতক থেকে এক শতক এই একশ বছরের মধ্যে প্রায় ত্রিশজন ব্যাক্ট্রিয় রাজা ও রানী পাঞ্জাবে রাজত্ব করে গেছেন। প্রাচীনকালের লেখকরা এই রাজাদের সম্পর্কে প্রায় অজ্ঞ ছিলেন। সুতরাং আমরা দেখতে পাচ্ছি প্রাচীন ভারত ইতিহাস রচনায় মুদ্রার গুরুত্ব অপরিসীম। প্রত্নবিদদের নিরলস প্রয়াসে ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে নানা ধরনের মুদ্রা- মার্ক মুদ্রা, ছাঁচে ঢালাই মুদ্রা, ভারত-ব্যাকট্রিয় মুদ্রা শক-পার্সিয়ান মুদ্রা, কুষাণ মুদ্রা, সাতবাহন মুদ্রা প্রভৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। মুদ্রাগুলির বিশ্লেষণে ঐতিহাসিকরা নানা গুরুত্বপূর্ণ তথ্য লাভ করেছেন।

প্রথমতঃ মুদ্রাগুলি থেকে সেই পর্বের অক্ষর গুলি জানা সম্ভব হয়েছে। ফলে লেখ-র পাঠোদ্ধার সহজ হয়েছে।

দ্বিতীয়তঃ মুদ্রাগুলিতে সন, তারিখ, রাজার নাম, রাজবংশের নাম প্রভৃতি থাকায় ধারাবাহিক ইতিহাস রচনা সম্ভব হয়েছে।

তৃতীয়তঃ মুদ্রাগুলিতে যে ধাতু ব্যবহৃত হয়েছে তা থেকে সে পর্বের অর্থনৈতিক ইতিহাস জানা সম্ভব হয়েছে। যে রাজত্বকালের মুদ্রায় রুপোর পরিমান বেশী ছিল সেই রাজত্বকালকে অর্থনৈতিক দিক থেকে সমৃদ্ধশালী ছিল বলে মনে করা হয়। আর যে রাজত্বকালের মুদ্রায় তামা বা খাদের পরিমাণ বেশী ছিল সেই রাজত্বকালকে অর্থনৈতিকভাবে দুর্দশাগ্রস্ত বলে মনে করা হয়। যেমন, গুপ্তদের প্রথম দিককার মুদ্রায় খাদের পরিমাণ বেশী ছিল, এর থেকে ঐতিহাসিকরা সে সময়কার অর্থনৈতিক দুরবস্থার কথা অনুমান করেছিলেন।

চতুর্থতঃ মুদ্রাগুলির গঠনরীতি থেকে সেই পর্বের মানুষের শিল্পানুরাগ সম্বন্ধে জানা সম্ভব হয়েছে। গ্রীক আক্রমণের পর থেকে রাজার নাম খোদাই করা মুদ্রার প্রচলন হয়। ব্যাকট্রিয় গ্রীকগণ সর্বপ্রথম এই ধরনের উল্লেখযোগ্য মুদ্রার প্রচলন করেন। বলা হয়, শিল্পোৎকর্ষের দিক দিয়ে এই মুদ্রাগুলিই শ্রেষ্ঠ। আবার মুদ্রায় চিত্রিত দেবদেবীর মূর্তি থেকে মানুষের ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে জানা সম্ভব। শিল্প-ইতিহাস অনুধাবনে মুদ্রার ব্যবহারের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়।

পঞ্চমতঃ অনেকসময় মুদ্রায় চিত্রিত ছবি থেকে আমরা কোন সম্রাটের ব্যক্তিগত গুণাবলীর পরিচয় পাই। যেমন — সমুদ্রগুপ্তের বীণা বাদনরত মুদ্রা থেকে আমরা তাঁর সঙ্গীতের প্রতি অনুরাগের কথা অনুমান করতে পারি।

ষষ্ঠতঃ দুটি দেশের মুদ্রার তুলনা অনেকসময় তারিখ নির্ধারনে সাহায্য করে। যেমন — প্রথম কদফিসের এক শ্রেণির মুদ্রার সঙ্গে রোম সম্রাট ক্লডিয়াসের মুদ্রার সাদৃশ্য থেকে আমরা কুষাণ রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতার রাজত্বকাল সম্পর্কে ধারণা করতে পারি।

সপ্তমতঃ মুদ্রাগুলির প্রাপ্তির স্থান থেকে সেপর্বের বাণিজ্যিক গতিপ্রকৃতি সম্পর্ক জানা যায়। যেমন — ভারতে প্রচুর রোমান মুদ্রা আবিষ্কৃত হয়েছে, এর থেকে ঐতিহাসিকেরা বলেছেন যে, প্রাচীনকালে রোম-ভারত বাণিজ্য চলতো এবং তা ভারতের অনুকূলে চলতো।

২.৪.১ অভিজ্ঞান মুদ্রা

সম্প্রতি অবশ্য প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় নাম মুদ্রা বা অভিজ্ঞান মুদ্রাকে গুরুত্ব দেওয়া হচ্ছে। অভিজ্ঞান মুদ্রাগুলি থেকে নির্দিষ্ট পর্বের শাসনব্যবস্থা, সমাজ, অর্থনীতি, শিক্ষা, ধর্মীয় ব্যবস্থা সম্পর্কে জানা যায়। যেমন- চন্দ্রকেতুগড় এলাকায় খ্রীঃ প্রথম-দ্বিতীয় শতকের একটি নাম-মুদ্রায় খরোষ্ঠী-ব্রাহ্মী লেখতে উৎকীর্ণ 'গণরাজ' শব্দটি আছে, যা গণরাজ্যের সন্ধান দেয়। এছাড়া রাজঘাট, বসার প্রভৃতি স্থান থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি অভিজ্ঞান মুদ্রায় 'অধিকরণ', 'অধিষ্ঠান' প্রভৃতি শব্দগুলি থেকে অনুমিত হয় যে মেগাস্থিনিস মৌর্য আমলের যে উচ্চমানের পৌর শাসনব্যবস্থার কথা বলেছেন তা হয়তো গুপ্ত যুগেও বিদ্যমান ছিল। সর্বোপরি, সমকালীন শিক্ষা ব্যবস্থা সম্পর্কেও এগুলি থেকে কিছু তথ্য পাওয়া যায়। উদাহরণ স্বরূপ — ঋগ্বেদের বহ্‌ভৃচ্ছ, যজুর্বেদের অধ্বর্যু ও সামবেদের ছান্দোগ্য-র কথা রাজঘাট থেকে প্রাপ্ত কয়েকটি অভিজ্ঞান মুদ্রা থেকে জানা গেছে।

২.৪.২ সতর্কতা

মুদ্রা যেহেতু ব্যবসা-বাণিজ্যের মাধ্যমে দূরদূরান্তে যেতে পারে, তাই কোনো রাজার মুদ্রা কোথাও আবিষ্কৃত হলে একথা বলা যাবে না যে, ঐ স্থানটি ঐ রাজার আয়ত্তে ছিল। লেখ-র প্রাপ্তিস্থানের যে রাজনৈতিক মাত্রা আছে, মুদ্রার ক্ষেত্রে তা নেই। তাছাড়া, প্রাচীন মুদ্রার অনুকরণজনিত সমস্যার প্রতিও সজাগ থাকা প্রয়োজন।

২.৫ স্থাপত্য-ভাস্কর্য

প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের অন্যতম আরেকটি শাখা হল স্থাপত্য-ভাস্কর্য। স্থাপত্য ভাস্কর্যের নিদর্শন বলতে খননকার্যের ফলে মাটির নীচের যে সব মূর্তি, মন্দির, পোড়ামাটির কাজ, মৃন্ময় পাত্রাদি পাওয়া গেছে প্রধানতঃ সেগুলিকে বোঝায়। রাজনৈতিক ইতিহাসের ক্ষেত্রে এগুলির গুরুত্ব অপরিসীম। উৎখনন কার্যের মধ্য দিয়ে শুধুমাত্র কয়েকটি মন্দিরমূর্তি নয়, কখনো সমগ্র শহর আত্মপ্রকাশ করে। এপ্রসঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার কথা বলা যায়। ভারতের সুপ্রাচীন কালের ইতিহাস রচনায় তাই এগুলি বিশেষভাবে সহায়ক হয়েছে। প্রাগৈতিহাসিক পর্বে হরপ্পা সভ্যতার ক্ষেত্রে এই সকল উপাদানই প্রধানতঃ ঐতিহাসিকদের তথ্য যুগিয়েছে। তাছাড়া প্রাচীন নগরীর ধ্বংসাবশেষ থেকে আমরা সেইপর্বের নগর ও সমাজ জীবন সম্পর্কে ধারণা করতে পারি।

সাম্প্রতিক কালে বর্ধমান জেলার মঙ্গলকোটে খননকার্যের ফলে প্রাপ্ত তথ্যাদি ইতিহাসের নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে। এছাড়া সম্প্রতি চন্দ্রকেতুগড়ে আনুমানিক খ্রীষ্ট পূর্ব প্রথম শতাব্দীর একটি পোড়া মাটির নিদর্শন পাওয়া গেছে, যাতে একজন ব্যক্তি এবং একটি কচ্ছপের ছবি দেখা যায়, এই ব্যক্তিটির আবির্ভাব থেকে বোঝা যায় যেন তিনি বিষ্ণুর উপাসক ছিলেন। বলাবাহুল্য এই ধরণের নিদর্শন বাংলার ইতিহাসে বিশেষ পাওয়া যায় না। এছাড়া পশ্চিমবঙ্গের গোসাবা থানা এলাকায় ব্যাঘ্র প্রকল্পের অধীন সংরক্ষিত বনাঞ্চলে মাটি খুঁড়তে গিয়ে পবিত্র পদচিহ্নের অনুকৃতি, একটি সূর্যমূর্তি এবং সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের 'শ্রী বিক্রম স্বর্ণমুদ্রা' প্রাপ্তির ঘটনার নানা ঐতিহাসিক তথ্যের সন্ধান দিয়েছে। অনুরূপে ইউনেস্কোর তত্ত্বাবধানে সাঁচী সাতধারা এলাকায় নতুন ১৪টি বৌদ্ধ মঠ এবং ৩২টি স্তূপ ১৯৯৫ সালে আবিষ্কৃত হয়েছে। যা প্রাচীন কালে মধ্যভারতে বৃহত্তম বৌদ্ধবসতির উপর আলোকপাত করেছে এবং গাছ ও লতা গুল্ম লাগিয়ে কিভাবে ভূমিক্ষয় রোধ করতে হয় তা যে সে যুগে জানা ছিল যে আবিষ্কার থেকে তাও জানা যায়। এ প্রসঙ্গে আর্য সংস্কৃতির অন্যতম প্রধানকেন্দ্র তক্ষশিলার তিনটি নগর ভীর মাউন্ড, সিরকাপ ও সিরমুখ আবিষ্কারের কথা বলা যায়। এদের একটি নগর সুপরিকল্পিত। সিন্ধু উপত্যকায় নগর পরিকল্পনার কথা মনে রাখলে, তক্ষশিলায় নগর পরিকল্পনার কৃতিত্ব পুরোপুরিভাবে গ্রীকদের দেওয়া যায়না কারণ এই নগর গুলির একটি নির্মিত হয়েছিল ভারতে ব্যাকট্রিয় গ্রীকদের অধিকারের সময়। তবে অত্রনজি খেরায় প্রাপ্ত নতুন তথ্যের কথা তো স্বীকার করতেই হবে। তার কারণ এই তথ্য থেকেই বলা যায় খ্রীঃ পূর্ব ১০০০ অব্দের কাছাকাছি সময় সেখানে মানুষ ধাতুর ব্যবহার বিশেষ করে লোহার ব্যবহার জানত। এই আবিষ্কারের ফলে ভারতবাসীরা খ্রীঃপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বে যে লোহার ব্যবহার জানত না, অনেকের কাছে এই মতের পুনর্বিবেচনা প্রয়োজনীয় মনে হয়েছে।

বর্তমানে বিচিত্র সব উপাদান থেকে প্রাচীন ভারতের ইতিহাসের নানা তথ্য পাওয়া যাচ্ছে। বিশেষ করে প্রাগৈতিহাসিক পর্যায়ের ইতিহাস রচনায় সেগুলি সহায়ক হয়েছে। যেমন — মানুষের ব্যবহৃত নানা অস্ত্র-শস্ত্র থেকে আমরা প্রস্তরপর্বের সভ্যতা-সংস্কৃতি সম্বন্ধে জানতে পারি। যেমন — Microlith থেকেও সে পর্বের জীবনযাত্রার আভাস মেলে। আবার বিভিন্ন ধরণের মৃৎপাত্র থেকেও সে পর্বের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে ধারণা লাভ করা যায়। যেমন — ধূসর চিত্রিত মৃৎপাত্র এবং উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণের মৃৎপাত্র থেকে সে পর্বের শৈল্পিকবোধের সম্বন্ধে জানতে পারি।

আবার মানুষ ও পশুপাখির দেহাবশেষও ইতিহাস রচনার উপাদান হয়ে উঠেছে। মানব প্রজাতির বিবর্তন তাঁর গুরুত্বপূর্ণ প্রমাণ হিসাবে কাজ করেছে। এছাড়া মানুষের ব্যবহৃত পোশাক-পরিচ্ছদ, বাসনপত্র, আসবাবপত্র, অলঙ্কার এইসব থেকেও প্রাচীনকালের সাংস্কৃতিক ও সামাজিক অবস্থার আভাস মেলে।

তবে সম্প্রতি অধ্যাপক রণবীর চক্রবর্তী জলজ উপাদানের সাহয্যে প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধান করেছেন। তিনি বলেছেন জলজ উপাদান থেকে প্রাচীনকালে ভারতের সঙ্গে সামুদ্রিক বাণিজ্য কোন দেশের কিরূপ যোগাযোগ হত তা নির্ণয় করা যায়। যার দ্বারা তিনি প্রমাণ করেছেন যে প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক জীবন স্থবির ছিল না ছিল প্রগতিশীল।

এভাবে সাহিত্যিক উপাদানের অপ্রতুলতা সত্ত্বেও ঐতিহাসিকগণ তাঁদের অনলস প্রয়াসে নানান প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শণ আবিষ্কার করে চলেছেন এবং তার উপর ভিত্তি করে ভারত ইতিহাসের আদি পর্ব রচনা করা সম্ভবপর হয়েছে। সাম্প্রতিক কালের বৈজ্ঞানিক — প্রযুক্তির ব্যবহারও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানগুলির নির্ভরযোগ্যতা অনেক বেশী বৃদ্ধি করেছে। ঐতিহাসিক রামশরণ শর্মার মতে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান গুলির সাহয্যে কোন একটি বিশেষ পর্যায়ের উৎপাদন পদ্ধতি সম্পর্কে জানা যায়, ফলে অর্থনৈতিক ইতিহাস রচনার ব্যাপারে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য। যাই হোক, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় ইতিহাসের নীরব সঙ্গী প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান যেমন গুরুত্বপূর্ণ, তেমনি বিভিন্ন গ্রন্থগুলি থেকে পাওয়া তথ্যগুলিও এক্ষেত্রে সহায়ক হয়েছে।

২.৬ সাহিত্যিক উপাদান

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার অন্যতম প্রধান সমস্যা হল ধারাবাহিক ইতিহাসের অভাব। ভারতবর্ষ তার সাহিত্যকীর্তির বিশাল ঐতিহ্য সত্ত্বেও হেরোডোটাস, থুকিডিডিস, পলিবিয়াস, লিভি বা ট্যাকিটাসের সঙ্গে তুলনীয় কোন ইতিহাস রচয়িতার জন্ম দেয় নি। বহু শাসক (হর্ষবর্ধন আনুমানিক ৬০০-৬৪০ খ্রীঃ) শিক্ষা ও সাহিত্যানুরাগে তাদের সমকালীন ইউরোপীয় শাসকদের চেয়ে বেশী অগ্রবর্তী ছিলেন। বড় বড় যুদ্ধ জয়ের জন্য বিশাল বিশাল সেনাবাহিনী গুলি তাঁরা নিজেরা পরিচালনা করতেন। কিন্তু জুলিয়াস সীজারের কমেনটারিস বা জেনোফেনের এনাবেসিসের মত বর্ণনাত্মক কোন রচনার কথা কেউ ভেবেছিলেন বলে মনে হয় না। তবে একটি মাত্র ভারতীয় অ্যাখ্যায়িকার আছে — রাজতরঙ্গিনী', যা ১১৪৯-৫০ খ্রীঃ (কলহন নামক কাশ্মীরী পন্ডিত কর্তৃক সংস্কৃত ছন্দে রচিত এবং পরে তাঁরই উত্তর সাধকের দ্বারা পরিবর্তিত)।

কিন্তু এই আখ্যায়িকরা সংস্কৃত কাব্যের প্রচলিত রীতি দ্বারা আক্রান্ত। বিশেষ করে এর দুরহ দ্ব্যর্থতার ফলে যতটুকু বাস্তবতাকে লেখক ফুটিয়ে তুলতে চান তা অপ্রচ্ছন্ন থেকে যায়, তাই অতীতযুগে অন্বেষণে টিকে থাকার সূত্র হচ্ছে বেদ, মহাকাব্য ও পুরাণগুলি। তবে সেগুলির ইতিহাস গত সারবস্তু অসংখ্য অমনোযোগী লেখকদের হাতে যুগ যুগ সম্পাদনায় অতি কথার কঠিন আবরণে আবৃত, যা আধাধর্মীয় উপকথায় দ্রবীভূত ও নিশ্চিহ্ন হয়ে আজ শুধু ধর্মীয় কাহিনী ও নীতিগল্পে পর্যবসিত হয়ে এসেছে। তাই কাউর পক্ষে এমনকি যথাযথ রাজবংশ তালিকার সংরক্ষণও দুরূহ হয়ে ওঠে।

সুতরাং, দেখা যাছে যে, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার কাজ অত্যন্ত দুঃসাধ্য, তবু ঐতিহাসিকগণ তাদের অনলস চেষ্টায় অব্যাহত থেকে বিভিন্ন সাহিত্যিক উপাদান থেকে ইতিহাসের সারবস্তু সংগ্রহের চেষ্টা করেছেন। এই সাহিতিক উপাদানগুলিকে প্রধানতঃ দু-ভাগে ভাগ করা যায়, যথা — দেশীয় ও বৈদেশিক সাহিত্য। ভারতীয় সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে বিভিন্ন ধর্মগ্রন্থ ও কতকগুলি ধর্মনিরপেক্ষ বিষয়ক গ্রন্থ এবং দুই মহাকাব্য। বিদেশী সাহিত্যের মধ্যে রয়েছে গ্রীক, চৈনিক, এবং আরবীয় পর্যটকদের ভ্রমণ বৃত্তান্ত।

২.৬.১ বেদ ও বৈদিক সাহিত্য

দেশীয় সাহিত্যের আলোচনা প্রসঙ্গে প্রথমেই বেদ ও বৈদিক সাহিত্যের উল্লেখ করতে হয়। খ্রীঃপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বের ইতিহাস জানার জন্য বেদ তথা বৈদিক সাহিত্যের উপর আমরা নির্ভর করে থাকি। বৈদিক সাহিত্য বলতে ঋক, সাম, যজু, অথর্ব — এই চারটি বেদ ছাড়াও ব্রাহ্মণ ; আরণ্যক, সূত্র সাহিত্য ও উপনিষদকে বোঝায়। চারটি বেদের মধ্যে ঋগ্বেদ প্রাচীন। ঋগ্বেদ রচনার আনুমানিক সময়কাল খ্রীঃপূর্ব ১৫০০ অব্দ থেকে খ্রীঃপূর্ব ১০০০ অব্দের মধ্যে। যদিও এ ব্যাপারে পন্ডিতরা একমত নন। এই গ্রন্থটি আর্যদের যজ্ঞানুষ্ঠানে উচ্চারিত সামগানের সমষ্টি। ঋগ্বেদে ১০২৮টি স্ত্রোত্র রয়েছে। এগুলিকে আবার ১০টি মন্ডলে ভাগ করা যায়। প্রথম এবং শেষ মন্ডলটি ১৭১টি সূত্রে সমৃদ্ধ। ঋগ্বেদ থেকে আমরা সমকালীন মানুষের রাষ্ট্রজীবন, সমাজজীবন, অর্থনৈতিক জীবন ও ধর্মীয়জীবন সম্বন্ধে জানতে পারি। তবে পরবর্তী বেদগুলি সম্ভবত রচিত হয়েছিল খ্রীঃপূর্ব ১০০০ অব্দ থেকে খ্রীঃপূর্ব ৬০০ অব্দের মধ্যে। সামবেদ ঋগ্বেদের পরবর্তীকালের সংকলন মাত্র। যজুর্বেদে আছে যজ্ঞ পুরোহিতদের অনুমোদিত বিধিগুলি। এবং অথর্ব বেদের অনেকাংশ জুড়ে রয়েছে যাদুমন্ত্র, সুতরাং বলা চলে এ গ্রন্থ আর্য সংস্কৃতির সঙ্গে অনার্য সংস্কৃতির মিশ্রণের প্রতিচ্ছবি। প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় বেদের গুরুত্বের কথা স্বীকার করে ইউ এন ঘোষাল বলেছেন, - "The Vedas occupied an important place in the evolution of Indian historiography."

তবে বৈদিক সাহিত্য বলতে শুধু চতুর্বেদকে বোঝায় না। ব্রাহ্মণগুলিকে বেদের পরিশিষ্ট এবং আরণ্যক গুলিকে ও উপনিষদগুলিকে ব্রাহ্মণসমূহের পরিশিষ্ট মনে করা হয়। ব্রাহ্মণগুলির মধ্যে শতপথ এবং ঐতরেয় এবং উপনিষদগুলির মধ্যে ছন্দোগ্য ও বৃহদারণ্যক প্রধান। অনেক প্রাচীন ঐতিহ্য এই গ্রন্থগুলির অঙ্গীভূত। সময়ের দিক থেকে ব্রাহ্মণ ও আরণ্যক গুলি সমসাময়িক খ্রীঃপূর্ব অষ্টম ও খ্রীষ্টঃপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যবর্তী। বৈদিক সাহিত্যের প্রধান সীমাবদ্ধতা হল তার রচনাকাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে ব্যাপক মতানৈক্য। উপরন্তু, যথেষ্ট পরিমাণে পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্যপ্রমাণ না থাকায় বৈদিক সাহিত্যের উপযোগিতা ও গ্রহণযোগ্যতা কিছুটা সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে।

২.৬.২ পুঁথি

প্রাচীন ভারতীয় সাহিত্যের পর্যায়ে পুঁথিগুলিও অন্যতম। ঋগ্বেদের সূত্রগুলির রচনাকাল থেকে মধ্যপর্বের আদিভাগের মধ্যে রচিত বিভিন্ন সময়ের অনুলিখনে কিছু গ্রন্থ আছে; সেগুলি আমরা পুঁথির আকারে পাই। এই পুঁথিগুলির অনেকগুলিই আধুনিক যুগে আবিষ্কৃত, সম্পাদিত ও মুদ্রিত হয়েছে। তবে আধুনিককালের গ্রন্থকাররা যেহেতু প্রাচীন কালের পুঁথিগুলি অনুলিখন করে থাকেন সেহেতু এগুলিতে ভুলভ্রান্তি থাকা অসম্ভব নয়, স্বাভাবিক। তাই প্রাচীন ভারত ইতিহাস রচনা কালে পুঁথিগুলিকে নির্দ্বিধায় গ্রহণ করলে চলে না।

২.৬.৩ রামায়ণ ও মহাভারত

বৈদিক সাহিত্যের পর দেশীয় সাহিত্যিক উপাদানের মধ্যে দুই মহাকাব্যের স্থান। রামায়ণ ও মহাভারত এই দুটি মহাকাব্য প্রাচীন ভারত ইতিহাস রচনায় নানা তথ্য যুগিয়েছে। যদিও গ্রন্থ দুটির রচনাকাল অনিশ্চিত, তবু মনে করার হয় যে রামায়ণ পূর্ববর্তী, মহাভারত পরবর্তী। এ. এ. ম্যাকডোনেলের মতে, মূল রামায়ণ রচিত হয়েছিল খ্রীঃপূর্ব পঞ্চম শতাব্দীর পূর্বে এবং মহাভারতের রচনাকাল খ্রীঃপূর্ব পঞ্চম শতাব্দী থেকে খৃষ্টীয় পঞ্চম

শতাব্দীর মধ্যে। রামায়ণের বিষয়বস্তু রাম এবং রাবণের যুদ্ধ তথা আর্য এবং অনার্যদের সংঘর্ষের কাহিনী এবং আর্যসভ্যতা দক্ষিণে সিংহল পর্যন্ত কিভাবে বিস্তার লাভ করে তা জানান দেয়। অপরদিকে পৃথিবীর দীর্ঘতম মহাকাব্য হল মহাভারত। এখানে বলা আছে 'মহত্ত্বাদ্ভারবত্ত্বাচ্চ মহাভারতমুচ্যতে'— যার অর্থ হল মহত্ব ও ভারবত্ত্ব থাকার জন্যেই এর নাম হল মহাভারত। এক কথায় মহাভারত হল ভারতের কলেবর, সত্য ও অমৃত। মহাভারতের শান্তিপর্বে যুধিষ্ঠির বলেছেন, "পাপ করে ফেলে নিজেকে অমানুষ মনে করা উচিত নয়, সূর্য যেমন রাত্রি শেষে উদিত হয়ে অন্ধকারকে বিনষ্ট করে, তেমনই সৎকর্মের দ্বারা দুষ্কর্ম বিনষ্ট করা যায়।" এই ধরনের নানা চিরন্তন সত্য আমরা মহাভারত থেকে জানতে পারি। তবে দুই মহাকাব্যের বৈষম্যে রামায়ণের শিল্পসৌন্দর্য বেশী, কিন্তু মহাভারত বেশি বলদৃপ্ত। প্রাচীন ভারত ইতিহাসের কোন যুগকেই মহাকাব্যের যুগ বলা না গেলেও এই দুটি গ্রন্থ থেকে সমসাময়িক সমাজ, রাষ্ট্রনীতি, অর্থনীতি সম্পর্কে আভাস পাওয়া যায়। তাই ইতিহাসের উপাদান হিসেবে এদের মূল্য কম নয়। রণবীর চক্রবর্তীর মতে, মহাকাব্যদ্বয়ের সবচেয়ে প্রধান গুরুত্ব হল ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতির পরিবর্তনশীল চরিত্র সম্পর্কে সম্যক ধারণা এই দুই গ্রন্থে পাওয়া যায়।

২.৬.৪ পুরাণ

খ্রীঃপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর পূর্বের ইতিহাস রচনার জন্য ঐতিহাসিকদের অন্যতম প্রধান উপাদান হল পুরাণগুলি। ১৮টি পুরাণের মধ্যে বিশেষ করে মৎস্যপুরাণ, বায়ুপুরাণ, বিষ্ণুপুরাণ, ভাগবত ও ভবিষ্য পুরাণের গুরুত্ব বিশেষ উল্লেখযোগ্য। পুরাণগুলি ঠিক কবে রচিত হয়েছিল তা নিশ্চিত করে বলা না গেলেও একথা বলা যেতে পারে যে এখন যে পুরাণগুলি আমরা ব্যবহার করে থাকি সেগুলির রচনাকাল আনুমানিক খ্রীষ্টীয় চতুর্থ থেকে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যে। প্রাচীন ভারত ইতিহাস রচনায় পুরাণের অবদান সম্পর্কে কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যেতে পারে যেমন — মৌর্যবংশের ক্ষেত্রে বিশ্বাসযোগ্য এক উপাদান হল বিষ্ণুপুরাণ। সাতবাহন ইতিহাস জানার জন্য মৎস্যপুরাণ, গুপ্তদের আদি বাসস্থান ও প্রারম্ভিক পর্বের ইতিহাস জানার জন্য বায়ুপুরাণ উল্লেখ্য। এছাড়া পুরাণে বর্ণিত নদী, পর্বত, শহর ও নগর স্বাভাবিকভাবে আমাদের ভৌগোলিক জ্ঞানের পরিধিকে বিস্তৃত করে, তবে ঐতিহাসিকরা একান্ত ভাবে পুরাণের উপর নির্ভর করতে পারেন না, কারণ পুরাণে বর্ণিত বিভিন্ন ঘটনাই গল্পের পর্যায়ে পড়ে এবং ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে তা খুব একটা নির্ভরযোগ্য নয়। বঙ্কিম চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, ভারতকলঙ্ক প্রবন্ধে লিখেছেন, "যে গ্রন্থগুলিন পুরাণ' বলিয়া খ্যাত আছে, তাহাতে প্রকৃত পুরাতত্ত্ব কিছুই নাই। যাহা কিছু আছে তাহা অনৈসর্গিক এবং অতি মানুষ উপন্যাস এরূপ আচ্ছন্ন যে, প্রকৃত ঘটনা কী, তাহা কোন রূপেই নিশ্চিত হয় না।" তাই এককভাবে পুরাণগুলি কোন সত্যকে প্রতিষ্ঠা করতে পারে না, অন্য উপাদান থেকে সংগৃহীত তথ্যকে সমর্থন করতে পারে মাত্র। সম্প্রতি অবশ্য ঐতিহাসিকরা পুরাণের তাৎপর্য বিচার করছেন এর আঞ্চলিক চরিত্রের নিরিখে।

২.৬.৫ বৌদ্ধ ও জৈনগ্রন্থ সমূহ

পুরাণের পরই উল্লেখ্য হল বৌদ্ধ ও জৈন গ্রন্থ গুলি। বৌদ্ধ সাহিত্যের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য হল — দীপবংশ, মহাবংশ এবং জাতক। দীপবংশ ও মহাবংশে মৌর্য সম্রাট অশোকের জীবন বৃত্তান্তের সংকীর্ণ বিবরণ আছে, তবে এই গ্রন্থ দুটিতে লোককাহিনীর সংমিশ্রণ ঘটায় এর ঐতিহাসিক মূল্য অল্প। তবে দীপবংশের তুলনায় মহাবংশ অনেক সংহত ও সম্পূর্ণ। এ ছাড়া বৌদ্ধ গ্রন্থ দীর্ঘ নিকায় এবং অঙ্গুত্তর নিকায় থেকে খ্রীষ্টপূর্ব

ষষ্ঠ শতাব্দীতে ভারতবর্ষের রাজনৈতিক ও মগধের অভ্যুত্থান সম্পর্কিত বিষয় জানা যায়। এছাড়া গৌতম বুদ্ধের পূর্বজন্মবিষয়ক লোককাহিনী গুলির নাম জাতক। রাজনৈতিক ইতিহাসের জন্য জাতকগুলি মূল্যহীন হলেও সামাজিক ও অর্থনৈতিক দিক থেকে এগুলি গুরুত্বপূর্ণ। উদাহরণস্বরূপ মেগাস্থিনিস ভারতের জনসমষ্টিকে কর্মের ভিত্তিতে সাতটি শ্রেণিতে ভাগ করেন যা প্রচলিত জাতিভেদ সংজাত ধারণার বিরোধী। তাই অনেকে মনে করেন মেগাস্থিনিস জাতিভেদ ব্যবস্থা সম্যক বুঝতে পারেন নি। কিন্তু পরবর্তীকালে ডঃ অতীন্দ্রনাথ বসু গবেষণা করে দেখিয়েছেন মেগাস্থিনিসের বর্ণনা নতুন বিশ্লেষণের দাবী রাখে এবং জাতকগুলিতেই তাঁর প্রমাণ মেলে। জৈন ভগবতী সূত্র থেকে খ্রীঃপূর্ব ষষ্ঠ শতাব্দীর রাজনৈতিক চিত্র জানা যায়। এতে ষোড়শ মহাজনপদের উল্লেখ আছে। এছাড়াও ভদ্রবাহু রচিত কল্পসূত্রে মহাবীরের জীবনী আছে, যা চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য সম্পর্কে একটি সহায়ক গ্রন্থও বটে। জৈন আচরঙ্গসূত্র বা আবশ্যকচূর্ণীর মতো সাহিত্য চরিত্রে প্রধানত ধর্মীয় গ্রন্থ হলেও, লোকজীভনের নানান দিক এগুলিতে ফুটে উঠেছে।

২.৬.৬ অন্যান্য কয়েকটি গ্রন্থ

কখনও বা সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিতভাবেই অন্যরকম গ্রন্থ থেকে ইতিহাসের তথ্য পাওয়া যায়, যেমন — গার্গীসংহিতা, এটি একটি গ্রহনক্ষত্র-বিজ্ঞান বিষয়ক গ্রন্থ হলেও মাঝে মাঝে সন, তারিখের গ্রন্থি মোচনে সাহায্য করে। এছাড়াও বৈদিক পর্বের পরবর্তী নানা তথ্য পাওয়া যায় পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য, এইদুটি ব্যাকরণ গ্রন্থ থেকে।

২.৬.৭ মৌর্য ও গুপ্ত পর্বের গ্রন্থসমূহ

মৌর্যদের সম্পর্কে সবথেকে নির্ভরযোগ্য গ্রন্থ হল কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্র। মেকিয়াভেলির মতে এই গ্রন্থে কৌটিল্য রাষ্ট্রনীতি সম্পর্কে বিশদ বর্ণনা দিয়েছেন, এর পরে প্রাক-গুপ্ত ও গুপ্তযুগে রচিত বিভিন্ন স্মৃতিশাস্ত্র গুলি — মনুস্মৃতি, নারদস্মৃতি, বৃহস্পতিস্মৃতি প্রভৃতি থেকে তৎকালীন আইন ও ধর্মশাস্ত্র সম্পর্কে নানা তথ্য জানা যায়। তবে গুপ্ত পর্বের ইতিহাস রচনার অন্যতম উপাদান হল কালিদাসের নাটকগুলি। কালিদাসের নাটক অভিজ্ঞান-শকুন্তলম্ এবং রঘুবংশম কাব্য দুটি ঐতিহাসিক দিক থেকে মূল্যবান। তাঁর নাটক 'মালবিকাগ্নিমিত্রম' — এর নায়ক অগ্নিমিত্রও শুঙ্গবংশের প্রতিষ্ঠাতা পুষ্যমিত্রের পুত্র একজন ঐতিহাসিক ব্যক্তি। এছাড়াও ভাস প্রণীত নাটক 'চারুদত্ত' এবং বরাহমিহিরের 'বৃহৎসংহিতা' ও বাৎসায়নের 'কামসূত্র' বিশেষ উল্লেখ্য। এগুলি থেকেও তৎকালীন সামাজিক, সাংস্কৃতিক এবং নাগরিক জীবনের ছবি ফুটে ওঠে।

২.৬.৮ গুপ্তোত্তর পর্বের সাহিত্য

গুপ্তোত্তর পর্বের ইতিহাস জানতে গেলে ঐতিহাসিকদের সাহায্য নিতে হয় কতকগুলি জীবনীগ্রন্থ এবং আঞ্চলিক ইতিবৃত্তের। জীবনী প্রসঙ্গে প্রথমেই মনে আসে অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিত'—এর কথা। লেখক কুষাণ পর্বের মানুষ ছিলেন। বানভট্ট রচিত 'হর্ষহচরিত'ও আরেকটি জীবনীমূলক গ্রন্থ। ডঃ আর এস ত্রিপাঠী এবং রমেশচন্দ্র মজুমদার স্পষ্ট জানিয়েছেন যে, বানভট্ট হর্ষকে অকারণে গৌরবদান করেছেন। 'বিক্রমাঙ্কদেব চরিত' বিলহন রচিত চালুক্য বংশীয় রাজা ষষ্ঠ বিক্রমাদিত্যের জীবনীগ্রন্থ। সন্ধ্যাকর নন্দী রচিত 'রামচরিত' বাংলার পালবংশের রাজা রামপালের জীবনী গ্রন্থ, বাকপতির 'গৌড়বাহ', জয়সিংহের 'কুমারপাল' চরিত এবং পদ্মগুপ্তের 'নবশশাঙ্ক চরিত'

প্রভৃতি জীবনী গ্রন্থগুলি এ প্রসঙ্গে স্মরণীয়। তবে এইসব জীবনী গ্রন্থগুলির উপর সম্পূর্ণ নির্ভরশীল হওয়া ঠিক নয় কারণ এই সকল গ্রন্থগুলিতে সংশ্লিষ্ট শাসকবর্গের প্রতি মাত্রাতিরিক্ত পক্ষপাত ফুটে উঠেছে।

২.৬.৯ স্থানীয় ইতিবৃত্ত

স্থানীয় ইতিবৃত্ত বলতে নেপাল, গুজরাত, সিন্ধু ও কাশ্মীরের ইতিবৃত্ত বোঝায়। তবে এগুলির মধ্যে ১১৪৯-৫০ খ্রীঃ রচিত কাশ্মীরের উপাখ্যান কলহন কর্তৃক রচিত 'রাজতরঙ্গিনী' সর্বাধিক উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থটিতে ভয়লেশহীন ভাবে অপক্ষপাত দৃষ্টিভঙ্গী নিয়ে লেখক বিজ্ঞানসম্মত ভাবে কাশ্মীরের আঞ্চলিক ইতিহাস তুলে ধরেছেন, তাই ভারতীয় সাহিত্যে এটিকে প্রথম ইতিহাসের মর্যাদা দেওয়া হয়। এটি ছাড়া মেরতুঙ্গের 'প্রবন্ধ চিন্তামণি', সোমেশ্বরের 'রাসমালা', বালচন্দ্রের 'বসন্তবিলাস', রাজশেখরের 'প্রবন্ধকোষ' গুজরাটের ইতিহাস রচনায় সহায়ক হয়েছে। নেপালের বংশাবলী এবং 'বুরানজি' থেকে আমরা অসমের আঞ্চলিক ইতিহাসও জানতে পারি।

২.৬.১০ কৃষিবিষয়ক গ্রন্থ

খ্রীষ্টীয় একাদশ শতক এবং খ্রীষ্টীয় দ্বাদশ শতকে কৃষি সম্পর্কিত দুটি গ্রন্থ 'কৃষি পরাশর' এবং 'কাশ্যপকৃষিসুক্তি' থেকেও আমরা সমকালীন এমনকি পূর্ববর্তী কয়েকশো শতাব্দীর কৃষিকাজ সংক্রান্ত খোঁজখবর পাই। তাই প্রাচীন ভারত ইতিহাস রচনায় এগুলিও গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছে।

২.৬.১১ সঙ্গম সাহিত্য

প্রাচীন ভারত ইতিহাস রচনায় বেশ কিছু তামিল সাহিত্যও উল্লেখের দাবী রাখে, দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস রচনায় যাদের ভূমিকা অন্যতম। যীশু খ্রীষ্টের জন্মের পরে প্রথম কয়েক শতাব্দীর শাসকবর্গের সম্বন্ধে সঙ্গম তথা তামিল সাহিত্য আমাদের অবহিত করে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, তামিল সাহিত্যই ইতিহাসে সঙ্গম সাহিত্য নামে পরিচিত। সেগুলির রচনাকাল আনুমানিক ৩০০ থেকে ৬০০ খ্রীঃ মধ্যে হয়েছিল বলেই মনে করা হয়। তবে তামিল সাহিত্যের মধ্যে 'তোলাকাপ্পিয়াম' এবং খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের দুটি প্রসিদ্ধ মহাকাব্য 'সিলপ্পাদিকরম' এবং 'মণিমেখলাই' বিশেষ ভাবে স্মরণীয়।

সুতরাং, আমরা দেখতে পাচ্ছি যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় বেশ কিছু দেশীয় সাহিত্য, ঐতিহাসিকদের সাহায্য করে। তবে এগুলি মধ্যে লোককথা, পক্ষপাতজনিত অতিকথন, কিছু অ-প্রাসঙ্গিক সাহিত্যকীর্তি এমনভাবে মিশে আছে যে, ঐতিহাসিকদের অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে সেগুলি ব্যবহার করতে হবে।

২.৬.১২ বিদেশী সাহিত্য

প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় দেশীয় সাহিত্যের মত বিদেশী সাহিত্যের অবদানও নেহাত কম নয়। বিদেশী সাহিত্য বলতে আমরা বিদেশী লেখক ও পর্যটকের রচনা বুঝি। তাদের মধ্যে গ্রীক, রোমান, চৈনিক, তিব্বতীয় এবং মুসলিমগণ ছিলেন। এরা অনেকে বর্ণনার উপর নির্ভর করে লিখেছিলেন আবার অনেকে ভারত ভ্রমণ বা বসবাসের অভিজ্ঞতা থেকে লিখেছেন।

আলেকজান্ডারের ভারত আক্রমণের পূর্বে হেরোডোটাস ও টিসিয়াস এই দুইজন গ্রীক লেখক ভারত সম্বন্ধে লিখেছিলেন। হেরোডোটাস কখনও ভারতে আসেন নি। তাঁর লেখা গ্রন্থটির নাম 'Historia', এই গ্রন্থেই সর্বপ্রথম 'ইণ্ডিয়া' নামটি ব্যবহার করা হয়। অপরদিকে টিসিয়াসের লেখ গ্রন্থটির নাম 'ইন্ডিকা'। এই দুটি গ্রন্থও নানা অবিশ্বাসে পরিপূর্ণ, তাই এগুলির ঐতিহাসিক মূল্য কম। তবে তাদের রচনা বিদেশীদের ভারত সম্পর্কে আগ্রহী করে তুলেছিল। আলেকজান্ডারের সঙ্গে ভারতে এসেছিলেন নিয়ারকাস, এরিসটোবুলাস এবং ওনেসিক্রিটাসের রচনায়ও সে সময়কার ভারতীয় সমাজ এবং প্রাকৃতিক পরিবেশ সম্পর্কিত নানা তথ্য পাওয়া যায়। এর কিছুকাল পরে সেলুকাসের দূত হয়ে ভারতে আসেন মেগাস্থিনিস। তাঁর রচিত 'ইন্ডিকা' মৌর্য পর্বের ইতিহাস রচনার এক অন্যতম উপাদান। তবে মূল গ্রন্থটি হারিয়ে গেছে কিন্তু তা বেঁচে আছে স্ট্র্যাবো, ডায়াডোরাস এবং এরিয়ানের রচনায়। এছাড়াও খ্রীঃ দ্বিতীয় শতকে জাস্টিনের 'এপিটোম' নামক গ্রন্থে আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের কাহিনী আছে।

তবে ভারত ইতিহাসের পক্ষে এ পর্বের সর্বশ্রেষ্ঠ বই হল "পেরিপ্লাস অফ দি এরিথ্রিয়ান সী" অর্থাৎ "ভারত মহাসাগরের ভ্রমণ"। কোন এক অজ্ঞাতনামা নাবিকের এই গ্রন্থে তৎকালীন ভারতের অর্থনৈতিক চিত্রটি বিবৃত যা অন্য কোন গ্রন্থে পাওয়া যায় নি। এতে ভারতের বন্দর, পোতাশ্রয়, আমদানি-রপ্তানী, পণ্য-দ্রব্য প্রভৃতির নিখুঁত বর্ণনা রয়েছে। তবে এতে আলোচিত বিভিন্ন বিবরণ থেকে ডঃ রমেশচন্দ্র মজুমদার এই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে গ্রন্থটি একজন মিশরবাসী গ্রীক কর্তৃক লিখিত এবং এর রচনার আনুমানিক সময়কাল খ্রীষ্টীয় প্রথম শতাব্দীর দ্বিতীয়ার্ধ। তিনি আরো বলেছেন বইটির ঐতিহাসিক গুরুত্বের জন্য "বইটিকে সোনা দিয়ে ওজন করা যায়"।

এছাড়া আলোচ্য সময়কালে ভারতের ইতিহাসের নানা তথ্য পাওয়া যায় বিভিন্ন ভৌগোলিক বিবরণ থেকে। যার মধ্যে রোমান পন্ডিত প্লিনির "ন্যাচারাল হিস্ট্রি" (আনুমানিক ২৩-৭৯ খ্রীঃ) উল্লেখযোগ্য। এর মাধ্যমে আমরা রোম-ভারত বাণিজ্যের কথা জানতে পারি। এ ছাড়াও এরিয়ানের 'ইন্ডিকা' এবং টলেমির 'ভূগোল' গ্রন্থটিও খ্রীঃ দ্বিতীয় শতাব্দীর মধ্যবর্তী সময়ের ভারতের ভৌগোলিক বিবরণ চিত্রিত করে। তবে এই রচনাগুলির ঐতিহাসিক ভিত্তি অত্যন্ত দুর্বল। কারণ এই গ্রন্থগুলির লেখকেরা গ্রীক লেখক এবং তৎকালীন ব্যবসায়ীদের প্রতিবেদনের উপর নির্ভর করেছিলেন অত্যধিক।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে প্রথম দিকের জন্য গ্রীক গ্রন্থসমূহের যে স্থান শেষের দিকের জন্য চীনের ইতিবৃত্ত এবং গ্রন্থসমূহের সেই স্থান। চৈনিক ইতিবৃত্ত দ্বারা শক, পল্লব, কুষাণ ক্রম-অগ্রগতির কথা জানা যায় না। চীনা পর্যটকদের মধ্যে প্রথমেই উল্লেখযোগ্য ব্যক্তি ফা-হিয়েন। তিনি গুপ্ত সম্রাট দ্বিতীয় চন্দ্রগুপ্তের রাজত্বকালে ভারতে আসেন। তাঁর লেখা গ্রন্থটির নাম "ফু-কুয়ো-কি"; তিনি ১৫ বছর ভারতে ছিলেন। বুদ্ধের স্মৃতি-বিজড়িত স্থানগুলি পরিভ্রমণ করে এ সম্পর্কে বেশ কিছু তথ্য লিপিবদ্ধ করেন। তবে তাঁর তথ্যাদি নির্দ্বিধায় গ্রহণ করা যায় না।

গুপ্তোত্তর কালে চীনা পর্যটকদের মধ্যে হিউয়েনসাঙ নিঃসন্দেহে শ্রেষ্ঠ। তিনি হর্ষবর্ধনের রাজত্বকালে ভারতে আসেন এবং ৬৪৫ খ্রীঃ নাগাদ দেশে ফিরে যান। তাঁর ভ্রমণ বৃত্তান্তের নাম 'সি-ইউ-কি'। ফা হিয়েনের বিবরণের তুলনায় যা অনেক সমৃদ্ধ ছিল। তবে তাঁর রচনায়ও হর্ষবর্ধনের প্রতি পক্ষপাত প্রকাশ পেয়েছে। কিন্তু নানা সমালোচনা সত্ত্বেও এটি একটি মূল্যবান ঐতিহাসিক উপাদান হিসাবে স্বীকৃত হয়েছে। হিউয়েন সাঙ ছাড়া অপর উল্লেখ্য চৈনিক পরিব্রাজক হলেন ই-সিং। তাঁর রচিত গ্রন্থ 'কাউ-ফা-কাং-সাং-চুয়েন' থেকে গুপ্তদের

আদি বাসস্থান ও তৎকালীন সামাজিক ও ধর্মীয় জীবনের কথা জানতে পারি। তাই নানা সমালোচনা থাকলেও প্রাচীন ভারত ইতিহাস রচনায় চীনা পরিব্রাজকদের অবদান এক কথায় অবিস্মরণীয়।

চীনা পর্যটক ছাড়া তিব্বতীয় ঐতিহাসিক তারানাথের রচনার কথা বলা যায়। যদিও এতে লেখকের ইতিহাস রচনার প্রয়াস লোককাহিনীর দ্বারা আক্রান্ত তথাপি বৌদ্ধ ধর্মের জন্য বিশেষভাবে পাল রাজাদের জন্য এই গ্রন্থ মূল্যবান।

আরবীয় পর্যটকদের বিভিন্ন রচনাও আমাদের প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় বিশেষ সহায়ক হয়েছে। উত্তর ভারতে মুসলিমদের ক্রমান্বয়িক জয়লাভের কাহিনীও আমরা এঁদের বর্ণনা থেকেই পাই। এঁদের মধ্যে পালবংশের শাসক দেবপালের সময় আরব বণিক সুলেমান ভারতে আসেন এবং ৮৫১ খ্রীঃ একটি ভারত বিবরণ লেখেন। এছাড়া আরব পর্যটক আল মাসুদি এক্ষেত্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি ৭১৫ সালে ভারতে আসেন এবং তাঁর রচনা থেকে আমরা প্রতিহার রাজ মহীপালের শাসন ব্যবস্থার সম্যক পরিচয় লাভ করি।

তবে এই পর্বের আরবীয় পর্যটকদের মধ্যে শ্রেষ্ঠ হলেন আল-বিরুণী। তিনি গজনীর সুলতান মামুদের সঙ্গে ভারতে আসেন। তাঁর প্রকৃত নাম 'আবু রৈহাণ'। তাঁর লেখা বিখ্যাত গ্রন্থটি হল 'তারিখ-ই-হিন্দ'(১০৩০ খ্রিঃ)। তাঁর এই গ্রন্থ থেকে তৎকালীন ক্ষয়িষ্ণু হিন্দুদের ধর্ম ও সমাজ ব্যবস্থার কথা জানা যায়। ইতিপূর্বে ভারত সম্পর্কে এত ব্যাপক গ্রন্থ আর লেখা হয়নি। তবে তাঁর গ্রন্থটির অন্যতম ত্রুটি হল তাঁর রচনায় ভারতের রাজনৈতিক অবস্থার চিত্র নেই এবং তিনি ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার উপর নির্ভর না করে ভারত বিষয়ক বইয়ের উপর নির্ভর করেছেন। অর্থাৎ ভারত ভুবনকে তিনি সাহিত্যের মধ্য দিয়েই দেখেছেন, নিজের চোখে কখনোই দেখেন নি।

সর্বোপরি, তাই এই কথা বলা যেতেই পারে যে প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের ন্যায় সাহিত্যিক উপাদানও সমানভাবে গুরুত্বপূর্ণ, কিন্তু অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে তা ব্যবহার করাটাও জরুরি।

২.৭ উপসংহার

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চার জন্য আকর তথ্য সূত্র সম্পর্কে যে সামগ্রিক পরিচিতি তুলে ধরা হল, তার ভিত্তিতে একথা বলা যায় যে তথ্যসূত্র সম্বন্ধে যথার্থ জ্ঞান ছাড়া অতীতকে বোঝা অসম্ভব। প্রাচীন ভারত সম্বন্ধে তথ্য সূত্রের বৈচিত্র্য থাকলেও তা নিতান্ত অপ্রতুল। তাই কোন একটিমাত্র তথ্যসূত্রের দ্বারা অতীতের সব ছবি ধরা পড়ে না। প্রাথমিক তথ্যসূত্র ও সহায়ক বিভিন্ন উপাদান যত্ন সহকারে ও নির্মোহ মূল্যায়ন করেই ঐতিহাসিক কোনো একটি যুগ বা এলাকার ইতিহাস তুলে ধরেন। আবার একথাও মনে রাখা দরকার ইতিহাস বোঝার জন্য কোনো চটজলদি, তৈরি তথ্যসূত্র থাকে না। ঐতিহাসিকের জিজ্ঞাসাই নতুন তথ্যের সন্ধানে বা জ্ঞাত তথ্যের পুনর্মূল্যায়নে তাঁকে এগিয়ে নিয়ে যায়। প্রাচীন ইতিহাস চর্চার জন্য আকর তথ্যসূত্র ও তার ব্যবহারবিধি দুই-ই একান্ত গুরুত্বপূর্ণ।

২.৮ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চায় প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের গুরুত্ব আলোচনা করো।

২. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস পুনর্গঠনে প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদান হিসাবে লেখ-র গুরুত্ব কতটা?

৩. প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের শাখা রূপে মুদ্রার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা সম্পর্কে টীকা লেখ।

৪. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনায় সাহিত্যিক উপাদানের ভূমিকা কতটা?

৫. সাহিত্যিক উপাদান হিসেবে বৈদিক সাহিত্যের গুরুত্ব কতটা?

৬. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে বৈদেশিক সাহিত্যের গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতা গুলি উল্লেখ করো।

৭. প্রাচীন ভারতের ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উপাদানের তুলনামূলক আলোচনা করো।

২.৯ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

অমলেশ ত্রিপাঠী, ইতিহাস ও ঐতিহাসিক, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য পুস্তক পর্ষৎ, কলকাতা, ১৯৮৮।

রণবীর চক্রবর্তী, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব(প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।

Upinder Singh– A History of Ancient and Early Medieval India– Pearson– 2009.

R.S. Sharma– India's Ancient Past– OUP– New Delhi– 2005.

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ), প্রথম খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

A. L. Basham– The Wonder that was India– Kolkata– 1987.

একক - ৩ ◻ ইতিহাসের ব্যাখ্যা (লিঙ্গ, পরিবেশ, প্রযুক্তি এবং আঞ্চলিকতার উপর বিশেষ গুরুত্ব সহ) (Historical interpretations with special reference to gender–environment–technology and regions)

গঠন

৩.০ উদ্দেশ্য

৩.১ সূচনা

৩.২ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চায় জেন্ডার বা লিঙ্গ

৩.৩ ইতিহাসে পরিবেশের প্রভাব

৩.৪ প্রাচীন ভারতে প্রযুক্তি

৩.৫ ইতিহাস চর্চার নতুন দিগন্ত — আঞ্চলিক ইতিহাস

৩.৬ উপসংহার

৩.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৩.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

৩.০ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠের উদ্দেশ্য হল ইতিহাসের বিভিন্ন ব্যাখ্যা সম্পর্কে সম্যক ধারণা অর্জন করা।
- আধুনিক ইতিহাসচিন্তার বিকাশের ফলশ্রুতি হিসেবে অতীতকে বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষণের চেষ্টা শুরু হয়েছে। এই দৃষ্টিভঙ্গিগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল-
  - ➢ লিঙ্গবাদী ব্যাখ্যা
  - ➢ পরিবেশবাদী ব্যাখ্যা
  - ➢ ইতিহাসে প্রযুক্তির ভূমিকা
  - ➢ আঞ্চলিক স্তরের ইতিহাসচর্চার বিকাশ

৩.১ সূচনা

ঊনবিংশ শতক থেকে আজ পর্যন্ত ভারতে ইতিহাসচর্চার ধারা ও পদ্ধতিতে বারংবার পরিবর্তন ঘটেছে। প্রথাগত ইতিহাসচর্চার পরিধিতে যুক্ত হয়েছে নিত্যনতুন বিষয়। এর ফলে যেমন অতীত ঘটনার পুনর্মূল্যায়ন

ঘটেছে, তেমনই অভিনব ব্যাখ্যাও উঠে এসেছে। ইতিহাস শুধুমাত্র অতীত স্মৃতিচারণার বিষয় না হয়ে, আকর্ষণীয় চরিত্র লাভ করেছে। অধ্যাপক অশীন দাশগুপ্তের ভাষায়, সমাজবদ্ধ মানুষের অতীতাশ্রয়ী তথ্যনিষ্ঠ জীবন ব্যাখ্যাই ইতিহাস।" আর সামাজিক জীব হিসাবে মানুষের কর্মধারা নিয়ত পরিবর্তশীল। তাই আজ থেকে চার-পাঁচ দশক আগেও যে সমস্ত বিষয় ইতিহাসের পরিধিতে স্থান পায় নি, আজ সেগুলি নিজস্ব স্থান করে নিয়েছে। নিত্যনতুন বিষয়ের অন্তর্ভুক্তি ইতিহাসচিন্তনকেই গভীরতা প্রদান করেছে। ইতিহাস কেবল রাজা মহারাজার কাহিনী নয়—তা হল মানুষের কাহিনী। রাজনৈতিক প্রক্রিয়ার প্রতি যথাযথ গুরুত্ব স্বীকার করেও তাই ঐতিহাসিকরা অতীতের প্রাণবন্তকর পরিচয় তুলে ধরতে প্রয়াসী হচ্ছেন। যে ধারার পথপ্রদর্শনকারী উদাহরণ নীহাররঞ্জন রায়- রচিত 'বাঙালীর ইতিহাস-আদিপর্ব'। বিগত কয়েক দশকে এই ধারা অনুসরণ করেই লিঙ্গ, পরিবেশ, প্রযুক্তি, অঞ্চল প্রভৃতি প্রসঙ্গ গুলিও ইতিহাসচর্চায় স্থান করে নিয়েছে।

৩.২ প্রাচীন ভারতের ইতিহাস চর্চায় জেন্ডার বা লিঙ্গ

সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস চর্চায় 'জেন্ডার' বা লিঙ্গ, লিঙ্গ-ভেদ এবং লিঙ্গ সচেতনতা সংক্রান্ত বিতর্ক ইতিহাসের বৌদ্ধিক ব্যাখ্যায় নতুন মাত্রা সংযোজন করেছে। বস্তুত 'জেন্ডার হিস্ট্রি' বা লিঙ্গ-ভিত্তিক ইতিহাস, সাধারণ ইতিহাসেরই একটি উপক্ষেত্র যেখানে অতীতের ঘটনাবলিকে স্ত্রী-পুরুষ ভেদের আলোকে ব্যাখ্যা করা হয়। অনেক দিক থেকে এটি নারীজাতির ইতিহাসেরই বর্তমান স্বরূপ। জোয়ান স্কট আমেরিকান হিস্টরিকাল রিভিউ (৯১ সংখ্যা, ৫ ডিসেম্বর ১৯৮৬)-তে "Gender : A Useful Category of Historical Analysis" শীর্ষক প্রবন্ধে বলেছেন যে, নারীবাদীরা ইতিমধ্যেই 'জেন্ডার' শব্দটিকে সামাজিক নির্মাণে লিঙ্গ-বৈপরীত্য বোঝাতে ব্যবহার করেন এবং তাত্ত্বিকরাও এই শব্দটিকে শ্রেণি, জাতি-র সমগোত্রীয় একটি বিশ্লেষণাত্মক বর্গ বা 'category' হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। বর্তমানে কিছু ঐতিহাসিক 'জেন্ডার' বা লিঙ্গ-ভিত্তিক ইতিহাসকে নারীজাতির ইতিহাসেরই সংযোজন মনে করেন। জেন্ডার বা লিঙ্গ-ভিত্তিক ইতিহাস দীর্ঘ না হলেও অতি অল্প সময়েই সাধারণ ইতিহাস চর্চায় এর অপরিসীম প্রভাব পড়ে। ১৯৭০ নাগাদ 'জেন্ডার' ঐতিহাসিকরা সাধারণ নারীদের আশা আকাঙ্ক্ষা ও মর্যাদার দিকগুলি লিপিবদ্ধ করতে শুরু করেন। ১৯৮০-র দশকে নারীবাদী আন্দোলনের ঢেউ আছড়ে পড়লে জেন্ডার-ইতিহাস চর্চায় নারীদের প্রতি বৈষম্য, অত্যাচার ও শোষণের দিকটি প্রাধান্য পায়।

ঊনবিংশ শতকের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারকরা এবং বিংশ শতকের জাতীয়তাবাদী ঐতিহাসিকেরা বৈদিক যুগকে নারীদের সুবর্ণযুগ বলে উপস্থাপন করেন। তাঁরা যুক্তি দেখান বৈদিক আর্যরা দেবীদের পূজা করতেন, ঋগ্বেদে নারীরা স্তোত্র রচনা করেন, ঋষির ভূমিকা পালন করেন, স্ত্রীরা স্বামীর স্বার্থে যজ্ঞ সম্পাদন ও সংস্কার পালন করেন, সভার অধিবেশনে এবং বিভিন্ন সামাজিক অনুষ্ঠানে যোগ দেন। বৈদিক যুগের নারীদের পতি নির্বাচনের স্বাধীনতা ছিল, এমনকি পিতৃগৃহে থেকে সারাজীবন বিদ্যাচর্চার স্বাধীনতাও তাঁদের ছিল। জাতীয়তাবাদীরা বৈদিক যুগের নারীদের এই উচ্চস্থান দেখিয়েছিলেন ঔপনিবেশিক শাসকদের শোষণ, অত্যাচার এবং ভারতীয় নারীদের হীনমর্যাদাসম্পন্ন রূপে দেখানোর প্রতিরিয়াস্বরূপ। সমকালীন ভারতীয় সমাজে নারীদের দুরবস্থা থেকে মুক্তি দিতেও জাতীয়তাবাদীরা এই পদক্ষেপ নেন।

সাম্প্রতিক কালের ইতিহাস চর্চায় নারীদের ইতিহাস বিচ্ছিন্নভাবে আলোচনা না করে নারী-পুরুষ সম্পর্কের আলোকে বিশ্লেষণ করা হয়। তাই 'জেন্ডার' বা লিঙ্গ-ভিত্তিক সম্পর্কের আলোচনায় একটি সাংস্কৃতিক মাত্রা আছে। পূর্বতন ঐতিহাসিকরা সাধারণত জনগণ ও জনক্ষেত্রের উপর আলোকপাত করতেন, আর পরিবার, গার্হস্থ্য এবং নারী-পুরুষ সম্পর্কের বিষয়টিকে ব্যক্তিগত, সাংসারিক ক্ষেত্রের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতেন। বর্তমানে ব্যক্তিগত তথা পারিবারিক ক্ষেত্র এবং জনক্ষেত্রের মধ্যে ফারাককে কৃত্রিম মনে করা হয়। পরিবার ও সংসারের মধ্যেই লিঙ্গ, বয়স ও আত্মীয়তার সম্পর্কের উপর ভিত্তি করে আচরণ, আদর্শ ও স্তরবিন্যস্ত ক্ষমতা ও কর্তৃত্ব বিরাজ করছে। সমাজতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিককেরা লক্ষ করেছেন যে বৃহত্তর রাজনৈতিক কাঠামোর সঙ্গে পরিবার ও সংসারের অভ্যন্তরের সম্পর্ক, বিবাহ আত্মীয়তার সম্পর্ক ইত্যাদি ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। নারীর যৌনতা, প্রজনন, শ্রেণি-জাতি-সম্পর্ক এইভাবেই নিয়ন্ত্রিত হয়। প্রতিটি সম্পর্ক একে অপরের সঙ্গে যুক্ত হয়ে এক বিরাট জটিল সামাজিক পিরামিড তৈরি করেছে। তাই জেন্ডার বা লিঙ্গ-ভিত্তিক সম্পর্ক সামাজিক ইতিহাসের এক গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ বলে বিবেচিত হয়।

বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক সম্পর্কের অঙ্গ হিসেবে নারী-পুরুষ সম্পর্ককে বিচার করলে কিংবা নারীর ইতিহাসকে সামগ্রিক ইতিহাসের একটি সংযোজন ভাবা হলে বৃহত্তর ক্ষমতার কাঠামোয় তার অবস্থান নির্ণয় করা সম্ভব হবে। জোয়ান স্কট বলেছেন নারীর ইতিহাসকে বৃহত্তর কাহিনীর অংশ হিসাবে সংযোজন করতে হবে যা এতদিন পর্যন্ত উহ্য ছিল। শুধু তাই নয় দেখতে হবে কেন তাদের ভূমিকাকে বাদ দেওয়া হয়েছিল এবং বিচার করতে হবে কোন ব্যবস্থা-এর জন্য দায়ী। ভারতীয় নারীদের কথা বিবেচনা করলে দেখা যাবে তাদের অভিজ্ঞতা অন্য সমাজ ও গোষ্ঠীর অভিজ্ঞতার থেকে ভিন্নতর। তাই নারীকে পদ, শ্রেণি, বৃত্তি এবং বয়সের ভিত্তিতে আরও সুনির্দিষ্ট বর্গে ভাগ করতে হবে। নারীকে বিচার করতে হবে এবং বুঝতে হবে পুরুষের সম্পর্কের ভিত্তিতে এবং জানতে হবে যে তদের এই সম্পর্ক বৃহত্তর সামাজিক, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক প্রেক্ষিতের সঙ্গে যুক্ত। সব যুগের জন্যই তখন নারীর পদমর্যাদার বিষয়টি মিলে গিয়ে কয়েকটি ছোট আরও অর্থবহ প্রশ্নে রূপান্তরিত হবে,যেমন গার্হস্থ্য জীবনে নারী-পুরুষের সম্পর্ক কী? কী করে একজন ব্যক্তির বংশ নির্ধারিত হবে? সম্পত্তি এবং উত্তরাধিকারের মানদন্ড কী হবে? উৎপাদন-সম্পর্কিত কার্যকলাপে ও তার ফলভোগের ক্ষেত্রে তাদের নিয়ন্ত্রণ থাকবে কি? কী করে নারীর যৌনতা এবং প্রজনন ক্ষমতা নিয়ন্ত্রিত হবে? ধর্মীয় ও সামাজিক আচারে নারীর ভূমিকা কী হবে? শিক্ষা ও জ্ঞানচর্চায় তাদের অবাধ গতি থাকবে কি? রাজনৈতিক ক্ষমতার কেন্দ্রে তাদের প্রত্যক্ষ যোগ থাকবে কি? নারীকে অধীন করে রাখার কাঠামোতে চিহ্নিত করাই শেষ কথা নয়, নারী-পুরুষ সম্পর্কের বিশ্লেষণে নারীকে অত্যাচারমূলক সামাজিক কাঠামোর অসহায় শিকার হিসেবে না দেখে এগিয়ে যেতে হবে বৃহত্তর ক্ষেত্রের দিকে। নারীর এই অধীনতা সত্ত্বেও সামাজিক ক্ষেত্রের বিভিন্ন দিকে সে স্থান করে নিয়েছে, নানাক্ষেত্রে সে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে এবং ইতিহাসের প্রধান ধারায় সে সক্রিয়ভাবে প্রতিনিধিত্ব করেছে। কিন্তু এই মহৎ কীর্তির কথা খুব কম-ই লেখা হয়েছে ইতিহাসে।

ভারতীয় জাতীয়তাবাদীদের এবং সমাজ ও ধর্ম সংস্কারকদের লেখায় বেশী করে বৈদিক যুগের সম্ভ্রান্ত নারীদের কথা তুলে ধরা হয়েছে। সমাজে পিছিয়ে পড়া নারীদের কোনো কথা বলা হয়নি। ঋগ্বেদে নারী দেবতাদের কথা বলা হয়েছে ঠিকই, কিন্তু এই দেবীদের কেউ-ই পুরুষ দেবতাদের মতো গুরুত্বপূর্ণ ছিলেন না। বস্তুত ঋগ্বেদে দেবীদের নিবেদিত স্ত্রোত্রের অনুপাত পুরুষ দেবতাদের তুলনায় খুবই কম। এক হাজারেরও বেশি

স্তোত্রের মধ্যে মোটে ১২থেকে ১৫টি নারী ঋষিদের সম্পর্কেও একই কথা প্রযোজ্য। এথেকে স্পষ্ট বোঝা যায় ধর্মীয় শিক্ষা লাভের ক্ষেত্রে নারীদের অবাধ গতি ছিল না। স্ত্রী স্বামীর সাথে একসঙ্গে যজ্ঞ সম্পাদন করতে পারলেও এককভাবে তা করতে পারতেন না। দান ও দক্ষিণা দেওয়া অথবা নেওয়ার ক্ষেত্রে তার একক স্বাধীনতা ছিলনা। পিতৃতান্ত্রিক বৈদিক সমাজে নারীর বস্তুগত সম্পত্তির উপর কোনো অধিকার ছিল না। তাদের যৌনতা, প্রজনন, সন্তান ধারণ সবই পিতৃতান্ত্রিক সমাজের বেধে দেওয়া নিয়মে নিয়ন্ত্রিত হত। চারুকলা বিশেষজ্ঞা সীমা বাওয়া তাঁর "Gods, Men and Women : Gender and Sexuality in Early Indian Art" শীর্ষক গ্রন্থে নারী প্রসঙ্গে ভারতীয় সমাজের স্ববিরোধিতার ছবি তুলে ধরেছেন। এই সমাজেই মানুষ একদিকে দেবীদের পূজা করেন, আবার অন্যদিকে নারীর অধিকারের প্রশ্নে তাদের অসম্মান করেন। তিনি শিল্পী ও গবেষণা চোখে মৌর্য-পরবর্তী প্রাচীন ভারতীয় ভাস্কর্যের ব্যাখ্যা করে সমকালীন নারী-পুরুষ সম্পর্ক তুলে ধরেন। ভাস্কর্যে নারীর প্রতিরূপে তিনি মাতা, প্রেমিকা, বিবাহিত দম্পতি, স্ত্রী, যারা স্ত্রী নন এমন, যক্ষী, দানবী ইত্যাদি ভাগে ভাগ করেছেন। প্রজনন-সক্ষম অপরিহার্য নারীদের তিনি 'লজ্জাগৌরী' ও 'দুগ্ধধারিনী' এই দুই ভাগে ভাগ করেছেন। নারীর অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ও অঙ্গসজ্জার প্রতিটি দিকের খুঁটিনাটি চর্চা করে (যেমন নগ্নতা, অলঙ্কার, অনিমেষ দৃষ্টি, দেহভঙ্গি ইত্যাদি) নারী-পুরুষ ভেদের দিকটি তুলে ধরেছেন। তিনি প্রশ্ন তুলেছেন নারীর যৌনতা ও প্রজনন সক্ষমতার দিকটি প্রকট করে সমকালীন পুরুষ সমাজ নারীকে সৃষ্টিশক্তির আধার হিসেবে তুলে ধরতে চেয়েছেন নাকি তাকে শুধুই জননতন্ত্রের বিষয়ে নামিয়ে এনেছেন।

ঋগ্বৈদিক যুগে পিতৃতান্ত্রিক সমাজের চাহিদা মেনে বংশরক্ষার তাগিদে পুত্র কামনা করা হত, কন্যা নয়। ঋগ্বেদে বিবাহ ব্যবস্থাকে যথেষ্ট গুরুত্বদান করা হয়েছে। বয়ঃসন্ধিকালের পরেই মেয়েদের বিবাহ দেওয়া হত এবং মেয়েদের পতি নির্বাচনের স্বাধীনতা ছিল। পতির মৃত্যু হলে বা সে নিরুদ্দেশ হলে পত্নীর পুনর্বিবাহের ব্যবস্থা ছিল। ঘোষা-র মতো বিদুষী মেয়েদের সারাজীবন অবিবাহিত থাকার নিদির্শনও ঋগ্বেদে আছে।

পৃথিবীর সব সমাজের ইতিহাসেই পুরুষের আধিপত্য এবং মেয়েদের দমিয়ে রাখার নিদর্শন আছে। তবে এই আধিপত্য ও দমনের মাত্রা সব জায়গায় একরকম নয়, এটি দেশ-কাল-সমাজ অনুযায়ী পরিবর্তন হয়েছে। যেমন পরবর্তী বৈদিক যুগের তুলনায় ঋগ্বৈদিক যুগের নারীরা বেশি অধিকার ও স্বাধীনতা ভোগ করত। এর কারণ পরবর্তী বৈদিক যুগের মতো সামাজিক ও ধর্মীয় অনুশাসন তখন দৃঢ়-প্রোথিত হয়নি। তবে ঋগ্বৈদিক সমাজেও প্রকৃত সাম্য ছিল না, পদ ও লিঙ্গ অনুযায়ী মর্যাদার তারতম্য হত। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রাচীন ভারতে নারীদের সামাজিক অবস্থানের আলোচনা নতুনভাবে বিশ্লেষণের প্রয়াস লক্ষ করা যাচ্ছে। একসময় অনন্ত সদাশিব অলটেকর প্রাচীন ভারতের নারীর উচ্চ মর্যাদা এবং দিল্লিতে তুর্কীশাসনের অভিঘাতে নারী মর্যাদার অবক্ষয়ের চিত্র অঙ্কন করেছিলেন। যার মূল কথা ছিল প্রাচীন ভারতে নারীর মর্যাদা ছিল উচ্চে, কিন্তু দ্বাদশ শতকের শেষ থেকে দিল্লীতে তুর্কী শাসনের অভিঘাতে নারীর স্থান অধোমুখী হয়। কিন্তু সুকুমারী ভট্টাচার্য, কুমকুম রায়, উমা চক্রবর্তী প্রমুখের সাম্প্রতিক গবেষণায় উঠে এসেছে পিতৃতান্ত্রিক সনাতন ভারতীয় সমাজ ব্যবস্থায় ও পারিবারিক জীবনে নারীর সম্মান ও মর্যাদা পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকেই হ্রাস পাচ্ছিল। নতুন তথ্যের আলোকে এই বিশ্লেষণ নিঃসন্দেহে প্রাচীন ভারত ইতিহাসের লিঙ্গ ভিত্তিক ইতিহাসচর্চায় এক নতুন দিগন্ত খুলে দিয়েছে।

৩.৩ ইতিহাসে পরিবেশের প্রভাব

মানব সভ্যতার ইতিহাসে পরিবেশের প্রভাব অপরিসীম। যে কোনো দেশের ভালো সময় কিংবা খারাপ সময়ের সাথে পরিবেশের প্রত্যক্ষ যোগ আছে। দেশ, জাতি ও সংস্কৃতির ইতিহাস ও তার বিবর্তন প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে, কারণ মানবসমাজ প্রাণীজগতের অন্যান্য প্রাণীর মতো প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে নিজেকে মানিয়ে নিয়েছে। আদিম যুগে মানুষ প্রাকৃতিক শক্তির কাছে অসহায় ছিল, এমনকি আধুনিকযুগে বিজ্ঞানের অগ্রগতি সত্ত্বেও প্রকৃতি ও পরিবেশকে সম্পূর্ণ নিয়ন্ত্রণে আনতে পারেনি। সভ্যতার বিকাশে মানুষ প্রাকৃতিক সম্পদকে কাজে লাগিয়েছে, কিন্তু এই সীমিত সম্পদের অতিরিক্ত ব্যবহার-ই প্রাকৃতিক ভারসাম্য নষ্ট করে পরিবেশগত বিপর্যয় ডেকে এনেছে। তাই প্রাকৃতিক পরিবেশ ও মানবসমাজের মধ্যে পারস্পরিক ক্রিয়া একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়রূপে বিবেচিত হয় যাকে আমরা পরিবেশ এবং বাস্তব সমস্যা আখ্যা দিতে পারি। তাই ভারতের ইতিহাসকে যথাযথভাবে বুঝতে হলে আমাদের ভারতের প্রাকৃতিক বৈশিষ্ট্য ,ভূগোল ও বাস্তববিদ্যা সম্পর্কে যথেষ্ট জ্ঞান থাকা চাই।

'ইকোলজি' 'ecology' বা বাস্তুবিদ্যা শব্দটি ১৮৬৯ সালে প্রথম ব্যবহৃত হয়। এটি জীববিদ্যার একতি নতুন শাখা হলেও সমাজবিজ্ঞানে —এর প্রয়োগ অনিবার্য হয়ে পড়েছে। কারণ জীবজগৎ ও পরিবেশের সঙ্গে মানবসমাজের প্রত্যক্ষ বা অপ্রত্যক্ষ যোগ রয়েছে। মানবজাতির আবির্ভাবের সাথে সাথে তাদের খাদ্য ও আশ্রয়ের প্রয়োজন হয়। প্রাচীনকালে মানুষ বনজঙ্গল থেকে গাছের ফল খেত, পশু-পাখি শিকার করত, পরে তারা নিজেই খাদ্য উৎপাদন করতে শেখে, বসতি গড়ে ওঠে, পরিবহণ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটে। এইভাবে নগরায়ণের সাথে সাথে মানুষ শিল্পের জগৎ-এ প্রবেশ করলে মানুষের সাথে গাছপালা ও প্রাণীর সম্পর্কের আমূল পরিবর্তন ঘটে। এই পরিবর্তনের ফলেই মানুষ বুঝতে পেরেছে তাদের জীবনে প্রকৃতি ও পরিবেশের গুরুত্ব কতটা। তাই মানুষ-ই এগিয়ে এসেছে জীবজগৎ, প্রাকৃতিক পরিবেশ সুরক্ষার কাজে।

'Environment'-কথাটির অর্থ হল পরিবেশ, যা প্রকৃতি ও মানুষ উভয়েরই সৃষ্টির ফল। পরিবেশের এই বৃহৎ ক্ষেত্রে যেমন রয়েছে জল, বায়ু ও মাটির মতো প্রাকৃতিক উপাদান যার উপর প্রাণী, গাছপালা ও মানুষের জীবন নির্ভরশীল তেমনি মানুষ্য-সৃষ্ট পরিবেশ গড়ে উঠেছে তার খাদ্য, বাসস্থান ও পরিবহণ সংক্রান্ত সুবিধা দানের প্রয়াসের মধ্যে। যেমন রাস্তা, সেতু, জলাধার, মানুষের বসবাসের জন্য অট্টালিকা নির্মাণ ইত্যাদি। পরিবেশের এই বিশাল পরিধিতে জল, বায়ু, মাটি, গাছপালা, প্রাণী জগৎ, মানুষ ও তার সৃষ্ট বস্তু ছাড়াও রয়েছে গ্রাম, শহর, আর্থসামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি যার পারস্পরিক ক্রিয়া ও প্রতিক্রিয়ায় পরিবেশের বিবর্তন ঘটে।

পরিবেশের ইতিহাস তাই প্রাকৃতিক জগত-এর সাথে মানুষের পারস্পরিক সম্পর্ক ও ক্রিয়া। পরিবেশের ইতিহাসের প্রধান লক্ষ্য হল আমাদের প্রকৃতির সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে গড়ে তুলে বোঝার চেষ্টা করা কীভাবে মানবজীবন প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে এবং মানুষই বা কীভাবে তার কাজের দ্বারা প্রকৃতিকে প্রভাবিত করছে বা কুপ্রভাব ফেলছে এবং ভবিষ্যতের ফল-ই বা কী হতে পারে।

পরিবেশবিদ্যা এবং বাস্তুবিদ্যা (Ecology)-র চর্চা ভারতে অপেক্ষাকৃত সাম্প্রতিক কালে শুরু হয়েছে। পরিবেশে বিদ্যার চর্চা শুরু হয়েছিল ফ্রান্সে। কিন্তু আমরা যদি প্রাচীন ভারতের দিকে ফিরে তাকাই তাহলে

দেখতে পাব বহু যুগ আগে বেদ, পুরাণ,জৈন ও বৌদ্ধশাস্ত্র পরিবেশ প্রেম ও তার সুরক্ষার কথা বলা হয়েছে। আমাদের প্রাচীন শাস্ত্রে মানব সমাজের সাথে গাছপালা প্রকৃতি ও জীবজগৎ-এর এত অদ্ভূত সামঞ্জস্য লক্ষ করি যা প্রাচীন ভারতীয়দের জন্য এক দূষণমুক্ত আদর্শ পরিবেশ রচনা করেছিল।

ভারতবর্ষে পরিবেশের ইতিহাস অনেক প্রাচীন, প্রাচীন ভারতীয়রা পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। তারা প্রকৃতির নানা উপাদান (যেমন জল, বায়ু, নদী, পাহাড়, অরণ্য) পূজা করত। প্রকৃতির সঙ্গে বসবাস-ই ছিল তাদের জীবনের আদর্শ। প্রকৃতির অনুশাসন তারা মানত। তারা, তুলসী, বেল, বট, অশ্বত্থ, নিম, শাল, কলাগাছকে পূজা করত এবং তাঁদের সামাজিক ও ধর্মীয় সংস্কারের সঙ্গে যুক্ত করেছিল। প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও পরিবেশ সুরক্ষায় যে বৃক্ষের বিরাট অবদান আছে এটা তাদের অজানা ছিল না। গাছকে তার ঔষধি গুণের জন্যেই পবিত্র মনে করা হত না, এটিকে উর্বতারও প্রতীক মানা হত। প্রাচীন ভারতীয়রা ভূমি, নদী, পাহাড়কেও তাদের জীবনের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ করে নিয়েছিল। বৈদিক আর্যরা সরস্বতী নদীকে, পরে গঙ্গা নদীকেও পবিত্র নদী রূপে গণ্য করত। সেই রকম কৈলাস পর্বতকেও শিবের আবাস বলে হিন্দুরা পবিত্র মনে করে। মহাভারতে গিরি গোবর্ধনকেও পূজা করার কথা বলা আছে।

মেগাস্থিনিস, প্লিনি, টলেমি, ফা-হিয়েন, হিউয়েনসাঙ, ই-সিং-এর মতো বিদেশী পরিব্রাজক ও লেখক ভারতের পরিবেশের বিভিন্ন দিক উল্লেখ করেছেন।

মানুষ ও তার সমাজের ওপর যেমন পরিবেশের প্রত্যক্ষ প্রভাব আছে তেমনি মানুষের নানাবিধ কাজ পরিবেশকে প্রভাবিত করেছে। যেমন মানুষ বন কেটে খাদ্য উৎপাদন করেছে, বসতি গড়ে তুলেছে, তেমনি জলবায়ুর পরিবর্তন, নদীর গতিরেখা পরিবর্তন মানুষকে বাধ্য করেছে বসতি ছেড়ে অভিপ্রয়াণ করতে।

বহু পন্ডিত মনে করেন মধ্য এশিয়ার প্রচন্ড ঠান্ডা থেকে অব্যহতি পেতে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে বহু মানুষ ভারতীয় উপমহাদেশের দিকে অভিপ্রয়াণ করে। এই মানুষগুলি-ই ছিল ঋগবৈদিক যুগের আর্য-ভাষী মানুষ।

বৈদিক আর্যরা পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে যথেষ্ট সচেতন ছিলেন। প্রাকৃতিক শক্তির নানা প্রকাশকে তারা দেবতা-জ্ঞানে পূজা করতেন। তাই বৈদিক সাহিত্যে (বেদ, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ইত্যাদি) প্রকৃতি ও পরিবেশ সচেতনতার নানা নিদর্শন পাই। আর্যদের ঋতুজ্ঞান-ই কৃষি সম্প্রসারণে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল। ঋগ্বেদে গাছপালা ধ্বংস না করার নির্দেশ আছে। ঋগ্বেদের নদীস্তোত্রে দশটি পবিত্র নদীর উল্লেখ রয়েছে। নদী আর্যদের জীবনে এতটাই গুরুত্বপূর্ণ ছিল যে সপ্তসিন্ধু ও পাঞ্জাব তাদের আদি বাসস্থানের এই ভৌগোলিক অভিধাগুলি যথাক্রমে সাতটি নদী ও পাঁচটি নদীকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল।

প্রাচীনকালে প্রাকৃতিক সম্পদের ব্যবহার মানব সমাজের অগ্রগতি অসম্ভব ছিল। ভারতে আদি পর্বের বসতি গড়ে উঠেছিল হ্রদের অথবা পাহাড়ি নদীর পাদদেশে, মালভূমিতে অথবা অরণ্যবেষ্টিত অঞ্চলে যেখানে মানুষ জীবন ধারণের উপযোগী খাদ্য সংগ্রহ করতে পারত এবং খাদ্য সংগ্রহের ও শিকারের উপযোগী পাথরের ও হাড়ের হাতিয়ার বানাতে পারত। এই হাতিয়ারগুলি মানুষ পশুপাখি শিকার এবং খাদ্যদ্রব্য উৎপাদন ও গৃহনির্মাণের কাজে ব্যবহার করত।

সভ্যতার অগ্রগতির সাথে পরিবেশও পরিবর্তিত হয়েছে। কৃষিভূমি ও মানুষের বসতি বিস্তারের জন্য বনজঙ্গল সাফ করতে হয়েছে। গাঙ্গেয় সমভূমিতে বিশাল কৃষি-বসতির জন্য লোহার কুঠার, লাঙলের ফলা ব্যহৃত হয়।

উর্বর জমি, নিয়মিত বৃষ্টিপাত, নদী, পাহাড় অরণ্য এবং খনিজ সম্পদের প্রাচুর্যই গাঙ্গেয় সমভূমিতে ঘন বসতির কারণ। এই অঞ্চলের নদীগুলির নাব্যতার কারণে ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশ ঘটেছিল। মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের কালেই এখানে অনেক শহর গড়ে উঠেছিল। সব মিলিয়ে গাঙ্গেয় সমভূমি প্রাঙ্গন ভারতীয়দের কাছে এক আদর্শ পরিবেশ ছিল। নদীর গতিরেখা পরিবর্তনের কারণেই খ্রীষ্টপূর্ব ২,৫০০ বছর আগে সরস্বতী নদী সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। আদর্শ পরিবেশের জন্য নিয়মিত বৃষ্টিপাত প্রয়োজন। হরপ্পা সভ্যতাকে আমরা শুষ্ক মরু অঞ্চলে দেখলেও খ্রীষ্টপূর্ব তিন সহস্রাব্দে সেখানে বৃষ্টিপাত হত, তাই কৃষিভূমি অরণ্য সবই সেখানে ছিল। কিন্তু সেখানে গাছ কাটার ফলে বৃষ্টিপাত কমে যায় যা হরপ্পা-বাসীদের জীবনে পতন ডেকে নিয়ে এসেছিল। কৃষিভূমির বিস্তার হলেও খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে অনেক বনভূমি ছিল যা বৃক্ষ ও প্রাণী সম্পদে পূর্ণ। বৈদিক যাগযজ্ঞ শেষে পুরোহিত ও সাধারণ পূজারী বৃক্ষ ও বনস্পতির শান্তি ও সমৃদ্ধি কামনা করত। অথর্ববেদের পৃথিবীসুক্ত ধরিত্র দেবীর উদ্দেশ্যে নিবেদিত যা নিঃসন্দেহে পরিবেশ প্রেমের প্রাচীনতম প্রার্থনা। বৈদিক ঋষিরা উদাত্ত কণ্ঠে ঘোষণা করেন "মাতা তুমিহ্ পুত্রোহাম পৃথিভ্যহ্" অর্থাৎ, পৃথিবা আমার মাতার মতো, আমি তাঁর পুত্র। ঋষিরা তাঁদের আশ্রম অর্থাৎ তপোবন নির্মাণ করেছিলেন অরণ্যের এমন মনোরম স্থানে যেখানে পরিবেশ শীতল এবং দূষণ-মুক্ত। এই মনোরম স্থানে বসেই তারা বিদ্যাচর্চা করতেন, রচনা করতেন স্তোত্র এবং পবিত্র গ্রন্থাদি। ঋগ্বেদে অরণ্যানি দেবী হিসেবে বন্দিত, কারণ এখানে বিনা চাষে খাদ্য পাওয়া যায়। বৈদিক আর্যরা বারে বারে বন্দনা করেছেন সাধারণ ও ঔষধিগুণসম্পন্ন গাছ চাষের জন্য যা মিষ্ট ও প্রাণশক্তিবৃদ্ধিকারী। পুরাণেও আমরা প্রাণী ও গাছপালা পরিবেশের প্রতি সচেতন থেকতে দেখি। অগ্নিপুরাণে পুকুর দূষিত করার অপরাধে মৃত্যুদণ্ড দেওয়ার নির্দেশ আছে। মনুস্মৃতিতে প্রাণীর প্রতি নিষ্ঠুরতা প্রদর্শন করাকে নিন্দা করা হয়েছে।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে জৈনধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের প্রবক্তারা যথাক্রমে মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ তাদের প্রচারিত ধর্মমতে পরিবেশ সংক্রান্ত বিষয়গুলিকে যথেষ্ট গুরুত্ব দিয়েছেন। জৈনধর্মে ও বৌদ্ধধর্মে পরিবেশ প্রকৃতির প্রতি কোমল অনাগ্রাসী দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়। প্রাকৃতিক সম্পদকে যথেচ্ছভাবে ব্যবহার না করে তার বুদ্ধিদীপ্ত ব্যবহারের কথা বলা হয়। বৃক্ষ তাদের কাছে খুব প্রিয় ও পবিত্র। মহাবীর কৈবল্য-জ্ঞান লাভ করেছিলেন অশ্বত্থ গাছের তলায়, যথাক্রমে ঋজুপালিকা ও নৈরঞ্জনা নদীর তীরে।

গৌতম বুদ্ধ মনে করতেন প্রকৃতির সঙ্গে মানুষের মেলবন্ধন রচনা করা উচিত। জাতকে বুদ্ধ বিভিন্ন বৃক্ষরূপে বর্ণিত হয়েছেন।বৃক্ষ তাই বৌদ্ধদের কাছে পূজার বস্তু। মনে হয় বৌদ্ধরা বৃক্ষপূজার আদর্শ বৈদিক আর্যদের কাছ থেকে গ্রহণ করেছিলেন।

উভয় ধর্ম অহিংসার বাণী প্রচার করে পশুহত্যার তীব্র বিরোধিতা করে। পালিধর্মগ্রন্থ সুত্তনিপাতে গৌতম বুদ্ধ গো-রক্ষার প্রয়োজনীয়তার কথা দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন। তাঁর মতে এর ফলে গাছপালা শস্য বৃদ্ধি পাবে। তিনি বলেন গোরু আমাদের খাদ্য দেয় জীবনীশক্তি স্বাস্থ্য এবং সুখ প্রদান করে। পরবর্তীকালে অর্থাৎ মৌর্যযুগেও আমরা পরিবেশ সচেতনতা ও সুরক্ষার পরিচয় পাই। কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে পরিবেশ সংক্রান্ত দুটি আইনের উল্লেখ পাওয়া যায়। কৌটিল্যের মতে পরিবেশ সুরক্ষা সমাজে প্রত্যেক ব্যক্তির ধর্ম (নৈতিক কর্তব্য) হওয়া উচিত। তাই গাছের বিভিন্ন অংশ কেটে ফেলার জরিমানা ধার্য করেন। তিনি শহরকে বাসযোগ্য করে তোলার জন্য আবাসের আশে-পাশে হ্রদ, বন-বীথি, বাগিচা, ছোট পাহাড়ের প্রয়োজনীয়তার কথা বলেন। মৌর্যযুগে অভূতপূর্ব কৃষির বিকাশ বজায় রাখার জন্য 'সীতাধ্যক্ষ' নামে একজন রাজকর্মচারী নিয়োগ করা হয়েছিল। কৃষিবিজ্ঞান সম্পর্কে এবং গাছ-গাছালি রোপণ বিষয়ে অভিজ্ঞ ব্যক্তিকে এই পদে নিয়োগ করা হত।

প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে গুপ্তযুগেও পরিবেশের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ লক্ষ করা যায়। এলাহাবাদ প্রশস্তি থেকে আমরা জানি যে প্রবল শক্তিধর গুপ্তসম্রাট সমুদ্রগুপ্ত মধ্যভারতের পাহাড় ও অরণ্যপূর্ণ আটবিক রাজ্য জয় করেন। এই সময় কৃষির অভাবনীয় বিকাশ ঘটে। কৃষির এই বিকাশের সাথে উন্নত জলসেচ ব্যবস্থার ঘনিষ্ঠ সংযোগ ছিল। জনগণ নদীর জলকে সেচের কাজে ব্যবহার করত। গুপ্তযুগের সাহিত্যেও পরিবেশ প্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। মহাকবি কালিদাস তাঁর "ঋতুসংহারম্" কাব্যে ছয় ঋতুর অনবদ্য বর্ণনা দিয়েছেন যার সঙ্গে মানব দেহমনের অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক রয়েছে। 'মেঘদূতম্' কাব্যেও তাঁর প্রকৃতিপ্রেমের পরিচয় পাওয়া যায়। আর্যভট্ট, বরাহমিহির প্রমুখ প্রকৃতিবিজ্ঞান, জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ে অসাধারণ প্রগতির স্বাক্ষর রেখেছেন। গুপ্তপরবর্তী যুগেও ভারতের প্রায় সব শাসক জল, অরণ্য ও অন্যান্য প্রাকৃতিক সম্পদ সুরক্ষার বিষয়ে সঠিক পদক্ষেপ নেন।

প্রাচীন ভারতীয়রা প্রকৃতি ও পরিবেশের গুরুত্ব অনুধাবন করে প্রকৃতিকে কীভাবে ধ্বংসের হাত থেকে রক্ষা করা যায় এবং পরিবেশকে কী করে দূষণমুক্ত রাখা যায় সেভাবে নীতি নির্ধারণ করেছেন এবং পদক্ষেপ গ্রহণ করেছেন। জীবনের সুখ স্বাচ্ছন্দ ও আর্থ-সামাজিক প্রগতির কথা ভাবার সময়ও তারা সমাজকে প্রাকৃতিক ভারসাম্য ও পরিবেশ সুরক্ষার বিষয়ে সচেতন করেছেন।

বর্তমানে আমাদের পরিবেশ এক বিশাল সঙ্কটের মুখে। সব প্রাকৃতিক সম্পদেরই একটা সীমা আছে। তাই প্রাকৃতিক সম্পদকে আমরা যথেচ্ছভাবে খরচ করতে পারি না। শুধু তাই নয় মানুষের নানাবিধ কাজই আবার পরিবেশকে দূষিত করছে। বর্তমানে তাই আমাদের প্রথম ও প্রধান কর্তব্য হল 'পরিবেশ'কে রক্ষা করা। মহাত্মা গান্ধী বলেন, "পৃথিবী আমাদের সকলের পর্যাপ্ত প্রয়োজন মেটানোর জন্য যথেষ্ট দান করেছে, কিন্তু তা সকলের লালসা মেটানোর জন্য নয়।" গান্ধিজীর উপরোক্ত কথাটি আপ্তবাক্য মেনে তাই আমাদের সকলেরই পরিবেশ সুরক্ষার কাজে এগিয়ে আসা উচিত।

৩.৪ প্রাচীন ভারতে প্রযুক্তি

প্রাচীন ভারত প্রধানত কৃষিপ্রধান হলেও প্রযুক্তি ও কারিগরি দক্ষতার ক্ষেত্রে যথেষ্ট এগিয়ে ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ সময়সীমার পরিব্যাপ্ত মেহেরগড় সভ্যতার মানুষও দুই প্রকার গম ফলাতে সক্ষম হয়েছিল। এই সভ্যতার মানুষ এতটা পরিমান খাদ্য উৎপাদন করেছিল যে তা সংরক্ষণের জন্য নির্দিষ্ট ইমারত গড়তে হয়েছিল। বস্তুত উপমহাদেশের আদিমতম শস্যাগারের অবশেষ মেহেরগড়েই পাওয়া গেছে। ইট (রোদে পোড়ানো) নির্মাতারা নিঃসন্দেহে কারিগর শ্রেণির পর্যায়ভুক্ত। মেহেরগড় সভ্যতার দ্বিতীয় পর্বে যব ও গমের সঙ্গে কার্পাসের চাষ যুক্ত হয়। সম্ভবত সুতিবস্ত্র ও কার্পাসের বীজ থেকে তেল বের করার জন্য এই চাষ শুরু হয়। কৃষি ব্যবস্থার বিকাশের অঙ্গ হিসেবে সেচ ব্যবস্থারও বিকাশ ঘটেছিল আনুমানিক ৪৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। সিন্ধু সভ্যতার আয়তন ও সমৃদ্ধি সিন্ধুবাসীদের অভিনবত্বেরই ফসল।

ভারতবাসীরা প্রযুক্তিগত দিক থেকে এগিয়ে না থাকলে হরপ্পাবাসীরা কখনো এমন উন্নত নগরের পরিকল্পনা করতে পারতেন না। পোড়া ইটের তৈরি আয়তাকারে সারিবদ্ধ গৃহগুলি নিঃসন্দেহে উন্নত পরিকল্পনার ফুসল যা সমকালীন মেসোপটেমীয় সভ্যতায় অনুপস্থিত। শুধু তাই নয় সমকালীন প্রাচীন সভ্যতার কোনো মানুষ এমন অসাধারণ পয়ঃপ্রণালী ও জলনিকাশি ব্যবস্থার সাক্ষর রেখে যায়নি। পোড়া ইট তৈরি ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও হরপ্পাবাসীরা চরম উৎকর্ষতার পরিচয় দিয়েছিল।

হরপ্পাবাসীরা উন্নত সেচ ব্যবস্থাও জলাধার নির্মাণ করে তাদের প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ও কারিগরি দক্ষতার পরিচয় দেন। হরপ্পা-মহেঞ্জোদারো ও অন্যান্য প্রত্নক্ষেত্রে নির্দিষ্ট মান সম্পর্কে জানতে পারি। এই নিখুঁত পরিমাণ পদ্ধতি অট্টালিকার নকশা তৈরি এও নির্মাণ কাজে ব্যবহৃত হত। এর থেকে বোঝা যায় হরপ্পাবাসীরা পরিমাপ পদ্ধতি ও জ্যামিতিক জ্ঞানের অধিকারী ছিল।

হরপ্পাবাসীদের প্রযুক্তিগত দক্ষতার অন্যতম নিদর্শন হল লোথালের পোতাশ্রয়। পলি জমার সম্ভাবনা যাতে না থাকে এমন স্থানে এই পোতাশ্রয় থেকে আধুনিক সমুদ্র-বিজ্ঞানীরা মনে করেন, হরপ্পাবাসীদের শুধু সমুদ্রের জোয়ার সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল তাইই নয়, জলবিজ্ঞান, সামুদ্রিক যন্ত্রবিজ্ঞান সম্পর্কেও তাঁরা অবহিত ছিলেন। বর্তমান পাকিস্তানের বালাকোটে উৎখনন করে চুল্লির নিদর্শন পাওয়া গেছে যা খুব সম্ভবত চীনা মাটির সামগ্রী বানানোর কাজে ব্যবহৃত হত। হরপ্পার নগরাশ্রয়ী অর্থনীতিতে ব্যবসা-বাণিজ্যের সাথে কারিগরি দ্রব্য নির্মাণ বড় জায়গা করে নিয়েছিল। ধাতব শিল্প সামগ্রীর মধ্যে তামা ও কাঁসার জিনিস গুরুত্বপূর্ণ ছিল।

হরপ্পায় প্রাপ্ত ষোলটি তামা গলানোর অগ্নিকুণ্ড ও লোথালে প্রাপ্ত তাম্রাকারদের কর্মশালা নিঃসন্দেহে ধাতব শিল্পে উন্নতির সাক্ষ্য বহন করে। তামার তৈরি খুর, বাটালি, বঁড়শি, কাস্তে, কুঠার ইত্যাদী প্রধান ছিল। পাথরের তৈরি সামগ্রীর মধ্যে ফ্লিন্ট পাথরের ছুরি বিখ্যাত ছিল। এগুলি সুক্কুরের কর্মশালায় তৈরি হত। রাজস্থানের কালিবঙ্গানে একদিক মাটিতে ঢোকানো পাত্রর আকারের চুল্লির অবশেষ পাওয়া গেছে। মাটির তৈরি জিনিস পোড়াবার জন্য অগ্নিকুন্ড ও চুল্লি-কক্ষবিশিষ্ট চুল্লি কালিবঙ্গানে পাওয়া গেছে। এগুলি নিঃসন্দেহে মৃৎশিল্পের সঙ্গে যুক্ত।বিভিন্ন ধরনের ও আকৃতির মৃৎপাত্রের নিদর্শন সিন্ধু উপত্যকায় পাওয়া গেছে। এই মৃৎপাত্রগুলি সাধারণত কুমোরের চাকে তৈরি হত। সাধারণত মৃৎপাত্রগুলি সম্ভবত দৈনন্দিন কাজে ব্যবহৃত হত। এগুলি কাদামাটির বাঁধা ধরা নকশায় তৈরি, পোড়ানোর পর তা লালচে রঙ দেখাত। বেশ কিছু মৃৎপাত্র ছিল বিচিত্র, এগুলি অপেক্ষাকৃত হালকা উজ্জ্বল বা কালো রঙের প্রলেপ দেওয়া। উন্নতমানের এই মৃৎপাত্রগুলির গায়ে জ্যামিতিক নকশা, লতা, পাতা ও পশু-পাখির চিত্র আঁকা থাকত। নানা ধরনের এই বিচিত্র মৃতপাত্রগুলি সম্ভবত শৌখিন সামগ্রী হিসেবে ব্যবহৃত থাকত। বিভিন্ন ধরনের ও বিভিন্ন গড়নের এই মৃৎপাত্রগুলি (যেমন জালা জাতীয় পেট মোটা ও সছিদ্র লম্বা গড়নের) গৃহস্থালির নানা কাজে ব্যবহৃত হত।

হরপ্পাবাসীদের কারিগরি দক্ষতার পরিচয় পাওয়া যায় তাদের বস্ত্রশিল্পে। আগেই বলা হয়েছে মেহেরগড়ের সময়কাল থেকেই কার্পাসের চাষ হত। পরে হরপ্পা সভ্যতায় বস্তশিল্পের উন্নতি লক্ষ্য করা যায়। এইসময় তাঁতিরা তুলা ও পশমের বস্ত্র তৈরি করতেন।

তবে সুতোয় বোনা কাপড়ের স্পষ্ট নিদর্শন পাওয়া যাত মহেঞ্জোদারোয়। এখানে প্রাপ্ত পুরুষমূর্তির উত্তরীয়তে তিন কোণা নকশার কাজ স্পষ্ট হয়ে উঠেছে। বস্ত্রশিল্পের সঙ্গে সূচিশিল্পের অবিচ্ছেদ্য যোগ ছিল তা এই মূর্তি থেকে প্রমাণিত।

প্রাচীন ভারতীয়দের যে বিশ্বব্রহ্মান্ড সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারণা ছিল বৈদিক ধর্মগ্রন্থগুলিতে তার প্রমাণ মেলে। শতপথে ব্রাহ্মণে ধর্মীয় আচারে যে জ্যামিতিক নির্মাণের পরিচয় পাওয়া তা শুল্বসূত্রের সঙ্গে তুলনীয়। বৌধায়ন রচিত বৌধায়ন শুল্বসূত্রের পীথাগোরাসের বর্গক্ষেত্রের চতুর্বাহু তত্ত্বের সহজ নিদর্শন পাওয়া যায়। বৌধায়ন আমাদের ২-এর বর্গমূলের সূত্র (ফর্মূলা) প্রদান করেন। পৃথিবীর প্রাচীনতম জ্যোতির্বিদ্যা বিষয়ক গ্রন্থগুলির

মধ্যে অন্যতম হল বেদাঙ্গ জ্যোতিষ।অনুমান করা হয় এই গ্রন্থ খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ অব্দের মধ্যে রচিত হয়েছিল। যেহেতু বেদাঙ্গ জ্যোতিষ একটি ধর্মীয় গ্রন্থ তাই এর সঙ্গে ভারতীয় জ্যোতিষের সংযোগ রয়েছে এবং সময়, ঋতু, চন্দ্রমাস, সৌরমাস, গ্রহণ, সাতটি গ্রহ, সাতাশটি নক্ষত্রপুঞ্জ এবং বারোটি প্রতীক সম্বলিত রাশিচক্রের গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলি সম্পর্কে বিস্তারিত বিবরণ রয়েছে।

প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাশাস্ত্রে যথেষ্ট অগ্রগতি লক্ষ করা যায়। এই যুগের চিকিৎসকেরা রোগীর রোগ নির্ণয় করে তার রোগ নিরাময়ের জন্য ওষুধ প্রয়োগ করতেন। ওষুধের উল্লেখ অথর্ববেদের মতো প্রাচীনতম গ্রন্থে পাওয়া যায়। কিন্তু বেশকিছু সমাজে ঝাড়-ফুঁক ও ম্যাজিকের মাধ্যমে রোগ নিরাময়ের ব্যবস্থা ছিল। বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে চিকিৎসা তখনও তাদের মধ্যে শুরু হয়নি। খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতকে ভারত আয়ুর্বেদের দুই প্রসিদ্ধ পন্ডিত আমাদের উপহার দেন। এঁরা ছিলেন সুশ্রুত ও চরক।

খ্রীষ্টিয় দ্বিতীয় শতকে রচিত সুশ্রুত সংহিতা প্রাচীন ভারতে চিকিৎসা শাস্ত্রের এক অমূল্য গ্রন্থ। এই গ্রন্থে ১৮৪টি অধ্যায় রয়েছে যার মধ্যে ১১২০ টি অসুখের এবং ৭০০টি ওষধি গাছের বিবরণ রয়েছে। এছাড়া রয়েছে শবব্যবচ্ছেদবিদ্যা সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা, রয়েছে খনিজসম্পদ থেকে ৬৪ রকমের এবং প্রাণীসম্পদ থেকে ৫৭ রকমের ওষুধ প্রস্তরের বিবরণ।

কেয়ানস এবং ন্যাস উল্লেখ করেছেন যে সুশ্রুতের এই গ্রন্থে কুষ্ঠ রোগের বর্ণনা আছে। শল্য চিকিৎসায় সুশ্রুতের পারদর্শিতার কথা এই গ্রন্থ থেকে জানা যায়। তিনি শল্য চিকিৎসার জন্য ১২১ রকম যন্ত্রপাতি ও সরঞ্জাম ব্যবহার করতেন। জবামুখী শলাকা নামের এক বিশেষ শলাকা দিয়ে তিনি চোখের ছানি কাটতেন। এই অস্ত্রোপ্রচারের সময় উষ্ণ মাখন দিয়ে চোখ ভিজিয়ে রেখে তার ওপর ব্যান্ডেজ বাঁধা হত। রোগ নিরাময়ের জন্য সুশ্রুত ওষুধ ছাড়াও খাদ্য ও পরিচ্ছন্নতার উপর বিশেষ জোর দিতেন। ব্যান্ডেজ বাঁধা হত। চোখের ছানি কাটার এই শল্য চিকিৎসা ভারত থেকে চিনা যায়। চরক রচিত সংহিতা-কে ভারতীয় ওষুধের বিশ্বকোষ বলা যেতে পারে। এই গ্রন্থে বিভিন্ন ধরনের জ্বর, কুষ্ঠ, মৃগি, যক্ষা প্রভৃতি রোগের বর্ণনা আছে। চরক সংহিতায় বিভিন্ন গাছ, ঔষধ, বনজ লতার বর্ণনা যা দিয়ে বিভিন্ন রোগের নিরাময় হয়। পরবর্তীকালে ভারতীয় চিকিৎসা শাস্ত্র ও ওষুধের বিকাশ চরকের নির্দেশিত পথেই এগিয়ে যায়। খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০ অব্দে রাজস্থানের উদয়পুরের কাছে জাওয়ারে দস্তার খনির সন্ধান পাওয়া যায়। ফতেগড়ে বিভিন্ন ধরনের তরবারি ও তার বাঁট আবিষ্কৃত হয়েছে। এই তরবারিগুলি খ্রীষ্টপূর্ব ১৭০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১৪০০ অব্দের বিস্তৃত সময়কালে তৈরি হয়েছিল। বর্তমান উত্তরপ্রদেশ মালহার, দাদুপুর, রাজানলুকিটিলা এবং মাহুরাদেওয়া প্রভৃতি স্থানে খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ১২০০ খ্রীষ্টাব্দের লোহার কারিগরি যন্ত্রাংশের সন্ধান মেলে। রেডিও কার্বন পদ্ধতির মাধ্যমে জানা যায় আদিপর্বের লোহার তৈরি বস্তুর সময়কাল ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আশেপাশে। বেশ কিছু পন্ডিতের মতে ভারতে এই সময় লৌহ গলানোর কৌশল ব্যাপকভাবে প্রচলিত হিল। তাই এই লোহা গলানোর কৌশল হয়ত আরও আগে শুরু হয়েছিল। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ-একাদশ শতাব্দীতে দক্ষিণ ভারতে (মহীশূর) লোহার আবির্ভাব ঘটেছিল বলে অনুমান করা হয়।

কৌটিল্যের অর্থশাস্ত্রে বাঁধ ও সেতু নির্মাণের কথা জানা যায়। খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকে আমরা স্তূপ নির্মাণের কথা জানতে পারি। মৌর্যযুগে দক্ষিণ ভারতের অন্ধ্রে ও কর্ণাটকে লৌহ প্রস্তুতির অগ্রগতির ফলেই বড় পাথরের নির্মাণ বিশেষ করে বৃত্তাকার স্তূপ নির্মাণ সম্ভব হয়েছিল।

এই সময় পাথরকাটা সিঁড়ি-সহ কুয়োর সন্ধান পাওয়া যায়। পরবর্তীকালে এই ধরনের কুয়ো ও সিঁড়ি-বাঁধানো পুকুর নির্মিত হত। অমরাবতী এবং অন্ধ্রের তিনটি স্থানে ও কর্ণাটকের ন'টি স্থানে অশোকের শিলালেখ পাওয়া গেছে। এর থেকে বোঝা যায় যে পূর্ব উপকূল থেকেই মৌর্যদের মাধ্যমেই ইস্পাত নির্মাণের কৌশল ভারতের বিভিন্ন স্থানে ছড়িয়ে পড়ে। ২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বা আরও আগে মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমিতে ইস্পাত নির্মিত বস্তুসামগ্রী পাওয়া যায়। ইস্পাতের ব্যাপক ব্যবহারের ফলেই বনজঙ্গল সাফ করা এবং কলিঙ্গে উন্নত চাষের পদ্ধতি প্রয়োগ করা সম্ভব হয়েছিল।

ভারতের প্রযুক্তি বিকাশে গ্রিকদের অবদান কম ছিল না। মৌর্য-পরবর্তীযুগে ভারতীয় জ্যোতির্বিদ্যা ও জ্যোতিষশাস্ত্র গ্রিকদের সংস্পর্শে এসে লাভবান হয়। বস্তুত ভারতীয় জ্যোতিষশাস্ত্র গ্রিক আদর্শ ও ধারণার দ্বারা প্রভাবিত ছিল। বস্তুত ভারতীয় জ্যোতিষ শাস্ত্রে ব্যবহৃত হোরাশাস্ত্র কথাটি গ্রিক শব্দ 'হরস্কোপ' থেকে এসেছে। মুদ্রা প্রচলনের ক্ষেত্রে ভারতীয়রা গ্রিকদের দ্বারা উপকৃত হয়েছিল। বস্তুত গ্রিক মুদ্রাগুলি যথাযথ আকৃতি এবং নির্দিষ্ট প্রতীক ও ছাপের বিচারে ভারতীয় অঙ্কচিহ্নিত মুদ্রাগুলির চেয়ে অনেক উন্নত ছিল। গ্রিক শব্দের দ্রকমা থেকেই ড্রামা কথাটি প্রচলিত। বিনিময়ে গ্রিক শাসকরাও ভারতের ব্রাহ্মী হরফ ব্যবহার করছেন এবং এদেশের অনেক প্রতীক তাদের মুদ্রায় ব্যবহার করেছেন। মধ্য এশিয়ার সঙ্গে সংযোগের ফলেও ভারতের প্রযুক্তিগত উন্নতি ঘটে। কণিষ্কের পরিচিত বসন (ফুল প্যান্ট) ও লম্বা পা-ঢাকা জুতো ঐতিহ্যবাহী ভারতীয় রাজাদের থেকে ভিন্নতর ছিল। কুষাণ শাসকরাই ভারতে অশ্বারোহীর রেকাব বা পা-দান (stirrup) চালু করেন। সম্ভবত কুষাণদের আমল থেকেই ভারতে চামড়ার জুতো তৈরি শুরু হয়। ভারতে কুষাণ যুগের তাম্র মুদ্রাগুলি রোমানদের অনুকরণে তৈরি হয়েছিল। রোমের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ফলে ভারতে প্রযুক্তিক্ষেত্রে পরিবর্তন আসে। এই সময় বিদেশিদের সঙ্গে সংযোগ স্থাপনের ফলে ভারতে কাঁচের সামগ্রী তৈরি শুরু হয়।

গুপ্তযুগে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির ক্ষেত্রে অসাধারণ অগ্রগতি ঘটে। এই সময় কৃষি ব্যবস্থার অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে বাঁধ ও সেচ ব্যবস্থার বিকাশ ঘটেছিল। বাঁধযুক্ত সেচ প্রকল্পের অসামান্য নিদর্শন হল সুদর্শন হ্রদ। গুজরাটের কাথিয়া ওয়াড়ের কাছে এই হ্রদ সম্ভবত পুষ্যগুপ্ত নির্মাণ কার্যের দায়িত্বে ছিলেন। পরে আনুমানিক ১৫০ খ্রীষ্টাব্দে শক শাসক রুদ্রদমনের শাসনকালে এই হ্রদের সংস্কার করা হয়েছিল। গুপ্ত শাসক স্কন্দগুপ্তের শাসনকালে এই বাঁধ তথা সেচ প্রকল্পটির মেরামতি প্রয়োজন হয়। স্কন্দগুপ্তের নির্দেশে দুই প্রাদেশিক শাসনকর্তা পর্ণদত্ত ও চক্রপালিত সংকারের কাজ সম্পন্ন করেন। কৃষির সঙ্গে তাল মিলিয়ে গুপ্তযুগে কারুশিল্প, ধাতব শিল্প এবং কারিগরি উৎপাদনে উন্নতি পরিলক্ষিত হয়। কর্মকার ও লৌহকারদের ব্যাপক উপস্থিতি ধাতুশিল্পের বিকাশের কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। এই যুগে লৌহ উৎপাদনের ও কারিগরি দক্ষতার শ্রেষ্ঠ নিদর্শন হল মেহরৌলি লৌহ স্তম্ভ। দিল্লির কুতুব মিনারের কাছে অবস্থিত এই লৌহস্তম্ভ খ্রীষ্টীয় চতুর্থ শতকে নির্মিত হয়েছিল। আশ্চর্যের বিষয় হল পরবর্তী ১৫০০ বছরেও এর গায়ে কোনো মরচে ধরেনি। এটি নিঃসন্দেহে ভারতীয় কারিগরদের প্রযুক্তিগত জ্ঞান ও দক্ষতার সাক্ষ্য বহন করে। গুপ্তযুগের ব্রোঞ্জ শিল্পীরাও যথেষ্ট দক্ষতার পরিচয় দেন। ব্যাপক হারে বুদ্ধের ব্রোঞ্জ মূর্তি নির্মাণের মাধ্যমে গুপ্তযুগের কারিগররা তাদের উন্নত কারিগরি দক্ষতা ও ধাতু-শিল্পজ্ঞানের পরিচয় দেন। মান্দাসোর লেখ থেকে আমরা গুপ্তযুগের রেশম শিল্পীদের কথা জানতে পারি। গুপ্তযুগে গণিত শাস্ত্রেও অসাধারণ প্রগতি সাধিত হয়। খ্রীষ্টিয় পঞ্চম শতকে পাটলিপুত্রের বাসিন্দা আর্যভট্ট তাঁর বিখ্যাত গ্রন্থ 'আর্যভট্টীয়' রচনা করেন। আর্যভট্ট শূন্যের প্রয়োগ এবং দশমিক ব্যবস্থা সম্পর্কে তাঁর সচেতনতা প্রকাশ করেন।

শুধু তাই নয় আর্যভট্ট ক্ষেত্রফল নির্ণয়ের সূত্র নির্দেশ করেন যা ত্রিকোণোমিতির সূচনা করে। এই সময় 'সূর্য সিদ্ধান্ত' শীর্ষক বিখ্যাত গ্রন্থ রচিত হয়। প্রাচ্যের আর কোনও গ্রন্থ এর সঙ্গে তুলনীয় ছিল না। ৪৪৮ খ্রীষ্টাব্দে এলাহাবাদ জেলায় প্রাপ্ত এক গুপ্ত শিলালেখ থেকে জানা যায় যে, পঞ্চম শতকের সূচনায় ভারতে দশমিক প্রথা প্রচলিত হছিল। জ্যোতির্বিদ্যার বিষয়ে এই সময় 'রোমক সিদ্ধান্ত' নামক এক গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থের নামের মধ্যেই গ্রিক ও রোমের প্রভাবের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। গুপ্তযুগের আরেক প্রসিদ্ধ বিজ্ঞানী বরাহমিহির খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে বৃহৎসংহিতা রচনা করেন। তিনি বলেন চাঁদ পৃথিবীর চারদিকে ঘোরে এবংপৃথিবী সূর্যের চারদিকে ঘোরে। তিনি গ্রিক গ্রন্থগুলির সদ্ব্যবহার করে গ্রহের গতিবিধির ব্যাখ্যা করেন এবং কিছু জ্যোতির্বিদ্যা সংক্রান্ত সমস্যার সমাধান করেন। বরাহমিহির গাছপালা ও প্রাণীদের শ্রেণিবদ্ধ করে আমাদের কৃষি বিষয়ক জ্ঞান বৃদ্ধি করেন। একইভাবে তাঁর ঋতু ও আবহাওয়া বিষয়ক জ্ঞান কৃষি পরিকল্পনা ও কৃষি ক্যালেন্ডার তৈরির কাজে লাগে। বরাহমিহির একাধারে জ্যোতির্বিদ ও জ্যোতিষ ছিলেন। ফলিত বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বিশেষত রসায়নে ভারতীয় কারিগররা গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখেন। ভারতীয় রঞ্জকরা দেশীয় পদ্ধতিতে স্থায়ী রঙ আবিষ্কার করেন। বস্তুত নীল রঙ আবিষ্কার করেন। বস্ত্র নীল রঙ করার জন্য নীল ব্যবহার করা হত। ভারতের নীল প্রথমে গ্রিসে, পরে অন্যান্য ইউরোপীয় দেশে যেত। ভৌগোলিক জ্ঞানচর্চার ক্ষেত্রেও ভারতীয়রা খুব পিছিয়ে ছিল না। প্রাচীন ভারতীয়দের সমুদ্রযাত্রা সম্পর্কে যে জ্ঞান ছিল তা তাদের জাহাজ নির্মাণের কাজে লাগে। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ ভারতীয় রাজশক্তি উপকুল থেকে অনেকটা দূরে থাকায় এবং সমুদ্র দিয়ে আক্রমণের তেমন আশঙ্কা না থাকায় ভারতীয় রাজারা সমুদ্রশক্তি বৃদ্ধির ব্যাপারে তেমন মনোযোগী হননি।

৩.৫ ইতিহাস চর্চার নতুন দিগন্ত — আঞ্চলিক ইতিহাস

সাম্প্রতিক কালে অঞ্চল, অঞ্চলের ইতিহাস, ইতিহাস চর্চার এক নবতম সংযোজন। আগে অঞ্চলের ইতিহাসে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্য সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক বিবর্তন আলাদা করে গুরুত্ব পেত না, ইতিহাসের মূল ধারায় তা লীন থাকত। কিন্তু সাম্প্রতিককালে ইতিহাস চর্চার এক গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হল অঞ্চলের তথা আঞ্চলিক ক্ষেত্রের এবং উপক্ষেত্রের পরিবর্তনশীল জীবনালেখ্যের ও রূপরেখার বিস্তৃত চর্চা। শিলালেখ ও সাহিত্যিক তথ্যসূত্রের সযত্ন বিশ্লেষণ ও বাস্তব অভিজ্ঞতামূলক পরীক্ষার মাধ্যমে সেই ইতিহাস চর্চায় রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কাঠামো পরিবর্তনগুলিকে চিহ্নিত করা হয়েছে। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার এই বিশ্লেষণে কৃষি সম্পর্কের উপর এবং রাজনৈতিক ক্ষমতার বৈধতার উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করা হয়েছে। এই কাজ করাতে গিয়ে ঐতিহাসিকরা ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশের নানা বৈচিত্রপূর্ণ ঐতিহাসিক লক্ষণ, বৈশিষ্ট্য ও গতিপথ উদ্ঘাটিত করেছেন। এইভাবে ইতিহাস চর্চা আরো সমৃদ্ধ হয়েছে।

'Region' বা অঞ্চল বলতে ভূ-পৃষ্ঠের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ, স্থান বা ক্ষেত্র বা একটি দেশের একটি প্রশাসনিক ভাগ বোঝায়। আর ইতিহাস হল তার অনুসন্ধান ও চর্চা। 'Region' এবং 'History' একত্রে মিলে আঞ্চলিক ইতিহাসের যে অর্থ দাঁড়াল তা হল ভৌগোলিক অবস্থা, প্রাকৃতিক উপাদান, জনগোষ্ঠী ইত্যাদি ছাড়াও সমাজ ও তার সঙ্গে পরিবেশের সম্পর্ক নিয়ে গঠিত। পরিবেশ প্রকৃতি ও মানবসমাজের সঙ্গে নিরন্তর পারস্পরিক ক্রিয়ার মাধ্যমে অঞ্চলের অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক সত্তা তৈরি হয়ে থাকে যাকে সাধারণভাবে আমরা সাংস্কৃতিক একক আখ্যা দিতে পারি। ঐতিহাসিক দৃষ্টিকোণ থেকে আঞ্চলিক ক্ষেত্রের বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে এক-একটি আঞ্চলিক ক্ষেত্রের মানুষ সেই অঞ্চলের ঐতিহাসিক ঐতিহ্যের তথা সংস্কৃতির সমান

অংশীদার, সুখে দুঃখে সেই অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সমাজ ও সম্প্রদায়গত একাত্মতার বন্ধন গড়ে ওঠে যা স্থানিক দূরত্ব ও বিশিষ্টতা দ্বারা চিহ্নিত করা যায়। দেখা যাবে অঞ্চলের ধারা ভৌগোলিক অবস্থান, ভাষা, শিল্প-সংস্কৃতি প্রভৃতি ঐতিহাসিক শক্তির ক্রমিক মেলবন্ধন। সমগ্র বিশ্ব অবিস্মরণীয় কাল থেকে এই রকম নানা সাংস্কৃতিক ক্ষেত্রের অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করছে। তাই আঞ্চলিক ইতিহাস হল এমন এক হাতিয়ার যার মাধ্যমে মানষ মানব জাতির প্রগতিকে পরিমাপ করতে সক্ষম হবে। একটু বিস্তৃতভাবে দেখলে আমরা বুঝব একটি অঞ্চলের ইতিহাস তার পার্শ্ববর্তী অঞ্চল থেকে মৌলিকভাবে পৃথক নয় এবং সমগ্র দেশের ইতিহাসের সঙ্গে অসম্পর্কিত নয় কারণ সে অঞ্চল সেই দেশেরই অংশ। আঞ্চলিক ইতিহাস তাই সামগ্রিকভাবে দেশের ইতিহাসের পরিপ্রেক্ষিতে উপস্থাপিত হয়। তবে আঞ্চলিক ইতিহাসের বৈচিত্র্যের মধ্যেই দেশের ঐক্যের সুরটি ধ্বনিত হয়।

বর্তমানে স্থানীয় বা 'micro history' অতি ক্ষুদ্র ক্ষেত্রের ইতিহাস ঐতিহাসিকদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে।এই ধরনের ইতিহাস চর্চায় কোন গ্রাম, ছোটশহর, একটি জেলা অথবা যে কোন স্থাধীন সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র নিয়ে গভীর বিশ্লেষণ দেখা যায়। এই ধরনের ইতিহাস চর্চার মাধ্যমে বৃহৎ সামাজিক পরিবর্তন অনুধাবন করা সহজ হয় এবং রাজনৈতিক বিষয়ে বা কেন্দ্রীয় সরকারের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক বৃহৎ কাঠামো ও তার পরিকল্পনা ও পদ্ধতি সম্পর্কে সাধারণ জনগণের প্রতিক্রিয়া লিপিবদ্ধ করা যায়। প্রাচীন ভারতের সংস্কৃতি গভীরভাবে অনুধাবন করলে এর বহুবিচিত্র বা বহুবর্ণ রঞ্জিত চিত্রটি ফুটে উঠবে। বিভিন্ন ভৌগোলিক ও ঐতিহাসিক ক্ষেত্র ভারতীয় সংস্কৃতির মৌলিক ঐক্যের ধারা বহন করলেও এদের কতকগুলি স্বকীয় বৈশিষ্ট্য ও লক্ষণ বিকশিত হয়েছে। ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য চর্চা করলে আমাদের বুঝতে সুবিধা হয় যে ভারতের বিভিন্ন অঞ্চলে, বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিভিন্ন সময়ে কী কী শক্তি কতটা প্রখরভাবে এই ক্ষেত্রগুলিতে প্রভাব ফেলেছে। আঞ্চলিক ইতিহাস চর্চার যথার্থতা এখানেইযে ভারতের প্রাচীন ইতিহাসকে আরও বিস্তৃত ও পূর্ণাঙ্গরূপে বুঝতে সক্ষম হই, যুগে যুগে তার সাফল্য ব্যর্থতার আরও স্পষ্ট হয়ে ওঠে। যেমন জাতীয় ইতিহাসের মাধ্যমে বিশ্বের ইতিহাস জানা যায়, তেমনি প্রাদেশিক ইতিহাসের মাধ্যমে ভারতের ইতিহাসের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব।

স্থানীয় ইতিহাস চর্চা মানে শুধু শহর ও গ্রামের ইতিহাস নয়। এই চর্চার আওতায় ব্যক্তির পরিচিত পারিপার্শ্বিক, সে সম্পর্কে তার কি ধারনা এবং প্রতিবেশ সম্পর্কে তাকে জ্ঞাত করা ইত্যাদি।

ঊনবিংশ শতকে প্রাকৃতিক বিজ্ঞান চর্চার অগ্রগতি এবং বৈজ্ঞানিক অনুসন্ধান ও গবেষণা পদ্ধতি ইতিহাস সম্পর্কে নতুন সমালোচনামূলক দৃষ্টিভঙ্গির জন্ম দিয়েছে।

ইতিহাসের 'macro' বা বিশাল তথা মহা-ব্যাখ্যায় সাধারণ ধারণা তৈরির উপযোগিতা আছে ঠিকই। কিন্তু বেশির ভাগ সময়ই তা একপেশে হয়। তাই ভারতের ইতিহাস চর্চায় আঞ্চলিক ইতিহাসের আবির্ভাব নিঃসন্দেহে আধুনিক ভারত ইতিহাস অর্চার একটি সদর্থক পদক্ষেপ। এর ফলে আমরা কোনো অঞ্চলের মানুষ ও তাদের জীবনচর্চা সম্পর্কে গভীর জ্ঞান আহরণ করতে পারি। আঞ্চলিক ইতিহাস অঞ্চলের মধ্যে ও বাইরে প্রাপ্ত উপাদানের উপরে ভিত্তি করে রচিত। আঞ্চলিক ইতিহাসে স্থানীয় ঘটনাপঞ্জি, বংশতালিকা পাওয়া যায় যা ইতিহাসের শূন্যস্থান পূরণে সাহায্য করে।

ভারত হল এক বৈচিত্র্যময় দেশ। তার এই বৈচিত্র্য সাংস্কৃতিক, ধর্মীয়, জাতিগত, ভাষাগত ও ভূ-প্রকৃতিগত। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ-সপ্তম শতকে ভারতে কর্ণাটক, মহারাষ্ট্র, উড়িষ্যা, রাজস্থান, তামিলনাড়ু প্রভৃতি এককে রূপান্তরিত

হয়। বিভিন্ন সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী হিসাবে ভারতের পরিচিতি ভারতীয় ও বিদেশিদের বিবরণে স্বীকৃত। চিনা পরিব্রাজক হিউয়েন সাঙ (শুয়েন চাঙ)তাঁর বিবরণে কিছু জাতিসত্তার উল্লেখ করেন। অষ্টম শতকের শেষ ভাগে রচিত জৈন সাহিত্যে ভারতে আঠারো রকমের প্রধান জনগোষ্ঠীর উল্লেখ করা হয়েছে, যার মধ্যে অন্তত ষোলটি জনগোষ্ঠীর দৈহিক বৈশিষ্ট্যেরও উল্লেখ রয়েছে। নবম শতকের লেখক বিশাখদত্ত বিভিন্ন অঞ্চলের উল্লেখ করেছেন যাদের ভাষা, পোশাক-পরিচ্ছদ, সংস্কৃতি ভিন্নতর। গুপ্ত সাম্রাজ্য পতনের পর যে স্বাধীন ক্ষেত্রের উদয় হয় তা দেশব্যাপী সংযোগ ও সংহতির অন্তরায় সৃষ্টি করে। এই সময় ব্যবসা-বাণিজ্যের পতনেও বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের মধ্যে সংযোগ ছিন্ন হয়। এই ধরনের সংযোগ-হীনতা স্বাধীন আঞ্চলিক ক্ষেত্র ও আঞ্চলিক সত্তার বিকাশ ঘটায়। এই পৃথক সত্তাকে আবিষ্কার করাই আঞ্চলিক ইতিহাসের প্রধান উদ্দেশ্য। আঞ্চলিক ইতিহাসের বিকাশে আঞ্চলিক ভাষার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। প্রত্যেক অঞ্চলের অতিসমৃদ্ধ নিজস্ব সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য রয়েছে যার জন্য তারা গর্ববোধ করে এবং তার বহিঃপ্রকাশ ঘটায়। কিন্তু ভাষার বিকাশ সমগ্র দেশের মানুষ ও বিদেশির দ্বারা স্বীকৃত না হলে তাদের এই প্রয়াস আঞ্চলিক ক্ষত্রেই সীমাবদ্ধ থাকে। আঞ্চলিক ভাষা হিসেবে তামিল, তেলেগু, কন্নড়, মালয়ালম, বাংলা, ওড়িয়া, গুজরাটি ইত্যাদি স্বীকৃত। ব্রিটিশ শাসনকালে সফল প্রশাসন পরিচালনার জন্য ব্রিটিশ প্রশাসকরা ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের ইতিহাস, ভাষা, ধর্ম, সংস্কৃতি ইত্যাদি নানা বিষয়ে তথ্য সংগ্রহ করতেন। ব্রিটিশ প্রশাসকরা আঞ্চলিক ভাষা রপ্ত করতে চাইতেন স্থানীয় জনগোষ্ঠীগুলির কাছে আসার জন্য এবং তাদের সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য অনুধাবনের জন্য। তাদের এই প্রয়াসের ফলে নতুন নতুন বিষয় আবিষ্কৃত হত এবং অনুসন্ধান ও গবেষণার নতুন ক্ষেত্র উন্মুক্ত হত।

আঞ্চলিক ইতিহাসের আরেকটি দিক হল মৌখিক ইতিহাস বা (Oral history) যা ভারতের বিভিন্ন উপজাতি জনগোষ্ঠীর মধ্যে কথনের আকারে দীর্ঘদিন ধরে চলে আসছে। পাহাড়ি উপজাতিদের মতো অনেক জনগোষ্ঠীর নিজস্ব ঐতিহ্য থাকলেও তাদের কোন লিপি নেই, ফলে যুগ যুগ ধরে মুখে মুখেই তাদের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের ধারা রক্ষিত হয়েছে। তাদের কাছে থেকে আঞ্চলিক ইতিহাসের অনেক মূল্যবান তথ্য আহরণ করা যায়। আঞ্চলিক ঐতিহাসিকের প্রধান কাজ হল এই মূল্যবান তথ্যগুলিকে সাজিয়ে সেই অঞ্চলের মানুষের ইতিহাস রচনা করা। আঞ্চলিক ঐতিহাসিক তথ্য অনুসন্ধান ও গবেষণা কেন্দ্রগুলির কাজ হল অঞ্চলের তথ্যসমৃদ্ধ ইতিহাস রচনার কাজকে বাস্তবায়িত করা। আঞ্চলিক ইতিহাস গবেষণার আন্দোলন প্রথমে প্রাচ্যবাদী ইংরেজদের হাত দিয়েই শুরু হয়েছিল। কলকাতার উইলিয়াম জোন্সের উদ্যোগে ১৭৮৪ খ্রীষ্টাব্দে এশিয়াটিক সোসাইটি প্রতিষ্ঠিত হবার পর ১৮৯৩ খ্রীষ্টাব্দে বেঙ্গল আকাডেমি অব লিটেরেচার প্রতিষ্ঠিত হয়। শুরুতে এটি বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের প্রতিষ্ঠান ছিল যারা বিনয়কৃষ্ণ দেবের শোভাবাজারের রাজবাড়িতে মিলিত হতেন। বাংলা ভাষাকে জনপ্রিয় করে তোলাই এই প্রতিষ্ঠানের সদস্যদের প্রধান উদ্দেশ্য ছিল। এছাড়া বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের বিষয়টিকে তাঁরা গুরুত্ব দিতেন। ১৮৯৪ খ্রীষ্টাব্দে এই আকাডেমির নতুন নাম দেওয়া হয় বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ। বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের সাফল্যে অনুপ্রাণিত হয়ে এর সদস্য রংপুরে 'রংপুর সাহিত্য পরিষদ' গড়ে তোলে। রংপুর সাহিত্য পরিষদ উত্তরবঙ্গের জমিদার ও বুদ্ধিজীবীদের পৃষ্ঠোপোষণায় গড়ে ওঠে। কোচবিহারের কোচরাজা নৃপেন্দ্র নারায়ণ ৫০০ টাকা দান করে এই প্রতিষ্ঠানের প্রথম পৃষ্ঠোপোষক ও আজীবন সদস্য হন। তাঁর মৃত্যুর পর রাজা রাজেন্দ্র নারায়ণ এর পৃষ্ঠপোষক হন এবং ৫০০ টাকা দান করেন। রংপুর সাহিত্য পরিষদের প্রধান কাজ ছিল উত্তরবঙ্গ ও আসামের বিভিন্ন অঞ্চলের সাহিত্যকীর্তি ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন আবিষ্কার। এই পথ ধরেই আরও বেশ কিছু স্থানীয় প্রতিষ্ঠান গড়ে ওঠে এই অঞ্চলের ইতিহাস ও সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারের জন্য। অন্যান্য আঞ্চলিক প্রতিষ্ঠানগুলির মধ্যে রাঢ় অনুসন্ধান সমিতি, বীরভূম সাহিত্য পরিষদ, বরেন্দ্র অনুসন্ধান

সমিতি, কামরূপ অনুসন্ধান সমিতি, আঞ্চলিক ইতিহাস ও সংস্কৃতি পুনরুদ্ধারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। আঞ্চলিক ইতিহাস রচনার তাগিদ থেকেই জেলাস্তরে ইতিহাসের রচনা (যেমন যশোর-খুলনার ইতিহাস, মুর্শিদাবাদের ইতিহাস ইত্যাদি) ও গবেষণার কাজ শুরু হয়। এইভাবে ঐতিহাসিক গবেষণার নতুন দিগন্ত উন্মোচিত হয়।

৩.৬ উপসংহার

ইতিহাসচর্চার ধারা নিয়ত পরিবর্তনশীল। আর এই পরিবর্তনশীল চরিত্রই ইতিহাসের আলোচনাকে প্রাণবন্তকর রূপ প্রদান করে। চর্বিতচর্বনের পরিবর্তে অভিনব ব্যাখ্যা ইতিহাসকে আকর্ষণীয় করে তোলে। সম্প্রতি অধ্যাপিকা রোমিলা থাপারের সুচিন্তিত মতামত এ প্রসঙ্গে তুলে ধরা যায়। তাঁর মতে বিদ্যালয় ও মহাবিদ্যালয় স্তরে এখনো সাবেকি ধারায় যেভাবে ইতিহাস পড়ানো হয় তার ভিত্তিতে ইতিহাস সম্পর্কে প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গী গড়ে ওঠে যেন, ইতিহাস শুধুমাত্র অতীত ঘটনার খবর দেয়। যা সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চার আলোকে গ্রহণ করা যায় না। অতীত সম্পর্কে শুধু তথ্য তথ্য জোগাড় নয়, প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে অতীতকে বোঝা ও ব্যাখ্যা দেওয়াই ইতিহাসচর্চার লক্ষ। প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চার ধারায় লিঙ্গ, পরিবেশ, প্রযুক্তি, অঞ্চলের অন্তর্ভুক্তি সেই লক্ষ্যেরই দ্যোতক।

৩.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. প্রাচীন ভারতের ইতিহাসচর্চায় লিঙ্গ-র প্রশ্ন কীভাবে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে?

২. প্রাচীন ভারতের ইতিহাসে পরিবেশ সচেতনতার নজির কেমন দেখা যায়?

৩. বিজ্ঞান ও প্রযুক্তিচর্চায় প্রাচীন ভারত কতটা এগিয়েছিল?

৪. আঞ্চলিক ইতিহাসচর্চা কিভাবে ভারত ইতিহাসে এক নতুন ঘরানার জন্ম দিয়েছে?

৩.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

দেবীপ্রসাদ চট্টোপাধ্যায়, প্রাচীন ভারতে চিকিৎসাবিজ্ঞান, পশ্চিমবঙ্গ বাংলা আকাদেমি, ১৯৯২।

ড. রতন কুমার বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (আদিপর্ব), প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, কলকাতা, ২০১৯।

রণবীর চক্রবর্তী, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব(প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ), প্রথম খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

Kumkum Roy (ed.)– Women in Early Indian Societies– Manohar– New Delhi– 1999.

Sukumari Bhattacharya. Women and Society in Ancient India– Basumati Publication– Kolkata– 1989.

Upinder Singh– A History of Ancient and Early Medieval India– Pearson– 2009.

R.S. Sharma– India's Ancient Past– OUP– New Delhi– 2005.

পর্যায় ২

প্রাগৈতিহাসিক শিকারী-খাদ্য সংগ্রহকারী

(Module II- Pre-historic hunter-gatherers)

একক ৪ ◻ পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতি ঃ পর্যায় এবং কালক্রম (Paleolithic cultures sequence and distribution)

গঠন

৪.০ উদ্দেশ্য

৪.১ সূচনা

৪.২ পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতি ও তার পর্যায় এবং কালক্রম

৪.৩ পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতির সাক্ষ্য ও তার বিস্তার

৪.৩.১ নিম্ন পুরাপ্রস্তর ক্ষেত্র

৪.৩.২ মধ্য পুরাপ্রস্তর ক্ষেত্র

৪.৩.৩ উচ্চ পুরাপ্রস্তর ক্ষেত্র

৪.৪ উপসংহার

৪.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৪.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

৪.০ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠের উদ্দেশ্য হল পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতির পর্যায় ও কালক্রমকে অনুধাবন করা।
- পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতির বিচিত্র সাক্ষ্য ও বিস্তার-
  - ➢ নিম্ন পুরাপ্রস্তর ক্ষেত্র
  - ➢ মধ্য পুরাপ্রস্তর ক্ষেত্র
  - ➢ উচ্চ পুরাপ্রস্তর ক্ষেত্র
- ভারত ইতিহাসে পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতির তাৎপর্য অনুধাবন করা।

৪.১ সূচনা

মানবসভ্যতার সুদীর্ঘ যাত্রাপথের সর্বপ্রথম প্রায় সভ্য পর্যায়টি হল প্রস্তরযুগ। বিবর্তনের এক দীর্ঘ প্রক্রিয়ার মধ্যে দিয়ে অনেকটা বানরের মতো পশু থেকে আধুনিক মানুষের উদ্ভবের পথে প্রস্তরযুগ এক উল্লেখযোগ্য অধ্যায় হিসেবে পরিগণিত হয়। কারণ, পৃথিবীতে মানুষের আবির্ভাবের সময় থেকেই মানুষ হাতিয়ার বানাতে শিখলেও সভ্যতার আদিপর্বে মানুষ কেবল পাথরের হাতিয়ারই ব্যবহার করতে জানতো। তাই সভ্যতার এই

ধাপকে সাধারণভাবে 'প্রস্তরযুগ' বলা হয়ে থাকে। প্রত্নতাত্ত্বিকগণ ইউরোপ, এশিয়া ও আফ্রিকার বিভিন্ন স্থানে খননকার্য চালিয়ে 'প্রস্তরযুগ'-এ মানুষের ব্যবহৃত হাতিয়ার যন্ত্রপাতি এবং আরো অনেক নিদর্শন আবিষ্কার করেছেন। প্রাপ্ত নিদর্শনগুলি থেকে সেই যুগের মানুষের জীবনযাপন প্রণালী এবং আরো অনেক বিষয় সম্পর্কে জানা যায়। ভারতবর্ষ ও তার ব্যতিক্রম নয়। আবার পাথরের তৈরি হাতিয়ারের গঠন প্রণালী, ধরণ ও অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের বিভিন্নতার ভিত্তিতে প্রস্তরযুগকে তিনটি প্রাথমিক পর্যায়ে ভাগ করা হয় যথা পুরাপ্রস্তর যুগ (Paleolithic Age), মধ্যপ্রস্তর যুগ (Mesolithic Age) এবং নব্যপ্রস্তর যুগ (Neolithic Age) অর্থাৎ বলা যায় যে প্রস্তরযুগের প্রাচীনতম পর্যায়টি হল — পুরাপ্রস্তর যুগ।

৪.২ পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতি ও তার পর্যায় এবং কালক্রম

প্রস্তরযুগের সর্বপ্রাচীন পর্যায়টিই হল পুরাপ্রস্তর বা প্রাচীন প্রস্তর সংস্কৃতি। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, 'সংস্কৃতি' শব্দটি এ ক্ষেত্রে একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করা হয়ে থাকে। 'সংস্কৃতি' শব্দটির মাধ্যমে একটি বিশেষ সময়ের এলাকার মানুষের জীবনযাত্রার উপকরণ সমূহকে বোঝায়। প্রস্তর যুগে মানুষের জীবনযাত্রা প্রণালী তাদের ব্যবহৃত হাতিয়ার ও যন্ত্রপাতি, খাদ্যদ্রব্য প্রভৃতি ছিল বিশেষ ধরণের। একই ধরণের জীবনযাত্রা প্রণালী ইত্যাদির সাক্ষ্য বহন করে এমন নিদর্শন যে সব এলাকা পাওয়া গেছে সে সব এলাকাকে ঐ যুগের সংস্কৃতির অন্তর্ভুক্ত করা হয়। যাই হোক, বিশ্বপ্রেক্ষাপটে পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতির সূচনাকাল খ্রীষ্ট জন্মের প্রায় ৪০ লক্ষ পূর্ববর্তী বলে ধরা হয়। কিন্তু ভারতে এখনও পর্যন্ত এই যুগের বৈশিষ্ট্যপূর্ণ যে সমস্ত নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে তার ভিত্তিতে অনুমান করা যায় এ দেশে এই যুগটির সূত্রপাত মোটামুটিভাবে ৪ লক্ষ বছর পূর্বে হয়েছিল। বলাবাহুল্য, এ দেশে পুরাপ্রস্তর পর্বের প্রাচীনত্ব নির্ধারণ করতে গিয়ে গবেষকদের যথেষ্ট সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়েছে। ফলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক, পুরাতাত্ত্বিক, নৃতাত্ত্বিক এমনকি ভাষাবিজ্ঞানীরাও এই পর্বের সূচনাকাল নিয়ে নানা মতবাদ পেশ করেছেন। এই মতভেদের অন্যতম প্রধান কারণ হল পুরাপ্রস্তর যুগের নির্ণীত তারিখের সংখ্যা প্রাচুর্য।

প্রাথমিকভাবে মহারাষ্ট্রের বোরি থেকে প্রাপ্ত তারিখই ভারতে প্রস্তরযুগের সূচনাকাল বলে ধরা হত। এই তারিখ ছিল প্রায় ১০ লক্ষ বছর আগেকার। কিন্তু পরবর্তী গবেষণায় এই তারিখ ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত হয়েছে। আধুনিককালে পুরাপ্রস্তর ক্ষেত্রগুলির মধ্যে সর্বনিম্ন যে তারিখ পাওয়া গেছে তা আজ থেকে প্রায় ৪ লক্ষ বছর পূর্বেকার। এ প্রসঙ্গে গোদাবরী উপত্যকায় নেভাসা এবং কৃষ্ণা উপত্যকার ইয়েদুরওয়াড়ির নাম উল্লেখ্য। অধ্যাপক দিলীপকুমার চক্রবর্তী অবশ্য ১৯৮০'র দশকে হিমাচল প্রদেশের শিবালিক পাহাড় ও লাদাখের সিন্ধুনদ উপত্যকায় প্রাপ্ত প্রস্তরায়ুধের সাক্ষ্যের ভিত্তিতে উল্লেখ করেছেন যে, ভারতবর্ষে পুরাপ্রস্তর যুগের সূত্রপাত ২ মিলিয়ন বছর বা তার কাছাকাছি সময় হওয়ার সম্ভাবনা ও দাবি দুই-ই জোরালো হয়ে উঠেছে এবং এই আবিষ্কারগুলি একথাও জানান দিচ্ছে যে দক্ষিণ এশীয় ভূখণ্ডের কোন অঞ্চল মানুষের ক্রমবিবর্তনের ইতিহাসে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ।

হাতিয়ারের গঠন, ধরণ, বিবর্তনের ভিত্তিতে আবার পুরাপ্রস্তর যুগকে তিনটি ভাগ করা হয়, যথা — নিম্ন পুরাপ্রস্তর যুগ, মধ্য পুরাপ্রস্তর যুগ, উচ্চ পুরাপ্রস্তর যুগ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অষ্টাদশ শতকের শেষ ও উনিশ শতকের সুচনায় ডেনমার্কের দুই পণ্ডিত পি.এফ সুহম ও ক্রিশ্চিয়ান থমসন তিনভাবে বিভক্ত যুগের ধারণা প্রথম তুলে ধরেছিলেন, প্রস্তরযুগের পরবর্তী ক্রমান্বয়ে সেখানে স্থান পেয়েছিল ব্রোঞ্জ ও লৌহ যুগ। এর

পরবর্তীকালপর্বে শুধুমাত্র প্রস্তরযুগের মধ্যেই পরিবর্তনের ধারা তথা লক্ষণগুলিকে সনাক্ত করার প্রচেষ্টা গবেষকমহলে জোরদার হয়ে ওঠে। ১৮৬৩ সাকলে জন লুবক প্রস্তর যুগকেই দুটি অংশে ভাগ করেছিলেন — পুরাপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর পর্ব। এর কয়েক বছর পর এডুয়ার্ড লারটেট সমগ্র পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতিকেই তিনটি ভাগে ভাগ করার পরামর্শ দেন — নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতি। বলাবাহুল্য এই ধরণের বিভাজনের মূল ভিত্তি ছিল পরিবর্তিত প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে তাল মিলিয়ে প্রস্তরায়ুধের নির্মাণ ও গঠন প্রকৃতির পরিবর্তন। যাই হোক, ভারতে নিম্ন পুরাপ্রস্তর পর্বের কালসীমা হিসেবে ২০০০০০০ বছর থেকে ১০০০০০ বছর, মধ্য পুরাপ্রস্তর পর্বের কালসীমা হিসেবে ১০০০০০ থেকে ৪০০০০ বছর এবং উচ্চ পুরাপ্রস্তর পর্বের কালসীমা ৪০০০০ বছর থেকে ১০০০০ বছরের মধ্যে নির্ধারণ করা হয়ে থাকে। তবে অঞ্চল ও ক্ষেত্র বিশেষে উপরোক্ত কালানুক্রমের মধ্যে তারতম্য থাকাটা অস্বাভাবিক নয়।

অধ্যাপক দিলীপকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন যে, নিম্ন পুরাপ্রস্তর পর্বের নির্ণীত তারিখের সংখ্যা এখনও কম। বর্তমানের ভারতের বিভিন্ন স্থান থেকে নিম্ন পুরাপ্রস্তর পর্বের যে তারিখগুলি পাওয়া গেছে তা কম সংখ্যক হলেও যথেষ্ট প্রাচীন, যেমন —পশ্চিমের রাজস্থানের দিদওয়ানা অঞ্চল — ৩৯০০০০ বছর এবং বেশি; ১৫০০০০ বছর পর্যন্ত।

সৌরাষ্ট্রের জুনাগড় ও উমরেথি থেকে পাওয়া তারিখ — ১৯০০০০ বছর, ৬৯০০০ বছর।

মহারাষ্ট্রের গোদাবরী উপত্যকার নেভাসা — ৪০০০০০ বছর বা কম বেশি।

কর্ণাটকের কৃষ্ণা উপত্যকায় ইয়েদুরওয়াড়ি থেকে — ৪০০০০০ বছর বা কম বেশি।

কর্ণাটকের হুনস্‌গি ও বৈচাবল উপত্যকা — ২৯০০০০ বছর, ৩৫০০০০ বছর ও ১৭৪০০০ বছর।

পূর্ব মধ্যপ্রদেশের শোন উপত্যকা — ১০৩০০০ কম বেশি ১৯৮০০ বছর — নিম্ন পুরাপ্রস্তর পর্বের একেবারে শেষ পর্যায়।

স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, নিম্ন পুরাপ্রস্তর যুগের তারিখগুলি বিক্ষিপ্ত। তবুও এগুলি থেকে এই পর্যায়ের প্রাচীনতার ব্যাপ্তি সম্পর্কে কিছু ধারণা পাওয়া যায়।

ভারতীয় উপমহাদেশে মধ্য পুরাপ্রস্তর পর্বের নিরূপিত তারিখগুলি সংখ্যায় বেশি। রেডিওকার্বণ সমীক্ষা পদ্ধতিতে যে তারিখগুলি করা হয়েছে তা ৪০০০০ থেকে ১০০০০ বছরের মধ্যে সীমাবদ্ধ এবং সবকটিই মধ্যপ্রদেশ ও মহারাষ্ট্র থেকে সংগৃহীত হয়েছে। অন্য পদ্ধতিতে নির্ণীত কয়েকটি তারিখ থেকে মনে করা যেতে পারে যে, এই পর্যায়ের সূত্রপাত ৪০০০০ বছরের অনেক আগেই হয়েছে। যেমন — পশ্চিম রাজস্থানে দিদওয়ানাতেই এই পর্যায় ১৬৩০০০ কম বেশি ২১০০০ বছর। সৌরাষ্ট্রের জেতপুরে ৫৬০০০ বছরের বেশি। মধ্যপ্রদেশের শোন উপত্যকায় এই পর্যায়ের তারিখ ১০০,০০০ থেকে ২৬,০০০ বছর।

পুরাপ্রস্তর পর্বের উচ্চপর্যায়ের একটি প্রাচীন তারিখ ৪৫০০০ — ৪০০০০ বছর। উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত অঞ্চলের পেশোয়ারের উত্তর-পূর্বে সাংঘাও গুহা থেকে এই পর্যায়ের একটি তারিখ ৪২৫০০ বছর। অন্যদিকে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনী ও মান্দাসোর জেলার দুটি অঞ্চল থেকে পাওয়া তারিখ ৩১,০০০ বছর। কিছু তারিখ অবশ্য ২০,০০০ বছরের কম। শোন উপত্যকায় উত্তরপ্রদেশে বেলান উপত্যকায় এই তারিখ ২৬,০০০ বছর হতে পারে। অন্ধ্রের কুর্নুল অঞ্চলের ২০০০০ বছরের কম বেশি।

৪.৩ পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতির সাক্ষ্য ও তার বিস্তার

ভারতীয় উপমহাদেশের সমস্ত উত্তর ও পূর্ব অঞ্চল জুড়ে একটি পর্বতভূমির বলয় আছে। ঐ অতি বিস্তৃত পার্বত্য ভূভাগে একেবারে উচ্চভাগ বাদ দিলে অন্যত্র প্রক্ষিপ্তভাবে পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতির সাক্ষ্য আবিষ্কৃত হয়েছে। সিন্ধুপ্রদেশের পশ্চিমভাগে এই যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। সিন্ধুপ্রদেশের 'মাইলস্টোন ১০১' এবং সুক্কুর — রোরহি' অঞ্চল দুটি পুরাপ্রস্তর যুগের কেন্দ্র 'উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত' প্রদেশে পেশোয়ারের উত্তরপূর্বে 'সাংঘাও' নামক পাহাড়ি গুহাতে উৎখনন করে পুরাপ্রস্তর যুগের মধ্য ও উচ্চ পর্যায়ের নিদর্শন পাওয়া গেছে। এর পূর্বদিকে পশ্চিম পাঞ্জাব পাটোয়ার অধিত্যকাতেও পুরাপ্রস্তর পর্বের সাক্ষ্য মিলেছে। এর কাছেই জম্মু ও কাশ্মীরেও একই ধরণের সাক্ষ্য আবিষ্কৃত হয়েছে ও লাদাখ অঞ্চল থেকেও পুরাপ্রস্তর যুগের নিদর্শনের কথা জানা গেছে। পূর্ব পাঞ্জাব ও হিমাচল প্রদেশের পার্বত্য নদী উপত্যকাতেও এই পর্বের সাক্ষ্য বিদ্যমান। এছাড়া আরো পূর্বদিকে সাক্ষ্য মিলেছে নেপালের অপেক্ষাকৃত নিম্নাঞ্চলের 'দুন' উপত্যকাবলী থেকে। অন্যদিকে মেঘালয়ের গারো পার্বত্যভূমির অংশ — ত্রিপুরা পাহাড় ও বাংলাদেশের কুমিল্লা অঞ্চলের লালমাই পাহাড়েও পুরাপ্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া গেছে। সুতরাং, সামগ্রিক ভাবে বলা যায় যে, উত্তরের পূর্বের পার্বত্যভূমি থেকে পাওয়া পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতির সাক্ষ্য সর্বত্র সমানভাবে ছড়ানো নয়। হিমাচল প্রদেশের পূর্বদিকে নেপাল ও তারও পূর্বদিকে পশ্চিম ত্রিপুরা ও বাংলাদেশের লালমাই অঞ্চল থেকেই শুধু অবিসংবাদী সাক্ষ্য মিলেছে, এর পেছনে বিশেষ কোনও কারণ আছে নাকি, এ শুধুই পর্যাপ্ত অনুসন্ধানের অভাব — সে সম্পর্কে পণ্ডিতরাও এখনও নিশ্চিত হতে পারেন নি।

উপমহাদেশের উত্তরের ও পূর্বের পর্বতময় অঞ্চলের নীচে ছড়িয়ে আছে — সিন্ধু-গঙ্গা-ব্রহ্মপুত্রের পাললিকভূমি। পাললিক উপাদান গঠিত হওয়ায় এই সুবিস্তৃত অঞ্চলে পুরাপ্রস্তর যুগের নিদর্শন আবিষ্কৃত হওয়ার সম্ভাবনা কম। তবে, এই বিস্তৃত ভূমির নীচে বিস্তৃত যে উচ্চতর ও প্রাচীনতর ভূমির অধিষ্ঠান যাকে ভূতাত্ত্বিক ভাবে ভারতীয় 'অন্তরীপ' (পেনিনসুলা) আখ্যা দেওয়া হয়েছে, সেই অন্তরীপ অঞ্চলের সর্বত্রই (বদ্বীপ ব্যতীত), এমনকি কেরলেও পুরাপ্রস্তর যুগের সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। এই বিবরণ শুরু করা যেতে পারে পশ্চিমবঙ্গ থেকে।

১৯৬০ — এর দশকে পশ্চিমবঙ্গের ডায়মন্ড হারবারের কাছে দেউলপোতা অঞ্চলে পাললিকভূমি থেকে কিছু পুরাপ্রস্তর যুগের মধ্য ও উচ্চপর্যায়ের পাথরের হাতিয়ার আবিষ্কৃত হয়েছিল। পণ্ডিতদের অনুমান, রাজমহল পাহাড়ের নীচ দিয়ে প্রবাহিত গঙ্গায় এই হাতিয়ারগুলি কোনোভাবে — সম্ভবত জলধারাতে মিশে যায় ও পরে নদীবাহিত হয়ে বদ্বীপ অঞ্চলে পলির অঙ্গ আবিষ্কার করা হয়। এই হাতিয়ারগুলির সাথে রাজমহল পাহাড়ে আবিষ্কৃত হাতিয়ারের সাদৃশ্য ছিল স্পষ্ট। পাললিকভূমির পশ্চিমদিকে ভারতীয় অন্তরীপ অঞ্চলের সংস্থান পশ্চিমবঙ্গে খুবই স্পষ্ট। এই অঞ্চলে বীরভূম থেকে মেদিনীপুরের দক্ষিণ-পশ্চিমাংশ পর্যন্ত পুরাপ্রস্তর যুগের বিভিন্ন পর্যায়ের চিহ্ন ছড়ানো। যেমন — বীরভূমের তারাপীঠের কাছে একটি নদী উপত্যকা থেকে সিউড়ির কাছে জীবধরপুরের কাঁকুরে ডাঙা, বর্ধমান-বীরভূম সীমান্তের 'এগারো মাইল', বনকাঠি — অযোধ্যার কঙ্কর মিশ্রিত ল্যাটেরাইট ভূমি, বাঁকুড়ার বিহারীনাথ শুশুনিয়া, খাতরা-মুকুটমণিপুরের কংসাবতী অঞ্চল মেদিনীপুরের গোপীবল্লভপুরে সুবর্ণরেখা পেরিয়ে নাকবিঁধি, পাতিনার বনভূমি, শিলদা- বেলপাহাড়ির তারাফেনী, ভৈরববাঁকি উপত্যকা, পুরুলিয়ার অযোধ্যা পাহাড় এবং অন্যান্য বিস্তৃত পার্বত্য অঞ্চল পশ্চিমবঙ্গের বিখ্যাত পুরাপ্রস্তর যুগীয় প্রত্নস্থল।

পশ্চিমবঙ্গের পর এবার চোখ ফেরানো যাক বিহারের দিকে। বিহারের ছোটনাগপুর অধিত্যকা জুড়ে সর্বত্রই পুরাপ্রস্তর যুগের নিদর্শন বিস্তৃত। সিংভূমে, পশ্চিমবঙ্গের 'লোধাশুলী' পেরিয়ে, বহরাগোড়া হয়ে ঘাটশিলা জামশেদপুর, চান্ডিল হয়ে যে রাস্তাটি বেরিয়েছে, তার দুপাশে, বিশেষত বহরাগোড়া ও ঘাটশিলার মাঝের কাঁকুরে ডাঙা জমিতে, পুরাপ্রস্তর যুগের বিভিন্ন পর্যায়ের নিদর্শন বিদ্যমান। অন্যদিকে চক্রুধরপুর পেরিয়ে রাঁচির রাস্তায় উচ্চভূমিতে টেবো, হেসাডি অঞ্চলে এই নিদর্শন আছে। রাঁচি অধিত্যকার বিভিন্ন অঞ্চলে, এমনকী রাঁচি শহরের মোরাবাদী পাহাড় থেকেও পুরাপ্রস্তর যুগের সাক্ষ্য মিলেছে হাজারিবাগ গিরিডিতেও যথেষ্ট পরিমাণে এই পর্বের নিদর্শন আছে। সাঁওতাল পরগনার রাজমহল পাহাড়ের ভেতর 'দামিন' অঞ্চলে উচ্চ পুরাপ্রস্তর যুগের চিহ্ন বহু বিস্তৃত, পূর্বভারতের অন্যত্র যা অমিল। তবে ছোটনাগপুর অধিত্যকার বাইরে বিহারের অন্যত্র নিদর্শন আছে। যেমন — মুঙ্গেরের কাছে খড়গপুর পাহাড়ের ভীমবাঁধ — পৈসরা অঞ্চলে, রাজগির পাহাড়ের দক্ষিণে জেঠিয়ান অঞ্চলে নওয়াদা অধিত্যকাতে, গয়ার পাহাড়েও আলোচ্য পর্বের কিছু নিদর্শন মিলেছে।

উত্তরপ্রদেশে হিমালয় বা তন্নিম্ন অঞ্চলে পুরাপ্রস্তর পর্যায়ের নিদর্শন তেমনভাবে পাওয়া যায়নি। পাওয়া গেছে মূলত অন্তরীপ ভাগ থেকে। বারানসীর কাছে মির্জাপুর জেলার পাহাড়ি অংশে, চুনারের কাছে শোনভদ্র অঞ্চলে, বিন্ধ্যাচল পেরিয়ে এলাহাবাদের কাছাকাছি মেজার কাছে বেলান নদী উপত্যকায় বহু নিদর্শন বিস্তৃত। এছাড়াও দিল্লী হরিয়ানার আরাবল্লী পাহাড় অঞ্চলে, হরিয়ানায় যমুনানগর পেরিয়ে শিবালিক শ্রেণির মধ্যে পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতির নিদর্শন মিলেছে।

পশ্চিমভারতের ক্ষেত্রে প্রথমেই বলতে হবে রাজস্থানের কথা, রাজস্থানের মাঝামাঝি উত্তর-পূর্ব থেকে দক্ষিণ-পশ্চিমে আড়াআড়ি ভাবে আরাবল্লী পর্বত বিস্তৃত। এর পূর্ব ও পশ্চিম দুই অংশেই পুরাপ্রস্তর যুগের নিদর্শন আছে। চিতোর দুর্গের নীচ দিয়ে প্রবাহিত গাম্ভীরি নদীর উপত্যকায় যোধপুরের কাছে লুনি নদীর অববাহিকায়, পুস্করের কাছে বালিয়াড়ি অঞ্চলে, মরু অঞ্চলে, নাগৌর অঞ্চলে, জয়াল, দিদওয়ানা ইত্যাদি অঞ্চলে, আরাবল্লী পাহাড়ের ভেতর ও সংলগ্ন বহু অঞ্চলে পুরাপ্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া যায়। গুজরাটের ক্ষেত্রে বলা যায় তিনটি মূল অঞ্চলেই — সবরমতী, নর্মদা-তাপ্তি অববাহিকার মূল ভূভাগ, কচ্ছ অন্তরীপ ও কাথিয়াবাড়ে, সৌরাষ্ট্র অন্তরীপে — পুরাপ্রস্তর যুগের নিদর্শন বিস্তৃত রয়েছে। এছাড়া মধ্যপ্রদেশে প্রায় সর্বত্র, বিশেষ করে নর্মদা ও শোন উপত্যকাতে, মহারাষ্ট্রেরও সর্বত্র, এমনকী পুনে ও মুম্বাই শহর থেকেও একসময় পুরাপ্রস্তর নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। আবার দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে মহীশূর, অন্ধ্র ও তামিলনাড়ুতেও পুরাপ্রস্তর পর্বের নিদর্শন ছড়ানো প্রায় সর্বত্র। অন্ধ্রে কুর্নুল অঞ্চলের কিছু গুহাতে উচ্চ পুরাপ্রস্তর যুগের গুরুত্বপূর্ণ নিদর্শন আবিষ্কৃত হয়েছে। চেন্নাই এর কাছে অত্তিরমপক্কম নালা ধরে একসময় অগণিত পুরাপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। উড়িষ্যার উপকূলবর্তী অঞ্চলের বাইরে সর্বত্রই এই পর্বের নিদর্শন আছে।

উপরোক্ত বিবরণ থেকে একথা বলা ভুল হবে না যে পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতির বিস্তার ভারতীয় উপমহাদেশের প্রায় সর্বত্রই কম বেশি পরিলক্ষিত হয়। দিলীপ কুমার চক্রবর্তী তাই যথার্থই লিখেছেন যে, পুরাপ্রস্তর যুগের নিদর্শন আমাদের খুব অচেনা ব্যাপার নয়। একটু চোখ তুলে তাকালেই পাললিক ভূমির বাইরে এই নিদর্শন সর্বত্রই কমবেশি পাওয়া যায়, বিশেষ করে 'অন্তরীপ' ভাগে। এই সাধারণ বর্ণনা থেকে বেরিয়ে এসে সাম্প্রতিক উৎখননের আলোকে এবার আমরা চোখ রাখতে পারি ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ পুরাপ্রস্তর কেন্দ্রগুলির দিকে। নিম্ন পুরাপ্রস্তর পর্বের কেন্দ্র গুলি থেকেই এই আলোচনা শুরু করা যায়-

৪.৩.১ নিম্ন পুরাপ্রস্তর ক্ষেত্র

অতি সম্প্রতি নিম্ন পুরাপ্রস্তর পর্বের তারিখ মিলেছে পাটোয়ার অধিত্যকা ও শিবালিক অঞ্চল থেকে। ব্রিটিশ প্রত্নতাত্ত্বিকদের একটি দল ঝিলম উপত্যকার দিনা ও জালালপুর থেকে হাতকুড়াল সহ বিভিন্ন সামগ্রী পেয়েছেন পুরাতাত্ত্বিকদের মতে যার সময়কাল আনুঃ ৭০০০০০ থেকে ৫০০০০০ বছর আগের। জম্মু অঞ্চলের উত্তরবৈনি প্রাচীন পুরাপ্রস্তর পর্বের হাতিয়ার মিলেছে যার কালক্রম আনুঃ ২৮০০০০০ থেকে ৫০০০০০ বছরের মধ্যে। নিশ্চিত কিছু তারিখও নিম্ন পুরাপ্রস্তর পর্বের কয়েকটি কেন্দ্র থেকে পাওয়া গেছে, যার মধ্যে অনত্যম হল রাজস্থানের দিদওয়ানা। যার তারিখ আজ থেকে ৩,৯০০০০ বছর আগের। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান, প্রস্তরায়ুধ নির্মাণের প্রধান কেন্দ্র গুলি মূলত কাঁচামাল প্রাপ্তির সুবিধাজনক এলাকার আশেপাশেই গড়ে ওঠে। প্রস্তরযুগের বিভিন্ন সময়েই এমনকি তার পরেও সেই অঞ্চলগুলিতে যাতায়াতের নিদর্শন পাওয়া যায়। সিন্ধু অঞ্চলে এরকম কেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। নিম্ন সিন্ধু অঞ্চলের জেরুক ও মাইলস্টোন ১০১ ক্ষেত্রে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ- তিন পুরাপ্রস্তর পর্বেরই সাক্ষ্য এসেছে। অন্যদিকে উচ্চ সিন্ধু অঞ্চলের সুক্কুর ও রোহরি পার্বত্য অঞ্চলে মিলেছে নির্মাণকেন্দ্রের সন্ধান। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, প্রস্তর কেন্দ্রের কথা এলেই আমাদের নির্জন, দূরবর্তী কোনো অঞ্চলের ছবিই মনে পড়ে। কিন্তু দক্ষিণ দিল্লী ও সংলগ্ন অঞ্চলে নয়নজ্যোত লাহিড়ী ও অন্যান্যদের অনুসন্ধানে স্পষ্ট হয়েছে যে ব্যস্ততম জনবহুল এলাকা থেকেও নিম্ন পুরাপ্রস্তর পর্বের ও মাইক্রোলিথের মতো প্রস্তরায়ুধের সন্ধান মিলতে পারে। দক্ষিণ দিল্লীরই অনঙ্গপুরের উৎখননে পাওয়া গেছে আদি ও পরবর্তী অ্যাকিউলিয়ন পর্বের প্রত্নসামগ্রী। সামগ্রিকভাবে ধরলে এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলটি একাধারে নিম্ন পুরাপ্রস্তর বসতি ও প্রস্তরায়ুধ নির্মাণের প্রধান কেন্দ্র হিসাবেই গড়ে উঠেছিল। আরেকটু পশ্চিমে, রাজস্থানে দিদওয়ানার কথা ইতিপূর্বেই আলোচিত হয়েছে। এখানে উল্লেখ করা যায় যোধপুরের নিকটবর্তী মোগরা পার্বত্য অঞ্চলের কথা। এটি প্রস্তরায়ুধ নির্মাণকেন্দ্র ছিল, যেখানে নিম্ন, মধ্য, উচ্চ পুরাপ্রস্তর পর্বের পাশাপাশি মধ্যপ্রস্তর পর্বের হাতিয়ারও নির্মিত হত। গুজরাটের সবরমতী উপত্যকায় ও সৌরাষ্ট্রে নিম্ন পুরাপ্রস্তরায়ুধ মিলেছে। আর কোঙ্কণ উপকূল ধরে গোয়া পর্যন্ত নিম্ন পুরাপ্রস্তরায়ুধ ও পরবর্তী পর্বের নিদর্শন পাওয়া গেছে। মহারাষ্ট্রেও বিভিন্ন স্থানে আলোচ্যপর্বের নিদর্শন মিলেছে, যার মধ্যে ওয়ার্ধা উপত্যকা ও নাসিকের গঙ্গাওয়ারি অঞ্চল অন্যতম।

মধ্যভারতের নর্মদা উপত্যকা নিম্ন পুরাপ্রস্তর সাক্ষ্যের অন্যতম প্রধান কেন্দ্র। হোসাঙ্গাবাদের নিকটবর্তী আদমগড় পার্বত্য অঞ্চলে উৎখননের মাধ্যমে নিম্ন ও মধ্য পুরাপ্রস্তর হাতিয়ারের পর্যায়ক্রমিক দৃষ্টান্ত মিলেছে। তবে সবচেয়ে আকর্ষক ভীমবেটকার গুহাবাসগুলি, যা নিম্ন পুরাপ্রস্তর পর্ব থেকে ঐতিহাসিক পর্যায়ের জীবনধারার এক ধারাবাহিক ছবি তুলে ধরে। এখানকার বেশিরভাগ প্রস্তরায়ুধ গুলি স্থানীয় হলুদ কোয়ার্টজ পাথরে নির্মিত। তবে ধূসর কোয়ার্টজ নির্মিত আয়ুধের দেখাও মেলে। প্রস্তর যুগের মানুষের কাছে এই কেন্দ্রটির প্রধান গুরুত্ব ছিল আশ্রয়স্থল, খাদ্যের সংস্থান ও হাতিয়ার নির্মাণের কাঁচামালের উৎস কেন্দ্র হিসাবে।

উত্তর প্রদেশের বেলান উপত্যকায় পুঙ্খানুপুঙ্খ সমীক্ষায় নিম্ন পুরাপ্রস্তর হয়ে নব্য প্রস্তর থেকে প্রায়-ঐতিহাসিক পর্বের প্রস্তরায়ুধ শিল্পের ধারাবাহিক সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। অন্যদিকে উড়িষ্যার সম্বলপুরের দারি-ডুংরি ও বুধবালান-ব্রাহ্মণী নদীর উপত্যকায় ব্যাপক মাত্রায় নিম্ন পুরাপ্রস্তর পর্বের হাতিয়ার মিলেছে।

উপমহাদেশের দক্ষিণ সম্পর্কে একসময় ধারণা ছিল যে, এখানকার নিম্ন পুরাপ্রস্তর শিল্প অন্যান্য স্থানের তুলনায় স্বতন্ত্র, যার পেছনে ছিল ভারী শিলাখন্ডের অনুপস্থিতি। কিন্তু বিগত কয়েক দশকের

গবেষণায় তা ভুল বলে প্রমাণিত হয়েছে। কারণ চপারের মত ভারী শিলাখন্ড দক্ষিণ ভারতের বিভিন্ন কেন্দ্রে সাম্প্রতিক উৎখননে ব্যাপক মাত্রায় পাওয়া গেছে। কর্ণাটকের হুনসগী উপত্যকার কথা দিয়ে এই অংশের আলোচনা শুরু করা যায়। আলোচ্য পর্বে হুনসগী অঞ্চলের প্রস্তরায়ুধগুলি বিভিন্ন ধরনের পাথরে নির্মিত হয় যেমন- চুনাপাথর, বেলেপাথর, কোয়ার্টজ, ডলোরাইট, চার্ট পাথর ইত্যাদি। অনেকগুলি স্থানীয়স্তরে দেখা যায় না। উৎখননকালে এখানকার একটি কেন্দ্র থেকে ৬৩ বর্গ মিটার আয়তনের গ্রানাইট পাথরে তৈরি ব্লকের সন্ধান মিলেছে যা, সম্ভবত অস্থায়ী আবাসস্থল হিসাবে ব্যবহার করা হত। এই হুনসগী উপত্যকারই ইসামপুর গড়ে উঠেছিল নিম্নপুরাপ্রস্তরায়ুধ নির্মাণের প্রধান কেন্দ্র রূপে। পণ্ডিতদের অনুমান ৫০০০০০ থেকে ৬০০০০০ বছর আগের এই ইসামপুর মানুষের বসতির অন্যতম কেন্দ্র হয়ে উঠেছিল, যেখানে চলতো খাদ্যপ্রক্রিয়াকরণের মত বস্তুগত কার্যকলাপ। দক্ষিণভারতে নিম্ন পুরাপ্রস্তর পর্বের সাক্ষ্য আলোচনায় আরেকটি কেন্দ্রের কথা বিশেষভাবে উল্লেখ্য তা হল, তামিলনাড়ুর আত্তিরাপককম। ১৮৬৩ সালে আবিষ্কারের পর থেকে এখানে ক্রমান্বয়ে উৎখনন চলতে থাকে। সাম্প্রতিক উৎখননে উঠে এসেছে নিম্ন, মধ্য ও উচ্চ পুরাপ্রস্তর পর্বের সাংস্কৃতিক অবশেষ। অ্যাকিউলিয়ন হাতিয়ারের পাশাপাশি পাওয়া গেছে বিভিন্ন ধরনের হাতকুঠার, যা মূলত স্থানীয়ভাবে অমিল কোয়ার্টজ পাথরের তৈরি। যা থেকে অনুমান করা সঙ্গত এগুলি অন্যত্র নির্মিত হয়ে এখানে আসতো। আরেকটি আকর্ষণীয় প্রাপ্তি হল, অ্যাকিউলিয়ন হাতিয়ার সহ বিভিন্ন প্রাণীর পায়ের ছাপ। দক্ষিণ এশিয়ার নিরিখে যা প্রথম।

৪.৩.২ মধ্য পুরাপ্রস্তর ক্ষেত্র

পুরাপ্রস্তর পর্বের সামগ্রিক কালপর্বেই পাথরের হাতিয়ারের মধ্যে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। হাতকুড়াল, চপার জাতীয় হাতিয়ারের পাশাপাশি ক্ষুদ্র ফ্লেক জাতীয় হাতিয়ারের আধিক্য ক্রমান্বয়ে বাড়তে থাকে। এগুলির মধ্যে অনেকগুলিই তৈরি হয়েছিল লেভোলিস প্রযুক্তিতে। যাই হোক, উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমে মধ্য পুরাপ্রস্তর পর্বের প্রস্তরায়ুধ ব্যাপক মাত্রায় মিলেছে পাটোয়ার মালভূমিতে। একইরকম গুরুত্বপূর্ণ পাকিস্তানের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের অন্তর্গত সাংঘাও গুহার নিকটবর্তী অঞ্চল। এখানে প্রাপ্ত পাথরের হাতিয়ার গুলি মূলতঃ কোয়ার্টজ পাথরে নির্মিত যা নিকটবর্তী অঞ্চলে সুলভ। থর অঞ্চলের ক্ষেত্রে গুরত্বপূর্ণ হল ছোট ছোট প্রস্তরায়ুধ নির্মাণ কেন্দ্রের উপস্থিতি। এর মধ্যে বুদ্ধ পুষ্কর হ্রদের নিকটবর্তী অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে আলোচ্য পর্বের নিদর্শণ মিলেছে। এছাড়া আজমের ও লুনি নদীর তীরবর্তী অঞ্চলের কথা ইতিপূর্বেই উল্লেখিত।

মধ্য ও উপদ্বীপিয় ভারতে মধ্য পুরা প্রস্তর পর্বের শিল্পকেন্দ্রের সাথে প্রায়শই উচ্চারিত হয় নেভাসীয় শিল্পকেন্দ্রের নাম, যেখানে পুরাতাত্ত্বিক এইচ. ডি. শাঙ্খালিয়া প্রথম বিস্তৃতমাত্রায় মধ্য পুরাপ্রস্তর পর্বের নিদর্শন আবিষ্কার করেছিলেন। এই নেভাসার কাছেই অবস্থিত চিরকি হল মধ্য পুরাপ্রস্তর পর্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বসতি ও শিল্পকেন্দ্র।

গাঙ্গেয় সমভূমি অঞ্চলে মানব বসতির প্রাচীনতম অঞ্চল হিসাবে উত্তরপ্রদেশের কল্পি-র নাম উল্লেখযোগ্য। এখানে বিভিন্ন পশুর জীবাশ্মের পাশাপাশি মধ্য পুরাপ্রস্তর পর্বের হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়া গেছে। এর মধ্যে যেমন আছে পশুর হাড়ের তৈরি হাতিয়ার তেমনই আছে চাছনির মত পাথরের হাতিয়ারও। এগুলোর নির্মাণকাল ৪৫০০০ বছর আগের বলে পুরাতাত্ত্বিকদের মত। পশ্চিমবঙ্গের প্রধান ক্ষেত্র গুলির কথা ইতিপূর্বেই আলোচিত।

দক্ষিণ ভারতে মধ্য পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতি বিশেষভাবে চিহ্নিত ফ্লেক জাতীয় আয়ুধ নির্মাণের সাথে। বিশাখাপত্তনাম উপকূলে মূলতঃ কোয়ার্টজাইট, চার্ট ও কোয়ার্টজ নির্মিত পাথরের হাতিয়ার ব্যাপক মাত্রায় দেখা যায়। লেভোলিস প্রযুক্তিতে নির্মিত হাতিয়ারের ব্যাপক নিদর্শণ এই অঞ্চলে প্রচুর দেখা যায়। বিভিন্ন আকৃতির চাছনির সংখ্যাধিক্য এই অঞ্চলের মধ্য পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতির গুরুত্বপূর্ণ সাক্ষ্য বহন করছে। কার্বন- ১৪ অনুযায়ী কুড্ডাপা জেলায় আলোচ্য পর্বের প্রস্তরায়ুধ গুলি ২৩০০০ বছরের পুরনো।

৪.৩.৩ উচ্চ পুরাপ্রস্তর ক্ষেত্র

উচ্চপুরাপ্রস্তর পর্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রযুক্তিগত উদ্ভাবন হল দুদিকে সমান্তরাল ভাবে ব্যবহার্য ছুরিকার নির্মাণ। এইসময় বাঁটালি জাতীয় হাতিয়ারের সংখ্যাধিক্যও লক্ষ্য করা যায়। ক্ষুদ্রাকৃতির হাতিয়ার তৈরির প্রবণতা ক্রমশ বাড়তে থাকে। এর পেছনে প্রধান কারণ ছিল নিঃসন্দেহে প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন। একথা প্রায় সকলেই স্বীকার করেছেন যে, উত্তর ও পশ্চিম ভারতে উচ্চ পুরাপ্রস্তর পর্ব থেকে আবহাওয়া ক্রমশঃ শুষ্ক হতে শুরু করেছিল। যার প্রভাব স্পষ্ট হয় আলোচ্য পর্বের প্রস্তরায়ুধ গুলির পরিবর্তনেও।

উত্তর-পশ্চিমের সাংঘাও গুহা থেকে মধ্য ও পুরাপ্রস্তর পর্বের পাথরের হাতিয়ার, পশুর হাড় ইত্যাদির সন্ধান পাওয়া গেছে। আবার থর অঞ্চলের ক্ষেত্রে দেখা যায়, উচ্চ পুরাপ্রস্তর পর্বের সাক্ষ্য পূর্ববর্তী পর্বের তুলনায় কম। যার অন্যতম কারণ ছিল আবহাওয়ার শুষ্কতা। তবে, বুদ্ধ পুষ্কর হ্রদের নিকটবর্তী অঞ্চলে মনুষ্য জীবনধারার নিদর্শন স্পষ্ট পরিলক্ষিত হয়। মধ্যভারতে আলোচ্য পর্বের জীবনধারার সাক্ষ্য পাওয়া যায় বিন্ধ্য পর্বতের গুহাবাসগুলিতে।

বেলান উপত্যকার চোপানি মান্ডো উচ্চ পুরাপ্রস্তর পর্ব থেকে নব্য প্রস্তর পর্বের ধারাবাহিক সাংস্কৃতিক সাক্ষ্যর অধিকারী। উচ্চ পুরাপ্রস্তর সাক্ষ্যর অন্তর্ভুক্ত প্রস্তরায়ুধ মূলতঃ চার্ট পাথরের তৈরি, বিন্ধ্যের আশেপাশে যা বহুল পরিমাণে মেলে। বেলান উপত্যকায় পাওয়া পশুর হাড়ের মধ্যে বন্য জীবজন্তুর পাশাপাশি, ভেড়া ও ছাগল অন্যতম। উপিন্দর সিং এ প্রসঙ্গে বলেছেন যে, খেয়াল রাখা দরকার আলোচ্য অঞ্চলে ভেড়া ও ছাগল থাকার কথা নয়, এবং এদের আগমন ঘটেছিল সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম থেকে। আর এই অনুমান সঠিক হলে বলাই যায় যে, এটি গৃহপালিত পশুপালনের একটি প্রাথমিক পর্যায়ের দৃষ্টান্ত বহন করছে।

মধ্যপ্রদেশের সিদ্ধি জেলার অন্তর্গত বাঘোর ১ নং প্রত্নকেন্দ্রে উচ্চ পুরাপ্রস্তর পর্বের উৎখননের নেতৃত্ব দেন জি. আর. শর্মা ও জে. ডি. ক্লার্ক। এখানে প্রাপ্ত সাক্ষ্যের ভিত্তিতে পন্ডিতদের অনুমান বিভিন্ন প্রস্তরায়ুধ গুলি এখানকার মানুষের বস্তুগত জীবনধারা ও শৈল্পিক কর্মের নজির তুলে ধরে। খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ, শিকার অথবা হস্তশিল্পের নানা কাজ এক্ষেত্রে হয়ে থাকতে পারে।

উচ্চ পুরাপ্রস্তর পর্বের আরেকটি আকর্ষণীয় ক্ষেত্র হল দক্ষিণ ভারতের কুর্নুল। আলোচ্য পর্বে এখানে পশুর হাড়ের তৈরি হাতিয়ারের সন্ধান পাওয়া গেছে, উপমহাদেশের নিরিখে যা অন্যত্র বিরল। এখানকার একটি গুহায় ৯০ শতাংশ আয়ুধই পশুর হাড়ে তৈরি। সৎকার হওয়া পশুর নিদর্শণের মধ্যে বিভিন্ন প্রজাতির পশু, পাখি ও প্রাণীর সন্ধান মিলেছে। যে তালিকায় চোখ মেললেই বোঝা যায়, এই অঞ্চলের মানুষের সাথে শুধু মাত্র যে বিভিন্ন প্রাণীর পরিচয় ছিল তাই নয়, এই অঞ্চল একসময় ঘন অরণ্যেও পরিপূর্ণ ছিল। চিত্তোর

জেলার রেনিগুন্টার একটি গুহা থেকেও উচ্চ পুরাপ্রস্তর পর্বের নিদর্শণ মিলেছে। সবমিলিয়ে বলা যায়, এই পর্বের পাথরের হাতিয়ার উপদ্বীপিয় ভারতের পূর্ব উপকূলের বিভিন্ন স্থানেই পরিলক্ষিত হয় এবং তার বয়সকাল আনুমানিক ২৫০০০ বছর থেকে ১০০০০ বছরের মধ্যে।

৪.৪ উপসংহার

ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে পুরাপ্রস্তর পর্বের সংস্কৃতির যে নিদর্শন আমাদের আলোচনায় উঠে এলো তার ভিত্তিতে একথা বলা ভুল হবে না যে, প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের জীবনযাত্রায় যে বদল ঘটেছে পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতির বিস্তার সে সাক্ষ্যই তুলে ধরে। একইসঙ্গে এই প্রশ্নও মনে আসে, উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অংশে ছড়িয়ে থাকা এই পর্বের মানুষের জীবনযাত্রা কেমন ছিল? তার ইঙ্গিত দিয়েই এই আলোচনায় ইতি টানা যায়। এ প্রসঙ্গে সর্বাগ্রে মনে রাখতে হবে উপমহাদেশের বিভিন্ন অংশে বসবাসকারী পুরাপ্রস্তর পর্বের মানুষের জীবনযাত্রার প্রধান নির্ধারক ছিল সংশ্লিষ্ট অঞ্চলের পরিবেশ। অবশ্য শিকারী-খাদ্যসংগ্রাহক এই পর্বের মানুষের জীবনযাত্রার কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য নিশ্চিতভাবেই কম-বেশি সর্বত্রই বিরাজমান ছিল। পুরাপ্রস্তর পর্যায়ের মানুষ পাথর, ঘাস, লতাপাতায় তৈরি গুহাবাসেই দিন কাটাতো। মোটামুটিভাবে স্থায়ী বাসের ঝোঁক স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায় এবং কিছু স্থান যে নির্দিষ্ট কাজের জন্যই ব্যবহৃত হত তার নজিরও স্পষ্ট। প্রাথমিক সামাজিক কাঠামোর প্রসঙ্গে বলা যায় এটি অনেকটা 'band society' র কাছাকাছি ছিল। আবার এই পর্যায়ের মানুষের ক্ষেত্রে এমন ধারণাও লক্ষ্য করা যায় যে, এই পর্বে মানুষ অস্তিত্বের সংগ্রামে এতটাই ব্যস্ত থাকতো যার ফলে অবসর ও সৃষ্টিশীলতার সময় খুব কম পাওয়া যেত। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই পর্বে মানুষের জীবনে চাহিদা ছিল অনেকটাই সীমিত এবং প্রযুক্তিগত দিক থেকেও তারা এতটাই পিছিয়ে ছিল যে উদ্বৃত্ত সংরক্ষণের তাগিদও সেভাবে তাদের ছিল না। এই দুটি বিষয় মাথায় রাখলে একথা বলাই যায় নিজস্ব বিনোদনের জগৎ নিশ্চিতভাবেই এই পর্বের মানুষের জীবনযাত্রাকেও প্রভাবিত করেছিল। নৃতাত্ত্বিক গবেষকরা দেখিয়েছেন আধুনিককালের শিকারী-খাদ্য সংগ্রাহক গোষ্ঠীর মধ্যেও একই ধরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়। আরেকটি খুব প্রচলিত মত হল, শিকার-খাদ্যসংগ্রহ খুবই অদক্ষ বস্তুগত সংস্কৃতির নিদর্শন। এই ধরণের মতামত যে কতটা ভুল তা প্রমাণ করে দেয় আলোচ্য জীবন নির্বাহ প্রণালীর ধারাবাহিক ইতিহাস। তাছাড়া নৃতত্ত্বের গবেষণায় দেখানো হয়েছে শিকারী-খাদ্যসংগ্রাহক গোষ্ঠীর মানুষরা তাদের চারপাশের প্রকৃতিকে নির্বিচারে ধ্বংসের বিরোধী। ভবিষ্যতের কথা ভেবে তারা বরং প্রাকৃতিক সম্পদের সুষ্ঠ সংরক্ষণেরই পক্ষপাতী। সর্বোপরি, লক্ষণীয় বিষয় হল আধুনিক শিকারী-খাদ্যসংগ্রাহক গোষ্ঠীর মধ্যে শিকারের তুলনায় খাদ্য সংগ্রহ করার প্রবণতাই বেশি চোখে পড়ে। এর থেকে বোঝা যায় পণ্ডিতরা শিকারের প্রবণতাকে খাদ্য সংগ্রহের প্রবণতার তুলনায় বেশি মাত্রায় গুরুত্ব দিয়ে থাকেন। কিন্তু এই ধারণা পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতির মানুষের বস্তুগত জীবনকে বোঝার ক্ষেত্রে আমাদের নতুন করে ভাবিয়ে তুলেছে এবং পুরাপ্রস্তর সমাজ ব্যবস্থায় লিঙ্গের অবস্থান ও ভূমিকাকেও মনে করিয়ে দেয়। বেশিরভাগ আধুনিক শিকারী-খাদ্যসংগ্রাহক গোষ্ঠীর ক্ষেত্রে দেখা যায়, পুরুষরা শিকারের কাজে ও মহিলারা খাদ্য সংগ্রহের কাজে যুক্ত থাকেন। যার ভিত্তিতে গবেষকদের অনুমান সম্ভবত একই ধরণের শ্রম বিভাজনের রীতি পুরাপ্রস্তর যুগেও প্রচলিত ছিল। কিন্তু উদ্ভিজ্জ উপাদানের ভূমিকা যদি সেইসময় খাদ্য তালিকার প্রধান অংশ হয়ে থাকে তাহলে একথা বলা ভুল হবে না যে মেয়েরাই পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতির বস্তুগত জীবনের ভিত্তি প্রস্তুতিতে মুখ্য ভূমিকা পালন করতো।

৪.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতির মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনা করো।

২. পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতির কালক্রম সম্পর্কে টীকা লেখ।

৩. ভারতীয় উপমহাদেশে পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতির বিস্তার কিভাবে হয়েছিল?

৪. আধুনিক উৎখননের আলোকে ভারতীয় উপমহাদেশে পুরাপ্রস্তর সংস্কৃতির বিস্তার আলোচনা করো।

৪.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

রণবীর চক্রবর্তী, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব(প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৯।

ইরফান হাবিব, প্রাক-ইতিহাস, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০২।

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ), প্রথম খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

Upinder Singh– A History of Ancient and Early Medieval India– Pearson– 2009.

R.S. Sharma– India's Ancient Past– OUP– New Delhi– 2005.

Raymond Allchin and Bridget Allchin– The Rise of Civilization in India and Pakistan– CUP– 1982.

অরুণিমা রায়চৌধুরী, প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষ-প্রস্তরযুগ থেকে লৌহযুগ, মিত্রম, কলকাতা, ২০০৮।

একক-৫ ◘ প্রস্তরায়ুধ নির্মাণ এবং প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশলের বিকাশ (Stone industries and technological developments)

গঠন

৫.০ উদ্দেশ্য

৫.১ সূচনা

৫.২ মানব প্রজাতির বিবর্তন ও প্রস্তরায়ুধ নির্মাণ কৌশলের প্রাথমিক উদ্যোগ—ওলডোয়ান ও আকিউলিয়ান শিল্পকলা

৫.৩ ভারতবর্ষে আদি মানুষ ও প্রস্তরায়ুধ কৃৎকৌশল

৫.৪ প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ও প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশলের অভিনবত্ব

৫.৫ শারীরিক গঠনে আধুনিক মানুষ ও লেভোলিস প্রযুক্তি

৫.৬ ভারতবর্ষে আধুনিক মানুষ ও উপমহাদেশের প্রাচীন প্রস্তরায়ুধ কেন্দ্রসমূহ

৫.৭ উপসংহার

৫.৮ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৫.৯ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

৫.০ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠের উদ্দেশ্য হল প্রাক-ঐতিহাসিক পর্যায়ে প্রস্তর দ্বারা নির্মিত আয়ুধ ও তার প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশল কীভাবে বিকশিত হয়েছিল তা জানা।
- ভারতবর্ষে প্রস্তরযুগে আয়ুধ নির্মাণের কৌশলের সূচনা ও বিকাশ।
- মানুষের শারীরিক বিবর্তন ও প্রযুক্তিগত পরিবর্তন।
- ভারতবর্ষের প্রস্তরায়ুধ কেন্দ্রসমূহের অবস্থান।

৫.১ সূচনা

আদিম কোন এক মানবযুগল- আদম আর ইভ, তাদের থেকে কিংবা এইরকম অন্য কোন উপায়ে একমুহূর্তে হঠাৎ সৃষ্ট হলো মানবপ্রজাতি- সৃষ্টিরহস্যের মীমাংসা প্রচলিত বিশ্বাসে এমনি ইঙ্গিত মেলে। ১৮৫৯ সালে 'অরিজিন অফ স্পেসিস' (প্রজাতির উদ্ভব) বইটিতে চার্লস ডারউইন যখন তার বিবর্তনের তত্ত্ব প্রকাশ

করলেন, তখন টলে গেল এই বিশ্বাস। চার বছর পরে টমাস হাক্সলি ঘোষণা করলেন যে, এই একই নীতিতে, বিবর্তনের দীর্ঘ এক প্রক্রিয়ার ফলেই মানবপ্রজাতি আজকের অবস্থানে পৌঁছেছে। শুরু হলো সন্ধান- 'হারানোর যোগসূত্র' অর্থাৎ যে মধ্যবর্তী প্রজাতিগুলির মধ্য দিয়ে সেই অনেকটা বানরের মত এক পশু থেকে আজকের এই শারীরিক গঠনের আধুনিক মানুষের (হোমো স্যাপিয়েন্স) উদ্ভব হলো তার সন্ধান। প্রাচীনকালের জৈব বস্তুর মূল আকার বা গঠন এখনো যেসব শিলায় সংরক্ষিত, তাদের অস্তিত্ব এর চিহ্নগুলি পড়ে আছে যেখানে, যাকে বলি জীবাশ্ম, তাদের কাছে পাওয়া গেলে এই সাক্ষ্য। অনেক অনেক যুগ আগের অতীত নিয়ে আজ যখন আমরা নাড়াচাড়া করছি, তখন তো সেই জৈব বস্তুর কোন কিছুই এখনো টিকে থাকবে এমন আশা করা যায় না। কিন্তু এর মধ্যেও যেসমস্ত নিদর্শণ পাওয়া যায় তার মধ্যে দিয়েই মানুষের প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশলের স্বাক্ষর ফুটে ওঠে।

৫.২ মানব প্রজাতির বিবর্তন ও প্রস্তরায়ুধ নির্মাণ কৌশলের প্রাথমিক উদ্যোগ—ওলডোয়ান ও আকিউলিয়ান শিল্পকলা

প্রায় ১০০ বছর আগে, এই ভারতবর্ষের শিবালিক পাহাড়ে আবিষ্কৃত হয় জীবাশ্ম হয়ে-যাওয়া মহা-বানর-নাম যার (Ramapithecus), প্রাচীনতর মিয়োসিন পলিতে (২৫০ লক্ষ থেকে ১৬০ লক্ষ বছর আগে) পাওয়া গেল তাকে। সঙ্গে সঙ্গে মারাত্মক ভুল হয়ে গেল। মানব জাতির বিবর্তনে এটাই মধ্যবর্তী প্রজাতির প্রতিনিধি এমন বিশ্বাস তৈরি হল। কিন্তু এখন জানা গেছে যে, সম্ভবত রামাপিথেকাস হল সিনাপিথেকাস (Sinapithecus) এর নারী বৈচিত্র, দুটিরই কঙ্কাল-জীবাশ্ম পাওয়া গেছে পাকিস্তানে, সেইসঙ্গে অন্যান্য দেশগুলোতে, ওরাংওটাং এর আত্মীয় এই প্রজাতি ইন্দোনেশিয়ায় প্রচুর দেখা যেত। অর্থাৎ মানববিবর্তনের প্রধান ধারা থেকে সরে যাওয়ার ধারাগুলোয় আরো একটি অন্তর্ভুক্ত হল। তাই, আমাদের পূর্বপুরুষদের মধ্যে এদের ধরা যাবে না। আফ্রিকার ভেতরেই প্রথমে আমাদের পূর্ব উত্তরাধিকারের শাখা পথটি উদ্ভব হয়েছিল। আমাদের থেকে অন্য উপশাখায় সরে যাওয়া আরেকটি প্রজাতি থেকে আফ্রিকায় দুটি বিশাল বনমানুষ শিম্পাঞ্জী আর গরিলার উদ্ভব। কেনিয়ায় পাওয়া কেনিয়েপিথেকাস (Kenyapithecus), ১৪০ লক্ষ বছর আগের) এই প্রধান প্রাক-মানবিক ধারার অন্তর্ভুক্ত ছিল বলে মনে করা হয়। অবশ্য মানব-প্রজাতির মতো এরা দ্বিপদী নয় (অর্থাৎ স্বাভাবিকভাবে এরা সোজা হয়ে দুপায়ে হাঁটতে পারেনা)।

পূর্ব আফ্রিকায় আর একটি প্রামাণ্য আবিষ্কারে পাওয়া গেল প্রজাতির আরেকটি গোষ্ঠী, নাম তার অস্ট্রালোপিথেসিন (Australopithecine), ৩৮ লক্ষ বছর আগের কিংবা ওরই সমসাময়িক যুগের পুরনো এরা। দ্বিপদী হওয়ায় এরা সত্যিই মনুষ্য প্রজাতিভুক্ত। ৩২ লক্ষ বছর আগেকার এক নারীর কঙ্কাল-জীবাশ্ম পাওয়া গেল ইথিওপিয়ায়, আবিষ্কারকের নাম দিলেন 'লুসি'। ছোটখাটো কাঠামোর শরির, খুলির (মগজের খোপ) ক্ষমতা অর্থাৎ আয়তন মাত্র ৪০০ ঘন সেন্টিমিটার (যেখানে আধুনিক মানুষের খুলির মাপ ১২৫০ থেকে ১৪৫০ ঘন সেমি) এবং যে প্রজাতির অন্তর্গত এই নারী তার নাম অস্ট্রালোপিথেকাস অ্যাফারেন্সিস (Australopithecus afarensis)। সমগ্র পূর্ব এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রায়, একই রকম আরও একটি প্রজাতি ছিল, তবে তারা একটু 'বলবান' ধরনের (অর্থাৎ আরো ভারি আর মোটা হাড়ের)। বরং দক্ষিণ আফ্রিকাতে অন্তত ২৩ লক্ষ বছর আগে অস্ট্রালোপিথেকাস অ্যাফারেন্সিস (Australopithecus afarensis) নামে

একটি ছিপছিপে (অর্থাৎ পাতলা হাড়ের) একটি প্রজাতির বিকশিত হয়েছিল যাঁদের ধারণ-ক্ষমতা সামান্য বেশি (৫০০ ঘন সেমি)। সম্ভবত তারা গাছের ডাল দিয়ে ধাক্কা মারত কিংবা আঁচড় কাটতে পারত, পাথর ছুঁড়তো, কিন্তু তাদের জিনিসপত্রের মধ্যে যত্ন করে তৈরি করা কোন কাজের জিনিস ছিল না।

যেসব প্রজাতি 'ছিপছিপে' ছিল তাদের পেশিশক্তি একটু কম ছিল বটে, কিন্তু অন্যদিকে তারা তাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গ বিশেষ করে হাত আর আঙ্গুল অনেক নিপুণভাবে ব্যবহার করতে পারত। কাজেই এই অস্ট্রালোপিথেকাস অ্যাফারেন্সিস নামের প্রজাতিটি শারীরিক গঠনের দিক দিয়ে আমরা যাকে প্রথম সত্যিকারের মানবপ্রজাতি হোমো হাবিলিস বলে থাকি তার খুবই কাছাকাছি এসে পৌঁছেছিল। ২৬ লক্ষ বছর থেকে ১৭ লক্ষ বছর আগে, পূর্ব আফ্রিকা আর দক্ষিণ আফ্রিকা উভয় অঞ্চলেই, যে হোমো হাবিলস দেখতে পাওয়া যেত তাদের খুলি-ধারণ-ক্ষমতা ৭০০ ঘন. সেমি. হওয়ায় আগের সমস্ত মানব প্রজাতির তুলনায় তারা অনেক বেশি বুদ্ধিমান ছিল এমন অনুমান করাই যায়। একটি পাথর দিয়ে অন্য পাথরে ঘা মেরে তারা পাথরের হাতিয়ার বানাতে পারত আর এইভাবে পাথরের ভিতর-অংশ কাটার জন্য ধারালো ফলা পেতে ভেঙে ফেলতো পাথরের স্তর। কেনিয়ার ওল্ডুভাই (Olduvai) অঞ্চলে এরকম হাতিয়ার প্রথম পাওয়া যায় বলে ওখানকার নামানুসারে এদেরকে বলা হল 'ওলডোয়ান' (Oldowan)। হোমো হাবিলিসের সম্মিলিত জীবনের কিছু প্রমাণ পাওয়া যায়। তার মস্তিষ্কের ব্রোকা (Broca) অঞ্চলের উন্নতির ফলে, আমরা আজ যাকে 'শব্দ' বলি, সেরকম একগুচ্ছ আওয়াজ সম্ভবত সে ইতিমধ্যেই ব্যবহার করতো।

আফ্রিকাতে হোমো ইরেকটাস (Homo Erectus) মানবপ্রজাতির মধ্যে হোমো হাবিলিসের হোমো এরগাস্টার (Homo Ergaster) নামের একটি সমসাময়িক সঙ্গী ছিল, কিন্তু তার বয়স ছিল অপেক্ষাকৃত কম। এই প্রজাতির শরীর কাঠামোর একটি জীবাশ্ম রয়েছে আফ্রিকাতে যার বয়স ১৮ লক্ষ থেকে ২ লক্ষ বছর; অবশ্য গোটা প্রজাতিটা ২০ লক্ষ বছরের পুরনো। হোমো হাবিলিসের চেয়ে হোমো ইরেকটাস অনেক বেশি বলবান ছিল, আর খুলি বেশি মোটা হলেও তার ধারণ-ক্ষমতা বেড়ে গিয়ে ১০০০ ঘন. সেমি. হয়ে গিয়েছিল। এই হল সেই প্রথম প্রজাতি যে জানতো কেমন করে আগুন ব্যবহার করতে হয়, কেমন করে বশে আনা যায় তাকে (এর প্রমাণ মিলেছে ১৪ লক্ষ বছর বা তারও আগে আফ্রিকার কেনিয়াতে, চেসোওয়ানাজ থেকে)। হোমো হাবিলিস যেসব হাতিয়ার ব্যবহার করত প্রথমদিকে হোমো ইরেকটাস ও ঐ একই হাতিয়ার কাজে লাগাতো, কিন্তু সেগুলোতে ছিল আরও অনেক বেশি দক্ষতার ছাপ। শুধু পাথরের ভেতরের অংশের আকার বদলেই তারা থামল না, এক একটা স্তর কেটে ফেলে তাকে হাতিয়ার রূপ দিল আর এভাবেই 'স্তরকাটা নুড়ি পাথরের হাতিয়ার' (Flaked pebble tool)-এর শিল্প তৈরি হয়ে গেল। শেষে হল হাত-কুঠার যেখানে পাথরের দুদিকেই ঢাল আর সেটা 'দুমুখওয়ালা'; এভাবে পাথরের একটা দিক হলো হয় অমসৃণ নয়তো এমন ধারালো যাতে কোনো কিছু কাটা যায়। এটা সরাসরি হাতে ধরা হতো। এরকম হাত-কুঠার তৈরীর করণ-কৌশলকে বলে আকিউলিয়ান (Acheulean) এরকম আদ্দিকালের, ১৪ লক্ষ বছর আগেকার হাত-কুঠার আছে আফ্রিকা মহাদেশে, ইথিওপিয়ার কোনসো-তে। ওলদোয়ান আর আকিউলিয়ান উভয় করণকৌশল পুরাতত্ত্বে নিম্নতর (lower) বা একটু পুরনো কালের (Earlier) প্রাচীন প্রস্তর যুগের (Palaeolithic— Paleo — প্রাচীন lithic - পাথর) অন্তর্গত।

৫.৩ ভারতবর্ষে আদি মানুষ ও প্রস্তরায়ুধ কৃৎকৌশল

আফ্রিকার ঘাসজমি আর ঘন অরণ্যে বেড়ে ওঠা হোমো হাবিলিস (অথবা পুরা কালের এক হোমো ইরেকটাস) যে তার পরিবেশের বাধা অতিক্রম করে ভিন্ন ভিন্ন বৈচিত্র্যময় জলবায়ুর এলাকায় সুদূর চিন (লং গুপ্পোঃ যেখানে ১৮ লক্ষ ১৯ লক্ষ বছরের পুরনো চোয়ালের জীবাশ্ম তার সঙ্গে ওলডোয়ান হস্তশিল্প পাওয়া গেছে) থেকে স্পেনের (বারাঙ্কো লিয়ন-এ, ১৮ লক্ষ বছর আগের) ছড়িয়ে পরেছিল, মানব প্রজাতির পক্ষে সে ছিল সাফল্যের এক দিক চিহ্ন। দামিনিসি-তে (জর্জিয়া, ককেশাস) ১৭ লক্ষ বছর আগের আর মোজোরেটা-তে (জাভা, ইন্দোনেশিয়া) ১৮ লক্ষ বছর আগের হোমো-ইরেকটাস বলে সনাক্ত করা সমসাময়িককালের অনেক প্রজাতির জীবাশ্ম পাওয়া গেছে। দামিনিসি-তে জীবাশ্মের সঙ্গে ওলডোয়ান হাতিয়ারও ছিল।

এইসব প্রাচীন যুগের অস্ত্রশস্ত্র, হোমো হাবিলিস কিংবা প্রথম দিকের হোমো ইরেকটাসও যেগুলো ব্যবহার করত, তাদের চিহ্ন রয়েছে পাকিস্তানের মাটিতেও। পাকিস্তানের পাঞ্জাবের পশ্চিমে, পাটওয়ার মালভূমির সোয়ান উপত্যকায় অবস্থিত রিয়াত-এ এগুলো পাওয়া গেছে, প্রাচীনত্বের বিচারে ২০ লক্ষ বছরেরও বেশি পুরনো সেগুলো। একইরকমের হস্তশিল্পের নমুনা ছড়িয়ে রয়েছে হিমাচল প্রদেশের শিবালিক পাহাড়ে, সেই পুরনো কালের ছাপ তাদের শরীরেও (১৮লক্ষ বছর কিংবা তারও পুরনো কালের)।

এমনকি খাঁটি হোমো হাবিলিস যদি আফ্রিকার বাইরে ছড়িয়ে পড়েও থাকে, তবু প্রাচীন এ পৃথিবীর সর্বত্র যার চিহ্ন প্রভূত মাত্রায় দেখা যায়, সেই হোমো ইরেকটাস সময়ের বিবর্তনে হোমো হাবিলিসকে পেছনে ফেলে এগিয়ে গেল। আগেই উল্লেখ করা হয়েছে যে, প্রাচীনতর চিহ্ন গুলো ছাড়াও সে ঢুকে পড়েছিল উত্তর চীনের শীতলাতর অংশেও (ঝৌকুওদিয়ান, ৭ লক্ষ বছর আগে); জাভার ঘন অরণ্য সঙ্কুল দ্বীপেও (ঐ একই সময়ে) তখন সে বসবাস শুরু করেছে। এমনকি তার কাজের হাতিয়ারগুলো যখনো পর্যন্ত প্রধানত অমসৃণ ভাঙাচোরা পাথরের টুকরোর ভেতরের অংশ তার খাঁজকাটা স্তর, সে সময়েও তার শক্তপোক্ত বলবান কাঠামো, মুখের কথার ওপর অনেক বেশি নিয়ন্ত্রণ আর দীর্ঘাকায় মগজ তাকে অনেক বেশি সুবিধা দিয়েছিল। আগুনকে সে ব্যবহার করতে পারত নানাভাবে; উষ্ণতা পেতে, বন্যজন্তুকে ভয় দেখাতে কিংবা জঙ্গল পরিষ্কার করতে, তবে খুব সম্ভবত তখনো পর্যন্ত মাংস আর হাড় ঝলসে খেতে জানত না।

পাকিস্তানে পাব্বি পাহাড়ে, ঝিলম নদীর তীরে সোয়ান উপত্যকায় পাওয়া গেছে প্রধান স্তরকাটা পাথর (Flaked pebble), যাকে কিনা 'টুকরো করার কাটারি' (Chopper Chopping) বলা হতো সেই রকম হাতিয়ারের বয়স ১০ লক্ষ বছর কি তারও বেশি। হিমাচল প্রদেশের বিপাশা, বনগঙ্গা আর অন্যান্য নদী উপত্যকাতেও একই রকমের হস্তশিল্পের নমুনা পাওয়া গেছে তবে তাদের শরীরে বয়সের স্তরচিহ্ন নেই। এই গোটা এলাকায় ঐ যুগের হোমো ইরেকটাস কোনো জীবাশ্ম আবিষ্কৃত হয়নি, কিন্তু একই রকম যন্ত্রপাতি যে ঐ প্রজাতিরই হাতের কাজ এটা প্রায় পুরোপুরি নিশ্চিত বলে মনে হয়।

হাত কুঠার বা আকিউলিয়ান শিল্প (আফ্রিকাতে ১৪ লক্ষ বছরের আগে ইতিমধ্যেই যেটি প্রচলিত) ৭ লক্ষ ৫ লক্ষ বছর আগের সময়কালে টুকরো করার কাটারির মত হাতিয়ারের সঙ্গে একই সাথে সোয়ান উপত্যকায় দেখা গিয়েছিল। হাতকুঠার সমেত ঐ একই রকম সময়কালের ঐ একইরকম সব হাতিয়ার কাশ্মীরের পহেলগাঁও এর সমতলে পাওয়া গেছে বলে জানানো হয়েছে। এটা হতে পারে যে, ছুঁড়ে মারতে সুবিধা হয় এমন

হাত-কুঠার সশস্ত্র, আগুনকে নিজের বশে এনে অনেকটা সুরক্ষিত এই হোমো ইরেকটাস (Scavenger — অন্যের মারা মাংস খায় যারা) ফলমূল আর বুনো ঘাসের বীজ সংগ্রহ করে ওঠার সঙ্গে সঙ্গে ছোট ছোট প্রাণী শিকারীও হয়ে উঠেছিল।

ভারতবর্ষের বাদবাকি অংশে এই হোমো ইরেকটাস ছড়িয়ে পড়ত একটু সময় লেগেছিল। ভূতাত্ত্বিকরা যাকে মধ্য প্লেস্টোসিন কাল (৭ লক্ষ ৩০ হাজার থেকে ১ লক্ষ ৩০ হাজার বছর আগে) বলেন, সে সময় প্রকৃতপক্ষে বিস্তার ঘটেছিল। হিমযুগের অত্যন্ত ঠাণ্ডা শুকনো সময়কালে যখন অরণ্য উজাড় হয়েছিল অথবা সীমান্তবর্তী উষ্ণ স্যাঁতস্যাতে দশায় যখন নিবিড় হয়েছিল অরণ্য, তখন এই পরিবেশ তাকে যে কিভাবে বাধা দিয়েছিল নাকি সাহায্য করেছিল, সে কথা এখন বলা সম্ভব নয়। কর্নাটকের হুন্সগি উপত্যকা আর চেন্নাই এর কাছে অবস্থিত আত্তিরামপাক্কাম সমেত দক্ষিণ ভারতের অনেক স্থানে 'প্রাচীন আকিউলিয়ান হাতিয়ার' (তথাকথিত 'মাদ্রাজীশিল্প) অর্থাৎ হাত কুঠার ইত্যাদির আবির্ভাব ঘটেছিল। U-Th (ইউরেনিয়াম-থেরিয়াম) পদ্ধতিতে কর্ণাটকের স্থানগুলির বয়স বেরিয়েছে ৩ লক্ষ ৫০ হাজার বছর। ওই একই পদ্ধতিতে রাজস্থানের পাওয়া দিদোয়ানায় নিম্নস্তরের প্রাচীন প্রস্তর যুগের হস্ত শিল্পকৃতি ৩ লক্ষ ৯০ হাজার বছরের পুরনো আর মহারাষ্ট্রের আহম্মদনগর জেলায় নাভাসা সামগ্রী ৩ লক্ষ ৫০ হাজারের পুরনো বলে দেখা গেছে।

ছড়িয়ে পড়ার এই প্রক্রিয়া চলার সময়, কালক্রমে আদি হোমো ইরকটাস এর মধ্যে কয়েকটি উপ প্রজাতির বিভক্ত হবার একটি ঝোঁক দেখা গেল। শক্তি তাদের একটু কম হলেও তারা ছিল অনেক বেশি দক্ষ আর সেকারণে এই পাথরের ভাঁজ থেকে আরো ছোট ছোট হাতিয়ার অর্থাৎ 'পরবর্তী আকিউলিয়ান হাতিয়ার' তারা তৈরি করতে পারত। হাতনোরাতে 'নর্মদা করোটি' আবিষ্কৃত হবার সঙ্গে সঙ্গে নর্মদা উপত্যকায় একইরকম হাতিয়ারের ভগ্নাবশেষও পাওয়া গেছে। একটি বিকশিত হোমো ইরেকটাস প্রজাতির অন্তর্ভুক্ত এই করোটি অনেক অনেক দূর-অতীতের কথা বলতে পারে; ১৩০০০০ বছরের চেয়েও অনেক আগের কোন সময়ের কথা।

৫.৪ প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তন ও প্রযুক্তিগত কৃৎকৌশলের অভিনবত্ব

হোমো ইরেকটাস যতই বিকশিত হচ্ছিল ততই তার হাতের তৈরি হাতিয়ারগুলো উন্নত হচ্ছিল। তাদের সে নতুন নতুন আকার দিচ্ছিল, নানান অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন যেসব উপাদান পাওয়া যাচ্ছিল সেই মতো তারা করণকৌশলকে সে মানানসই করে তুলেছিল। খুবই ধীরে ধীরে চোখে পরে এমন সব পরিবর্তন। কয়েক হাজার বছর লেগে যায়। কিন্তু শেষমেশ নানান আঞ্চলিক 'সংস্কৃতি'র অভিমুখেই এই পরিবর্তন চালিত হয়। পুরাতত্ত্ববিদরা যখন এক বা একাধিক অঞ্চলের একটি বিশেষ স্তরে একই রকম হাতিয়ার, অলংকার আর মানবশ্রমে উৎপন্ন অন্যান্য সামগ্রী, যাদের এককথায় তাঁরা হস্তশিল্পকৃতি বলেন তার সমাবেশ দেখতে পান, আর তারই সঙ্গে সঙ্গে একই ধরনের রীতিনীতি বিশ্বাস যেমন মৃতদেহ সৎকারের বিভিন্ন প্রথা, নানান ধর্মীয় সঙ্কেত চিহ্ন তাদের চোখ পড়ে, ঠিক তখনই 'সংস্কৃতি' এই শব্দটি ব্যবহার করা হয়। হোমো ইরেকটাসের কথা ধরলে, তার প্রথা বা বিশ্বাস সম্বন্ধে কিছুই জানা যায় না। কেবলমাত্র তার পাথরের হাতিয়ারের গড়নই তার বৈচিত্র্যময়

সংস্কৃতির নানান সূত্র আমাদের যোগান দেয়। শতাব্দীর পর শতাব্দী কেটে গেলে পর, আরো ছোট আরো হালকা হাতিয়ার উৎপাদনের প্রবণতা আসে। আর এমনই এক প্রবণতা স্বাভাবিক পরিণতি পৃথিবীর নানান স্থানে আপাতদৃষ্টিতে স্বাধীন চেহারার স্তরকাটা ছুরির ফলার (flake blade) আবির্ভাব। এই স্তরকাটা ছুরির ফলাকে ভারতবর্ষে মধ্য প্রস্তর যুগের চিহ্ন হিসাবে ধরা হয়। 'নেভাসা সংস্কৃতি'তে (নেভাসা অঞ্চলের নামানুসারে এই নাম এ কথা ইতিমধ্যেই বলা হয়েছে) এরকম পাথরের ছুরির ফলার (Stone bloade) দেখা যায়। এই সংস্কৃতি মনে হয় পরে দক্ষিণে উপদ্বীপ এবং মধ্য ভারতে প্রসারিত হয়েছিল। TL পদ্ধতিতে দিদওয়ানার মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগের বয়স পাওয়া গেল প্রায় ১৫০০০০ বছর আগেকার অথচ গুজরাটে, U-Th পদ্ধতির সাহায্যে ৫৬,৮০০ বছর আগের কোনো সময় পাওয়া গেল। শ্রীলংকার দক্ষিণ দিকের উষ্ণ এলাকায় এই যুগের বয়স ২০০০০০ বছর ৪০০০০ বছর আগেকার বলে ধরা হয়েছে। কাজেই এই সংস্কৃতি খুব বেশি না হলেও ১ লক্ষ বছর বেঁচে ছিল। নিম্নতর প্রাচীন প্রস্তর যুগের সঙ্গে প্রত্যক্ষ ধারাবাহিকতায় এই সংস্কৃতি যুক্ত ছিল। আর কোথাও, অন্য কোন অঞ্চলে যদিও কঙ্কালের কোন ভগ্নাবশেষ এখনো পাওয়া যায়নি, তবু এর স্রষ্টারা সম্ভবত ছিল হোমো ইরেকটাসের প্রত্যক্ষ উত্তরাধিকারী।

যুগ	হাতিয়ারের ধরণ	প্রথম ব্যবহারকারী হিসেবে চিহ্নিত প্রজাতি
নিম্নতর প্রাচীন প্রস্তর	ওলডোয়ান	হোমো হাবিলিস
নিম্নতর প্রাচীন প্রস্তর	আকিউলিয়ান	হোমো ইরেকটাস
নিম্নতর প্রাচীন প্রস্তর	পাথুরে স্তর	হোমো ইরেকটাস
নিম্নতর প্রাচীন প্রস্তর	স্তরকাটা ছুরির ফলা	হোমো ইরেকটাস বিকশিত আর্কিয়া হোমো স্যাপিয়েন্স
মধ্য প্রাচীন প্রস্তর	লেভোলিস	নিয়ানডারথল
উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর	পিঠওলা ছুরির ফলা	হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স
মধ্যপ্রস্তর	মাইক্রোলিথ	হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স

৫.৫ শারীরিক গঠনে আধুনিক মানুষ ও লেভোলিস প্রযুক্তি

পাকিস্তানের রোহারি পাহাড়ে (উত্তর সিন্ধু) আর সোয়ান উপত্যকায় (পাটোয়ার মালভূমি) মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগের (স্তরকাটা ছুরির ফলা সমেত) যেসব হাতিয়ার প্রচুর পরিমাণে যত্রতত্র পাওয়া যায় তার সূত্র ধরেও প্রাচীনতর সংস্কৃতির এমন কোনো ধারাবাহিকতা অনুমান করতে পারা যায় না। কার্বন-১৪ পদ্ধতির সাহায্যে পতওয়ার মালভূমিতে এই সংস্কৃতি সময়সীমা নির্ধারিত হয়েছে ৬০০০০ বছর থেকে ২০০০০ বছর। ৫০০০০০ বছর আগেকার নিম্ন প্রাচীন প্রস্তর যুগের সোয়ান সংস্কৃতির সঙ্গে এর কোনো যোগসূত্র নেই। সেক্ষেত্রে আদিকালের যে আধুনিক মানুষ (হোমো স্যাপিয়েন্স) ভারতবর্ষে ঢুকেছিল, পরবর্তীকালের শিল্প গুলি তারই হাতের কাজ বলে মনে করা হয়। সেজন্য তার সৃষ্টির একেবারে মূলস্তরের দিকে তাকানো এখন খুব জরুরী।

বৈচিত্র্যময় এই প্রাচীন পৃথিবীতে অনেক অনেক দূরদেশে ছড়িয়ে পড়েছিল হোমো ইরেকটাস। প্রত্যেকটা দল বা গোষ্ঠী পরস্পরের থেকে বিচ্ছিন্ন হতে চাওয়ায় এদের মধ্যে জিন-প্রবাহ একেবারে ঘটলই না বলা যায়। এবার হোমো ইরেকটাসের বিভিন্ন উপ-প্রজাতিতে বিভক্ত হতে শুরু করাটা অবশ্যম্ভাবী ছিল। এদের কখনও কখনও 'আর্কিয়া হোমো স্যাপিয়ান্স' হিসাবে শ্রেণীবিভক্ত করা হয়। শরীরের ভার কমানোর প্রবণতা বা 'লঘুতা' অত্যন্ত সুদূর প্রসারী হলেও তাকে কোনোমতেই বিশ্বজোড়া বলা যায় না। ইয়োরোপের হোমো ইরেকটাস অধিক জীবনযুদ্ধে বলবান এক প্রজাতি, হোমো স্যাপিয়ান্স নিয়ানডার্থালেনসিস (Homo Sapience Neanderthalensis) বা নিয়েনডারথল মানুষ উদ্ভব হল আর ২৩০০০০ থেকে ৩০০০০ বছরের আগে পর্যন্ত তারা বেড়ে চলল, সমৃদ্ধ হল। ৫০০০০ বছর আগের কোন সময় থেকেই নিয়েনডারথল মানুষেরা পশ্চিম এশিয়া এবং আরো পূর্বদিকে বসতি তৈরি করতে শুরু করেছিল বলে মনে হয়। এই নিয়েনডারথল মানুষ আকারে অত্যন্ত ছোটখাটো। খুবই সরু কপাল, ভুরুর হাড় উপর দিকে ঠেলে বেরিয়ে আসা, চিবুক নেই। মগজের খাপটি প্রায় ১৪৫০ ঘন সেমি. আয়তনের; গড় আধুনিক মানুষের তুলনায় এটি অনেক বেশি বড়। হাতিয়ার তৈরীর ক্ষেত্রে এরা একটু বেশি পরিশীলিত কায়দায় কাজ করত। তার নাম লেভোলিস মাউস্টোরিয়ান (Levallois Mousterians)। এর সাহায্যে পাথরের ভিতর এর অংশটাকে প্রথমে এমন ভাবে ছেঁটে ফেলত যাতে আকারের চাহিদা মতো স্তরগুলোকে বিচ্ছিন্ন করা যেতে পারে। এসব কিছু সত্ত্বেও আজকের আধুনিক মানুষের একেবারে বিপরীত অবস্থানে সে বিকশিত হতে লাগল।

শরীর-গঠনের দিক দিয়ে আমরা যাকে আধুনিক মানুষ বলি, তার চিহ্ন হলো, অন্যান্য মানব সদৃশ প্রজাতির সঙ্গে তুলনায় তার কপাল লম্বা হবে, চোখের ওপরে ভারি হাড় সরে যাবে, মুখে থাকবে একটা উলম্ব রেখা (বাইরের দিকে ঢালু হয়ে যাওয়া রেখার তুলনায়) আর চিবুক। তার হাড়গুলো হবে পাতলা অর্থাৎ 'বলবান' হবার বদলে সে হবে 'ছিপছিপে'। আমাদের প্রজাতি যে প্রথম আফ্রিকায় উদ্ভব হয়েছিল আর তারপর ছড়িয়ে পড়েছে গোটা বিশ্বে, এমন অনুমানের সপক্ষে অনেক ভালো ভালো যুক্তি আছে। অন্যান্য মানব বসতির তুলনায় আফ্রিকার সাহারায় মানুষজনের মধ্যে জিনগত বৈচিত্র অনেক বেশি এর থেকেই এমন একটা আন্দাজ করা যায় যে, হোমো স্যাপিয়েন্স স্যাপিয়েন্স হিসেবে তুলনামূলকভাবে অনেক সুদীর্ঘকাল পেরিয়ে আসার জন্য অন্যান্য অংশের মন্যষ্যবসতির তুলনায় তাদের জিনে অনেক বেশি ক্রমবিবর্তন ঘটে গেছে। পুরাতাত্ত্বিক সন্ধানে একথা প্রতিষ্ঠিত যে, আফ্রিকায় হোমো ইরেকটাসের ক্রম পরিবর্তন ঘটেছিল কয়েকটি স্তরে। যে হোমো ইরেকটাস পাওয়া যায় তার মধ্যে আধুনিক মানুষের অনেক বৈশিষ্ট্য বিদ্যমান। তারপর ২ লক্ষ বছর আগের সময়কালে দক্ষিণ আফ্রিকার এলান্ডসফন্টেন (Elandsfontein)এ অ্যাকিউলিয়ান হস্তশিল্পের সঙ্গে আবির্ভূত হলো আর্কিয়া হোমোস্যাপিয়েন্স এর একটি গোষ্ঠী। ১২০০০০ বছর আগে দেখা দিল এর আরও অনেক বেশি বিকশিত একটি রূপ; অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট হাতি আর বিশেষত যাকে বলা হয় আফ্রিকার মধ্য প্রস্তর যুগের (Middle Stone Age) শিল্প সেই স্তরকাটা ছুরির ফলা তৈরি করতে আর তাকে কাজে লাগাতে পারা এই গোষ্ঠী যথেষ্ট পরিমাণে দক্ষ ছিল।

জিন বিশেষজ্ঞদের অনুমানে প্রায় ২০০০০০ বছর আগে এই প্রজাতি (১০০০০ বা তারও বেশি লোকের একটি অন্তঃপ্রজননকারী জনগোষ্ঠী সমেত) তার মূল গঠনটি পেয়েছে। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার পুরাতাত্ত্বিক রেকর্ড থেকে দেখা যাচ্ছে যে, প্রকৃতপক্ষে শরীর গঠনের বিচারে আজকের আধুনিক মানুষের প্রথম আবির্ভাব ঘটেছিল আজ থেকে প্রায় ১ লক্ষ ১৫ হাজার বছর আগে। প্রথমদিকে এই আধুনিক

মানুষের সঙ্গে মধ্য প্রস্তর যুগের হাতিয়ার এর একটি যোগ ছিল বটে, কিন্তু তারপর (প্রায় ৯০০০০ বছর আগে) তাদের আরও পাতলা দু'ধারওয়ালা প্রিজমের গড়নের তিনকোনা পাত বা যাকে বলে 'পিঠওলা ছুরির ফলা' (backed blades) তৈরি করতে দেখা গেল। সমান্তরাল ধার সমেত পিঠওলা ছুরির ফলা' (backed blades) অবশ্যই একান্তভাবে আধুনিক মানুষের হাতিয়ার বলে মনে করা হয়। আলাদা আলাদা কাজের জন্য এটা দিয়ে সে এখন আলাদা আলাদা বিচিত্র সব পাথরের হাতিয়ার তৈরি করতে পারল; এমন কি পশুর হাড় আর শিং থেকেও গড়তে পারলো হাতিয়ার, অলংকার। এরই সঙ্গে সঙ্গে যেকোনো প্রাচীন করণ-কৌশলও তৎক্ষণাৎ সে গ্রহণ করল কিংবা এর সঙ্গে মিলিয়ে নিল; তা সে হাতিয়ার লেভালিস মাউস্টেরিয়ান কিংবা আর্কিয়ান কিংবা স্তরকাটা নুড়িপাথরের (Pebble-Flake) যারই হোক না কেন, যার সঙ্গে তার পরিচয় হল সেটাই সে আত্মস্থ করল।

শরীর গঠনের দিক থেকে, হোমো ইরেকটাসের চেয়ে কথা বলার ব্যাপারে প্রায়-আধুনিক মানুষ অনেক বেশি দক্ষ ছিল কিনা সে বিষয়ে আমরা নিশ্চিত নই, কিন্তু সে যে এখন অনেক বেশি নানা ধরণের আওয়াজ করতে পারতো তা হতে পারে। তখনও বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই সম্ভবত কণ্ঠস্বর এর অভাব পূরণ করে দিতে অঙ্গিভঙ্গি, শিস, শ্বাসের ওঠাপড়া, ঘোত ঘোত শব্দ বা ওই রকম আরও সব আওয়াজ। এটা ঘটনা যে, এত সুদীর্ঘকালের বিচ্ছিন্নতা, বিশেষত অস্ট্রেলিয়ার ক্ষেত্রে এই বিচ্ছিন্ন সময়কাল লক্ষণীয় মাত্রায় দীর্ঘ- ৬০০০০ বছরেরও বেশি, তা সত্ত্বেও পৃথিবীর সমস্ত প্রান্তের মানবজাতিকে যে এক বা অন্য যেকোনো ধরনের ভাষার পূর্ণ অধিকারী হিসেবে দেখতে পাওয়া যায় তা থেকে আমরা অনুমান করতে পারি, আফ্রিকা থেকে আধুনিক মানুষ এর ছড়িয়ে পড়া শুরু হবার আগেই ধ্বনি নিয়ে অভিব্যক্তি প্রকাশের রপ্ত করেছিল। ভাষা তাকে দিল এক দুরন্ত ক্ষমতা, তার পাশের মানুষটির সঙ্গে ভাব বিনিময় ক্ষমতা; তাতে একজনের থেকে অন্যজনে দক্ষতার ঠাই বদলে জোর সুবিধে। আগে থেকে ঠিক করে নেওয়া জটিল কোনো কাজ কত সহজে একসাথে করা সম্ভব। তার ওপর অনেক কথা যখন মনে তোলপাড় করে, তখন ভাবনা গুলো ঠিকমতো সাজাবার জন্য অনেক বেশি সুবিধাজনক একটা বহন পাওয়া, সে বড়ো কম কথা নয়।

৫.৬ ভারতবর্ষে আধুনিক মানুষ ও উপমহাদেশের প্রাচীন প্রস্তরায়ুধ কেন্দ্রসমূহ

আফ্রিকা থেকে আধুনিক মানুষের খুব দ্রুত ছড়িয়ে পড়ার সাক্ষ্য বহন করে মানব কঙ্কালের ভগ্নাবশেষ (এখনও জীবাশ্ম); পিঠওলা ছুরির কারিগরি সমেত তাকে পাওয়া যায় পশ্চিম এশিয়ায় ৯০০০০ বছর আগে। এশিয়ায় ঘুরতে ঘুরতে ৬০০০০ বছরের আগে সে পৌঁছে গেলো অস্ট্রেলিয়ায়, ঢুকে পড়ল সাইবেরিয়ায় আর আলাস্কার নবীন জগতে; সম্ভবত আজ থেকে প্রায় ২০০০০ বছরের বেশি দেরিতে নয় সেটা। আফ্রিকা থেকে তার এই ভ্রাম্যমাণতার মাঝপথে যেহেতু ভারতবর্ষের সীমানারেখা, কাজেই আজ থেকে ৬০০০০ বছরের চেয়ে অনেক আগেই সে ভারত উপমহাদেশের প্রান্তসীমায় পৌঁছে গিয়েছিল হয়তো। পরবর্তী ২০০০০ বছরের মধ্যে ভারতবর্ষ পার হয়ে নিশ্চয়ই শ্রীলঙ্কায় পৌঁছেছিল, কেননা শ্রীলঙ্কায় ফা-হিয়েন গুহায় ৩১০০০ বছর আগেকার সময়ে আধুনিক মানুষের শিলীভূত কঙ্কাল (তার মধ্যে একটি শিশুও আছে) দেখতে পাওয়া গেছে, অথচ ওই অঞ্চলে মানব-অধিকারের চিহ্ন আরও পুরনো, প্রায় ৩৪০০০ বছর আগের। শ্রীলংকার 'বাটাডোমবা লেনা' (Batadomba Lena) গুহাতেও ২৮৫০০ বছরের পুরনো মানব কঙ্কালের ভগ্নাবশেষ পাওয়া গেছে। আমাদের মনে রাখা দরকার যে, প্রায় ৩০০০০ বছর আগে যদিও সমুদ্র জেগে উঠেছে, কিন্তু তারও আগে,

হিমায়ুনের প্রাচীনতর দশায় (৫০০০০ বছর বা তারও অনেক আগে) সমুদ্রতল নেমে যাবার সময়কালে শ্রীলঙ্কার সঙ্গে সরাসরি একটা স্থলভাগের সেতু ছিল।

এশিয়া পার হয়ে অস্ট্রেলিয়ায় দেশান্তরী হবার পূর্ব-সূত্র ধরে আমরা যদি আধুনিক মানুষের প্রথম আগমনকে সাজাই, তবে এটা স্বীকার করতেই হবে যে, ভারতবর্ষের সীমান্তরেখায় যে আধুনিক মানুষ পৌঁছেছিল তার পিঠওলা ছুরি শিল্পকৌশল অধিকারী ছিল না, কেননা তারা তো অস্ট্রেলিয়া থেকে সেগুলি নিয়ে আসতে পারেনি। পাকিস্তানের সোয়ান অববাহিকার মধ্য প্রাচীন প্রস্তর-যুগ সংস্কৃতির (৬০০০০ থেকে ২০০০০ বছর আগে) যে আধুনিক মানুষ তার কীর্তির মধ্যে ছুরি উপস্থিত ছিল না। এই সংস্কৃতির বিশেষ বিশেষ অঞ্চলে, বিশেষত রোহারি পার্বত্য অঞ্চলে হাতিয়ার এবং অন্যান্য ভাঙাচোরা সামগ্রীর যে স্তূপ পাওয়া যায় তার থেকে যে সমাজচিত্র ফুটে ওঠে তা হল, কয়েকটি দল সমতলে, বনজঙ্গলে, সংকীর্ণ গিরিসংকটে শিকার করে বেড়াচ্ছে আর হাতিয়ার তৈরিতে বিশেষভাবে দক্ষ আরেক দল রয়েছে বিভিন্ন অঞ্চলে যেখানকার পাথরখাদান থেকে অনেক ভালো ভালো, উপযোগী পাথর তোলা যায় সেখানকার 'কারখানা'তে। ইরফান হাবিবের মতে, এর থেকে অনুমান করা যায়, একটা মোটা দাগের শ্রমবিভাজন আর বিনিময় প্রথা তখনই চালু হয়ে গিয়েছিল।

প্রচলিত পর্যায়ক্রমে, যেখানে উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগের পিঠওলা ছুরি শিল্প আর মাইক্রোলিথ এ রয়েছে মধ্য প্রস্তর যুগের চিহ্ন, দক্ষিণ এশিয়ার ক্ষেত্রে সেটা কেমন ঝাপসা ধোয়াটে লাগে, কেননা এমন কোন পরিষ্কার স্তরবিভাজনে সেখানকার পর্যায়ক্রমটি প্রতিষ্ঠিত নয়। শ্রীলংকার মাইক্রোলিথ বা ছোট ছোট পাথরের হাতিয়ার যেসময় প্রথম দেখা গেল, সেই ৩৪০০০ বছর আগেও সেখানে কোথাও উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগের কোনো এলাকা দেখতে পাওয়া যায়। কিন্তু যুক্তির বিচারে এই দুই করণকৌশলের ক্রমপর্যায় এত সুস্পষ্ট যে, আগে হাতিয়ার তৈরি করার যন্ত্র পিঠওলা ছুরির ব্যবহার না করেই ছোট ছোট পাথরের সামগ্রী তৈরি করে ফেলার কল্পনা করা খুবই আশ্চর্যের। কাজেই ভারতবর্ষে এখন যত প্রাচীন পিঠওলা ছুরির সম্ভার পাওয়া গেছে, আরো বেশি বেশি অনুসন্ধান করলে তার চেয়ে অনেক পুরনো কালের এইরকম সামগ্রীর সন্ধান পাওয়া যাবে এমন কথা নিশ্চয়ই আমরা ভাবতে পারি।

অন্ধ্রপ্রদেশের চিতোর জেলার রেনিগুন্টাতে যে উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগের অঞ্চল কিংবা কর্নাটকের শোরাপুর দোয়াবে অবস্থিত অঞ্চল কিংবা রাজস্থানের বুদ্ধপুষ্কর থেকে পাওয়া পিঠওলা ছুরির ফলা- এসব কিছুর সঙ্গে সেই অনেক পুরনো সময়ের একটা যোগ নিশ্চয়ই ছিল। কিন্তু তাদের প্রকৃত বয়স যে কি সে বিষয়ে এখন খুব সামান্য কিছুই বলা যায়। মধ্য ভারতে, আমরা পেয়েছি উচ্চ প্রাচীন প্রস্তর যুগের দুটি প্রধান এলাকা- বাঘোর-১- এর ২৫০০০ থেকে ১৫০০০ বছর আগের সংস্কৃতি আর বেলান উপত্যাকার ১৮০০০ থেকে ১৬০০০ বছর আগের সংস্কৃতি। বাঘোর-১ বিশেষভাবে তাৎপর্যপূর্ণ একটা অঞ্চল; শোন উপত্যকার একেবারে মাঝখানে তার অবস্থান; এ এমন এক অঞ্চল যেখানে পাথরের হাতিয়ার, যার মধ্যে রয়েছে পিঠওলা ছুরির ফলা, বিষমভূজ ত্রিভুজ, তুরপুন, এসব বিপুল পরিমাণে তৈরি হতো। সেখানে যেহেতু মাটির ওপরে বালিপাথরের একটা আলগা চাতালের মতো আছে যার কেন্দ্রে নানা রঙের আভাসে উদ্ভাসিত একখণ্ড লৌহময় (ferruginous) বালিপাথর, দেখতে যেন এক দেবমূর্তি, তাই সে অঞ্চলে ছড়িয়ে পড়ছে কত সংস্কার (এ বুঝি মানুষের এক বিশেষ গুণ!)।

আধুনিক মানব গোষ্ঠী একইসঙ্গে মায়ানমারের দিক থেকেও পূর্ব ভারতে দেশান্তরী হতে পারে এমন সম্ভাবনা রয়েছে। শিলীভূত গাছে তৈরি হস্তশিল্পকৃতি, তার মধ্যে পিঠওলা ছুরির ফলাও রয়েছে, প্রায় ১১০০০

থেকে ৪৫০০ বছর আগেকার এসব সামগ্রী পাওয়া গেছে ত্রিপুরায়, পূর্ব বাংলাদেশে। পরবর্তী দশায় এটি মায়ানমার এর উচ্চ ইরাবতী উপত্যকার তথাকথিত প্রাচীন প্রস্তর যুগের (আন্নাথিয়ান) শিল্পের সঙ্গে যুক্ত হয়।

ভারতবর্ষে আগমনকালে এই নতুন প্রজাতি কি অন্য মানব প্রজাতির সদস্যদের সঙ্গে সংঘর্ষে লিপ্ত হয়েছিল? যুক্তির সপেক্ষ অনেক প্রমাণ আছে। যে লেভালোইস মাউস্টোরিয়ান হাতিয়ায়ের (পাথর এর মূল অংশটি দেওয়া কিংবা আকাঙ্ক্ষিত আকার দিতে পারে এমন যন্ত্র তৈরি করা) সঙ্গে নিয়েনডারথলদের যোগাযোগ সেগুলো পাওয়া গেছে আফগানিস্তানের দারা-ই-কুর (৫০০০০ বছর আগের) এবং কারা কামারে (৩০০০০ বছর আগের) আর পাকিস্তানের সাঙ্ঘাও গুহাতে উজবেকিস্তানের টেসিক টাস যেখানে নিয়েনডারথল-করোটি পাওয়া গেছে সেখান থেকে ওই জায়গা গুলো বেশি দূরে নয়। একটা করোটি পাওয়া গেছে দারা-ই-কুরে; সে 'খানিকটা' নিয়েনডারথল জনসমষ্টির একজন সদস্য হলেও হতে পারে। মহারাষ্ট্রের মুলাবাধ (৩১০০০ বছর আগের), গুজরাটের বরদিয়া (১৫০০ বছর আগের) আর ভারতবর্ষের অন্যান্য অঞ্চলে পাওয়া একই রকমের মাউস্টোরিয়ান হাতিয়ার যদি নিয়েনডারথলেরর হাতের কাজ না হয়, তবে উত্তর-পশ্চিমের এই মানুষদের কাছ থেকে আধুনিক মানুষ সেই কৌশল শিখে ছিল এবং সেটা ভারতবর্ষে এনেছিল, এমন হতে পারে। যদি তাই হয়, তবে নিয়েনডারথলদের সঙ্গে অবশ্যই অন্তরপ্রজনন ঘটেছিল তাদের, যেমন হয়েছিল পশ্চিম এশিয়ায়, সেখানের কাল মধ্যবর্তী হাড়ের কাঠামো গঠন বিচার করে তা বোঝা যায়। এই একই রকম অন্তরপ্রজনন ঘটেছিল আধুনিক মানুষ আর টিকে থাকা হোমো ইরেকটাস গোষ্ঠীর মধ্যে, আর আবারও তা ঘটেছিল ইন্দোনেশিয়ার জাভায়, Ngandang-এ ৫৩০০০ থেকে ২৭০০০ বছর আগে। এখন উত্তর-পশ্চিম শ্রীলংকার উপকূলবর্তী একটু কম পুরনো মধ্য প্রাচীন প্রস্তর যুগের স্রষ্টা(৭৪০০০-২৮০০০ বছর আগে) যদি হয় পরের দিকের হেমো ইরেকটাস; আর অন্যদিকে কঙ্কালের ভগ্নাবশেষ থেকে যেমন আমরা জানি সেই মতো দক্ষিণ শ্রীলঙ্কায় ৩৪০০০ বছর আগে যে মানুষ ছোট ছোট পাথরের হাতিয়ার তৈরি করত, নির্ভুলভাবে সে যদি হয় আধুনিক মানুষ তবে তো শ্রীলংকার ক্ষেত্রেও একই রকম ঘটেছিল এমন কথাই ভাবতে হবে (কিন্তু শ্রীলঙ্কায় যদি ৬০০০০ বছর আগে আধুনিক মানুষ পৌঁছেই গিয়ে থাকে তবে অন্যান্য সংস্কৃতিরও স্রষ্টা হতে পারত)। সেক্ষেত্রে প্রতিদ্বন্দ্বী প্রজাতিগুলিকে নির্বিচারে হত্যা করা হয়েছিল একথা মেনে নিতে হবে, মেনে নিতে যে, যারা শ্রেষ্ঠ তারা বাধাদানে অসমর্থ অন্যদের হত্যা করেছিল। এইভাবে শরীর-গঠনে আধুনিক মানুষ নিজেদের সঙ্গে মিলিয়ে নিয়ে এবং সরিয়ে দিয়ে দুভাবেই কেবল ভারতবর্ষ থেকে নয় সারা পৃথিবী থেকে পুরনো মানব প্রজাতিকে একেবারে চিরতরে নিশ্চিহ্ন করে দিয়েছিল।

অন্যান্য প্রজাতির সঙ্গে আমাদের যদি অন্তরপ্রজনন ঘটেই থাকে তবে সেই প্রাচীনতর প্রজাতি আমাদের মধ্যে তার বৈশিষ্ট্যর কোনো ছাপ যে রেখে গেল না এই প্রশ্ন অনেক বিতর্ককে উস্কে দিয়েছে। পূর্ব এশিয়ার বর্তমানের মঙ্গেলীয় আর অস্ট্রেলিয়ার অস্ট্রেলয়েডদের মধ্যে স্থানীয় হোমো ইরেকটাস কিছু কিছু অপ্রধান শারীরিক বৈশিষ্ট্য এখনো টিকে আছে বলে বিশ্বাস করা হয়। কিন্তু তাদের এই ক্ষুদ্র 'জাতিগত' পার্থক্য, আর পৃথিবীর অন্যান্য অংশের মানুষের থেকে অস্ট্রেলীয় এবং আমেরিন্ডিয়ান জনসমষ্টির বিচ্ছিন্নতা সত্ত্বেও, বর্তমানের মানবজাতি জৈবিকভাবে অত্যন্ত সমজাতীয় এক প্রজাতি। পশ্চিম ইউরোপের একেবারে পাশাপাশি বাস করত আধুনিক মানুষ আর নিয়েনডারথলরা; সে তো খুব বেশি দিনের কথা নয়, ১০০০০ বছর আগে পরে। অথচ নিয়েনডারথলের সাম্প্রতিক জিন-নিষ্কাশন থেকে ইউরোপের জিন ভাণ্ডারে নিয়েনডারথলের কোন বিশিষ্ট অবদান রয়েছে এমন কোনো খবর প্রকাশিত হয়নি। এর থেকে নিশ্চিত ভাবে একটা অনুমানই করা যায় যে,

অপরাপর প্রজাতির সঙ্গে সংযোগ-এর সময়কালে, আধুনিক মানুষের জনসংখ্যা গুনতিতে এত বিপুল হয়ে গিয়েছিল যে, অন্য কোন কম জনসংখ্যার জাতি বা প্রজাতির থেকে আসা জিন প্রবাহ খুব তাড়াতাড়ি তার তাৎপর্য হারিয়ে একেবারে অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল।

৫.৭ উপসংহার

মানব প্রজাতির বিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের তৈরি প্রস্তরায়ুধ নির্মাণকৌশলেরও একটা ব্যাপক পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। এই প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের কোন শৈল্পিক দিক ছিল কী? এই প্রশ্নের উত্তর অনুসন্ধানের মধ্যে দিয়েই এই আলোচনায় ইতি টানা যায়। পুরাপ্রস্তর পর্ব বিশেষত উচ্চ পুরাপ্রস্তর পর্বের ইউরোপীয় শিল্পকলার কথা বহুবিদিত। কিছুদিন আগে পর্যন্তও এই ধারণা ছিল যে ভারতবর্ষে পুরাপ্রস্তরযুগীয় শিল্প নিদর্শন নেই। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় এই ধারণায় একটা পরিবর্তন লক্ষ করা যাচ্ছে। পণ্ডিতদের মতে, সবচেয়ে পুরনো যে নিদর্শন তা ভীমবেটকার একটি গুহাশ্রয় (৩ এফ ২৪) থেকে পাওয়া গেছে। এখানে পাথরের দেওয়ালে ১৬.৮ মিলিমিটার গভীর ৭ টি বাটির মতো গর্ত আছে। অনুমান করা হয়েছে যে এই গর্তগুলি পুরাপ্রস্তর যুগের নিম্ন থেকে মধ্য পর্যায়ে উত্তরণের সময় করা হয়েছিল। এই গুহাশ্রয়েই চ্যালসেডোনি নামক চিকন এক পাথরের একটি ছোট ছিদ্রযুক্ত চাকতি পাওয়া গেছে। মধ্যপ্রদেশ ও রাজস্থানেও বিক্ষিপ্ত আরো কিছু নিদর্শন মিলেছে। স্বল্প হলেও পুরাপ্রস্তরযুগীয় প্রস্তরায়ুধ নির্মাণ কৌশলের নিত্যনতুন পরিবর্তনের সাথে মিলিয়ে দেখলে বলা যায় সেইসময়কার মানুষের একটা মনোজগৎ নিশ্চিতরূপে ছিল। ভারতীয় শিল্পের ইতিহাসেও যা নিজস্বতার দাবি রাখে।

৫.৮ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. মানবপ্রজাতির বিবর্তনের সাথে তাল মিলিয়ে পুরাপ্রস্তর পর্বের প্রস্তরায়ুধ নির্মাণ কৌশলে কিরূপ পরিবর্তন দেখা যায়?

২.বিভিন্ন রকম প্রস্তরায়ুধ নির্মাণ কৌশলের তুলনামূলক আলোচনা করো।

৩. ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে পুরাপ্রস্তরায়ুধ নির্মাণ প্রযুক্তির একটি সংক্ষিপ্ত বর্ণনা দাও।

৪. টীকা লেখোঃ লেভোলিস শিল্পকৌশল ও আকিউলিয়ান শিল্পকৌশল।

৫.৯ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

রণবীর চক্রবর্তী, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব(প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৯।

ইরফান হাবিব, প্রাক-ইতিহাস, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০২।

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ), প্রথম খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

Upinder Singh– A History of Ancient and Early Medieval India– Pearson– 2009.

R.S. Sharma– India's Ancient Past– OUP– New Delhi– 2005.

Raymond Allchin and Bridget Allchin– The Rise of Civilization in India and Pakistan– CUP– 1982.

একক ৬ ◘ মধ্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি — আঞ্চলিক এবং কালানুক্রমিক বিস্তৃতি (Mesolithic cultures-regional and chronological distribution)

গঠন

৬.০ উদ্দেশ্য

৬.১ সূচনা

৬.২ মধ্যপ্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য

৬.৩ কালরেখা

৬.৪ ভৌগোলিক বিস্তৃতি

৬.৫ উপসংহার

৬.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৬.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

৬.০ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠের উদ্দেশ্য হল মধ্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতির আঞ্চলিক ও কালানুক্রমিক বিস্তার কে অনুধাবন করা।
- এই সংস্কৃতির তিনটি মৌলিক দিক বিশ্লেষণ করা-
  - ➢ মধ্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতির বৈশিষ্ট্য
  - ➢ কালরেখা
  - ➢ ভৌগোলিক বিস্তৃতি

৬.১ সূচনা

পুরাপ্রস্তর যুগের অবসানের পর নব্যপ্রস্তর যুগে উত্তরণের মধ্যবর্তী পর্যায়টি মধ্যপ্রস্তর যুগ বা 'Mesolithic age' নামে পরিচিত। তুষার যুগের অবসানের পর পৃথিবীর প্রাকৃতিক পরিবেশে এক ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে যায়। তুষার গলে যাওয়ায় সমুদ্রপৃষ্ঠের উচ্চতার তারতম্য ঘটে। কোথাও সৃষ্টি হয় গভীর অরণ্য আবার কোথাও অতি শুষ্ক আবহাওয়ার ফলে গড়ে ওঠে মরুভূমি। এই আবহাওয়ার পরিবর্তনের সঙ্গে তাল মিলিয়ে চলতে না পেরে পুরাপ্রস্তরযুগীয় অনেক উদ্ভিত ও প্রাণী বিলুপ্ত হয়ে যায়। যারা প্রকৃতির সঙ্গে লড়াইতে জয়লাভ করতে

পারে সেইসব মানুষরা তুষার যুগোত্তর পর্যায়ে এক নতুন সংস্কৃতির জন্ম দেয়। পুরাতন এই সংস্কৃতিই 'মধ্যপ্রস্তর সংস্কৃতি' (Mesolithic Culture) নামে পরিচিত।

৬.২ মধ্যপ্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য

মধ্যপ্রস্তর যুগের কয়েকটি সাধারণ বৈশিষ্ট্যকে পণ্ডিতরা চিহ্নিত করে থাকেন, এগুলি হল

প্রথমত, এই যুগের মূল পরিচায়ক হল ১ থেকে ৩ সেন্টিমিটার লম্বা সূক্ষ্মদানা পাথরের তৈরি হাতিয়ারের ব্যাপক ব্যবহার। এর ব্যতিক্রমও অবশ্য দেখা যায়, তবে ছোট ছোট হাতিয়ারের ব্যাপক ব্যবহারই হচ্ছে এই যুগের মূল পরিচায়ক। তাই মধ্যপ্রস্তর যুগকে 'ক্ষুদ্রাশ্মীয় যুগ'-ও বলা হয়ে থাকে। 'Microlith' কথার অর্থ 'ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ'। প্রত্নতাত্ত্বিক যুগবিভাগের দ্বিতীয় তথা মধ্যপ্রস্তর পর্বে আবহাওয়ার গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সাথে সাথে মানুষের ব্যবহার্য প্রস্তর আয়ুধ নির্মাণেও উন্নততর প্রযুক্তির প্রয়োগ লক্ষ করা যায়, যার অবশ্যম্ভাবী পরিণতি হল ক্ষুদ্রাকৃতির প্রস্তর আয়ুধ, প্রত্নতাত্ত্বিক পরিভাষায় যা 'মাইক্রোলিথ' নামেই পরিচিত। মধ্যপ্রস্তর যুগেই এই ছোটো ছোটো হাতিয়ারের ব্যবহারের প্রাচুর্য লক্ষ করা যায়, যার ভিত্তিতে মধ্যপ্রস্তর পর্বকে ক্ষুদ্রপ্রস্তর যুগ বা ক্ষুদ্রাশ্মীয় পর্ব-ও বলা হয়ে থাকে। মাইক্রোলিথ হাতিয়ারগুলির আকৃতি নিঃসন্দেহেই পূর্ববর্তী প্রস্তরের হাতিয়ারগুলির তুলনায় অনেক ক্ষুদ্র। বেশিরভাগ মাইক্রোলিথের দৈর্ঘ্য ১ থেকে ৩ সেন্টিমিটার। তবে কোনো কোনো ক্ষেত্রে অবশ্য হাতিয়ারগুলি ৮ সেন্টিমিটার পর্যন্তও লম্বা। দিলীপকুমার চক্রবর্তীর মতে, মাইক্রোলিথগুলির একটি বড়ো বৈশিষ্ট্য হল যে, তার একটা বড়ো অংশ ছোটো ছোটো লম্বাটে চিলকা (ব্লেডলেট) থেকে বের করা হয়েছে। বর্তুলাকার ছোটো প্রস্তরখণ্ড থেকে এরকম চিলকা ছাড়ানো হয়েছে। এই আয়ুধগুলি অনেকক্ষেত্রেই একের পর এক কোনো কিছু হাতলের গায়ে আটকে করাত, ছুরি ইত্যাদি কাজে ব্যবহার করা হত। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া গেছে নানা প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধানে। কোয়ার্টজাইটের পরিবর্তে 'চ্যালসেডান' এবং 'সিলিকা'-র বিভিন্ন শ্রেণির পাথর দিয়ে এই ক্ষুদ্রাকৃতির হাতিয়ারগুলি তৈরি করা হত। যেমনফ্লেক নির্মিত বিভিন্ন ধরনের ব্লেড, ক্র্যাপার, শল্য, বাটালি, মাইক্রোলিথিক হাতিয়ারগুলির একটি গুরুত্বপূর্ণ তাৎপর্য হল যে, বহুক্ষেত্রেই এই হাতিয়ারগুলি এত ক্ষুদ্র যে কোনো দণ্ড জাতীয় বস্তুর সাথে তাদের জুড়ে বা গেঁথে নিতে হত। সেদিক থেকে বিচার করলে এইগুলি 'মিশ্র আয়ুধ' বা 'Composite tool'।

ইরফান হাবিব তাঁর 'Pre-History'-তে দেখিয়েছেন যে, মাইক্রোলিথ ব্যবহারের প্রাচীনতম নজির রয়েছে দক্ষিণ এশিয়ার শ্রীলঙ্কার ফাহিয়েন গুহায়, যেখান থেকে আবিষ্কৃত আয়ুধগুলি আজ থেকে ৩৪,০০০ বছরের পুরনো। আর শ্রীলঙ্কার বাটাডোমবালেনাতে প্রাপ্ত জ্যামিতিক মাইক্রোলিথ ২৮,০০০ বছর আগেকার। এছাড়া ভারতের মহারাষ্ট্রের চালিসগাঁও-এর নিকটস্থ পাটন থেকে প্রাপ্ত ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধগুলি ২৪,০০০ বছর আগেকার। এছাড়া ভারতের প্রায় সর্বত্রই যেমনবিহার, উত্তরপ্রদেশ, পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, গুজরাট, অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু, কর্ণাটক প্রভৃতি অঞ্চলেও ক্ষুদ্রাশ্মীয় আয়ুধ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া গেছে। এর মধ্যে পশ্চিমবঙ্গের মেদিনীপুরের উচ্চাংশে এর সংখ্যা অগুনতি। মানবসংস্কৃতির প্রযুক্তিগত অগ্রগতির এক উৎকৃষ্ট সাক্ষ্য বহন করছে মাইক্রোলিথগুলি এবং পুরাপ্রস্তর পর্বের তুলনায় মধ্যপ্রস্তর পর্বে যে 'খাদ্য সংগ্রহের ধারা' ও রীতি যে আরো বিকশিত হয়েছিল তারও জানান দিচ্ছে প্রাগৈতিহাসিক পর্বের এই মাইক্রোলিথগুলি।

দ্বিতীয়ত, ভূতাত্ত্বিক কালবিচারে মধ্যপ্রস্তর যুগ আধুনিক যুগের, অর্থাৎ 'হলোসিন' পর্বের। যা প্লাইস্টোসিন যুগের পরবর্তী কালপর্ব। তবে, এক্ষেত্রে মনে রাখা দরকার যে, উচ্চ পুরাপ্রস্তর যুগেই সেই সময়ে হাতিয়ারের সঙ্গে ছোট ছোট হাতিয়ারও তৈরি হতএমন উদাহরণও বিভিন্ন স্থান থেকে পাওয়া গেছে।

তৃতীয়ত, সাংস্কৃতিক স্তর-পরম্পরা বিচারে মধ্যপ্রস্তর যুগের স্থান উচ্চ পুরাপ্রস্তর যুগ ও খাদ্য উৎপাদনকারী সংস্কৃতির মাঝখানে। তবে এ-কথা মনে রাখতে হবে যে, এই স্তরগুলির মাঝে বিভাজন রেখাগুলি খুব জোরালো নয়, বহু ক্ষেত্রেই একে অন্যের মাঝে মিলে গেছে।

৬.৩ কালরেখা

মধ্যপ্রস্তর যুগের সঠিক কালরেখা নিয়ে অনেক বিভ্রান্তি এবং মতানৈক্য দেখা যায়। সাধারণত এই যুগের তারিখ নির্ণয়ে রেডিও কার্বন পদ্ধতির প্রয়োগ বেশি হয়েছে। কিন্তু একই ধরনের বিভিন্ন ক্ষেত্র থেকে প্রাপ্ত তারিখে বিভিন্নতা থাকায় বিভ্রান্তির সৃষ্টি হয়েছে। এই মতানৈক্য ও বিভ্রান্তি সত্ত্বেও যেটুকু জানা গেছে তার ভিত্তিতে বলা যায় ভারতে এই যুগের সূত্রপাত হয়েছে 'হলোসিন' বা 'আধুনিক' যুগের গোড়ার দিকে। আর সাধারণভাবে এটা মনে করা হয় যে, ১০,০০০ বছর আগে ভূতাত্বিক আধুনিক যুগ শুরু হয়েছিল এবং তখন থেকে আবহাওয়ার মৌলিক কিছু পরিবর্তন ঘটেনি। যাই হোক, বৈজ্ঞানিক অগ্রগতি সত্ত্বেও কালের পরিমাপ, সব সময় সোজা পথে হবে এমন ভাবাটা ঠিক নয়। সব মিলিয়ে বিচার করে দেখাই শ্রেয়। উত্তরপ্রদেশের বেলান উপত্যকায় 'কঙ্করস্তর নম্বর ৪' বলে একটি কঙ্করস্তর দেখা যায়। এই স্তরে ওই অঞ্চলের প্রাগৈতিহাসিক স্তর-পরম্পরায় মধ্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার প্রায়ই মেলে। মহাগরা নামক স্থানে এই ৪ নং স্তরেই ৫টি তারিখ আছে, খ্রীষ্টপূর্ব ১১/১২ হাজার থেকে ৮/৯ হাজার বছরের ভেতর। এর ভিত্তিতেই প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান ভারতবর্ষে মধ্যপ্রস্তর যুগ ভূতাত্বিক 'হলোসিন' যুগের গোড়াতেই শুরু হয়েছিল। তবে এই প্রত্যক্ষ তারিখের পাশাপাশি কিছু অপ্রত্যক্ষ তারিখও আছে। অন্যদিকে এই অঞ্চলেই উত্তরপ্রদেশের সবাই নাহার রাইতে দুটি তারিখের ভেতর একটি ৮৩৯৫+/- ১১০ খ্রীষ্টপূর্ব, আর অন্যটি ৯৯০+/- ১২৫ খ্রীষ্টপূর্ব। আঞ্চলিক পরিপ্রেক্ষিতে প্রথম তারিখটিই বেশি গ্রহণযোগ্য। রাজস্থানের ভিলওয়া জেলার বাগোর গ্রামে মধ্যপ্রস্তর যুগীয় সংস্কৃতির প্রথম পর্যায়ের তারিখ হচ্ছে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ থেকে চতুর্থ সহস্রাব্দের ভেতর। মধ্যপ্রদেশের হোসংগাবাদের কাছে আদমগড়ে দুটি তারিখের ভেতর একটি খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম সহস্রাব্দ ছুঁয়ে, আর অন্যটি মাত্র ১০০০ খ্রীষ্টপূর্ব ছুঁয়ে। মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকা থেকেও বেশ কিছু তারিখ মিলেছে। তবে এর বেশিরভাগটাই এলোমেলো। খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম ও পঞ্চম সহস্রাব্দ নিয়ে দুটি তারিখ আছে। আর একটি প্রাচীন তারিখ পাওয়া গেছে বিহারের পৈসরা থেকেখ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম সহস্রাব্দে। এছাড়া মধ্যপ্রদেশের শোন উপত্যকায় বাঘোর গ্রামের ২ নং প্রত্নতাত্বিক অঞ্চলে এই পর্যায়ের তারিখ খ্রীষ্টপূর্ব অষ্টম সহস্রাব্দ। সব মিলিয়ে বিক্ষিপ্ত কিছু তারিখ সত্ত্বেও এ-কথা অস্বীকার করা কঠিন যে, মধ্যপ্রস্তর যুগের সূত্রপাত ভারতবর্ষে যথা সময়েই হয়েছিল। বস্তুত, আমরা যেখানে মধ্যপ্রস্তর যুগের সাক্ষ্য পুরো প্রাগৈতিহাসিক পরম্পরা পাই সেখানে এই যুগের তারিখ প্রাচীন না হওয়ার কোনও কারণ নেই। যেমনপশ্চিমবঙ্গে পুরাপ্রস্তর যুগ শেষ হওয়ার পরপরই মধ্যপ্রস্তর যুগের নিদর্শন পাওয়া যায়। তাই, এই অঞ্চল থেকে প্রত্যক্ষ তারিখ না থাকলে মধ্যপ্রস্তর যুগের সময় এখানে কম হতে পারে না। দক্ষিণ ভারতে তিউতিকোরিন অঞ্চলে যে মধ্যপ্রস্তরযুগীয় নিদর্শন আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে, সময়ের বিচারে তাও যথেষ্ট প্রাচীন, কারণ, ওইখানে এই যুগের চিহ্ন প্রাচীন সামুদ্রিক তটরেখার সঙ্গে জড়িত। অন্যমতে, এটি প্লাইসটোমিন যুগের শেষ পর্যায়েও হতে পারে।

মধ্যপ্রস্তর যুগের কালসীমা ও এই পর্বের নিদর্শন নিয়ে যে সমস্যায় প্রত্নতাত্ত্বিকদের প্রায়ই পড়তে হয়, তা হল এই যে, প্রাপ্ত সব নিদর্শন প্রাচীন নয়। এবং শুধুমাত্র আয়ুধ বা হাতিয়ারের ভিত্তিতে প্রাচীন, অপ্রাচীন তফাত করা যায় না। ক্ষুদ্রপ্রস্তর জাতীয় হাতিয়ার লৌহযুগের শুরুতেও ব্যবহৃত হত। শুধু তাই নয়, আন্দামান দ্বীপপুঞ্জে ঊনবিংশ শতাব্দী পর্যন্ত উপজাতীয়রা জাহাজ ডুবি থেকে পাওয়া কাচের বোতল ভেঙে 'মাইক্রোলিথ' বা ক্ষুদ্রপ্রস্তরযুগীয় হাতিয়ারের মতো জিনিস বানাতেন তার প্রত্যক্ষ বিবরণ আছে। আবার অনেক প্রত্নতাত্ত্বিক স্তর থেকে ক্ষুদ্রপ্রস্তরযুগীয় হাতিয়ারের অনেক পরবর্তী তারিখও পাওয়া গেছে। সুতরাং, এ-কথা অবশ্যই মনে রাখা দরকার যে, ভারতবর্ষে মধ্যপ্রস্তর যুগের নিদর্শন একদিকে যেমন সুপ্রাচীন, অন্যদিকে সেই যুগের হাতিয়ারের মতো হাতিয়ার বহু পরবর্তী সময়েও পাওয়া যেতে পারে। শুধু মাটির ওপর ছড়িয়ে থাকা 'মাইক্রোলিথ' দেখে সেই 'মাইক্রোলিথ' সত্যিসত্যিই মধ্যপ্রস্তর যুগের, এ-কথা বলা প্রায়ক্ষেত্রেই অসম্ভব। মধ্যপ্রস্তর সংস্কৃতির কালরেখা নির্ণয়েও সে-কথা মনে রাখা জরুরি।

৬.৪ ভৌগোলিক বিস্তৃতি

পুরাপ্রস্তর পর্বের তুলনায় মধ্যপ্রস্তর সংস্কৃতির নিদর্শনের ভৌগোলিক ব্যাপ্তি একটু বেশি, তবে হিমালয় পাদদেশের যে সমস্ত অঞ্চলে পুরাপ্রস্তরযুগীয় নিদর্শন আছে সেখানে সর্বত্রই হয়তো মধ্যপ্রস্তরযুগীয় নিদর্শন পাওয়া যায়নি। অবশ্য, 'অন্তরীপ' অঞ্চলে এর নিদর্শন ব্যাপক এবং সংখ্যায় পুরাপ্রস্তরযুগীয় নিদর্শনের চেয়ে অনেক বেশি। 'অন্তরীপ' অঞ্চল ছাড়াও গাঙ্গেয় পাললিক ভূমিতেও এই যুগের সাক্ষ্য পাওয়া গেছে। পাললিক ভূমিতে সাক্ষ্য এখনও ব্যাপক নয়। তবে ভবিষ্যতে আরো আবিষ্কৃত হবে বলে আশা করা যায়। ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন রাজ্যগুলির গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নকেন্দ্রগুলির উল্লেখ এ প্রসঙ্গে বাঞ্ছনীয় হবে, এবং এর পরিপ্রেক্ষিতেই স্বাভাবিকভাবে মধ্যপ্রস্তর সংস্কৃতির ভৌগোলিক ব্যাপ্তিও বোঝা যাবে।

পাঞ্জাবে মধ্যপ্রস্তর যুগের উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হল পেশোয়ারের নিকটস্থ সাংঘাও। রাজাস্থানে বিশেষভাবে লুনি উপত্যকায় এবং অন্যত্র যথাউদয়পুর, চিতোর, ভিলওয়ারা, আজমের, টংক, জয়পুর ও ঝালরপাটন জেলা থেকে এই পর্বের নিদর্শন মিলেছে। তবে নিঃসন্দেহে এই রাজ্যে মধ্যপ্রস্তর যুগের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র হল পূর্ব রাজস্থানের বানাস নদীর উপনদী কোঠারির তীরবর্তী বাগোর। গুজরাটের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নকেন্দ্র হল, আমেদাবাদের ৬০ কিমি. দূরে লাংঘানজ। এছাড়াও, ভাদর নদীর তীরবর্তী রোজদি ও জেটপুরেও এই পর্যায়ে প্রত্নকেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের রাইসেন জেলা ভীমবেটকার কথাও এ-প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যায়। এছাড়াও, নর্মদা উপত্যকার দোঙ্গের গাও ও চোলি এবং ইন্দোরের নিকটস্থ রাউ নামক স্থানে ও অন্যত্র যেমন, হোসঙ্গাবাদ, নরসিংহপুর, মহেশ্বর ও শিহোরা ক্ষুদ্রপ্রস্তর তথা মধ্যাশ্মীয় যুগের বহু নিদর্শনের সন্ধান পাওয়া গেছে। উত্তরপ্রদেশের এই পর্বের গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নকেন্দ্রগুলি হল—সরাই নাহার রাই, মহাদহা, চোপানিমানডো, প্রতাপগড় প্রভৃতি। বিহারে উল্লেখযোগ্য কেন্দ্র হল পৈসরা। এছাড়া পাটনা, ভাগলপুর, মুঙ্গের, সিংভূম প্রভৃতি জেলা থেকেও মধ্যপ্রস্তর সংস্কৃতির নিদর্শন পাওয়া গেছে। পশ্চিমবঙ্গের পাললিক ভূমিতে ক্ষুদ্রপ্রস্তর পর্বের নিদর্শন এখনও সেভাবে পাওয়া না গেলেও, পশ্চিমবঙ্গের বীরভূম থেকে মেদিনীপুরের উচ্চ অংশে এর সংখ্যা অগুনতি। সাধারণত চার্ট জাতীয় পাথর এবং স্ফটিক পাথরের ব্যবহার এখানে বেশি ছিল। যেখানে স্ফটিক পাথরের ব্যবহার বেশি হয়েছে সেখানে অনেক সময় মাটিতে জুঁই ফুলের মতো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতিয়ার ছড়ানো দেখতে পাওয়া যায়। অযোধ্যা পাহাড়ের ওপর অযোধ্যাতেই এক টুকরো চষা

জমিতে পাওয়া স্ফটিক পাথরের একটি বর্তুলাকার টুকরো যেখান থেকে নিপুণভাবে লম্বা, ছোট চিলকে ছাড়ানো হয়েছে। তার কারিগরি নৈপুণ্য পশ্চিমবঙ্গের ইতিহাসে স্থান পাওয়ার যোগ্য। অধ্যাপক দিলীপকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন যে, সব সময়ে যে জঙ্গলেই 'মাইক্রোলিথ' পাওয়া যাবে তা নয়, অনেক জায়গায় জলের ধারে, আবার অনেক জায়গায় পাহাড়ের নীচের ঢালেও পাওয়া যায়। পুরুলিয়ার ঝালদার কাছে যেসব পাহাড় আছে তার প্রায় প্রত্যেকটির নীচের দিকে অনুচ্চ জায়াগায় একটু খুঁজলেই এক সময় মাইক্রোলিথ পাওয়া যেত। তবে পশ্চিমবঙ্গে মধ্যপ্রস্তর যুগের বিখ্যাত প্রত্নক্ষেত্র হল বর্ধমান জেলার দুর্গাপুর রেল স্টেশনের নিকটবর্তী দামোদর নদের তীরস্থ বীরভানপুর আর উড়িষ্যার উল্লেখযোগ প্রত্নকেন্দ্র হল ঢেনকানল জেলার হরিচন্দনপুর।

বিন্ধ্যপর্বতের দক্ষিণাংশেও মধ্যপ্রস্তর তথা ক্ষুদ্রাশ্মীয় যুগের বেশ কিছু প্রত্নকেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে। মহারাষ্ট্রে ক্ষুদ্রপ্রস্তর যুগের প্রত্নস্থল আবিষ্কৃত হয়েছে আহমেদনগর জেলার নেভাসায়, গোদাবরী উপত্যকায় সুরেগাঁও, কালেগাঁও, পুনা জেলায় ভেল নদী উপিত্যকার শিকারপুর প্রভৃতি স্থানে। অন্ধ্রপ্রদেশের ইয়েলশ্বরমের কিছুটা উপরে রামতীর্থমপায়ায়, গুন্টুর জেলায় নাগার্জুনিকোণ্ডায় এবং করিমনগরে মধ্যপ্রস্তর যুগের কয়েকটি প্রত্নকেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে। কর্ণাটক ও তামিলনাড়ুতেও আলোচ্য পর্যায়ের কিছু প্রত্নকেন্দ্রের সন্ধান পাওয়া গেছে।

ভারতবর্ষে মধ্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি গড়ে ওঠার কালে প্রাকৃতিক পরিবেশ কেমন ছিল সে বিষয়ে নিশ্চিত করে বলা শক্ত। পশ্চিম রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশে শোন আর উত্তরপ্রদেশে বেলান উপত্যকার ক্ষেত্রে অনুমান করা হয়েছে যে, 'আধুনিক' যুগের শুরুতে, বৃষ্টিপাতের মাত্রা বৃদ্ধি পেয়েছিল। অন্যদিকে পশ্চিমবঙ্গ ও বিহারের ছোটনাগপুর অধিত্যকার ক্ষেত্রে এরকম মনে করা কোনও কারণ নেই। বরং, মনে হয় যে, আবহাওয়ায় বৃষ্টিপাত কম ও শুষ্কতার মাত্রাই বেশি ছিল। দুর্গাপুরের বীরভানপুর অঞ্চলে, শান্তিনিকেতনের পারুলডাঙা অঞ্চলে পরিষ্কার দেখা যায় যে, মাইক্রোলিথ যে স্তরে আছে সেই স্তরটি বায়ুতাড়িত বালিস্তরে ঢাকা। এই বালিস্তর শুষ্কতা ছাড়া এমনভাবে জমা হতে পারে না। সব মিলিয়ে, সাময়িক আবহাওয়া ও সামগ্রিক গবেষণার প্রয়োজন অস্বীকার করা কঠিন। সাধারণভাবে এটা জেনে নেওয়াই ভালো যে গত ১০,০০০ বছরে, অর্থাৎ যখন থেকে ভূতাত্ত্বিক 'আধুনিক' যুগ শুরু হয়েছে সেই থেকে আবহাওয়া তেমন একটা পাল্টায় নি।

৬.৫ উপসংহার

পুরাপ্রস্তর পর্বের তুলনায় সাংস্কৃতিক সাক্ষ্য, মানুষের জীবন নির্বাহ এবং থাকার সাক্ষ্য মধ্যপ্রস্তরযুগে অনেক বেশি। তবুও সমস্ত ভারতের দৃষ্টিকোণ থেকে বিচার করলে বলা যায় মাত্র অল্প কয়েকটি অঞ্চল থেকেই নির্ভরযোগ্য সাক্ষ্য মিলেছে। পুরো পশ্চিমবঙ্গের কথা ধরলেই বলা যায় শুধু হাতিয়ারের সংখ্যা গোনা আর মাপজোক করা ছাড়া আর কিছু হয় নি। তবে রাজস্থানের বাগোর, মধ্যপ্রদেশের বাঘোরে মধ্যপ্রস্তর সংস্কৃতির জীবনধারার স্পষ্ট ছবি মেলে। অন্যদিকে মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকা ও প্রান্তবর্তী বিন্ধ্য-ঘেঁষা বেলান উপত্যকা থেকে ক্ষুদ্রপ্রস্তর সংস্কৃতির যে বিস্তৃত সাক্ষ্যের আলোচনা করা হয়েছে তা থেকে সহজেই বোঝা যায় গাঙ্গেয় সংস্কৃতির পেছনে মধ্যপ্রস্তর যুগের অবদান যথেষ্ট। তবে এই বিষয়ে সুসংসহত গবেষণা প্রয়োজন।

৬.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. মধ্যপ্রস্তর যুগ বলতে কী বোঝ? এই যুগের সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি উল্লেখ করো।

২. মাইক্রোলিথ' সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত টীকা লেখো।

৩. ভারতীয় উপমহাদেশে মধ্যপ্রস্তর সংস্কৃতির কালসীমা নির্ধারণ করো।

৪. ভারতীয় উপমহাদেশে মধ্যপ্রস্তর সংস্কৃতির ভৌগোলিক বিস্তার সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখো।

৬.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

রণবীর চক্রবর্তী, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব (প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৯।

ইরফান হাবিব, প্রাক-ইতিহাস, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০২।

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ), প্রথম খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

Upinder Singh– A History of Ancient and Early Medieval India– Pearson– 2009.

R.S. Sharma– India's Ancient Past– OUP– New Delhi– 2005.

Raymond Allchin and Bridget Allchin– The Rise of Civilization in India and Pakistan– CUP– 1982.

একক ৭ ◘ প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা; গুহাচিত্র ও শিল্পকলা (New Developments in Technology and Economy— Rock Art)

গঠন

৭.০ উদ্দেশ্য

৭.১ সূচনা

৭.২ প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

৭.৩ গুহাচিত্র ও শিল্পকলা

৭.৪ উপসংহার

৭.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৭.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

৭.০ উদ্দেশ্য

- এই এককটি পাঠের উদ্দেশ্য হল মধ্যপ্রস্তর যুগে প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বিকাশ বোঝা।
- এই কালপর্বে গুহাচিত্র ও শিল্পকলার বিকাশ অনুধাবন করা।

৭.১ সূচনা

মানব সভ্যতার ইতিহাসে মধ্যপ্রস্তর যুগ দ্বিবিধ কারণে গুরুত্বপূর্ণ। একদিকে প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি, অন্যদিকে নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থার প্রসারের মধ্য দিয়ে এই যুগ স্বতন্ত্রতার দাবি রাখে। হাতিয়ার নির্মাণ কৌশলের বৈচিত্রের মাধ্যমে এই যুগের প্রযুক্তিগত মানের নিত্য নতুন উন্নতির নজির যেমন আমরা পাই, তেমনই এই পরিবর্তনের পটভূমিতেই দেখা মেলে নতুন অর্থনৈতিক পরিবেশের। তবে এর পাশাপাশি আরো একটি বিষয় উল্লেখ্য যে, এই যুগেই মানুষের সাংস্কৃতিক ও শারীরিক সাক্ষ্য অনেক বেশি পাওয়া যায়। সময়ের পরিমাপে পুরাপ্রস্তর যুগের তুলনায়, মধ্যপ্রস্তর যুগ আধুনিককালের। তাই সেই সময়ের জিনিসপত্র যে পুরাপ্রস্তরযুগীয় নিদর্শনের তুলনায় অনেক বেশি ধরনের পাওয়া যাবে তা বলাই বাহুল্য। এছাড়া এযুগের শিল্পনিদর্শন বিশেষত গুহাশ্রয়ী চিত্রের নিদর্শন ভারতে ব্যাপক। এই পর্বের মানুষের দৈনন্দিন জীবনের পরিচয় এই ধরনের চিত্রাবলী থেকেও পাওয়া যায়। তাই এটা আদৌ আশ্চর্যের নয় যে, মধ্যপ্রস্তর যুগের সামগ্রিক চিত্রের মধ্যে যে প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে, তা বর্তমান মানুষেরও অনেকটাই কাছাকাছি।

৭.২ প্রযুক্তিবিদ্যার অগ্রগতি ও নতুন অর্থনৈতিক ব্যবস্থা

পুরাপ্রস্তর যুগের তুলনায় মধ্য প্রস্তর যুগে নির্মিত হাতিয়ারের ধরনে ব্যাপক পরিবর্তন ঘটে। আয়ুধ বা হাতিয়ারগুলি ক্ষুদ্র হলেও সংখ্যাগত দিক থেকে তা ছিল অনেক বেশি। বিভিন্ন ধরনের হাতিয়ার তৈরির পিছনে নিশ্চিতভাবে কাজ করেছিল ভিন্ন ধরনের কাজের প্রেরণা। আসলে, পরিবর্তিত সমাজ ও অর্থনীতিতে নিত্য নতুন কাজের তাগিদে প্রয়োজনীয় হাতিয়ার তৈরিতে অগ্রণী হয়েছিল সেইসময়ের মানুষ। এই পর্বের প্রস্তরায়ুধগুলি তৈরি হত সাধারণত কোয়ার্টজ, চ্যালসেডনি ও চার্ট পাথরের দ্বারা। এছাড়াও, অ্যাগেট, কার্ণেলিয়ান, ও গার্নেট পাথরের ব্যবহারও মাঝে মাঝে লক্ষ্য করা যায়। এই যুগের হাতিয়ারগুলির একটা উল্লেখযোগ্য দিক হল বেশিরভাগই ছোট ছোট চিলকা বা ব্রেডলেট' থেকে তৈরি করা হয়েছে। এই সমস্ত চিলকাগুলি বের করা হয়েছে বর্তুলাকার ছোট প্রস্তরখণ্ড থেকে। প্রস্তরায়ুধের মধ্যে পূর্বতন যুগের হাত কুঠার ও কোপানির পরিবর্তে বহু বৈচিত্রপূর্ণ হাতিয়ারের সমাবেশ লক্ষ্য করা যায়। এই সময়কার উল্লেখযোগ্য হাতিয়ার গুলি হল, বাটালি, চাঁচনি, ব্লেড, তুরপুণ, ত্রিকোণী প্রস্তরায়ুধ। পাথরের জাঁতা, হামানদিস্তা ও ক্ষুদ্র ছেদকও পাওয়া গেছে কয়েকটি প্রত্নক্ষেত্রে। হাড় কিংবা চকমকি পাথর দিয়ে তৈরি করা তীর প্রমাণ করে শিকারীদের হাতিয়ার হিসাবে তীর-ধনুকের আবির্ভাব তখন ঘটে গিয়েছিল। এছাড়া মধ্যপ্রদেশের ভীমবেটকার গুহায় বর্শা, তীর, ধনুক প্রভৃতির ছবিও দেখা যায়। যার ভিত্তিতে বলাই যায় যে, মধ্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার যথেষ্ট উন্নত ছিল এবং এই বিবর্তন ঘটেছিল অবশ্যই প্রয়োজনের দিকে লক্ষ্য রেখে। এপ্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, পুরাপ্রস্তর যুগের তুলনায় মধ্যপ্রস্তর সংস্কৃতিতে খাদ্য সংগ্রহের ধারা ও রীতি আরো বিকশিত হয়েছিল।

পুরাপ্রস্তর যুগের সঙ্গে মধ্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ারের মূলগত কিছু পার্থক্য লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত কারিগরী কৌশল ও উপকরণের ক্ষেত্রে এই পার্থক্য বিশেষ উল্লেখের দাবি রাখে। মনে রাখা দরকার যে, বৈচিত্রপূর্ণ হাতিয়ার শিকার জীবনের ক্ষেত্রে পূর্ববর্তী যুগের তুলনায় এই যুগের মানুষের দক্ষতার পরিচয় বহন করে। শুধু তাই নয় হাতিয়ার নির্মাণ পদ্ধতিরও পরিবর্তন ঘটেছিল এযুগে। আয়ুধ নির্মাণের ক্ষেত্রে পাথরের মূল অংশের তুলনায় পাত বা চাকলা (ফ্লেক)- র ওপরেই এই যুগের মানুষ বেশি গুরুত্ব দিয়েছিল। যার ফলে, অস্ত্রগুলি হালকা ও বেশি কার্যকরী হয়েছিল। অর্থাৎ, জীবন নির্বাহকে আরো সাবলীল ও উন্নত করার তাগিদে প্রযুক্তিতে পরিবর্তন আনার নিরলস প্রচেষ্টা শুরু হয়েছিল সেই সুদূর প্রাগৈতিহাসিক পর্বেই। সমকালীন অর্থনৈতিক পরিস্থিতিও তার সাথেই জড়িয়ে গিয়েছিল। এখনকার মতো অর্থনীতির প্রধান তিন উৎস— কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপের তখন কোন প্রশ্নই ছিল না। বরং তৎকালীন অর্থনৈতিক পরিবেশের অনুসন্ধান আমাদের করতে হবে প্রযুক্তিগত মানের নিত্য নতুন উন্নতি এবং শিকার তথা জীবিকা নির্বাহের জন্য নানা ধরনের প্রচেষ্টা গ্রহণ ও ক্রমবিবর্তন এবং সর্বোপরি পশুকে পোষ মানানোর প্রতি তীব্র আকর্ষণের মধ্যে।

মধ্যপ্রস্তর সংস্কৃতিতে প্রযুক্তির অগ্রগতি কতদূর হয়েছিল তা বোঝা সহজ হবে যদি গুরুত্বপূর্ণ প্রত্নকেন্দ্র গুলিতে নিদর্শন এবং সেগুলির ভিত্তিতে জীবনধারণের বিভিন্ন দিকগুলি সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়। বিহারের মুঙ্গের অঞ্চলের খড়গপুর পাহাড়ের পৈসরার নিদর্শন দিয়ে এই আলোচনা শুরু করা যায়। পৈসরার খননকার্য 'বি' এবং 'এফ' অঞ্চল থেকে মধ্যপ্রস্তর যুগীয় বসতির চিহ্ন পাওয়া গেছে। তবে মূল নিদর্শন এসেছে 'এফ' থেকে। ১০৫ বর্গমিটার জায়গা এখানে খনন করা হয়েছে। ইতস্তত ছড়ানো হাতিয়ার আর হাতিয়ার তৈরির নিদর্শন বাদ দিয়ে পৈসরায় আলোচ্যপর্বে যা পাওয়া যাচ্ছে তা আগুন জ্বালানোর চিহ্ন হিসাবে মাটিতে

পোড়ার চিহ্ন, পোড়ানোর জন্য গর্ত বা নিচু ছড়ানো জায়গা, আর পুড়ে যাওয়া মাটির গোলা। কিছু জায়গায় পোড়া অংশের আশপাশ থেকে হাতিয়ার তৈরির বহু চিহ্ন পাওয়া গেছে। এ থেকে মনে হয় যে, হাতিয়ার তৈরির আগে পাথর গরম করা হত। যা খুবই স্বাভাবিক ব্যাপার। তবে উদ্বেগের বিষয় হল পোড়া অংশগুলির সঙ্গে কোনও হাড়গোড়ের অবশিষ্ট জড়িত ছিল না, তাছাড়া, অস্থায়ী হলেও কোনও আশ্রয়ের চিহ্ন এখানে পাওয়া যায় নি। যার ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, পৈসরায় মধ্যপ্রস্তর যুগের বসতি স্বল্পকালের জন্যই ছিল।

তবে অস্থায়ী কিছু আশ্রয়স্থল বা কুটিরের সন্ধানও মিলেছে কিছু প্রত্নকেন্দ্র থেকে, যার মধ্যে অন্যতম হল মধ্যপ্রদেশের সিধিজেলার বাঘোর প্রত্নকেন্দ্রটি। এই প্রত্নকেন্দ্রের একটি এলাকা থেকে বাঁশ ও কাঠের সরু ও অগভীরভাবে পোঁতা কয়েকটি খুঁটির চিহ্ন পাওয়া গেছে। যেভাবে খুঁটির গর্তের দাগ গুলি পাওয়া গেছে তার ভিত্তিতে পণ্ডিতরা অনুমান করেছেন যে, কমপক্ষে এখানে পাঁচটি অস্থায়ী আশ্রয় ছিল। ক্ষেতে পশুপাখি তাড়ানোর জন্য অনেক সময় লোক থাকার জন্য অস্থায়ী একধরনের আশ্রয় বানানোর উদাহরণ এখনও কোনও কোনও অঞ্চলে দেখতে পাওয়া যায়। সম্ভবত এরকম ধরনের কোনও আশ্রয় ছিল। এই আশ্রয় গুলির মেঝেতে বেশ কিছু ছোট ছোট পাথরের টুকরো পাওয়া গেছে, হয়তো আশ্রয়গুলির মেঝেতে পাথরের টুকরো বিছানো হয়েছিল।

অধ্যাপক দিলীপকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, পাথরের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র হাতিয়ার ব্যবহার করা সংস্কৃতি পর্যায় যে খুব সহজে লোপ পায় নি, তার ভাল প্রমাণ পাওয়া গেছে রাজস্থানে ভিলোয়াড়া জেলায় বাগোর গ্রামের উপকণ্ঠে কোঠারি নামক একটি ছোট্ট নদীর পাশে বালিয়ারির এক ঢিবিতে। ঢিবিটি উচ্চতায় ৬মি. ও দৈর্ঘ্য প্রস্থ ২০০×১৫০ মি.। তিনটি পর্যায়ের বসতিস্তর এখানে পাওয়া গেছে- প্রথম পর্যায় খ্রিস্টপূর্ব ষষ্ঠ সহস্রাব্দের মাঝামাঝি থেকে চতুর্থ সহস্রাব্দের সূত্রপাত পর্যন্ত, দ্বিতীয় পর্যায় এরপর থেকে তৃতীয় সহস্রাব্দের প্রথম এবং আরো পর পর্যন্ত ও তৃতীয় পর্যায় সম্ভবত ঐতিহাসিককালের। খননকার্যের তারিখ ছিল- প্রথম পর্যায় খ্রিষ্টপূর্ব ৫০০০-২৮০০, দ্বিতীয় পর্যায় খ্রিস্টপূর্ব ২৮০০-৬০০, তৃতীয় পর্যায় খ্রিস্টপূর্ব ৬০০ থেকে ২০০ খ্রিস্টাব্দ। রেডিও কার্বন তারিখগুলির নতুন বিশ্লেষণের ভিত্তিতে একথা মেনে নেওয়াই যুক্তিযুক্ত হবে যে, বাগোরে মধ্যপ্রস্তর যুগীয় বসতির সূত্রপাত খ্রিষ্টপূর্ব সহস্রাব্দের মাঝামাঝি পর্যন্ত হতে পারে। আর শেষ হয়তো খ্রিস্টীয় দ্বিতীয়-তৃতীয় শতকে এসে থেমেছে। বাগোরে যে কয়েক লক্ষ পাথরের ছোট ছোট হাতিয়ার পাওয়া গেছে তার বেশিরভাগই প্রথম পর্যায়ের, প্রায় চল্লিশ রকমের হাতিয়ার। সবকটিই ছোট ছোট লম্বাটে চিলকা থেকে বানানো। বড় চিলকার ওপর বানানো হাতিয়ার কম। কোনো কোনো হাতিয়ার ৪০ মিলিমিটার পর্যন্ত লম্বা, কিন্তু বেশিরভাগই দৈর্ঘ্য ১৫ থেকে ২০ মিলিমিটার। ৫ থেকে ১০ মিলিমিটারের নিদর্শনও আছে। কোয়ার্টজ পাথর ও চার্ট জাতীয় পাথর দুই-ই ব্যবহার করা হয়েছে। এর মধ্যে কোয়ার্টজ পাথরের সংস্থান বসতিটির খুব কাছেই ছিল, এত সময় ধরে বসতিতে ছিল, কিন্তু বিভিন্ন পর্যায়ের হাতিয়ারের ধরনের বিশেষ পরিবর্তন ধরা পড়েনি। পণ্ডিতদের অনুমান, এখানে যারা থাকতেন তারা নিজেদের দরকার মতো হাতিয়ার তৈরি করে নিতেন। আলোচ্য পর্বে মানুষের বসবাসের উল্লেখযোগ্য প্রমাণ হিসেবে কিছু বড় পাথরের চাতাল বা চত্বরের কথা বলা যেতে পারে। বসবাসকারী মানুষ জীবনধারণের জন্য যেসব জন্তু জানোয়ার যথা গরু, ছাগল, ভেড়া, হরিণ, শুয়োরের মাংস খেত তার প্রমাণও মিলেছে। এইসব জন্তু জানোয়ারের মধ্যে হয়তো পোষ-মানানো গরু, ভেড়া, ছাগল ছিল। যদিও এইসব পশু যে গৃহপালিত হয়ে গিয়েছিল, এমন কোনো নিশ্চিত প্রমাণ নেই। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এমন কোনো কোনো এলাকায় ৪০ থেকে ৭০ সেন্টিমিটার চওড়া গোলাকার জায়গা

পাওয়া গেছে, যেগুলি পাথর দিয়ে বেদির মতো করা হত। লক্ষণীয় বিষয় হল ঐ 'বেদিগুলির' চারপাশে ওপরে উল্লিখিত জন্তু-জানোয়ারের হাড় পাওয়া গেছে। অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে, ঐ গোলাকার বেদি গুলিতে মাংস কাটা হত। পাথরের তৈরি ধারালো ব্লেড, ও ব্লেড জাতীয় হাতিয়ারের উপস্থিতি প্রমাণ করে যে, এগুলির সাহায্যেই পশু কাটা হত। যদিও পুড়ে যাওয়া হাড় পাওয়া গেছে, তবুও কোনো চুলা-জাতীয় নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

রাজস্থানের বাগোরের প্রথম পর্যায়ের চাষবাসের কোন অস্তিত্ব নেই। তবে বুনো শস্য যে, সংগৃহীত হত সে বিষয়ে সংশয়ের অবকাশ নেই। এর প্রত্যক্ষ প্রমাণ হল, এমন কিছু প্রস্তরায়ুধের উপস্থিতি, যা পেষাই এর কাজকে স্পষ্টতই সমর্থন করে। বস্তুত উদ্ভিজ্জ জিনিস যে খাওয়া হত, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেষাই ও বাটনার কাজে ব্যবহৃত হত এমন পাথর। 'শিল' জাতীয় এবং বাটনা বাটার উপযুক্ত অর্থাৎ পেষাই কাজে ব্যবহৃত দুই ধরনের পাথরই পাওয়া গেছে বাগোর এর প্রথম পর্যায়ে। সবমিলিয়ে এই পর্যায়ের যে ছবি আসে তা এই- বৃষ্টিপাত অপেক্ষাকৃত কম হয় এবং আশেপাশের জমি কিছু পাথরে, কিছু উর্বর, বাবলা, পলাশ, বুনোকুল ইত্যাদি গাছে ভরা। একটি অঞ্চলের স্থানীয় একটি ছোট নদীর ধারে একটি বালিয়াড়িতে কিছু লোকের বসতি। বালিজমিতে বসতি করার অর্থ এই যে, কাদা হবে না কখনো। পাথর বিছিয়ে জায়গাটা আরো শুকনো রাখা হত। লতাপাতা গাছ-গাছড়া দিয়ে ঝুপড়ি, চারপাশে পাথর চাপা দিয়ে রাখা। বাইরে উঠোনে কোথাও কোথাও পাথর দিয়েই বেদি করা, যার ওপর হয়তো মৃত জন্তু জানোয়ারদের রেখে তা কাটা হত। হাতিয়ার বলতে বহু রকমের ছোট ছোট পাথরের জিনিস, তীর আর 'ধারালো ব্লেড' আর 'ব্লেড' দিয়ে তৈরি বহু জিনিস, কিছু গরু আর ভেড়া-ছাগল পোষ মানানো ছিল। যদিও আরো কিছু গোরু বুনো ছিল। তাছাড়া অন্য বুনো জানোয়ার যথা হরিণ, শুয়োর ইত্যাদি। নদীর মাছ, মহিষও খাওয়া হত। আবার উদ্ভিদ জিনিসও যে খাওয়া হতো তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পেষাই ও বাটনার কাজে ব্যবহার করা যেত এমন পাথরের উপস্থিতি। এই পর্যায়ে চাষবাসের কোন প্রশ্ন নেই, তবে বুনো শস্য সংগৃহীত হওয়াতে কোনো অসুবিধা নেই। মৃতকে কবর দেওয়া হত, পাথর দিয়ে তৈরি পুঁতির মালাও নজরে পড়ে। গেরুমাটির টুকরো যখন আছে তখন অলংকরণও ছিল। সর্বোপরি, প্রযুক্তিগত উন্নতি ও অর্থনৈতিক অগ্রগতির প্রথম পর্যায়ের এই ধারা বাগোরের পরবর্তী পর্যায়তেও চলতে থাকে। আর এই ধারাবাহিকতা থেকে একথাও আমাদের মনে রাখা দরকার যে, ক্ষুদ্রপ্রস্তর হাতিয়ার মিললেই অনুমান করা ঠিক হবে না যে, সেটি সত্যি সত্যিই মধ্যপ্রস্তর পর্বের এবং পরবর্তী ধারার অংশ নয়। অধ্যাপক দিলীপকুমার চক্রবর্তীর কথায়, যদিও ভারতবর্ষে অগুনতি জায়গায় 'মাইক্রোলিথ' পাওয়া যায়, আমরা জানি না তার কতভাগ সুপ্রাচীন, আর কতভাগ পরবর্তী যুগের। একবার একটা জীবনধারা গড়ে উঠলে এবং প্রকৃতির সঙ্গে যদি তা খাপ খেয়ে যায় তবে সেই জীবনধারা সহজে সম্পূর্ণ পাল্টায় না। বাগোরে যেমন ক্ষুদ্র প্রস্তরযুগীয় জীবনধারা বহুদিন অবলুপ্ত হয়নি। বাগোরের মতোই সাক্ষ্য মিলেছে উত্তর গুজরাটের লাংঘনাজ কেন্দ্র থেকে, এই অঞ্চলে পুরনো বালিয়াড়ি রয়েছে প্রচুর, আর এই বালিয়াড়ি গুলির মাঝখানে বৃষ্টির জল জমে গড়ে ওঠে জলাশয়। গবেষকরা মনে করেন, অন্তত তৃতীয় সহস্রাব্দের সময় থেকে এই অঞ্চলটি 'মাইক্রোলিথ' ব্যবহারকারী জনগোষ্ঠীর প্রিয় ছিল। তাদের বহু বসতির নিদর্শনও মিলেছে। তবে মূল খননকার্য হয়েছে লাংঘনাজ নামক স্থানে। খননকার্যের প্রথম পর্যায়ে দেখা যাচ্ছে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পাথরের হাতিয়ার, অল্প পোড়ানো মৃৎপাত্রের ছোট ছোট টুকরো, গণ্ডার, নীল গাই, তিন রকমের হরিণ ইত্যাদি। তবে গরু, ভেড়া, ছাগল পাওয়া যায় নি। গণ্ডারের কাঁধের দিকের একটি বড় হাড়ের টুকরো পাওয়া গেছে, যার ওপর পাথর রেখে হাতিয়ার বানানো হত।

পরবর্তী পর্যায়ে পাথরের হাতিয়ারের সঙ্গে একটি তামার ছুরি, বীজ পোঁতার গর্ত করার কাজে লাগা ছুঁচলো লাঠির ছিদ্র করা পাথর এবং, কালো-লাল মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। তৃতীয় পর্যায়ে বাগোরের মতো এ ক্ষেত্রেও পাথরের হাতিয়ারের সাথে লোহার ব্যবহার দেখা যায়। সব মিলিয়ে ১২/১৩ টি কবর পাওয়া গেছে। যেখানে মৃতের সঙ্গে এক ক্ষেত্রে দেখা যাচ্ছে একটি নেকড়েকেও কবর দেওয়া হয়েছে, আর একটি ক্ষেত্রে সামুদ্রিক খোলা দিয়ে বানানো পুঁতি। সমুদ্র যেহেতু উত্তর গুজরাট থেকে বেশ দূরে, তাই সামুদ্রিক খোলা দিয়ে বানানো পুঁতিটি সম্ভবত আদানপ্রদানের মাধ্যমে বাণিজ্যিক সূত্রেই এখানে এসেছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশে মধ্যপ্রস্তর সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রার বিস্তৃত সাক্ষ্যের ক্ষেত্রে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যাকার তিনটি ক্ষেত্রের কথা অবশ্যই উল্লেখ করতে হবে। এগুলি হল- সরাই নাহার রাই, চোপানি মান্ডো, এবং মহাদহা। সরাই নাহার রাইতে আবিষ্কৃত হয়েছে দুই পাশের ধারওয়ালা ছুরি, হাড়ের তৈরি তীরের ফলা, মানুষ তখনও শিকারী। সরাই নাহার রাইতেই পাওয়া গেছে বিবিধ পশুর হাড়- যেমন কুঁজ বিশিষ্ট ভারতীয় বৃষ, মহিষ ভেড়া, ছাগল, হরিণ, শূকর, গণ্ডার, হাতি, কচ্ছপ এবং বিভিন্ন পাখি। পশুর মাংস ঝলসে নেওয়ার জন্য আগুনের ব্যবহার জানা ছিল। কিন্তু নিহত পশুগুলি সবই ছিল বন্য, যা হত্যা করা হয়েছিল। ভেড়া বা ছাগল যে গৃহপালিত পশু হিসাবে ছিল। তার কোনো প্রমাণ পাওয়া যায় না। এই প্রত্নক্ষেত্রে জাঁতা জাতীয় উপকরণও দেখা যায়, যা শস্যের দানা চূর্ণ করার কাজে ব্যবহৃত হত। তবে সরাই নাহার রাইয়ের মানুষ কিন্তু খাদ্য উৎপাদন করতো না। তারা সম্ভবত বন্য শস্য সংগ্রহ করে জাঁতায় চূর্ণ করে খেয়ে থাকবে। অন্যদিকে চোপানি মান্ডো কেন্দ্রটি বর্তমানে এলাহাবাদ শহরের মেজা মহকুমায় বেলান নদীর একটি পুরনো খাতের বাঁকে। এই খাতে ১৫০ মি. বিস্তৃত আর প্রস্থে ১০০ মিটার ১৫০০০০ বর্গমি. কেন্দ্রটির ৬৮০বর্গমি. জায়গায় খননকার্য করা হয় এবং মোট ১.৫৫ মি. গভীরতায় এই প্রত্নকেন্দ্রের তিনটি পর্যায়ক্রম পাওয়া যায়- ১) উচ্চপুরাপ্রস্তর যুগের একেবারে শেষ পর্যায়ে, ২) আদি ক্ষুদ্র প্রস্তরযুগীয় পর্যায় ১ এবং ২, ৩) উচ্চ ক্ষুদ্র প্রস্তর যুগীয় পর্যায়। পাথরের বিভিন্ন হাতিয়ার সব পর্যায়েই যথেষ্ট পরিমাণে পাওয়া গেছে, তবে প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাক্ষ্য এখান থেকে যেভাবে মিলেছে তা সাংস্কৃতিক জীবনের এক চিত্তাকর্ষক ছবিই তুলে ধরে।

চোপানি মান্ডোতে কুটির যে ছিল তার প্রমাণ আদি ক্ষুদ্র প্রস্তরযুগীয় পর্যায়-১ এ প্রথম পাওয়া যাচ্ছে। তবে সবচেয়ে বেশি কুটিরের নিদর্শন মিলেছে চোপানি মান্ডোর তৃতীয় পর্যায়ে অথবা ক্ষুদ্র প্রস্তর যুগের শেষ ভাগে। এদের মধ্যে বেশ কিছু কুটির গোল আর কিছু ডিম্বাকৃতি। কিন্তু কুটিরের চারপাশ ঘিরে বড় বড় প্রস্তরখণ্ড রাখা আছে। মেঝেতে হাতিয়ার, প্রস্তরখণ্ড প্রচুর ছড়ানো আছে। এছাড়া পাওয়া যাচ্ছে অগুনতি হাতুড়ি জাতীয় আর নিহাই জাতীয় কাজে ব্যবহৃত হতে পারে এমন বিভিন্ন মাপের পাথর, গুলতিতে ব্যবহৃত হতে পারে এমন বিভিন্ন মাপের পাথর, গুলতিতে ব্যবহৃত হতে পারে এমন পাথরের গোলা, পেষাইকরার কাজে লাগার মতো পাথর, পুড়ে যাওয়া মাটির চাকলা, হাড়ের টুকরো এবং মৃৎপাত্রের টুকরো। অন্তত দুটি ক্ষেত্রে বেশ বড়ো নিমাইয়ের পাথর পাওয়া গেছে। এখানে দাগ লক্ষ্য করলে পরিষ্কার বোঝা যায় যে, চারিদিকে মানুষ বসে একইসঙ্গে পাথর ভেঙ্গেছে। একটি নিহাইয়ের ওপরে একটি হাতুড়ি পাথরও পাওয়া গেছে। আর তার চারপাশে হাতিয়ার তৈরির নিদর্শন ছড়ানো। কুটিরের বাইরে উঠোনে অন্তত চারটি গোল চুলা পাওয়া গেছে। এদের ব্যাস ৮০ সেমি. থেকে ১ মি. আর গভীরতার গড় ৪০ সেমি.। পোড়ামাটির টুকরো, ছাই মাটি ইত্যাদি এই চুলা বাদ দিয়ে কুটিরগুলির বাইরে গোল অথবা ডিম্বাকৃতি পাথর দিয়ে বানানো ৭০ থেকে ৩০ সেমি. ব্যাসের বেদি জাতীয় চিহ্ন পাওয়া গেছে। এদের চারপাশে বাঁশ জাতীয় উদ্ভিদের দাগ বিশিষ্ট

মাটির পোড়া টুকরো দেখে অনুমান করা হয়েছে যে, এই সমস্ত বেদির ওপর বাঁশ ইত্যাদি দিয়ে গোলাজাতীয় জিনিস তৈরী হত, যেখানে শস্য বা অন্য কিছু রাখা যেতে পারে। তবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হল, যতগুলি কুটিরের চিহ্ন মিলেছে ততগুলি চুলা বাইরের উঠোনে নেই। কয়েকটি কুটিরের জন্য একটি চুলা ছিল। মৃৎপাত্র যা পাওয়া গেছে তা হাতে বানানো, ভাল ভাবে পোড়ানো নয়, এবং সহজেই টুকরো টুকরো হয়ে যায়। যে আকৃতি পাওয়া যায় তা বাটি ও ঘটির মতো। বীজ পোঁতার ছুঁচলো খুঁটিতে লাগানোর মতো ছিদ্রযুক্ত পাথরও পাওয়া গেছে এই পর্যায়ে। চোপানি মান্ডোতে খননকার্যের ফলে পাওয়া সর্বমোট ৪৬২৪ হাড়ের টুকরোর ভেতরে ৪৪৫৫ টুকরোই তৃতীয় পর্যায়ের। এর মধ্যে গরু, ৩ ভেড়া অথবা ছাগলের উপস্থিতি নির্ণয় করা গেছে। শেষের পর্যায়তেই পোড়ানো অথবা পুড়ে যাওয়া চারটি মাটির টুকরোতে পুড়ে যাওয়া ধানের অবশিষ্টাংশ পাওয়া গেছে। এগুলিকে বুনো ধান বলে চিহ্নিত করা হয়েছে। একটিমাত্র পাথরের পুঁতি পাওয়া গেছে শেষ পর্যায়ে আর বাঁশ বেত জাতীয় উদ্ভিদের ছাপ লাগা পোড়ামাটির চাকলা দেখে হয় যে, কুটির গুলির লতাপাতা ইত্যাদি দিয়ে তৈরি দেওয়াল যদি পুড়ে যায়, তাতে তার টুকরোতে এই সমস্ত লতাপাতার দাগ থাকবে।

প্রতাপগড় জেলার পাও মহাকুমার মহাদহ প্রতাপগড় শহরে থেকে ৩১ কিমি উত্তর-পূর্বে। এই কেন্দ্রটিতে বিস্তৃত জায়গা জুড়েই মধ্যপ্রস্তর পর্বের মানব সমাজের প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক জীবনযাত্রার পরিবর্তন এর সাক্ষ্য মিলেছে। প্রত্নতাত্ত্বিক খননকার্যের ফলে দেখা গেছে যে, কেন্দ্রটি তিন ভাগে বিভক্ত ছিল। প্রথম অংশটিতে লোক থাকত এবং কবর দেওয়া হতো, দ্বিতীয় অংশে মৃত পশু কাটা হতো, আর তৃতীয় অংশের অবস্থান দহটির একেবারে কিনারে। প্রথম অংশটিতে বসতির চিহ্ন বহন করছে কয়েকটি চুলা, যা ডিম্বাকৃতির এবং অগভীর গর্ত করে সেগুলি বানানো হত। তবে কোনও কাঠকয়লা না পাওয়াতে অনুমান করা যায় যে, এই ধরনের চুলাতে লতাপাতা বা কুঠোকাটা দিয়েই আগুন ধরিয়ে মাংস ঝলসানো হত। কেন্দ্রটির দ্বিতীয়াংশ প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের সাক্ষ্য বহন করছে। জন্তু-জানোয়ারের মাংস ছাড়ানো ও কাটার নিদর্শন তো মিলেছেই, সেখানে বসেই হাড়ের হাতিয়ার আর গয়নাও বানানো হত। এই ধরনের গয়না মূলত হরিণের শিংয়ের তৈরি। গলা ও কানের গয়নাই বেশি মিলেছে। তৃতীয় বা দহভিত্তিক অংশটুকুতেও প্রচুর জানোয়ারের হাড়, পাথরের হাতিয়ার, গেরুমাটির টুকরো, বাটনা বাটা ও পেষাই করার কাজে লাগে এমন পাথর ইত্যাদিও মিলেছে।

তবে, মধ্যপ্রস্তর পর্বে পশু পালনে ক্রমশ অভ্যস্ত হয়ে ওঠা মানবসমাজের স্পষ্ট পরিচয় বোঝা যায় উত্তরপ্রদেশের এলাহাবাদ জেলার দুই প্রত্নস্থল মহাগড় ও কোলদিহাওয়া থেকে, দুটি প্রত্নস্থলই বেলান নদীর তীরে অবস্থিত। তবে কোলদিহাওয়ার অবস্থান মহাগড়ার উল্টোদিকে। মহাগড়ার উৎখননে আবিষ্কৃত হয়েছে একটি প্রায় আয়তকার এলাকা (১২.৫ মি. ▯ ৭.৫ মি.)। এই কেন্দ্রের উৎখনন কে গোবর্ধন শর্মা ও তার সহযোগীরা ব্যাখ্যা দিয়েছেন যে, আয়তকার ক্ষেত্রটি ছিল গৃহপালিত গবাদিপশুর জন্য একটি খোঁয়াড়। মহাগড়ার মানব গোষ্ঠী মূলত পশু পালনের উপর নির্ভরশীল। পশুচারণকারী মানবসমাজে যেহেতু শিকারি গোষ্ঠীর মতো সদা ভ্রাম্যমান নয়, তাই মহাগড়ার প্রত্নস্থলে অন্তত কুড়িটি কুটিরের অবশেষ দেখা যায়। যদিও কুটিরগুলি শুধুমাত্র মাটির মেঝে ও খুঁটি পোতার গর্তই অবশিষ্ট আছে। এটি পুরোমাত্রায় স্থায়ী মনুষ্যবসতি নয়, কিন্তু গৃহপালিত গবাদি পশু সম্পদ শিকারী ও খাদ্য সংগ্রাহকদের জীবনযাত্রার তুলনায় অধিকতর আর্থ সামাজিক নিরাপত্তা ও স্থিতি দেয়। তারই প্রকাশ গুহাবাসী অবস্থা থেকে কুটির নিবাসী মানবগোষ্ঠীর বিবর্তনে প্রকটিত হবে।

খাদ্য ও দুধের অধিকতর সম্বল পশুপালনের দ্বারা সম্ভব হওয়ায় বোধহয় খাদ্য ও তরল খাদ্য (দুধ ও জল) সংরক্ষণ ও সঞ্চয়ের প্রচেষ্টাও শুরু হয়। মহাগড়ার ঠিক বিপরীতে বেলান নদীর বাম তীরে অবস্থিত কোলদিহাওয়ায় পাওয়া গেছে হাতে তৈরি মৃৎপাত্র। মৃৎপাত্রের গায়ে বহু ক্ষেত্রে ঝুড়ির ছাপ দেখা যায়। ঝুড়ি জাতীয় কোনও আঁধারে মাটি ঢেলে আঙ্গুলের পেষনে তাকে সম্ভবত পাত্রের আকার দেওয়া হত। অর্থাৎ ঝুড়িটি এক্ষেত্রে কার্যত ছাচের কাজ করতো। একথা বলা বাহুল্য যে, কৃৎকৌশল এর দিক থেকে কুমোরের চাকে নির্মিত পাত্রের থেকে এগুলি অনেক নিম্নমানের। কিন্তু মাটির পাত্র তৈরির অন্যতম প্রাচীন নজির হিসাবে কোলদিহাওয়ার মৃৎপাত্র গুলোর তাৎপর্য অপরিসীম। মধ্য প্রস্তর যুগের প্রযুক্তিগত পরিবর্তনের অনবদ্য সাক্ষ্য বহন করছে এই মৃৎপত্রগুলি। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এই মাটির পাত্র গুলির গায়ে কোনও কোনও ক্ষেত্রে ধানের তুষও দেখা যায়। বিষ্ণু মিত্র এই ধানের তুষের পুরাউদ্ভিদ বিদ্যানুযায়ী পরীক্ষা করে রায় দিয়েছিলেন যে, এই ধান আবাদী শস্য, বুনো ফসল নয়, ধানের তুষের যে কার্বন ১৪ পরীক্ষা হয়, তাতে প্রাচীনতম কাল নির্দিষ্ট হয়েছিল খ্রিস্টপূর্ব ৬৫৭০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ২১০, এই কথা মানলে স্বীকার করতে হবে যে, কোলদিহাওয়ার মানুষ পশু পালনের সঙ্গে সঙ্গে সামান্য কৃষিকর্ম জানতো, গোবর্ধন শর্মার অভিমত যে, সমগ্র বিশ্বে আবাদী ধান ফলানোর প্রাচীনতম নিদর্শন কোলদিহাওয়াতেই পাওয়া যায়। কিন্তু এই মত সর্বসম্মত নয়। ইরফান হাবিব একসময় কোলদিহাওয়ার ধানের প্রাচীনত্বর ব্যাপারে গোবর্ধন শর্মার সহমত ছিলেন, কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণার আলোকে হাবিব মনে করেন যে, কোলদিহাওয়ায় প্রাপ্ত ধানের প্রাচীনত্ব খ্রিস্টপূর্ব তৃতীয় বা সহস্রাব্দের পূর্বে নয়।

৭.৩ গুহাচিত্র ও শিল্পকলা

প্রাচীন ও মধ্যপ্রস্তর যুগের মানুষ গুহা চিত্রের মাধ্যমে তাদের সৃজনশীলতা প্রকাশ করেন। ভারত তথা বিশ্বে গুহাচিত্র প্রথম আবিষ্কৃত হয় ১৮৬৭-৬৮ সালে, বর্তমানে উত্তরপ্রদেশের মির্জাপুর জেলার অন্তর্গত কায়মুর পাহাড়ের সোহাগি ঘাটে। আবিষ্কর্তা ভারতের প্রত্নতত্ত্ব বিভাগের সহকারি সার্ভেয়ার এ. সি. এল. কার্লাইল। বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে দেড়শটিরও বেশি মধ্যপ্রস্তর যুগীয় গুহাচিত্রের ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এরমধ্যে ভারতের মধ্যভাগে এর ঘন সন্নিবেশ দেখা যায়। গুহাচিত্র মধ্য প্রস্তর যুগীয় মানবসমাজের জীবনযাত্রা সম্পর্কে তথ্য সরবরাহ করে। এই গুহাচিত্র থেকেই ভারতের বিভিন্ন প্রান্তের মানুষের ধারণাগত সাদৃশ্য অনুধাবন করা যায়। আমাদের মনে প্রশ্ন জাগে কেন উচ্চস্তর প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষ চিত্রাংকন করত। শুধু কি শিল্পের প্রয়োজনেই শিল্পচর্চা করত? মানব ইতিহাসের আদিম পর্যায়ের মানুষ সম্পর্কে এই ধারণা করা হয়তো যুক্তিসঙ্গত হবে না। বরং তাদের শিল্পরুচি ভাবনা সম্পর্কে উচ্চ ধারণা পোষণ করা হবে। এবিষয়ে অনেকের মত হল সামাজিক বিরোধ এড়াতেই তারা শিল্পে আশ্রয় নেই। এই ধারণাও ঠিক নয়, কারণ সামাজিক বিরোধ সাধারণত জটিল সামাজিক কাঠামোয় ঘটে, সেখানে সামাজিক ভেদাভেদ তীব্র। এই ধরনের সামাজিক জটিলতা উচ্চস্তর প্রাচীন প্রস্তর যুগের মানুষের মধ্যে ছিল না। খুব সম্ভবত সেই যুগের মানুষ বন্য প্রাণীর ছবি চিত্রিত করেছিল তাদের উপর নিয়ন্ত্রণ স্থাপনের জন্য, কারণ শিকার-ই ছিল তাঁদের জীবন ধারণের প্রধান মাধ্যম। যদিও অনেক নারী-পুরুষের ছবিও গুহাচিত্রে পাওয়া যায় কিন্তু বিভিন্ন ধরনের প্রাণীর ছবিই গুহাচিত্রে প্রাধান্য পেয়েছে।

১৯৫৭ সালে প্রত্নতত্ত্ববিদ ভি. এস. ওয়াকঙ্কর ভোপাল থেকে ইটারছি যাওয়ার পথে ভীমবেটকা গুহাচিত্র লক্ষ করেন এবং তারপর নিকটবর্তী রেল স্টেশনে নেমে আবিষ্কার করেন। এইভাবেই বিশ্বের অন্যতম শ্রেষ্ঠ

গুহাচিত্র আবিষ্কৃত হয়। ভীমবেটকা ভোপাল থেকে ৪৫ কিলোমিটার দক্ষিণে বিন্ধ্য পাহাড়ে অবস্থিত। বস্তুত ভীমবেটকা অপরূপ প্রাকৃতিক পরিবেশে সজ্জিত সাত পাহাড়ের একটি। এখানে দশ বর্গ কিলোমিটার জুড়ে ৬৪২ টি গুহা আশ্রয় রয়েছে। তার মধ্যে প্রায় ৪০০টিতে গুহাচিত্র রয়েছে। ভীমবেটকায় উচ্চস্তর প্রাচীন প্রস্তর যুগ মধ্য প্রস্তর যুগের গুহাচিত্র রয়েছে। এখানকার গুহাচিত্রের ধরণ, বিষয় বস্তু ও ক্ষয়ে যাওয়ার অবস্থা দেখে বোঝা যায় যে, এগুলি বহু প্রাচীনকালের। ভীমবেটকার গুহাচিত্রগুলি ভি. এস. ওয়াকঙ্কর, যশোধর মঠপল এবং এরউইন নেউমায়ের (Erwin Neumayer) গভীরভাবে চর্চা করেছেন। তাদের এই গবেষণা ও বিশ্লেষণের ফলেই ভীমবেটকার চিত্রকরদের জীবনের নানাদিক উদ্ঘাটিত হয়েছে। মঠপল এই গুহাচিত্র গুলোর তিনটি পর্যায়ে চিহ্নিত করেন এবং একেকটি পর্যায়ের আবার উপ বিভাজন করেন। প্রথম পাঁচটি উপপর্যায় হলো মধ্য প্রস্তর যুগের, ষষ্ঠ রূপান্তর পর্যায়ের এবং শেষ তিনটি ঐতিহাসিক যুগের। ষোলটি রঙের ব্যবহার কে চিহ্নিত করা গেছে, তার মধ্যে সাদা ও হালকা লাল রঙের ব্যবহারই বেশি। রঙগুলির খনিজ পদার্থ, পশুর চর্বি, মজ্জা, ডিমের সাদা অংশ দিয়ে জল মিশিয়ে প্রাকৃতিক উপায়ে তৈরি করা হত। কিছু কিছু গুহাচিত্র একটি রং ব্যবহৃত হয়েছে, আবার কিছু চিত্র একাধিক রং ব্যবহার করা হয়েছে।

মধ্য প্রস্তর যুগের বেশিরভাগ গুহাচিত্রে প্রাণীর ছবি রয়েছে। চিতল হরিণ, চিতা বাঘ, বাঘ, প্যান্থার, হাতি, গন্ডার, হরিণ, কাঠবেরালি ইত্যাদি ২৯ প্রজাতির প্রাণীর ছবি চিত্রিত রয়েছে। বিভিন্ন ধরনের পাখি, মাছ, টিকটিকি, ব্যাঙ, কাঁকড়া বিছে এবং তেঁতুলে বিছে বা কেন্নোর ছবিও পাওয়া গেছে। যদিও ভীমবেটকার পাহাড়ি এলাকায় এখনও বহু বন্যপ্রাণীর বিচরণক্ষেত্র। হাতি, গন্ডার, সিংহ, বুনো মোষ প্রভৃতি প্রাণী যা মধ্য প্রস্তর যুগের গুহাচিত্রে চিত্রিত হয়েছে এখানে আর সেগুলিকে দেখা যায় না। একটি বিষয় আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, কোন সাপের ছবি মধ্য প্রস্তর যুগের ভারতের গুহাচিত্র চিত্রিত হয়নি। ভীমবেটকার এবং অন্য স্থানের মধ্য প্রস্তর যুগীয় গুহাচিত্রে শিকারের অঙ্গ হিসাবে বিভিন্ন প্রাণী চিত্রিত হয়েছে। শিকারীরা কখনো এককভাবে অথবা দলবদ্ধভাবে মুখোশ পড়ে এবং শিরোভূষণ পরে শিকারে বের হত। গলার হার, হাতের বাজু, কবজিবন্ধ ইত্যাদি নানা অলঙ্কারে ভূষিত হতেও তাদের দেখা যায়। কেউ অস্ত্রহীন আবার কেউ লাঠি, বল্লম, তীর ধনুক ইত্যাদি অস্ত্র নিয়ে শিকার বের হত। কোনো কোনো গুহাচিত্রে শিকারিদের ফাঁদ পেতে বা জাল বিছিয়ে শিকারের পেছনে ধাওয়া করার দৃশ্যও চিত্রিত হয়েছে। অনেক ক্ষেত্রে প্রাণীর বাস্তব চিত্র, আবার কিছু ক্ষেত্রে তাদের বিমুর্ত ছবি দেখা যায়। কিছু ক্ষেত্রে প্রাণীর দেহে বিভিন্ন নকশার কাজ দেখা যায়।

ভীমবেটকা এবং অন্যত্র মধ্য প্রস্তর যুগের গুহাচিত্রে পুরুষ ও নারীর যৌবনের এবং বৃদ্ধ বয়সের ছবি চিত্রিত হয়েছে। পুরুষ চিত্রগুলি অনেকটা দেশলাই কাঠির মতো দেখতে, অনেক সময় নারীর পূর্ণ দেহাবয়ব চিত্রিত হতে দেখা যায়। অনেক পুরুষকে গাছের পাতার বা গাছের ছালের বা পশুর চামড়ার কৌপিন পড়তে দেখা যায়। পুরুষদের খোলা চুলে এবং নারীদের বিনুনি করতে দেখা যায়। নারী-পুরুষের কিছু মূর্তি প্রশস্ত এবং জ্যামিতিক নকশায় সজ্জিত দেখে মনে হয় তারা কর্তৃত্বের অধিকারী। কিছু মুখোশপরা নর্তক-নর্তকীর (যাদের প্রাগৌতিসাহিক নাচুনে যাদুকর বা নাচুনে ডাকেনি আখ্যা দেওয়া হয়েছে) ছবি দেখা যায় যারা সম্ভবত রীতি বা আচার বিশেষজ্ঞ ছিল। ভীমবেটকার গুহাচিত্রে লিঙ্গ অনুযায়ী শ্রম-বিভাজন লক্ষ্য করা যায়, যেমন পুরুষরা শিকার করছে এবং নারীর খাদ্য সংগ্রহ ও প্রস্তুত করছে। নারীদের জাঁতা বা হামানদিস্তায় খাদ্য পিষতে দেখা যায়। এই যুগের চিত্রে কোনো পাত্র এর ছবি দেখা যায়নি, খুব সম্ভব শুকনো লাউয়ের খোলা অথবা চামড়ার ব্যাগে রাখা হতো। কিছু চিত্র মানুষকে ফল ও মধু সংগ্রহ করতে দেখা যায়। ভীমবেটকার গুহাচিত্রে যৌনক্রিয়ার

ছবি দেখা যায়, আবার কিছু চিত্র তাদের নৃত্য-ছন্দ ফুটে উঠেছে। নাচের সময় অনেককে ভারসাম্য না রাখতে পেরে পড়ে যেতে দেখা যায়।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের গুহাচিত্র ভারতের আরও বিভিন্ন প্রান্তে দেখা যায়। পূর্ব ভারতের ৫৫টিরও বেশি গুহাচিত্রসহ গুহা আশ্রয় চিহ্নিত হয়েছে। এগুলি উড়িষ্যার পশ্চিমের জেলাগুলোতে বিশেষ করে সুন্দরগড় ও সম্বলপুর জেলায় অবস্থিত। এইসব স্থানে ক্ষুদ্রাশ্মীয় (microliths) হাতিয়ার প্রাপ্তি নিশ্চিত করেছে যে এই অঞ্চলের মানুষ মধ্য, প্রস্তরযুগীয় জীবিকার সঙ্গে যুক্ত। গুহাচিত্রের সবচেয়ে সমৃদ্ধ অঞ্চল হল ছেঙ্গেপাহাড় ও গর্জন পাহাড়ের সংরক্ষিত বনাঞ্চলএর অন্তর্গত লেকামোডা বর্গের ১২টি গুহাশ্রয়। এই ১২টি গুহা আশ্রয়ের একটিতে খননকার্য চালিয়ে মধ্য প্রস্তর যুগ থেকে তাম্র প্রস্তর যুগে উত্তরণের সাংস্কৃতিক শৃঙ্খলা প্রকাশিত হয়েছে। উড়িষ্যার গুহাচিত্রের এক অনন্য বৈশিষ্ট্য হলো একটি গুহাশ্রয়ে গুহাচিত্রের পাশাপাশি তক্ষণ চিত্রের সহাবস্থান। এখানকার চিত্রগুলি অঙ্গভিত্তিক হওয়ার পরিবর্তে বিমূর্ত শৈলীর, যেখানে জ্যামিতিক ও অজ্যামিতিক নকশা পরিস্ফুট হয়েছে। প্রাণীর ছবি দু-একটা থাকলেও মানুষের ছবি প্রায় নেই বললেই চলে। কেরালাতেও কিছু গুহাচিত্র ও খোদাইয়ের কাজ রয়েছে। এখানকার প্রাচীনতম গুহগুলির একটি ইদুক্কি জেলার চন্দনকাঠের গভীর জঙ্গলে অবস্থিত। এটি এজহুথু গুহা নামে পরিচিত। এখানকার প্রাচীনতম গুহাচিত্রগুলিতে পশুর ছবি থাকলেও মানুষের ছবি নেই। এখানকার গুহাচিত্রগুলিকে মধ্যপ্রস্তর যুগের শেষ পর্যায়ের গণ্য করা হলেও মধ্য প্রস্তর যুগের কোনোও হাতিয়ার এখানে পাওয়া যায়নি। মধ্যপ্রদেশের জাওরায় একটি বিমূর্ত চিত্র পাওয়া গেছে যেখানে বায়ু, মাটি এবং অগ্নি নিয়ে গড়া বিশ্ব প্রতিফলিত হয়েছে।

প্রাগৈতিহাসিক যুগের মানুষ কেন চিত্রাংকন করত? বিভিন্ন কারণে হয়তো তারা একাজ করত- তাদের সৃজনশীলতা প্রকাশ করতে, তাদের ঘর সাজাতে চিত্রের মাধ্যমে কোনো কাহিনী বলতে। এইসব গুহাচিত্রের বেশ কিছু ছবিতে তাদের দৈনন্দিন জীবনের স্মরণীয় অভিজ্ঞতা ছিল, আবার বেশ কিছু ছবি তাদের জীবনযাত্রা, জীবিকা বিশেষত শিকার ও উর্বরতার সাথে যুক্ত। নারী অথবা পুরুষ বা উভয়েই এই শিল্প সৃষ্টি করেছিল কিনা তা বলা কঠিন। তবে এগুলির মাধ্যমে তাদের শিল্পসত্তা পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে।

৭.৪ উপসংহার

সামগ্রিকভাবে দেখা যাচ্ছে যে, মধ্যপ্রস্তর যুগের সভ্যতা পুরাপ্রস্তর যুগের তুলনায় অনেকটাই এগিয়েছিল। প্রযুক্তিগত ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন ছিল এই অগ্রগতির অন্যতম স্বাক্ষর বহন করে। তবে তখনও বস্তুগত দিক থেকে মানুষের খাদ্য সংগ্রাহকের ভূমিকাই ছিল প্রধান। অবশ্য ধীর গতিতে হলেও খাদ্য উৎপাদনের পথে রূপান্তরের ধারাটিও ছিল লক্ষ্যণীয়। মনে রাখা দরকার এই রূপান্তরের ধারা বিভিন্নভাবে হয়েছে। দিলীপকুমার চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন যে, ভারতবর্ষের অধিকাংশ অঞ্চলেই খাদ্য উৎপাদন পর্যায় খাদ্যসংগ্রহ পর্যায় অবলম্বন করেই এগিয়েছে, যার প্রত্যক্ষ প্রমাণ পাওয়া যায় মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার বিভিন্ন কেন্দ্রের সাক্ষ্য থেকে। মধ্যপ্রস্তর পর্বের শিল্পকলা ও চিত্রের মধ্যেও এই রূপান্তরের আভাষ মেলে। উপমহাদেশের পরবর্তী খাদ্য উৎপাদন সংস্কৃতিতে যার অবদান অনস্বীকার্য।

৭.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. মধ্যপ্রস্তর সংস্কৃতিতে প্রস্তরায়ুধ নির্মাণের প্রযুক্তিগত পরিবর্তন সম্পর্কে কী জান?

২. প্রযুক্তিগত পরিবর্তন মধ্যপ্রস্তর যুগের অর্থনৈতিক জীবনধারার বদলে কতটা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল?

৩. ভারতীয় উপমহাদেশে মধ্যপ্রস্তর যুগের শিল্পকলার বিকাশ সম্পর্কে আলোকপাত করো।

৭.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

রণবীর চক্রবর্তী, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব(প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৯।

ইরফান হাবিব, প্রাক-ইতিহাস, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০২।

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ), প্রথম খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

Upinder Singh– A History of Ancient and Early Medieval India– Pearson– 2009.

R.S. Sharma– India's Ancient Past– OUP– New Delhi– 2005.

Raymond Allchin and Bridget Allchin– The Rise of Civilization in India and Pakistan– CUP– 1982.

পর্যায় ৩

খাদ্য উৎপাদনের অগ্রগতি

(Module III- The advent of food production)

একক : ৮ ◘ নব্য প্রস্তর যুগ এবং খাদ্য উৎপাদনের সূচনা (The Neolithic Age and the Beginnings of Food Production)

গঠন

৮.০ উদ্দেশ্য

৮.১ সূচনা

৮.২ নব্য প্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য- তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

৮.২.১ জলবায়ু সঙ্কট তত্ত্ব

৮.২.২ জনসংখ্যা তত্ত্ব

৮.২.৩ সামাজিক অবস্থান তত্ত্ব

৮.২.৪ সাংস্কৃতিক প্রভাব

৮.৩ গর্ডন চাইল্ড ও নব্যপ্রস্তর বিপ্লব

৮.৪ নব্যপ্রস্তর বিপ্লব তত্ত্বের সমালোচনা

৮.৫ বিপ্লব না বিবর্তন

৮.৬ বিভিন্ন নব্যপ্রস্তর যুগীয় সংস্কৃতি

৮.৭ উপমহাদেশে খাদ্য উৎপাদনের সূচনা

৮.৮ উপসংহার

৮.৯ নির্বাচিত প্রশ্নাবলি

৮.১০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

৮.০ উদ্দেশ্য

- এই একক পাঠের উদ্দেশ্য হল নব্যপ্রস্তর যুগে খাদ্য উৎপাদনের সূচনাকে ব্যাখ্যা করা।
- নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতির বিকাশ ও বৈশিষ্ট্য সমূহর তাত্ত্বিক বিশ্লেষণকে অনুধাবন করা।
- 'নব্যপ্রস্তর বিপ্লব' সম্পর্কে গর্ডন চাইল্ডের মতকে বোঝা এবং বিভিন্ন দৃষ্টিভঙ্গি থেকে এই বিপ্লবের মূল্যায়ন করা।
- ভারতীয় উপমহাদেশে খাদ্য সংস্কৃতির বিকাশ আলোচনা করা।

৮.১ সূচনা

পুরাপ্রস্তরযুগ অতিক্রম করে মধ্যপ্রস্তর যুগের মধ্যে দিয়ে মানব সভ্যতা এসে পৌঁছায় প্রস্তরপর্বের তৃতীয় যুগটির দ্বার প্রান্তে, যা নব্যপ্রস্তর যুগ নামেই পরিচিত। নব্য প্রস্তর যুগ মানবসমাজের বিবর্তনে এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এই পর্বে মানুষ খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদকে রূপান্তরিত হয় এবং তার সঙ্গে তার শিকারি যাযাবর জীবনের অন্ত হয়। শুরু হয়, কৃষিভিত্তিক স্থিতিশীল জীবন। হাতিয়ার নির্মাণেও দেখা যায় উন্নত প্রযুক্তি ও কৌশলের প্রয়োগ যা কৃষি উৎপাদনের পথকে প্রশস্ত করে। নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনযাত্রায় এই গভীর পরিবর্তনের কথা মনে রেখেই পুরাতত্ত্ববিদ ভি. গর্ডন চাইল্ড নবপ্রস্তর যুগকে নবপ্রস্তর বিপ্লব (Neolithic Revolution) আখ্যা দিয়েছেন। ব্রিটিশ বিজ্ঞানী জন লুবক তাঁর Antiquity of Man (১৮৬৫) গ্রন্থে প্রথম 'নব্যপ্রস্তর' (Neolithic) কথাটি ব্যবহার করেন। গোটা প্রস্তর যুগকে তিনি পুরাপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর- এই দুই ভাগে ভাগ করেছিলেন। নব্যপ্রস্তর বা Neolithic কথাটি এসেছিল Neo (New বা নব্য) এবং Lithic (Stone বা প্রস্তর) কথা দুটি থেকে। নব্যপ্রস্তর যুগে পাথরকে শান দিয়ে ধারালো ও মসৃন করা হয়েছিল। এই ধারালো ও মসৃণ হাতিয়ার প্লিসটোসিন পরবর্তী পর্বে মানুষকে খাদ্য উৎপাদনে সাহায্য করেছিল। তাই নব্যপ্রস্তর যুগ কৃষির সূচনার যুগ হিসাবে চিহ্নিত। আবার একই সময় মানুষ কর্তৃক বিশেষ ধরনের শান্ত পশুপালন হয়ে ওঠে অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের এক অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। প্রকৃতপক্ষে কৃষিকাজের সূচনা ও নগর গড়ে ওঠার মধ্যবর্তী পর্যায় মানুষের বিবর্তনের ইতিহাসে নব্যপ্রস্তর যুগ (Neolithic Age) নামে পরিচিত। এই যুগের সমকাল মোটামুটি ৮০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত।

৮.২ নব্য প্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য - তাত্ত্বিক ব্যাখ্যা

দুটি দিক দিয়ে নব্যপ্রস্তর যুগ ছিল তাৎপর্যপূর্ণ- কৃষিকাজের সূচনা ও পশুপালন। খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন জাগে —কীসের তাড়নায় বা কী প্রয়োজনে মানুষ শিকারি-সংগ্রাহক জীবন পরিত্যাগ করে কৃষিকাজ ও পশুপালনে লিপ্ত হল? তা নিয়ে পুরাতাত্ত্বিক ও প্রাক-ইতিহাসবিদদের মধ্যে বিতর্ক আছে বিস্তর। কেউ আবহাওয়ার পরিবর্তনকে এর মুখ্য কারণ হিসাব উল্লেখ করেছেন। কারও মতে বর্ধিত জনসংখ্যার চাপ এই পরিবর্তন আনতে মানুষকে বাধ্য করেছিল। অপর একদল পণ্ডিত আবার সামাজিক ও সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের দৃষ্টিকোণ থেকে বিষয়টি ব্যখ্যা করেছেন। কোনো কোনো তত্ত্বে একটি বিষয়ের ওপর ভিত্তি করে কৃষি ও পশুপালনের সূচনা বিশ্লেষণ করা হয়েছে; কোনো তত্ত্বে আবার বলা হয়েছে এই পরিবর্তন নানাবিধ ঘটনা বিন্যাসের ক্রমপুঞ্জিত পরিণতি।

৮.২.১ জলবায়ু সঙ্কট তত্ত্ব

যে সমস্ত পুরাতাত্ত্বিক আবহাওয়ার পরিবর্তনকে কৃষির সূচনার কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন, তাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য নাম ভি. গর্ডন চাইল্ড (V. Gordon Chield)। গর্ডন চাইল্ড তাঁর 'Man Makes Himself' (১৯৩৬) গ্রন্থে জোরের সঙ্গে বলেছেন, প্লিসটোসিন পরবর্তী কালে হলোসিন যুগের প্রারম্ভিক পর্বে বরফ গলে যাওয়ার পরিপ্রেক্ষিতে আবহাওয়া উষ্ণতর ও শুষ্কতর হয়েছিল। এই পরিবর্তিত আবহাওয়ার সঙ্গে মানিয়ে নিতে পারেনি শিকারী-সংগ্রাহকরা। ফলে মানুষ ও পশু উভয়েই তাদের ঐতিহ্যগত বসতি পরিত্যাগ করেন

নিকট প্রাচ্যের মতো জলাধার সমৃদ্ধ অঞ্চল এর দিকে অভিবাসন শুরু করে। নতুন ভোজ্য সম্পদের অনুসন্ধানে মানুষ গাছপালা ও পশু নিয়ে নতুন করে অনুসন্ধান শুরু করে। এই তত্ত্ব 'জলবায়ু সঙ্কট তত্ত্ব' (Climatic Crisis Theory) নামে পরিচিত এবং এই তত্ত্বের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ প্রবক্তা গর্ডন চাইল্ড।

৮.২.২ জনসংখ্যা তত্ত্ব

যারা কৃষির আগমনের কারণ অনুসন্ধানে ক্রমবর্ধমান জনসংখ্যার চাপের উল্লেখ করেছেন তাদের মধ্যে লিউইস বিনফোর্ড (Lewis Binford)- এর নাম উল্লেখযোগ্য। তিনি বলেছেন কৃষির আগমনের আগে শিকারি-সংগ্রাহকরা তাদের প্রাকৃতিক পরিবেশের সঙ্গে এক ভারসাম্য বজায় রেখেছিল। এই ভারসাম্য বজায় রেখেই তারা বন্য গাছপালা ও পশু তাদের খাদ্য হিসেবে গ্রহণ করত। কিন্তু ক্রমেই ভারসাম্য নষ্ট হয়। ভারসাম্য নষ্ট হওয়ার কারণ প্রাকৃতিক পরিবেশের দ্রুত পরিবর্তন, নয়তো জনসংখ্যার পরিবর্তন (Demographic Change)। বিনফোর্ডের মতে সে সময় নিকট প্রাচ্যের আবহাওয়া বা প্রাকৃতিক পরিবেশের পরিবর্তনের কোনো সাক্ষ্যপ্রমাণ পাওয়া যায় না। সুতরাং, জনসংখ্যাগত পরিবর্তনই কৃষির উৎপত্তির কারণ। বর্ধিত জনসংখ্যার উদরপূর্তির জন্যই চাষবাসের প্রয়োজন দেখা দিয়েছিল। তবে গর্ডন চাইল্ড কিন্তু জনসংখ্যা বৃদ্ধির বিষয়টিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তিনি তাঁর Man Makes Himself গ্রন্থে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় মন্তব্য করেছেন- জনসংখ্যার আশানুরূপ বৃদ্ধি ঘটেছিল, এ বিষয়ে কোনো গুরুত্বপূর্ণ পরিসংখ্যান পাওয়া যায়নি (No vital statistics have been recorded to prove that the expected increase of population did occur)। তবে মার্ক কোহেন (Mark Cohen) তাঁর 'The Food Crisis in Prehistory- overpopulation and the Origins of Agriculture (১৯৭৭)' গ্রন্থে জনস্ফীতিকে কৃষির সূচনার মুখ্য কারণ হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তিনি বলেছেন- পৃথিবীর বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে বিশেষত নিকট প্রাচীন, চিন, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া ও দুই আমেরিকান মহাদেশে তুষার যুগের অবসানের পর জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেয়েছিল। শিকার ও সংগ্রহ এই বর্ধিত সংখ্যক মানুষের জীবন ধারণের জন্য যথেষ্ট ছিল না। তাই মানুষ কৃষির মাধ্যমে খাদ্য উৎপাদনে উৎসাহী হয়েছিল।

৮.২.৩ সামাজিক অবস্থান তত্ত্ব

অনেকে আবার কৃষির সূচনার জন্য সামাজিক অবস্থানের ওপর গুরুত্ব আরোপ করেছেন। বারবারা বেলডার, ব্রায়ান হেডেন প্রমুখ প্রাক-ইতিহাসবিদ কৃষির আগমনের কারণ হিসেবে জনস্ফীতিকে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাদের মতে সামাজিক সংগঠনের পরিবর্তন নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষকে কৃষির প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। শিকার-সংগ্রহের যুগে সংগৃহীত খাদ্য সকলের মধ্যে ভাগ করে দেওয়া হত। ফলে অতিরিক্ত প্রাপ্তির প্রতি উৎসাহ তেমন ছিল না। কিন্তু ক্রমে খাদ্য ভাগ করে নেওয়ার রীতি বন্ধ হয়ে যায়। তখন কিন্তু ব্যক্তি শ্রম ও সম্পদের ওপর নিজের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠিত করার লক্ষ্যে অন্যের সঙ্গে প্রতিযোগিতায় লিপ্ত হয়। সেখান থেকেই কৃষির সূচনা ও বিকাশ।

৮.২.৪ সাংস্কৃতিক প্রভাব

কৃষির সূচনা প্রসঙ্গে আর একটি তাৎপর্যপূর্ণ মত হল- প্লিসটোসিন পরবর্তী পর্বে মানুষের সাংস্কৃতিক ও বৌদ্ধিক বিকাশের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে বেশ কিছু গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষণীয় হয়ে ওঠে। কৃষির আবিষ্কার ছিল

সেই পরবর্তনেরই অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। রবার্ট ব্রেইডউড ও লিন্ডা ব্রেইডউড (Robert Braidwood and Linda Braidwood) ১৯৮০র দশকে ইরানের কুর্দিশ পার্বত্য ভূমিতে অর্থাৎ নব্যপ্রস্তরীয় জার্মো অঞ্চলে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষেত্রসমীক্ষা চালান। তাদের শ্রমনিষ্ঠ গবেষণার উপর ভিত্তি করে তারা এই সিদ্ধান্ত উপনীত হন যে সে সময় বৃষ্টিপাতের অঞ্চলিক বণ্টনের কিছু তারতম্য ছাড়া আবহাওয়ার বিপর্যয় সৃষ্টিকারী কোনো পরিবর্তন ঘটেনি। তাদের মতে জনস্ফীতির বিষয়টিও তেমন তাৎপর্যপূর্ণ ছিল না। মানুষের সাংস্কৃতিক বৈচিত্র ও দক্ষতা তৎকালীন অর্থনৈতিক পরিবর্তনের পথ প্রশস্ত করেছিল। তাঁরা আরও বলেছেন- সে সময় সাংস্কৃতিক বিকাশ নতুন নতুন উদ্ভাবন ও পরীক্ষা-নিরীক্ষার প্রতি মানুষের আগ্রহ বাড়িয়ে তুলেছিল। এই আগ্রহ থেকেই তারা 'কেন্দ্রকীয় অঞ্চল' (Nuclear zone) গুলিতে ভোজ্য উদ্ভিদের চাষ আবাদ ও পশুপালনের উপযোগিতা উপলব্ধি করে।

৮.৩ গর্ডন চাইল্ড ও নব্যপ্রস্তর বিপ্লব

নব্যপ্রস্তর যুগ সম্পর্কে অন্যতম শ্রেষ্ঠ পুরাতাত্ত্বিক গর্ডন চাইল্ড তাঁর 'What Happened in History' (১৯৪২) গ্রন্থে সুচিন্তিত মন্তব্য করেছেন- "অর্থনৈতিক ও বিজ্ঞানভিত্তিক বিপ্লব বর্বরতার অচলাবস্থা থেকে মুক্তি দিয়ে মানুষকে প্রকৃতির উপর নির্ভরশীল হওয়ার পরিবর্তে প্রকৃতির সক্রিয় অংশীদার করে তুলেছিল"। (The escape from the impasse of savagery was an economic and scientific revolution that made the participants achieve partners with nature instead of parasites of nature)। পুরা প্রস্তর যুগের অন্তিম লগ্নে পুরুষরা যখন শিকার করত তখন মেয়েরা খাদ্যের জন্য বুনো ঘাসের বীজ সংগ্রহ করত। এই বুনো ঘাসের বীজ থেকে উত্তরাধিকার সূত্রে এসেছিল গম ও যব। এরকম বীজ উপযুক্তভাবে বপন করে জমিকে আবাদি জমি করে তোলার জন্য সুচিন্তিতভাবে চূড়ান্ত পদক্ষেপ গৃহীত হয়েছিল। খাদ্যের জোগান বৃদ্ধির জন্যই নব্যপ্রস্তর যুগে সাধারণ জমিকে আবাদি জমিতে পরিণত করার দরকার পড়েছিল। জমিকে আবাদি করার জন্য প্রয়োজন ছিল উৎকৃষ্ট মানের হাতিয়ার।

গর্ডন চাইল্ড তাঁর 'Man Makes Himself' (১৯৩৬) গ্রন্থে নব্য প্রস্তর যুগে উৎকৃষ্ট হাতিয়ার নির্মাণ প্রক্রিয়ার কথা উল্লেখ করেছেন। এই সময়ে পাথর দিয়ে পাথর ঘষে প্রস্তর নির্মিত হাতিয়ারকে আরও ধারালো ও মসৃণ করা হয়েছিল। নতুন ধরনের হাতিয়ার মানুষের বস্তুগত জীবনে তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন নিয়ে এল। প্রস্তর নির্মিত ধারালো কুঠার দিয়ে গাছ কাটা ও বনজঙ্গল পরিষ্কার করা হত। মসৃণ ও ধারালো পাথর দিয়ে এক ধরনের আদিম নিড়ানি (Primitive hoe) তৈরি করা হয়েছিল। এই নিড়ানি দিয়ে মাটি নরম করে তাকে বীজ বপনের উপযুক্ত করা হল। তাছাড়া সেই সময় ধারালো অগ্রভাগ বিশিষ্ট বর্শা ও তির তৈরি হয়েছিল। শস্য গুঁড়ো করার জন্য হামানদিস্তার আবিষ্কার-ও এই যুগে। তাছাড়া এই যুগ মাটি পুড়িয়ে মৃৎশিল্পের সূচনারও সাক্ষী। গর্ডন চাইল্ড নব্যপ্রস্তর যুগের চারটি বৈশিষ্ট্যর উল্লেখ করেছিলেন (ক) কৃষি কাজের সূচনা, (খ) পশুপালন, (গ) মৃৎ শিল্পের সূচনা ও বিকাশ এবং (ঘ) শস্য পেষণের জন্য প্রস্তর নির্মিত মসৃণ হাতিয়ারের আবিষ্কার। বিগত ৫০-৬০ বছর ধরে এ বিষয়ে যা গবেষণা হয়েছে তা কতগুলি বৈশিষ্ট্যর সূচক। যেমন এ সময় গৃহনির্মাণে স্থাপত্যের পরিচয় পাওয়া যায় যা, নব্য প্রস্তর যুগের মানুষের স্থিতিশীল জীবনের ইঙ্গিতবাহী। শস্য কাটা ও গুঁড়ো করার জন্য নির্মিত নিপুণ হাতিয়ার খাদ্য প্রক্রিয়াকরণ এর সাক্ষ্য বহন করে। মৃৎ শিল্পের বিকাশ খাদ্যবস্তু সঞ্চয় ও বন্ধনের ইঙ্গিতবাহী। পুরাতাত্ত্বিক অনুসন্ধান এর ফলে সম্প্রতি জানা গেছে যে কেবল নিকট

প্রাচ্যেই নয়, ইউরোপের কিছু অঞ্চলে, বিশেষত স্ক্যান্ডিনেভীয়, দানিয়ুব, আয়ারল্যান্ড ইত্যাদি অঞ্চলেও মানুষ স্থিতিশীল ও শান্ত জীবন-যাপনে অভ্যস্ত ছিল।

নব্য প্রস্তর যুগে কৃষির সূচনা, উৎকৃষ্ট হাতিয়ার নির্মাণ, বিভিন্ন জন্তুকে পোষ মানানো এবং মৃৎ শিল্পের বিকাশ ইত্যাদি অবশ্যই সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন ও প্রগতির ইঙ্গিতবাহী। এই তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তনের সূত্র ধরেই গর্ডন চাইল্ড তাঁর ১৯৩৬ সালে প্রকাশিত Man Makes Himself গ্রন্থে 'নব্যপ্রস্তরীয় বিপ্লব' (Neolithic Revolution) কথাটি ব্যবহার করেছেন। নব্য প্রস্তর যুগের বর্ণনা প্রসঙ্গে চাইল্ড বলেছেন প্রথম বিপ্লব যা মানুষের অর্থনীতি আমূল পাল্টে দিয়েছিল আর খাদ্যের যোগান এর উপর মানুষের নিয়ন্ত্রণ সুপ্রতিষ্ঠা করেছিল (The first revolution that transformed human economy gave man control over his own food supply.) কৃষিকর্মের কৌশল রপ্ত করার ফলেই মানুষের জীবনযাত্রার ইতিহাস এক বৈপ্লবিক পরিবর্তনের সাক্ষী হয়ে রইল। গর্ডন চাইল্ড এর মতে- খাদ্য উৎপাদন- স্বেচ্ছাপ্রণোদিত চাষাবাদ, শস্য ফলানো, পশুদের পোষ মানানো ও প্রজননের বন্দোবস্ত এবং তাদের নির্বাচন- আগুনের ওপর কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠার পর মানব ইতিহাসে এটি ছিল শ্রেষ্ঠ অর্থনৈতিক বিপ্লব (Food production—the deliberate cultivation of plants–especially cereals and the taming, breeding and selection of animals and economic revolution the greatest in human history after the mastery of fire.)

প্রকৃতপক্ষে শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের ওপর নির্ভরশীলতা হ্রাস করে খাদ্য উৎপাদন ও গৃহপালিত পশুর উপর নির্ভরশীলতা বৃদ্ধি মানুষের সাংস্কৃতিক প্রগতির ক্ষেত্রে এক মৌলিক পরিবর্তন নিয়ে এসেছিল। কৃষিকাজে অভ্যস্ত হবার পর অধিকাংশ মানুষ তাদের ভ্রাম্যমাণ জীবন পরিত্যাগ করে নির্দিষ্ট স্থানে শান্ত ও স্থিতিশীল জীবন (sedentary life) যাপন করতে শুরু করে। একই সঙ্গে শুরু হয়েছিল জনসংখ্যা বৃদ্ধির প্রক্রিয়া। এর অনিবার্য পরিণতি হিসাবে পরিবারের আয়তন বৃদ্ধি পেল, গ্রাম গড়ে উঠল, এবং বিশ্বের প্রায় সমস্ত অঞ্চলে কৃষির বিস্তার ঘটল। এই নতুন অর্থনৈতিক পরিবর্তন সমাজে শ্রম বিভাজন ও সামাজিক বৈষম্যের জন্ম দিল। ব্যক্তির হাতে খাদ্যের উদ্বৃত্ত উৎপাদন সঞ্চিত হল এবং নগরভিত্তিক সভ্যতার উত্থানের পথ প্রশস্ত হল। এই পরিবর্তন গুলোকেই গর্ডন চাইল্ড 'বৈপ্লবিক' হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁর মতে প্রাথমিক পর্বে বুনো ঘাসের বীজ সংগ্রহ করা হত (যে বীজ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে গম ও যব এসেছিল) এবং তারপর এই বীজ উপযুক্ত জমিতে বপন করে ও আগাছা নির্মূল করে জমিকে আবাদি জমিতে পরিণত করার উদ্দেশ্যে সুচিন্তিত পদক্ষেপ নেওয়া হয়েছিল। এই প্রক্রিয়ায় ছিল নব্যপ্রস্তরীয় 'বিপ্লব' এর প্রাথমিক পদক্ষেপ।

চাইল্ড এর মতে নব্য প্রস্তর যুগের উন্নত হাতিয়ার জমি কর্ষণের কাজকে সহজে করে তোলে। ফলে মানুষ শুধু বুনো শস্য সংগ্রহ করার মধ্যে আটকে না থেকে শস্য বীজ মাটিতে রোপন করে খাদ্য উৎপাদনে আগ্রহী হয়ে ওঠে। আগেকার অমসৃণ হাতিয়ারের চেয়ে এখনকার মসৃণ অস্ত্র নানা কাজে ভীষণ উপযোগী হয়ে ওঠে। মাটি খননের কাজে সূক্ষ্ম হাতিয়ার বেশি কাজে আসে। নব্য প্রস্তর যুগের অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের মধ্যে মৃৎশিল্পের আবিষ্কার, অনড় তথা স্থির জীবনযাত্রা, স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সমাজের আবির্ভাব, লিঙ্গের ভিত্তিতে শ্রমবিভাজন ইত্যাদি উল্লেখযোগ্য। গর্ডন চাইল্ড এই পরিবর্তন গুলোকে চিহ্নিত করার জন্য Neolithic Revolution বা নব্য প্রস্তর বিপ্লব কথাটি ব্যবহার করেছেন। তবে এই পরিবর্তন কোনো আকস্মিক পরিবর্তন নয়, ধীরে ধীরে ক্রমশ পরিবর্তন যা বিভিন্ন বৈশিষ্ট্য ও পরিণতি নিয়ে বিভিন্ন স্থানে কয়েকবার আবির্ভূত হয়েছে। বিপ্লব বলতে সাধারণত আমরা আকস্মিক আমূল পরিবর্তনের কথা বুঝি। তবে মধ্য প্রস্তর যুগের সঙ্গে

যদি নব্য প্রস্তর যুগের পরিবর্তন তুলনা করা যায় তাহলে দেখা যাবে মধ্য প্রস্তর যুগের আট ভাগের এক ভাগ সময়ে নব্য প্রস্তর যুগের পরিবর্তন সংঘটিত হয়েছিল। এই অল্প সময়ে মানব জীবনের গভীর পরিবর্তনের ফলেই নব্যপ্রস্তর বিপ্লব আখ্যা দেওয়া হয়েছে।

৮.৪ নব্যপ্রস্তর বিপ্লব তত্ত্বের সমালোচনা

গর্ডন চাইল্ড এর 'নব্যপ্রস্তরীয় বিপ্লব' সংক্রান্ত ধারণা কিছু কিছু ঐতিহাসিক এর সমালোচনার মুখে পড়েছে। গ্লিন ড্যানিয়েল (Glyn Daniel) তাঁর 'The First Civilisations:- The Archaeology of their Origins'– (1968) গ্রন্থে স্পষ্টই বলেছিলেন উপরোক্ত ঘটনাবলীর মধ্যে কোন বৈপ্লবিক পরিবর্তন চোখে পড়ে না; বরং গোটা প্রক্রিয়া ছিল মানব সমাজের বিবর্তনের পরিণতি। তাঁর মতে, মানব সমাজের সামান্য অগ্রগতি কখনোই বৈপ্লবিক পরিবর্তন এর সমার্থক নয়। বীজ সংগ্রহ থেকে বীজ বপন সবকিছুই ছিল মানব সমাজের বিবর্তনের অঙ্গ। আর এক প্রাক-ইতিহাসবিদ গ্রাহাম ক্লার্ক (Graham Clark) তাঁর 'World Prehistory- In New Prespective' (1977) গ্রন্থে 'নব্যপ্রস্তরীয় বিপ্লব' কথাটি নিয়ে সংশয় প্রকাশ করেছেন। তাঁর মতে পুরাপ্রস্তর যুগ ও নব্যপ্রস্তর যুগের মাঝখানে মধ্যপ্রস্তর যুগীয় সেতুর একটা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। পুরাপ্রস্তর ও নব্যপ্রস্তর যুগের মধ্যে যোগসূত্র স্থাপন করেছিল মধ্য প্রস্তর যুগ। ক্লার্ক আরও বলেছেন, যে প্রক্রিয়া মানুষ, পশু ও গাছপালার পারস্পরিক সম্পর্কের পরিবর্তন ঘটিয়ে একটি উন্নত মানের সামাজিক ব্যবস্থা গড়ে তুলেছিল, সেই প্রক্রিয়ার সঙ্গে কেবল নব্যপ্রস্তরীয় নয়, মধ্যপ্রস্তরীয় বেশ কিছু গোষ্ঠী যুক্ত ছিল। তাই ক্লার্ক নব্যপ্রস্তর যুগের পরিবর্তনের মধ্যে কোন বৈপ্লবিক বৈশিষ্ট্য খুঁজে পাননি। গর্ডন চাইল্ডের এই তত্ত্ব মানতে নারাজ রবার্ট জে. ব্রেইডউড (Robert J. Breidwood)। তিনি যুক্তি দেখান প্লেইসটোসিন যুগের মধ্যেও পরিবেশের পরিবর্তন ঘটেছিল কিন্তু তা থেকে কৃষির সূচনা হয়নি। তিনি বলেন কিছু 'নিউক্লিয়ার' বা কেন্দ্রীয় ক্ষেত্রে পশুপালন বা বন্যপ্রাণী পোষ মানানো ও বুনোগাছ গৃহে উৎপাদন সম্ভব হয়েছিল যাদের সে সম্ভাবনা ছিল। এই তত্ত্বে মানুষ কেন পশুপালন ও শস্য চাষে প্রণোদিত হয়েছিল সে ব্যাখ্যা দেওয়া হয়নি। মানব জাতি কেন তার দীর্ঘদিনের অনুসৃত জীবনযাত্রার আমূল পরিবর্তন ঘটিয়েছিল তার যুক্তিগ্রাহ্য কারণ অনুসন্ধান প্রয়োজন। লুইস. আর. বিনফোর্ড (Lewis. R. Binford) ব্রেইডের তত্ত্বকে অগ্রাহ্য করেন। কারণ তাঁর তত্ত্ব প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে প্রমাণিত নয়। বিনফোর্ড বলেন জাতি তত্ত্বের প্রমাণ আমাদের এই নির্দেশ দেয় যে যেখানে পরিবেশ ও মানব সমাজ স্থির বা স্থিতিশীল সেখানে মানুষ ও খাদ্য সম্পদের মধ্যে একটি ভারসাম্য রক্ষিত হয় এবং খাদ্য সংগ্রহের জন্য সেখানে নতুন কৌশল অবলম্বন করতে হয় না। দুটি কারণে মানুষ ও খাদ্যের মধ্যে ভারসাম্য নষ্ট হতে পারেঃ- পরিবেশ পরিবর্তনজনিত চাপের ফলে অথবা জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত কারণে। বিনফোর্ডের মতে জনসংখ্যার চাপ দুই ভাবে সৃষ্টি হতে পারেঃ- অভ্যন্তরীণ দিক থেকে মানব গোষ্ঠীর সংখ্যা বৃদ্ধির ফলে এবং বাহ্যিক দিক থেকে অভিপ্রয়ান জনিত কারণে জনসংখ্যার চাপ অনুভূত হয়। কৃষির সূচনা প্রসঙ্গে বিনফোর্ড বাহ্যিক জনসংখ্যার চাপের কথা বলেছেন। বিনফোর্ড যুক্তি দেখান প্লেইসটোসিন যুগের শেষে সমুদ্রপৃষ্ঠ স্তর বৃদ্ধির ফলে উপকূলবর্তী এলাকার মানুষ ভিতরের সমভূমির দিকে অভিপ্রয়াণ করতে বাধ্য হয়। এর ফলে অভ্যন্তরীণ ভূমির মানুষ ও খাদ্য সম্পদের ভারসাম্য নষ্ট হয়। তাই খাদ্য জোগানের নতুন পরিকল্পনার কথা তারা ভাবতে বাধ্য হয়। কিন্তু সমস্যা হল সমুদ্র উপকূল থেকে অভ্যন্তরে মানব অভিপ্রয়াণের তেমন প্রমাণ নেই। অভ্যন্তরীয় জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত কারণেও মানুষ ও খাদ্যের ভারসাম্য নষ্ট

হতে পারে। তবে এখানেও একটি বিষয় মাথায় রাখতে হবে, সেই সময় যখন মানবসমাজ ক্ষুদ্র গোষ্ঠীভুক্ত তখন অতিরিক্ত জনসংখ্যা বৃদ্ধি জনিত কারণে বিপুল খাদ্য সম্পদের সংকট উপস্থিত হতে পারে কিনা। কেন্ট ফ্ল্যান্নেরি (Kent Flannery) খাদ্য উৎপাদন তথা কৃষির সূচনা প্রসঙ্গে এক নতুন তত্ত্ব উপস্থাপন করেন। তিনি বলেন নতুন পরিবেশে চারা গাছের অভিযোজন এর সুবিধা মানুষকে বুনোগাছকে ঘরে চাষ করতে ও বন্যপ্রাণীকে গৃহপালিত করতে উদ্বুদ্ধ করে। ফ্ল্যান্নেরি ভুট্টা গাছের উদাহরণ দিয়ে বোঝান যে, প্রাকৃতিক পরিবেশে যে ভুট্টা গাছ কম ফলনশীল এবং যার শস্যদানা খুব ছোট সেই গাছকেই অন্যস্থানে লাগালে তারা উৎপাদন বাড়ে এবং দানাগুলো বড় হয়। নতুন মাটিতে ও পরিবেশের ফলন বৃদ্ধি দেখে মানুষ বেশি করে বুনোগাছকে ঘরে চাষ করতে উদ্বুদ্ধ হয়। অর্থাৎ মানুষ বুঝতে সক্ষম হয় কেন শস্য চাষ তথা কৃষি কাজ খাদ্য সংগ্রহের চেয়ে বেশি সুবিধাজনক। কিন্তু ফ্ল্যান্নেরি এখানে ব্যাখ্যা করেননি কেন মানুষ গৃহে উৎপাদনের এই পরীক্ষা প্রথমে করেন।

৮.৫ বিপ্লব না বিবর্তন

নব্য প্রস্তর যুগীয় বিপ্লব কথাটি গর্ডন চাইল্ড ব্যবহার করেছিলেন ১৯৩৬ সালে। পরবর্তীকালে তিনি তাঁর বক্তব্যের ব্যাখ্যা দিতে গিয়ে বলেন, বিপ্লব কথাটি বলতে তিনি অকস্মাৎ পরিবর্তন বোঝাননি। বরং তিনি বলতে চেয়েছেন নব্যপ্রস্তর যুগে বিভিন্ন গোষ্ঠীর আর্থ-সামাজিক সংগঠনের ক্রমান্বয়ী পরিবর্তন চূড়ান্ত পর্যায়ে উন্নীত হয়েছিল। সুতরাং শিকার সংগ্রহের যুগ থেকে খাদ্য উৎপাদনের যুগে উত্তরণ ছিল বিবর্তনের অনিবার্য পরিণতি, এটি কোন বৈপ্লবিক ঘটনা নয়। তাছাড়া এই পরিবর্তনের প্রক্রিয়া দ্রুত ছিল না, এবং বিশ্বের বিভিন্ন প্রান্তে এই পরিবর্তন একই রকম ছিল না। তবে 'নব্যপ্রস্তর যুগের বিপ্লব' কথাটির যথার্থতা বিশ্লেষণ করতে গেলে 'বিপ্লব' কথাটির সংজ্ঞা নির্ণয় করা জরুরি। সাধারণত বিপ্লব কথাটির অর্থ- যখন অত্যন্ত অল্প সময়ের মধ্যে সামান্য পরিমাণগত পরিবর্তন গুরুত্বপূর্ণ গুণগত পরিবর্তন নিয়ে আসে। নব্যপ্রস্তর যুগের আগে লক্ষ লক্ষ বছর ধরে মানব সভ্যতার অগ্রগতি ঘটেছিল অত্যন্ত শ্লথ গতিতে। কিন্তু ৯০০০-৬০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে মানুষের কর্মকান্ড ও অগ্রগতি ছিল চমকপ্রদক ও যুগান্তকারী। তাছাড়া পৃথিবীর প্রায় সর্বত্রই যখন বিকল্প জীবন ধারণের উপায় হিসাবে কৃষির আগমন ঘটেছিল, তখন মানুষ আর শিকারী-সংগ্রাহক জীবনে ফিরে যায়নি। নব্যপ্রস্তর যুগের সংক্ষিপ্ত সময়কালে মানুষের সামাজিক জীবনের যে সুদূরপ্রসারী পরিবর্তন এসেছিল, তার নিরিখে এই যুগের বৈশিষ্ট্যগুলি কে 'বিপ্লব' হিসেবে আখ্যায়িত করা অসংগত হবে না।

৮.৬ বিভিন্ন নব্যপ্রস্তর যুগীয় সংস্কৃতি

১৯৫০ সাল পর্যন্ত প্রাক-ইতিহাসবিদদের ধারণা ছিল নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতি বেশিদিনের পুরোনো নয়। কিন্তু পুরাতাত্ত্বিক গবেষণায় রেডিওকার্বন পদ্ধতি প্রয়োগের পর এই ধারণা ভ্রান্ত প্রমাণিত হয়েছে। ১৯৪৯ সালে রেডিওকার্বন পদ্ধতির মাধ্যমে কোন পুরনো সংস্কৃতির কাল নির্ণয়ের বিষয়টি আবিষ্কার করেন মার্কিন বিজ্ঞানী। অধিকাংশ গৃহই ছিল একটি ঘর বিশিষ্ট। কিছু বাড়িতে একাধিক ঘরের অস্তিত্ব ছিল। প্রাথমিক পর্বে এই সব বাড়ির কাঁদা ও কাঠ দিয়ে তৈরি। পরবর্তী পর্বে প্লাস্টার করা মেঝে ও দেয়ালের সন্ধান পাওয়া গেছে। নব্যপ্রস্তরীয় জেরিখোর অধিকাংশ বাড়ির সংলগ্ন এলাকায় গর্ত থাকত। এই গর্তগুলি খাদ্যশস্য, বাদাম ইত্যাদি

মজুত করে রাখা হত। দীর্ঘদিন ধরে নব্যপ্রস্তরীয় সংস্কৃতির সঙ্গে মৃৎশিল্পের বিকাশ ওতপ্রোতভাবে জড়িত ছিল। কিন্তু জেরিখো অঞ্চলে পুরাতাত্ত্বিকরা কোনো রকম মৃৎশিল্প সন্ধান পাননি।

নব্য প্রস্তর যুগের প্রাথমিক স্তরে মৃৎশিল্পের সূচনা হয়নি। মৃৎশিল্পের পূর্ববর্তী যুগকে পুরাতাত্ত্বিকরা দুটি স্তরে ভাগ করেছেন- প্রাক-মৃৎশিল্প নব্য প্রস্তর-ক বা Pre-pottery Neolithic-A (PPN-A) এবং প্রাক-মৃৎশিল্প নব্যপ্রস্তর-খ বা Pre-pottery Neolithic-B (PPN-B)। এই দুটি স্তরের সংস্কৃতিতে নরম চুনাপাথর দিয়ে তৈরি বাসনপত্রের সন্ধান পাওয়া গেছে। প্রাক-মৃৎশিল্প পর্বে জেরিখো অঞ্চলে একটি বিরাট প্রতিরক্ষার প্রাচীরের অস্তিত্ব ছিল। এই প্রাচীর প্রাচীন স্থাপত্য শৈলীর উৎকর্ষের সাক্ষ্য বহন করে। গোটা বসতিকে ঘিরে রাখত এই প্রাচীর। এই প্রাচীরের ৩০ ফুট উঁচু একটি চূড়া ছিল।

PPN-A ও PPN-Bর পরবর্তী পর্যায়ে মৃৎশিল্পের সূচনা ও বিকাশ ঘটতে থাকে। মৃৎশিল্পের সূচনা নব্যপ্রস্তর যুগের প্রযুক্তিগত অগ্রগতির সাক্ষ্যবাহী। কাদায় জল মিশিয়ে পাত্রকে একটা বিশেষ রূপ দেওয়া হত; তারপর আগুনে পুড়িয়ে পাত্রগুলিকে শক্ত ও স্থায়ী করা হত। ইতিমধ্যে নব্যপ্রস্তর যুগের মানুষ আগুনের নিয়ন্ত্রিত ব্যবহার শিখে নিয়েছিল। নতুন পদ্ধতি উনুন তৈরি করা হয়েছিল, যাতে কাদা পুড়িয়ে শক্ত করা পর্যন্ত তাতে আগুন থাকে। মৃৎপাত্রগুলিতে কাঁচা ও রান্না করা দু'ধরনের খাদ্যই মজুত করে রাখা হত। এক একটি গোষ্ঠী এক এক ধরনের পাত্র তৈরি করত, আর সেগুলোকে সুসজ্জিত করার প্রক্রিয়াতেও বৈচিত্র ছিল।

জেরিখোর পার্শ্ববর্তী অঞ্চলে বিশেষত সিরিয়ার আবু হুরোর এবং জর্ডনের আইন ঘজল এলাকাতেও পুরাতাত্ত্বিকরা কৃষির সূচনার প্রমাণ পেয়েছেন। আবু হুরোর অঞ্চলের আয়তন ছিল বেশ বড়ো, প্রায় ২৮ একর। জোরিখো, আবু হুরোর ও আইন ঘজল অঞ্চলের মানুষ গম উৎপাদনের পেছনে বেশি সময় ব্যয় করত। কৃষির সুবিধার জন্য তারা বিশেষ ধরনের প্রস্তর নির্মিত হাতিয়ার নির্মাণের কৌশল আয়ত্ত করেছিল। এই অঞ্চলে প্রচুর কাস্তের সন্ধান পাওয়া গেছে। তাছাড়া এই সময় পাথর দিয়ে এক ধরনের ভারী যন্ত্র নির্মাণ করা হত। এই যন্ত্র শস্য পেষাই এর কাজে ব্যবহৃত হত। এই অঞ্চলের মানুষ ছাগল, ভেড়া ইত্যাদি পশুকে পোষ মানাতে শুরু করে। নিকট প্রাচ্যের উপরোক্ত অঞ্চল থেকে প্রচুর তির পাওয়া গেছে, যা প্রমাণ করে যে তখনও মানুষের জীবনধারণের জন্য শিকারের উপর নির্ভরশীলতা থেকে গিয়েছিল।

এ বিষয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকরা মোটামুটি নিঃসন্দেহ যে প্রথম নব্য প্রস্তরীয় সংস্কৃতি জেরিখোতে গড়ে উঠেছিল। কিন্তু প্রত্নতাত্ত্বিক খননের মাধ্যমে প্রথম নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া গিয়েছিল ১৯৪০এর দশকে উত্তর ইরাকের জ্যাগ্রোস পর্বতের পাদদেশে। রবার্ট ব্রেইডউড-এর নেতৃত্বে ও তত্ত্বাবধানে খননকার্য চলেছিল। রবার্ট ব্রেইডউড দাবি করেছিলেন জ্যাগ্রোস পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত জার্মো অঞ্চলেই প্রথম নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল। কিন্তু পরবর্তীকালে আর এক পুরাতাত্ত্বিক ক্যাথলিন কেনিয়ন (Kathleen Kenyon) খননকার্য চালিয়ে দাবি করেন জেরিখো প্রাচীনতম নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির কেন্দ্র। সাম্প্রতিক গবেষণায় অবশ্য কেনিয়নের দাবিকে সঠিক প্রমাণ করেছে। পুরাতাত্ত্বিকরা এ বিষয়ে সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে জেরিখো প্রাচীনতম নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতি সাক্ষ্য বহন করে। জেরিখোতে নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল আজ থেকে সাড়ে ১০ হাজার বছর আগে, আর জ্যাগ্রোস পর্বতের পাদদেশে অবস্থিত জার্মো অঞ্চলে নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির আগমন ঘটে ৭ হাজার বছর আগে। তবে কৃষি ও খাদ্য উৎপাদনের আদি ইতিহাস আলোচনা করতে গেলে উত্তর ইরাকের জার্মো এবং আলিকোষ অঞ্চলের গুরুত্ব অনস্বীকার্য।

বর্তমান তুরস্ক বা আনাতোলিয়া অঞ্চলে কৃষির সূচনা হয়েছিল আজ থেকে প্রায় সাড়ে নয় হাজার বছর আগে। এই অঞ্চলে সবচেয়ে তাৎপর্যপূর্ণ নব্যপ্রস্তরীয় ক্ষেত্র ছিল ক্যাটাল হুউক। এখানে নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির সূচনা আজ থেকে ৮০০০ বছর আগে। ক্যাটাল হুউক ছিল এক বিরাট বসতি। ৩২ একর এলাকা জুড়ে এই অঞ্চলের বিস্তার। এখানে ইট রোদে পুড়িয়ে তাকে শক্ত করে তা দিয়ে বাড়ি তৈরি হত। এই অঞ্চলে কিছু উপসনাস্থলের সন্ধান পেয়েছেন পুরাতাত্ত্বিকরা। ক্যাটাল হুইক অঞ্চলকে একটি শহর হিসাবে বর্ণনা করা যায়। এখানে পাথরের কাঁচামাল, ঝিনুক বিনিময় প্রথার মাধ্যম হিসেবে আনাতোলিয়া অঞ্চলে গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছিল। এই পাথর হাতিয়ার নির্মাণের জন্য অত্যন্ত উপযোগী ছিল।

জেরিখো অঞ্চলের ঝরনার উল্লেখ আগেই করা হয়েছে। এই অঞ্চলে জনসংখ্যা বৃদ্ধির পর ঝরনা থেকে খাল কেটে কৃষি জমি গুলিকে সিক্ত করা হত। কৃষির ইতিহাসে এটি ছিল যুগান্তকারী পদক্ষেপ। ক্যাথলিন কেনিয়ন মন্তব্য করেছেন জেরিখোর নব্য প্রস্তর যুগের মানুষ এক সামাজিক কর্মপ্রক্রিয়ার (Social Mechanism) মাধ্যমে কৃষি জমিগুলিতে সমানভাবে জলবন্টন করতে সক্ষম হয়েছিল।

পশুদের পোষ মানানো ও পশুপালন ছিল আরও জটিল প্রক্রিয়া। সরাসরি হত্যা করে খাদ্যের ব্যবহার করার পরিবর্তে মানুষ পশুকে সঙ্গে নিয়ে বাঁচার কৌশল রপ্ত করেছিল নব্য প্রস্তর যুগে। পশু পালন করে তাদের থেকে মানুষ দুধ, ডিম, মাংস ইত্যাদি খাদ্য সংগ্রহ করত। পশুদের এমন ভাবে প্রজননের বন্দোবস্ত করা হয়েছিল যে তাদের থেকে উদ্বৃত্ত ডিম ও দুধ পাওয়া যেত। মানুষের হস্তক্ষেপের মাধ্যমে ভেড়ার লোম থেকে পশম তৈরির সূচনাও এই যুগে। পশুদের পোষ মানানোর জন্য মানুষকে যথেষ্ট সর্তকতা অবলম্বন করতে হয়েছিল। প্রজননের জন্য গৃহপালিত পশুরা যাতে বন্য হিংস্র জন্তুর সঙ্গে মিলিত না হয়, সে বিষয়ে মানুষকে সজাগ দৃষ্টি রাখতে হত। তবে একথা উল্লেখ করা জরুরি যে পশুকে পোষ মানানোর প্রক্রিয়া শুরু হয়েছিল উচ্চ পুরাপ্রস্তর যুগে। কুকুর ছিল প্রথম গৃহপালিত পশু। উচ্চ পুরা প্রস্তর যুগের মানুষ কুকুরের সাহায্যে শিকার করত। তাছাড়া সে যুগে বল্গা হরিণকেও পোষ মানানো হয়েছিল। পোষ মানা বলগা হরিণ শিকারের দিকে নিয়ে এসে শিকারির সুবিধা করে দিতে।

তবে উচ্চ পুরাপ্রস্তর যুগের পশুপালন ও নব্যপ্রস্তর যুগের পশু পালনের মধ্যে পার্থক্য ছিল। নব্যপ্রস্তর যুগে পশুপালনের বিষয়টি মানুষের জীবন যাত্রার ক্ষেত্রে নতুন মাত্রা যোগ করেছিল। উচ্চ পুরাপ্রস্তর যুগে গৃহপালিত জন্তু শিকারে সাহায্য করার কাজে ব্যবহৃত হত। কিন্তু নব্যপ্রস্তর যুগে অনেক বেশি সংখ্যায় বিচিত্র ধরনের পশুকে পোষ মানানো হত। তাছাড়া খাদ্য উৎপাদনকারী নব্যপ্রস্তরীয় সমাজে পশুদের প্রতি মানুষের দৃষ্টিভঙ্গি উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন এসেছিল। এই যুগের মানুষ পশুদের প্রতি একটা আবেগ অনুভব করতে শুরু করেছিল, যা পুরাপ্রস্তর সমাজে সম্পূর্ণ অনুপস্থিত ছিল। শিকার সংগ্রাহক যুগ অনেক বেশি সংখ্যায় পশুপালনের সহায়ক ছিল না।

নব্য প্রস্তর যুগের প্রাথমিক পর্বে উৎপাদন প্রক্রিয়ার ওপর থেকে একটি যৌথ নিয়ন্ত্রণ ছিল। দল (band) গুলোর পরিবর্ত উপজাতি বা গোষ্ঠী (Clan) গড়ে উঠতে শুরু করে। উপজাতি বা গোষ্ঠী হয়ে ওঠে মুখ্য সামাজিক একক। ক্রমে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ পরিবার গড়ে ওঠে। গোষ্ঠীগুলি ছিল পরিবারের বর্ধিত রূপ। রক্তের সম্পর্ককে কেন্দ্র করে গোষ্ঠী ও পরিবার গড়ে উঠেছিল। একই বংশধারার উপর ভিত্তি করে গোষ্ঠী ও পরিবার তৈরি হত। আত্মীয়তার বন্ধন অত্যন্ত কঠোরভাবে মান্য করা হত। তার ওপর ভিত্তি করে বিবাহ/সহবাস ইত্যাদির বিধিনিয়ম নির্দিষ্ট করা হয়েছিল। ভিন্ন গোষ্ঠীতে বিবাহ প্রথা (exogamy) প্রচলিত ছিল। একই

গোষ্ঠীভুক্ত নারী ও পুরুষ পারস্পরিক সম্পর্কে আবদ্ধ হতে পারত না। অর্থাৎ একই রক্তের সম্পর্ক বিশিষ্ট নারী ও পুরুষের মধ্যে বিবাহ নিষিদ্ধ ছিল।

ভিন্ন গোষ্ঠীর মধ্যে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনের রীতি সামাজিক সহযোগিতার বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছিল। বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপনকারী দুটি গোষ্ঠীর মধ্যে উপহার আদান প্রদানের রীতির প্রচলন ছিল। কেবলমাত্র বস্তু নয়, পাত্রপাত্রী উপহার দেওয়ার প্রথাও গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে প্রচলিত ছিল। সন্তানের ধারণ ও পালনের জন্য মায়ের ভূমিকা প্রশ্নাতীত। মূলত এই কারণেই আদিম সমাজে কোম (tribe) ও গোষ্ঠীতে (Clan) ভরণপোষণের দায়িত্ব মেয়েদের ওপর বর্তায়। আত্মীয়তার বন্ধন যেহেতু মায়ের সূত্র ধরেই গড়ে উঠত, তাই এই সমাজ ছিল 'মাতৃধারানুসারী' (Matrilinear)। জে. ডি. বার্নাল তাঁর 'Science in History' গ্রন্থে অনুমান করেছেন এমনও হতে পারে যে একেবারে গোড়ার দিকে মেয়েরাই গোষ্ঠী পরিচালনা করতেন, অর্থাৎ সে সমাজ মাতৃতান্ত্রিক (Matriarchal) ছিল। নব্য প্রস্তর যুগের প্রাথমিক পর্বে কৃষির বিকাশের ক্ষেত্রে নারীদের উল্লেখযোগ্য ভূমিকা ছিল। কৃষিজ পণ্য সঞ্চয় করে রাখার জন্য মাটির বাসন প্রথম মেয়েরাই তৈরি করে। পুরাপ্রস্তর যুগে বুনোঘাসের বীজ সংগ্রহ করার কাজে মেয়েরাই যুক্ত রক্ত থাকত। নব্যপ্রস্তর যুগে যখন বীজ বপনের পদ্ধতি আবিষ্কৃত হল, তখনও তাই মেয়েরাই মুখ্য ভূমিকা পালন করেছিল।

ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-অনুষ্ঠান নব্য প্রস্তর যুগে আরো বিশদ রূপ নিয়েছিল। আদি নব্য প্রস্তর বসতিগুলিতে কাদা ও প্লাস্টার নির্মিত প্রচুর মূর্তির সন্ধান পাওয়া গেছে। এগুলির অধিকাংশই নারী মূর্তি, যার মধ্যে গর্ভবতী নারীমূর্তিও পাওয়া গেছে। নারীমূর্তি গুলি পড়ে দেবীমূর্তি হিসেবে পরিচিত হয় এবং এগুলো হয়ে ওঠে কৃষিভিত্তিক সংস্কৃতির অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ। এখান থেকেই উর্বরতা কামনার ব্রত পালনের আচার অনুষ্ঠানের (fertility cult) সূচনা। এইসব আচার-অনুষ্ঠানে মানুষের যৌন মিলনকে অধিক শস্য ফলনের অনুপ্রেরণা হিসেবে ধরা হত। জেরিখো অঞ্চলে খনন কার্যের মাধ্যমে জানা যায় যে বাসস্থানগুলিতে মানুষের খুলি সযত্নে রক্ষিত থাকত। ক্যাথলিন কেনিয়ন মনে করেন সে যুগে খুলি পূজা ছিল ধর্মীয় বিশ্বাসের অঙ্গ। অনেক খুলি ছিল গোষ্ঠীর পূর্বপুরুষদের। ক্যাটাল হুউক অঞ্চলে অসংখ্য ষাঁড়ের খুলি আবিষ্কৃত হয়েছে। ষাঁড়ের খুলির পূজার জন্য বেশ কিছু উপাসনা স্থলের সন্ধান পাওয়া গেছে। আনাতোলিয়া ও পূর্ব ভূমধ্যসাগরীয় অঞ্চলে ষাঁড়ের খুলি পূজার প্রচলন বহুদিন পর্যন্ত টিকেছিল।

৮.৭ উপমহাদেশে খাদ্য উৎপাদনের সূচনা

ব্রিজেট এবং রেমন্ড আলচিন তাদের 'The Rise of Civilization in India and Pakistan' শীর্ষক গ্রন্থে প্রথম কৃষি সমাজের আবির্ভাব প্রসঙ্গে বলেছেন প্লেইসটোসিন যুগের শেষে আনুমানিক দশ হাজার বছর পূর্বে পশ্চিম ও দক্ষিণ এশিয়ার জলবায়ু অনেকটা একালের মতোই ছিল। এর ফলে মানুষের পরিবেশ নিয়ন্ত্রণের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ অগ্রগতি ঘটে যা ৬ হাজার বছর আগে উভয় স্থানে নগরসমাজ গড়ে উঠতে সাহায্য করে। সবচেয়ে মৌলিক ক্ষেত্রে যে পরিবর্তন ঘটে তা হল বিভিন্ন প্রজাতির পশু পালন এবং শস্য উৎপাদন।

গোটা বিশ্বের কথা বিচার করলে দেখা যাবে নব্য প্রস্তর যুগের সূচনা হয়েছিল ৯০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে নব্য প্রস্তরযুগের সূচনা হয়েছিল ৭ হাজার খ্রিষ্টপূর্বাব্দে পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশের মেহেরগড়ে। মেহেরগড়ের অবস্থান বোলান নদীর তীরে কোচি সমভূমিতে যাকে বালুচিস্তানের 'bread

basket' আখ্যা দেয়া হয়। এখানকার বসতি সিন্ধু সমভূমির একপ্রান্তে। সিন্ধু ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যবর্তী এই অঞ্চল নব্যপ্রস্তর যুগের সর্ববৃহৎ বসতি। নব্য প্রস্তর যুগের অন্যান্য ক্ষেত্র গুলি হল সোয়াট উপত্যাকার গলিঘাই, আরও দক্ষিণে সরাইখোলা, কাশ্মীর উপত্যাকার লোয়াস মালভূমি, বিহারের চিরান্দ, উত্তরপ্রদেশের বেলান উপত্যাকার চোপানি মান্ডো, গোদাবরী ও কৃষ্ণা উপত্যাকার উৎনুর, পিক্লিহাল, মাস্কি, তেক্কা-লাকোটা, ব্রহ্মগিরি, হাল্লুর, পৈয়াম্পাল্লি এবং টি. নারাসপুর ইত্যাদি।

নব্যপ্রস্তর যুগের সাধারণ বৈশিষ্ট্য হল খাদ্য উৎপাদন, মৃৎশিল্প এবং অনড় তথা স্থিতিশীল জীবনযাপন। কিন্তু বাস্তবে এই জীবনযাত্রা যথেষ্ট জটিল। কৃষির সূচনা ও বিকাশ মানবসমাজে খাদ্যের জোগানকে যেমন নিশ্চয়তা দিয়েছিল, তেমনি প্রয়োজনের তুলনায় অধিক ফসল ফলানো সম্ভব হল। এই অতিরিক্ত ফসল সংরক্ষণ, বন্টন ও বিপণনের কথাও মানুষকে ভাবতে হল। এর ফলে কৃষির বিকাশের সাথে সাথে পেশাদারি কারিগর, বণিক, প্রশাসক প্রভৃতি এই ব্যবস্থার সাথে যুক্ত হল যা নগরায়ন ও জটিল রাষ্ট্রব্যবস্থার উদ্ভবকে অনিবার্য করে তুলেছিল।

ভারতীয় উপমহাদেশে নব্যপ্রস্তর যুগের সভ্যতার এই সাধারণ বৈশিষ্ট্যর বেশ কয়েকটির মূল মধ্যপ্রস্তর যুগে নিহিত আছে। আমরা আগেই দেখেছি মধ্যপ্রস্তর যুগেও মৃৎশিল্পের ও পশুপালনের নিদর্শন রয়েছে। অন্যদিকে নব্য প্রস্তর যুগের কিছু ক্ষেত্র আছে যেখানে আমরা মৃৎশিল্পের কোন নিদর্শন পায়নি। অনড় তথা স্থির জীবনযাত্রা (Sedentary life) যা নবপ্রস্তর যুগের এক অন্যতম বৈশিষ্ট্য মধ্যপ্রস্তর যুগের শিকারি ও খাদ্য সংগ্রাহকদের মধ্যেও দেখা গেছে। মধ্যপ্রস্তর যুগের কিছু সম্প্রদায়কে পশুপালন ও বৃক্ষপালন করতে দেখা যায় যারা একই স্থানে বেশিদিন থাকত না।

৮.৮ উপসংহার

খাদ্য উৎপাদন ও পশু পালনের সূচনা মানেই শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের জীবনযাত্রার পরিসমাপ্তি নয়। যে মানবগোষ্ঠী কৃষি ও পশুপালন শুরু করেছিল তারা শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের কাজ চালিয়ে যায়। এরকম বেশ কিছু সম্প্রদায় আছে যারা শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের জীবন ছেড়ে পশুপালন শুরু করেনি। এটি অবশ্য সাধারণ ধারা নয়। সাধারণত নব্যপ্রস্তর যুগে শিকার ও খাদ্য সংগ্রহের জীবন থেকে মানবজাতির খাদ্য উৎপাদন ও পশু পালনের জীবনে উত্তরণ ঘটে। এই বৃহৎ ভারতীয় উপমহাদেশের নানা বৈচিত্র বিশেষ করে ভূমি, জলবায়ু এবং বৃক্ষ ও প্রাণী সম্পদের প্রাচুর্য ও সহজলভ্যতার উপর কৃষিজীবী ও পশুপালকদের বৈচিত্র নির্ভর করত। ভারতীয় উপমহাদেশে খাদ্য উৎপাদনকারী ক্ষেত্রগুলি বিভিন্ন আঞ্চলিক বিশেষত্ব নিয়ে ভাস্বর। বিন্ধ্য পর্বতের উত্তর দিকে খাদ্য উৎপাদনকারী নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির আবির্ভাব ঘটেছিল মধ্যপ্রস্তর যুগের আদিপর্বে। আবার অন্যকিছু ক্ষেত্রে যেমন উত্তর-পশ্চিমে মধ্য প্রস্তর যুগের কোন পর্ব নেই। আদি পর্বের বসতিতেই নব্য প্রস্তর যুগের কৃষিজীবী ও পশুপালকদের অস্তিত্ব প্রমাণিত হয়। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হলো কতগুলি বিশুদ্ধ নব্য প্রস্তর যুগের ক্ষেত্র যেমন আছে তেমনই বেশ কিছু নব্য প্রস্তর-তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতি আছে যার মধ্যে নব্য প্রস্তর যুগের উৎপাদনের পাশা-পাশি ধাতুর (প্রধানত তামা) ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। আবার রাজস্থানের মতো ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য কিছু স্থানে নব্য প্রস্তর যুগ, এমনকি নব্যপ্রস্তর-তাম্রপ্রস্তর যুগের অস্তিত্বের প্রমাণ নেই, আদি অনড় স্থিতিশীল সমাজকে একেবারে পূর্ণ বিকশিত তাম্রপ্রস্তর সভ্যতায় আবির্ভূত হতে দেখা যায়।

৮.৯ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. নব্যপ্রস্তর যুগ বলতে কী বোঝ? এর প্রধান বৈশিষ্ট্য গুলি উল্লেখ কর?

২. 'নব্যপ্রস্তর বিপ্লব' কথাটি কে কোন প্রেক্ষিতে তুলে ধরেছিলেন? এর মুখ্য দিক গুলি কী কী? এই মত কতটা গ্রহণযোগ্য?

৩. মানব সংস্কৃতির বিকাশে খাদ্য উৎপাদন সম্পর্কে বিভিন্ন তত্ত্ব গুলি ব্যাখ্যা করো।

৪. মানব সংস্কৃতির বিকাশের ধারায় নব্যপ্রস্তর যুগ 'বিপ্লব' না বিবর্তনের' সাক্ষী?

৮.১০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

রণবীর চক্রবর্তী, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব(প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৯।

ইরফান হাবিব, প্রাক-ইতিহাস, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০২।

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ), প্রথম খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

ভি গর্ডন চাইল্ড, হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন হিস্ট্রি, (ভাষান্তর তরুণ হাতি), দীপায়ন, কলকাতা, ২০১৪।

সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও অপরাজিতা ভট্টাচার্য, বিশ্ব সভ্যতা-প্রাচীন যুগ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৯।

ড. রতন কুমার বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (আদিপর্ব), প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, কলকাতা, ২০১৯।

Upinder Singh– A History of Ancient and Early Medieval India– Pearson– 2009.

R.S. Sharma– India's Ancient Past– OUP– New Delhi– 2005.

Raymond Allchin and Bridget Allchin– The Rise of Civilization in India and Pakistan– CUP– 1982.

একক : ৯ ◘ নব্যপ্রস্তর ও তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির আঞ্চলিক এবং কালানুক্রমিক বিস্তার সম্পর্কে ধারণা (Understanding the regional and chronological distribution of the Neolithic and Chalcolithic cultures)

গঠন

৯.০ উদ্দেশ্য

৯.১ সূচনা

৯.২ উপমহাদেশের নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির কেন্দ্রসমূহ

৯.২.১ মেহেরগড়

৯.২.২ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র

৯.৩ উপমহাদেশের তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির কেন্দ্র সমূহ

৯.৪ তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির গুরুত্ব

৯.৫ তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতা

৯.৬ উপসংহার

৯.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

৯.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

৯.০ উদ্দেশ্য

- এই একক পাঠের উদ্দেশ্য হল নব্যপ্রস্তর ও তাম্রপ্রস্তর যুগের আঞ্চলিক ও কালানুক্রমিক বিস্তার অনুধাবন করা।
- ভারতীয় উপমহাদেশে তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির কেন্দ্রসমূহের পর্যালোচনা।
- তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির গুরুত্ব ও সীমাবদ্ধতাকে ব্যাখ্যা করা।

৯.১ সূচনা

কেবলমাত্র উপমহাদেশের ইতিহাসে নয়, সমগ্র মানবসমাজের ইতিহাসেই নব্যপ্রস্তর যুগের গভীর তাৎপর্য রয়েছে। তবে ভারতীয় পরিস্থিতির বিশেষ দিক হল নব্যপ্রস্তর যুগে যেমন কৃষির উন্মেষ ঘটে, তেমন পাথরের উপকরণের সঙ্গে ধাতুর ব্যবহারও শুরু হয়। ধাতুর ব্যবহার অবশ্য প্রধানত তামা ও কাঁসের ব্যবহারের মধ্যেই

সীমাবদ্ধ ছিল। লোহার ব্যবহার এই আমলে অনাগত। তামার তৈজস ও পাথরের উপকরণ যৌথভাবে হত বলে ব্রিজেৎ ও রেমণ্ড অলচিন আলোচ্য সময়কে 'Chalcolithic Age' বা তাম্র-প্রস্তর যুগ' বলে অভিহিত করেছেন। রণবীর চক্রবর্তীর মতে, এই পর্বে পাথরের হাতিয়ার ও সামগ্রী তৈরি হলেও ধাতব সামগ্রীর উপস্থিতি ক্রমবর্ধমান।

৯.২ উপমহাদেশের নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির কেন্দ্রসমূহ

খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০০—৯০০০ অব্দের মধ্যবর্তী সময়কালে নব্যপ্রস্তর যুগের কৃৎকৌশল প্রথম ব্যবহৃত হয়েছিল সিরিয়া ও প্যালেস্টাইনে। ইরফান হাবিব লিখেছেন, যদি উত্তর-আফগানিস্তানের 'ঘর-ই-আসপ' কিংবা 'আখ-কুপরূক'' এর পার্শবর্তী অঞ্চল থেকে পাওয়া কুমোরের হাতের ছাপ-হীন নব্যপ্রস্তর হাতিয়ারে ভরা স্তরটির কার্বণ-কাল নির্ণয়ের ওপর আস্থা রাখা যায়, তাহলে বলা যায় ভারতবর্ষের দরজায় নব্যপ্রস্তর পর্বের পদধ্বনি শোনা যায় প্রায় খ্রীস্টপূর্ব ১০০০০ বছর আগে। আফগানিস্তান থেকেই এই কৃৎকৌশল নানাদিকে ছড়িয়ে পড়েছিল। ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম সীমান্তরেখার প্রথম কৃষিজীবী গোষ্ঠীর বর্ণনা দিয়েই এই আলোচনা শুরু করা যথোপযুক্ত।

৯.২.১ মেহেরগড়

ভারতীয় উপমহাদেশে নব্য প্রস্তর যুগের প্রাচীনতম নিদর্শন হল মেহেরগড়। মেহেরগড়ের অবস্থান বর্তমান পাকিস্তানের বালুচিস্তান প্রদেশের বোলান নদীর তীরে কাচ্চি সমভূমিতে। নব্যপ্রস্তর যুগের এই প্রত্নস্থলটির আবিষ্কর্তা হলেন ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিক ফ্রাঁসোয়া জারিজ। মেহেরগড় সভ্যতার সূচনা হয় আনুমানিক ৭০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে। সিন্ধু ও ভূমধ্যসাগরের মধ্যে একটি অন্যতম বৃহত্তম নব্যপ্রস্তর প্রত্নক্ষেত্র। এরপর মেহেরগড় প্রত্নক্ষেত্রে নব্য প্রস্তর যুগের সভ্যতার তিনটি পর্যায়ের সন্ধান পাওয়া গেছে। এই সভ্যতার প্রথম পর্ব খ্রিস্টপূর্ব ৭০০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ৫০০০ বছরের সময়সীমায় পরিব্যাপ্ত। এই সময় পাথরের তৈরি মসৃণ ছুরি ও হাড়ের অস্ত্র বা হাতিয়ার ও পাওয়া যায়। কোন ধাতব সামগ্রী এই সময় পাওয়া যায়নি। এখানে আমরা শুধু শস্য উৎপাদনের প্রমাণ পাইনা, অতিরিক্ত শস্য মজুত ও সংরক্ষণের নজিরও পাই।

মেহেরগড় সভ্যতার দ্বিতীয় পর্ব খ্রীষ্টপূর্ব ৫০০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৪০০০ বছর পর্যন্ত পরিব্যাপ্ত ছিল। এই সময় পাথরের হাতিয়ারে মধ্যে কাস্তে, ছুরি, হাতুড়ি ও ব্লেড ছিল প্রধান। কাস্তের হাতল কাঠ বা হাড় দিয়ে তৈরি হত। উপমহাদেশে পাথরের কাস্তে ব্যবহারের এটাই প্রাচীনতম নিদর্শন। তখনও মৃত ব্যক্তির সাথে তার ব্যবহৃত প্রিয় সামগ্রী সমাধিস্থ করা হত।

মেহেরগড় সংস্কৃতির তৃতীয় পর্বটিও (খ্রিষ্টপূর্ব ৪৩০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ৩৮০০) নানাদিক থেকে গুরুত্বপূর্ণ। কৃষির অগ্রগতির সাথে জনসংখ্যা বৃদ্ধিরও প্রমাণ রয়েছে এই পর্বে। এই জনসংখ্যা বৃদ্ধি হয়তো বাইরের জনগোষ্ঠীর অনুপ্রবেশের কারণেও হতে পারে। মেহেরগড়ের প্রথম ও দ্বিতীয় পর্যায়ের মানুষদের সঙ্গে যদি তৃতীয় পর্যায়ের সমাধিস্থ কঙ্কালের তুলনা করা যায় তাহলে দেখ দেখা যাবে প্রথম দুই পর্যায়ের মানুষ দক্ষিণ এশীয় বৈশিষ্ট্যের বিপরীতে। তৃতীয় পর্যায়ের মানুষদের সঙ্গে ইরান মালভূমির মানুষদের সাদৃশ্য রয়েছে। এর থেকে স্পষ্ট হয় যে পশ্চিম থেকে বেশ ভাল সংখ্যায় মানুষের অনুপ্রবেশ ঘটেছিল। এই পর্বে কর্ষিত শস্যেও বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। অন্তত চার প্রকার গমের চাষ, দুই সারির বার্লি আর ওট চাষের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ

রয়েছে। অতিরিক্ত শস্য উৎপাদনের ফলে শস্যাগারের আয়তন ও সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে এই পর্বে। দরজা-জানালা বিহীন একাধিক কক্ষ বিশিষ্ট বহু শস্যাগার এর নিদর্শন এইসময় দেখা যায়। হস্তশিল্পের অভাবনীয় বিকাশ এই পর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। এই পর্বের মেহেরগড়ে লাপিস লাজুলি, কর্নেলিয়ান, গার্নেট, টারকোইজ, নীলকান্তমণি প্রভৃতি মূল্যবান পাথর, শঙ্খ ও বিটুমিন নিয়ে কাজের প্রমাণ পাওয়া যায়। এই তৃতীয় পর্যায়েই মেহেরগড়ে কৃষিপ্রধান গ্রামীণ সমাজের বিকাশশীল জীবনের ছবি প্রতিভাত হয়।

আনুমানিক ৩৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে মেহেরগড়ের জনবসতি হ্রাস পেতে শুরু করে। জলবায়ুর বা অন্য কোনও প্রতিকূলতার কারণে মানুষ এই স্থান পরিত্যাগ করতে শুরু করে। সম্ভবত ২৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এবং ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের মধ্যে কোনও এক সময় প্রাকৃতিক প্রতিকূলতা বা অন্য কোনো কারণে এই স্থান বসবাসের অনুপযুক্ত মনে করে পরিত্যাগ করা হয়।

৯.২.২ অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র

নব্য প্রস্তর যুগের অন্যান্য প্রত্নক্ষেত্রগুলি হল পশ্চিম পাকিস্তানের কিলিগুল মহম্মদ, দামর-সাদাত, কোটদিজি, আমরি, নাল, নুন্দরা, আফগানিস্তানের মুন্ডিগক, কাশ্মীরের বুর্জাহোম ও গুফক্রাল, বিহারের চিরান্দ, উত্তরপ্রদেশের চোপানি মান্ডো ও কোলদিহাওয়া, পূর্বের রাজ্যের পান্ডু রাজার ঢিবি, আরো পূর্বদিকে দাওজালি হাডিং ও সুরতুর এবং দক্ষিণাত্যের একগুচ্ছ ক্ষেত্র- রায়চুর দোয়াব এবং গোদাবরী ও কৃষ্ণ উপত্যাকার উৎনুর, পিকলিহাল, মাস্কি, তেক্কালাকোটা, ব্রহ্মগিরি, হাল্লুর, পৈয়ামপল্লি এবং টি, নারসিপুর।

নব্যপ্রস্তর যুগের এই প্রত্নক্ষেত্রগুলি ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক বৈচিত্র নিয়ে বিরাজমান ছিল। তাই আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে উপমহাদেশের সর্বত্র নব্যপ্রস্তর ও তাম্র প্রস্তর যুগের সংস্কৃতি একই ধাঁচে গড়ে ওঠেনি এবং নব্যপ্রস্তর যুগ ও তাম্রপ্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য প্রতিটি প্রত্নক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় না। তবে সাধারণভাবে বলা যায়- নবপ্রস্তর যুগের এই প্রত্নক্ষেত্রগুলিতে কৃষি সমাজের ছবি প্রতিভাত হয়।

কাশ্মীরের বুর্জাহোম ও গুফক্রাল নবপ্রস্তর পর্বের দুটি বিখ্যাত প্রত্নক্ষেত্র। শ্রীনগর থেকে ১৬ কিলোমিটার উত্তর-পশ্চিমে অবস্থিত বুর্জাহোম বা 'বার্চ' এর ক্ষেত্র (The place of birch)। নবপ্রস্তর যুগের মানুষ এখানে হ্রদের ধারে গহ্বরে বাস করত এবং দিনাতিপাত করত পশুশিকার করে। সম্ভবত কৃষিকাজ তাদের অজানা ছিল না। বস্তুত বুর্জাহোম প্রত্নক্ষেত্রটি উৎখননের পর মনুষ্যবসতির চারটি পর্ব আবিষ্কৃত হয়েছে। এই চারটে পর্যায়ের মধ্যে প্রথম দুটি নবপ্রস্তর যুগের, তৃতীয়টি মহাশ্মীয় বা মধ্যপ্রস্তর যুগের এবং চতুর্থটি আদি ঐতিহাসিক পর্বের।

বুর্জাহোমের আদি পর্যায়ে ২৯২০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যেসব প্রত্নবস্তু পাওয়া গেছে তা হল হাতে গড়া ধূসর, লাল, হলুদ ও বাদামি রঙের স্থূল মৃৎপাত্র। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে কুঠার, বাটালি, ছুরি, সূচ, হারপুন, পেষণি এবং হাড়ের ও হরিণের শিঙে তৈরি হাতিয়ার। প্রায় প্রতিটি বাসস্থানেই পেষণি পাথর পাওয়া গেছে। নব্য প্রস্তর যুগের এই প্রত্নক্ষেত্রে পাথরের ব্লেড শিল্পের অনুপস্থিতি একটি লক্ষণীয় বিষয়। বুর্জাহোমের মানুষরা কিভাবে জীবন নির্বাহ করত তা স্পষ্ট নয়; তবে অনুমান করা যায় শিকার তাদের জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কর্ষিত পণ্যের মধ্যে যব, গম ও মসুরের নিদর্শন পাওয়া গেছে। বুর্জাহোমের প্রথম পর্যায়ের সমাধির কোন নিদর্শন মেলেনি। বুর্জাহোমের দ্বিতীয় পর্ব রেডিও কার্বন পদ্ধতি সময় নির্ধারণ

করে বলা হয়েছে তা ১৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। বুর্জাহোমের আদি ও উত্তর উভয় পর্বেই কাস্তে জাতীয় এক হাতিয়ার পাওয়া গেছে। মনে হয় শস্য কাটার জন্যই হাতিয়ার ব্যবহৃত হত।

কাশ্মীরের নব্যপ্রস্তর যুগের আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল গুফাক্রল। এখানে মানুষের আদিম জীবিকার তিনটি পর্যায় আবিষ্কৃত হয়েছে। নব্যপ্রস্তর যুগের এই প্রত্নক্ষেত্রটি শ্রীনগরের ৪১ কিলোমিটার দক্ষিণ-পশ্চিমে অবস্থিত। গুফাক্রল কথাটির আক্ষরিক অর্থ হল কুমোরের গুহা (Cave of the Potter)। এখানকার অধিবাসীরা কৃষি ও পশুপালন উভয় পেশার সাথে যুক্ত ছিল। রেডিও কার্বন পদ্ধতিতে গুফাক্রলের মধ্য পর্যায়ের যে কাল নির্ণীত হয়েছে তা হল ২৪৬৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ-২১৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ। গুফাক্রালে আদি নব্যপ্রস্তর যুগের সূচনা সম্ভবত ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগে শুরু হয়েছিল। গুফাক্রালের দ্বিতীয় পর্যায় (আনুমানিক ২৪৬৮-২১৩৯ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এখানকার মানুষ তার গহ্বরের বাস ছেড়ে ভূপৃষ্ঠের উপর মাটির বাড়িতে বসবাস শুরু করে। শিকারি জীবনের উপর পুরোপুরি নির্ভর না করে তারা পশুপালন ও শস্য চাষে (যব, গম, মসূর ইত্যাদি) মন দেয়। তৃতীয় পর্যায়ে (আনুমানিক ২০০০-১৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ) এই প্রবণতা আরো বাড়ে। এই পর্যায়ে হাতে গড়া মৃৎপাত্রের স্থান নেয় কুমোরের চাকে তৈরি মৃৎপাত্র।

নব্যপ্রস্তর যুগের আরেক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হল বিহারের চিরান্দ। চিরান্দের অবস্থান হল পাটনার ৪০ কিলোমিটার পশ্চিমে গঙ্গানদীর তীরবর্তী অঞ্চলে। এই প্রত্নক্ষেত্রের বিশেষত্ব হল এটাই ভারতের একমাত্র নব্যপ্রস্তর ক্ষেত্র যেখানে প্রচুর পরিমাণে হাড়ের সরঞ্জাম পাওয়া গেছে। হরিণের শিং থেকে নির্মিত এই সরঞ্জাম নব্যপ্রস্তর বসতির শেষ পর্যায়ের পাওয়া গেছে। এই অঞ্চলে তখন ১০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত হত। এই স্থানটি বসবাসের উপযুক্ত হয়েছিল কারণে এটি গঙ্গা, শোন, গণ্ডক ও ঘর্ঘরা এই চার নদীর সঙ্গমস্থলে একটি উন্মুক্ত প্রান্তর ছিল। এখানে পাথরে হাতিয়ারের অভাব ছিল। চিরান্দ নব্য প্রস্তর যুগের শেষ পর্যায়ের প্রত্নক্ষেত্র। কারণ এখানে প্রাপ্ত হাড় ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দের আগের ছিল না। দক্ষিণ উত্তরপ্রদেশের বোলান নদীর ছোট্ট উপত্যকায় চোপানি মান্ডো প্রত্নক্ষেত্রে মধ্য প্রস্তর যুগের শেষের দিকের এবং নব্যপ্রস্তর যুগের প্রথম পর্যায়ের (৩৩৮৫-৩১৩৫ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ) সংস্কৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে বিপুল সংখ্যক মাইক্রোলিথ (ছোট পাথরের হাতিয়ার) পাওয়া গেছে। এখানকার মানুষ কুঁড়েঘরে বাস করত এবং শিকার ও খাদ্য সংগ্রহ করে জীবন যাপন করত। এখানে পাথুরে হাতুড়ি, জাঁতা আর হামানদিস্তার মতো মসৃণ পাথুরে যন্ত্র পাওয়া গেছে। বুনো চাল সংগ্রহ করার প্রমাণ প্রথম পাওয়া গেলও পশুপালনের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। হাতে তৈরি মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে যার গায়ে সুতো দিয়ে নকশা আঁকা রয়েছে।

আসামের পাহাড়ি অঞ্চলে নব্যপ্রস্তর যুগের কিছু হাতিয়ার পাওয়া গেছে। ভারতের উত্তর-পূর্ব সীমান্তের মেঘালয়ের পাহাড়ে নব্যপ্রস্তর যুগের হাতিয়ার পাওয়া গেছে। নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির নিদর্শন বিন্ধ্য অঞ্চলে ও কাইমুর পাহাড়েও বিদ্যমান। বিন্ধ্য পাহাড়ের উত্তর দিকে উত্তরপ্রদেশে মির্জাপুর এবং এলাহাবাদ জেলায় নব্যপ্রস্তর যুগের বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে। যেমন এলাহাবাদ জেলার কোলদিহাওয়া এবং মহাগড়ায় খ্রিস্টপূর্ব পাঁচ সহস্রাব্দে চাল (ধান) চাষের প্রমাণ পাওয়া যায়। জি. আর. শর্মা ও তার সহকর্মীরা এলাহাবাদের দক্ষিণে বোলানের ছোট বিন্ধ্যায়ন নদীর উপত্যকায় অবস্থিত কোলদিহাওয়ার গৃহে ব্যবহৃত চালের দানা আবিষ্কার করেন। বস্তুত পৃথিবীতে সর্বপ্রাচীন চালের ব্যবহারের নিদর্শন এখানেই রয়েছে। রোটাস জেলার কাঊমুর পাহাড়ি অঞ্চলের সেনুয়ারও নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির এক গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র। পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলায় পান্ডুরাজার ঢিবিতে নব্যপ্রস্তর যুগের প্রথম ও দ্বিতীয় উভয় পর্যায়র নিদর্শন পাওয়া গেছে। এখানে পাওয়া গেছে আবাদ

করা ধান আর সুতোয় চিত্রবিচিত্র করা মাটির সামগ্রী। দ্বিতীয় পর্যায়ে এখানে নতুন একদল মানুষ বসতি শুরু করেছিল। এই পর্যায়ে ধান ও কুমোরের চাকা পাওয়া গেছে।

নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির মানুষের বসতি ও স্মৃতিচিহ্ন দক্ষিণ ভারতে বিরাজমান। অনধ্রপ্রদেশ, কর্ণাটক ও তামিলনাড়ু এইটিন প্রদেশে ৮৫০ টিরও বেশি বসতি গড়ে উঠেছিল। নব্যপ্রস্তর যুগের গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্রগুলি অথবা উৎখনিত নব্যপ্রস্তর যুগের স্তরগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল কর্নাটকের মাস্কি, ব্রহ্মাগিরি, হাল্লুর, কোদেকল, সঙ্গনাকাল্লু, পিকলিহাল, তক্কালাকোটা, তামিলনাড়ুর পৈয়ামপল্লি, অন্ধ্রপ্রদেশের উৎনুর। দক্ষিণ ভারতের নব্যপ্রস্তর যুগের এই প্রত্নক্ষেত্রগুলি ২৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময় সীমায় প্রসারিত। নব্যপ্রস্তর যুগের পিকলিহাল অঞ্চলের অধিবাসীরা গবাদি পশু পালক ছিল। তারা গবাদি পশু, ভেড়া, ছাগল ইত্যাদি গৃহে পালন করত। গোশালাগুলি ঘিরে তারা বিভিন্ন ঋতুতে শিবির বসাত এবং গোবর সংগ্রহ করত। স্থান পরিবর্তনের সময় এলে সমগ্র শিবিরস্থানটি আগুন জ্বালিয়ে পরের শিবিরের জন্য পরিষ্কার করতে। পিকলিহালে ছাইয়ের ঢিবি ও বাসস্থানের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

৯০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ৩০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ এই দীর্ঘ সময়ে পশ্চিম এশিয়ায় উল্লেখযোগ্য প্রযুক্তিগত পরিবর্তন হয়েছে। নব্যপ্রস্তর যুগের এই পর্বে মানুষ আগের চেয়ে অনেক উন্নত হাতিয়ার বানিয়েছে, চাষ করার কৌশল আয়ত্ত করেছে, মৃৎপাত্র বানাতে, ঘর নির্মাণ করতে, বস্ত্রবয়ন করতে, পশু পালন করতে শিখেছে। এই যুগের পাথরের হাতিয়ার আগের তুলনায় মসৃণ ও পাতলা। যা তারা বিভিন্ন কাজে ব্যবহার করেছে। এই পর্বে পাথরের হাতিয়ারের পাশাপাশি হাড়ের ব্যবহার বহুগুণ বৃদ্ধি পেয়েছে। হাড় দিয়ে মানুষ সূচ, হারপুন, বর্শাফলক, তিরের ফলা, ছুরি ইত্যাদি বানিয়েছে। মধ্য প্রস্তরযুগের তুলনায় কৃষিকাজ অনেকগুণ বৃদ্ধি পায় এবং উৎপাদিত ফসলের পরিমাণ ও সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটে। যব, গম, ডাল ও ধান উৎপাদন, মেহেরগড়ের তুলো বা কার্পাসের চাষও শুরু হয়েছিল। শিকার ও ফল তথা খাদ্য সংগ্রহের অনিশ্চিত জীবন থেকে তারা কৃষি ও পশুপালকের স্থায়ী জীবনে উন্নীত হয়। কৃষিকাজের বিকাশের সাথে সাথে তাদের অস্থায়ী যাযাবরের জীবনের অন্ত হয় এবং স্থায়ীভাবে বসবাসের সূচনা হয়। বয়ন শিল্পের সূচনা এই যুগের উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি যদি উপমহাদেশের আর কোনও প্রত্নস্থলে বয়ন শিল্পের সুস্পষ্ট নিদর্শন এখনও পাওয়া যায়নি। পরবর্তীকালে হরপ্পা সভ্যতার সময়কালে মহেঞ্জোদারোতে কার্পাস বস্ত্রের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে নব্যপ্রস্তর যুগের সূচনা হয়েছিল সপ্তম সহস্রাব্দে। এখানে গম ও যবের মতো গুরুত্বপূর্ণ ফসলের চাষ শুরু হয়। কৃষি বিকাশের সাথে সাথে গ্রাম গড়ে ওঠে। তবে নব্য প্রস্তর যুগে নানাদিকে গুরুত্বপূর্ণ বিকাশ ঘটলেও তাদের একটি বড় সীমাবদ্ধতা ছিল। প্রস্তরযুগের মানুষ হওয়ায় এবং প্রস্তর নির্মিত আয়ুধের উপর তাদের নির্ভর করতে হয়েছিল বলে পাহাড়ে বা পাহাড়ি অঞ্চলে গুহাগাত্রে তাদের আশ্রয় নিতে হয়েছিল। ধাতুর ব্যবহার শেখার পরেই তাদের জীবনযাত্রায় পরিবর্তন এসেছিল।

৯.৩ উপমহাদেশের তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির কেন্দ্র সমূহ

নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির পর তাম্রপ্রস্তর (Chalocolithic) সংস্কৃতির উদয় হয়। বস্তুত নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির শেষ লগ্নে তাম্র ধাতুর ব্যবহার দেখা যায়। তামা ও পাথর এই দুই বস্তুকে অবলম্বন করে এই সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল বলে এর নাম মনে হয় তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতি। প্রযুক্তিগত দিক থেকে তাম্রপ্রস্তর পর্ব প্রাক-হরপ্পা যুগের যদিও ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতি হরপ্পার ব্রোঞ্জ সংস্কৃতিকে অনুসরণ করেছিল।

তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতিকে আগে প্রাক-হরপ্পা (Pre-Harappan) যুগের সংস্কৃতি বলে চিহ্নিত করা হত। সাম্প্রতিক কালে তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতিকে হরপ্পা সভ্যতারই আদি পর্যায়ভুক্ত (Early Harappan) বলে গন্য করা হয়। নগরাশ্রায়ী হরপ্পা সভ্যতাকে এর পরিণত অবস্থা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। বিশেষজ্ঞদের মতে হরপ্পা সভ্যতার নগরজীবন হঠাৎ করে আবির্ভূত হয়নি, তার ক্রমবিকাশের একটি ধারা আছে। তাই তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির সাথে এর ঘনিষ্ঠ যোগসূত্র আছে বলে মনে করা হয়। বস্তুত নব্যপ্রস্তর ও তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির অন্তর্গত বিস্তীর্ণ প্রত্নক্ষেত্র বিশেষত উত্তর-পশ্চিম অঞ্চলের মেহেরগড়, কিলিগুল মহম্মদ প্রভৃতি স্থানের জনজীবনে এর সন্ধান পাওয়া যাবে। তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির তিনটি পর্যায় লক্ষ করা যায়। এগুলি হল আদি তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতি, পরিণত হরপ্পা ও সমকালীন তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতি এবং হরপ্পা-পরবর্তী তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতি। তাম্রপ্রস্তর যুগের মানুষ সাধারণত পাথর এবং তামার জিনিস ব্যবহার করত। তবে কিছু ক্ষেত্রে তারা মাঝে মাঝে নিম্নমানের ব্রোঞ্জ এমনকি লোহাও ব্যবহার করেছিল। তাম্রপ্রস্তর যুগের মানুষ প্রধানত পাহাড়ি এলাকা এবং নদীর তীরবর্তী ও পার্শবর্তী বিস্তৃত অঞ্চলে গ্রামীণ সমাজ গড়ে তুলেছিল। অন্যদিকে হরপ্পা সভ্যতার মানুষ ব্রোঞ্জ ব্যবহার করত এবং কৃষি অর্থনীতির উপর ভর করে নগরসভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির আদি পর্যায়ের সন্ধান পাওয়া যায় আফগানিস্তানের মুন্ডিগকে, বেলুচিস্তানের কিলিগুল মহম্মদ, পেরিয়ানো ঘুন্ডাই, ডাম্বসাদাত, ডাবরকোট, রানা ঘুন্ডাই, কুল্লি, মেহি, নাল, নাদারা, সুটকাদেনদোর, সিন্ধুর আমরি, কোটদিজি, পশ্চিম পাঞ্জাবের জলিল্পুর এবং রাজস্থানের কালিবঙ্গান ও সোথি এবং হরিয়ানার সিসওয়াল প্রভৃতি স্থানে।

ভারতে তাম্রপ্রস্তর যুগের বসতি আবিষ্কৃত হয়েছে দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থানে, মধ্যপ্রদেশের পশ্চিম ভাগে, পশ্চিম মহারাষ্ট্রে এবং ভারতের দক্ষিণ ও পূর্বভাগে। দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থানের দুটি প্রত্নকেন্দ্র অহর ও গিলুন্দ উৎখনন করা হয়েছে। এই দুটি প্রত্নক্ষেত্র বানস উপত্যকার শুষ্ক অঞ্চলে অবস্থিত। পশ্চিম মধ্যপ্রদেশের বা মালব, কায়থ ও এরানেও উৎখনন করা হয়েছে। মালব প্রত্নক্ষেত্রটি তাম্রপ্রস্তর যুগের মৃৎশিল্পের জন্য বিখ্যাত। এখানকার কিছু মৃৎপাত্র এবং অন্যান্য সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য মহারাষ্ট্রে দেখা গেছে।

পশ্চিম মহারাষ্ট্রের বিস্তীর্ণ অঞ্চল জুড়ে খনন কার্য চালানো হয়েছে। এর মধ্যে আহম্মদ নগর জেলার জোরওয়ে, নেভাসা, দাইমাবাদ উল্লেখযোগ্য। এছাড়া পুনা জেলার চান্দোলি, সোনগোও ও ইমামগাও এবং প্রকাশ ও নাসিকেও উৎখনন করা হয়েছে। এই প্রত্নক্ষেত্রগুলি জোরওয়ে সংস্কৃতির কাছে ঋণী কিন্তু দক্ষিণের নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির কিছু বৈশিষ্ট্যও এর মধ্যে রয়েছে।

এলাহাবাদ জেলার বিন্ধ্যায়ন অঞ্চলে বেশ কিছু তাম্রপ্রস্তর ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। পূর্বভারতে গঙ্গার ধারে চিরান্দ ছাড়া পশ্চিমবঙ্গের বর্ধমান জেলার পান্ডুরাজার ঢিবি, বীরভূম জেলার শান্তিনিকেতনের কাছে কোপাই নদীর তীরবর্তী মহিষদল গ্রামে এই ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। এছাড়া আরও কিছু স্থানে উৎখনন করা হয়েছে। এছাড়া আরও কিছু স্থানে উৎখনন করা হয়েছে যেমন বিহারের তারাদি, সোনপুর, সেনুয়ার এবং পূর্ব উত্তর প্রদেশের খৈরাদি এবং নরহনে।

তাম্রপ্রস্তর যুগের বেশ কিছু ক্ষেত্র আছে যেগুলি পরিণত হরপ্পা সভ্যতার চেয়ে নবীন এবং হরপ্পা সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুক্ত নয়। ১৭০০-১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নভদাতোলি, এরান ও নাগাডায় প্রাপ্ত মানব সংস্কৃতিকে অ-হরপ্পা সংস্কৃতি হিসেবে গণ্য করা হয়। মহারাষ্ট্রের বিস্তৃত অঞ্চল জুড়ে বিস্তৃত জোরওয়ে সংস্কৃতি সম্পর্কেও

একই কথা প্রযোজ্য। দক্ষিণ ভারতে ও পূর্বভারতেও তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতি হরপ্পা সভ্যতার প্রভাবমুক্ত হয়ে স্বাধীন স্থানীয়ভাবে আত্মপ্রকাশ করেছিল। দক্ষিণ ভারতে তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতি নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতিকে অনুসরণ করেছিল। বিন্ধ্য অঞ্চল, বিহার ও পশ্চিমবঙ্গের তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতিও হরপ্পা সংস্কৃতির সঙ্গে সম্পর্কিত নয়।

আবার বেশ কিছু প্রাক্-হরপ্পা পর্বের তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতি ছিল যেগুলি সিন্ধু, বালুচিস্তান, রাজস্থান ও অন্যত্র কৃষিকার্য ও পশুপালনকে সমৃদ্ধ করেছিল। সিন্ধু, আমরি ও কোটদিজি এবং রাজস্থানের কালিবঙ্গান ও গনেশ্বর এপ্রসঙ্গে স্মরণীয়। মনে হয় তাম্র প্রস্তর যুগের কিছু কৃষক ও পশুপালক সমাজ সিন্ধুর বন্যা বিধৌত সমভূমির দিকে অগ্রসর হয়েছিল এবং ব্রোঞ্জ প্রযুক্তি আয়ত্ত করে নগর গড়ে তুলতে সক্ষম হয়েছিল। জে. এম. কেনোয়ার ও মেডো সম্প্রতিকালে হরপ্পায় যে নতুন খননকার্য চালান তাতে প্রমাণিত হয় যে হরপ্পার অস্তিত্ব ৩৩০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দেও বিদ্যমান ছিল যাকে হরপ্পার গ্রামীণ স্তরের আখ্যা দেওয়া যেতে পারে। এই সময়কার মানুষজন কুটিরে বাস করত। এই কুটিরগুলি কাঠের দ্বারা নির্মিত এবং এর দেওয়াল তৈরি হয়েছিল মাটিলেপা বাখারি ও কঞ্চি দিয়ে। সেই সময় ব্যবহৃত মৃৎপাত্র ছিল হাতে গড়া। কুমোরের চাকা ব্যবহারের কোন নিদর্শন নেই। রাভি বা ইরাবতী নদীর তীরে এই প্রত্নস্থলের প্রাচীনতম পর্ব রাভিস্তর (খ্রিষ্টপূর্ব ৩৩০০ থেকে খ্রিষ্টপূর্ব ২৮০০) বলে কিনোয়ার ও মেডো মনে করেন। এই পর্বে হরপ্পার আয়তন ২৫ হেক্টরের মধ্যে সীমায়িত ছিল। বসতি বিন্যাসেও পরিকল্পনার ছাপ লক্ষ্য করা গেল। রাস্তাঘাট উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিমে বিস্তৃত যা হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল।

উত্তর-পশ্চিম ভারতের প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের ফলে তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির পতন ঘটে। এক বিরাট অগ্নিকাণ্ডে কোটদিজির আদি তাম্রপ্রস্তর সভ্যতার অবসান ঘটে। এক প্রবল ভূমিকম্পে কালিবঙ্গান জনশূন্য হয়ে পড়ে। পরবর্তীকালে সেখানে হরপ্পা সভ্যতার উত্থান ঘটে।

৯.৪ তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির গুরুত্ব

তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির গুরুত্ব অপরিসীম। এই পর্বে মানুষ যেভাবে বসতি বিস্তার করেছিল, বা মৃৎশিল্পে বা ধাতুশিল্পে দক্ষতা প্রকাশ করেছিল, তা আরও পরিণত হয় পরবর্তীকালের হরপ্পা সভ্যতায়। ভারতের নানা স্থানে তাম্রপ্রস্তর শিল্পের যে নিদর্শন পাওয়া গেছে তা বৈচিত্রে ও বৈশিষ্ট্যে অনন্য। গভীর অরন্য ছাড়া তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতি ভারতের প্রায় সর্বত্র আবিষ্কৃত হয়েছে। মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমির পলিমাটি সমৃদ্ধ অঞ্চলে এবং কোনও কোনও ক্ষেত্রে হ্রদের ধারে ও নদীর মোহনায় তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতি আবিস্কৃত হয়েছে। এই পর্যায়ে মানুষ যে গ্রামীণ বসতি গড়ে তুলেছিল তা পাহাড়ের অনতিদূরে নদীর তীরবর্তী অঞ্চলে ছিল। এই পর্যায়ে তারা ছোটো ছোটো পাথরের হাতিয়ার (Microlith) এবং অন্যান্য পাথরের ও তামার হাতিয়ার ও যন্ত্র ব্যবহার করত। এই সময় তারা তামা গলানোর কৌশল আয়ত্ত করেছিল। প্রায় সব তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতিতে কুমোরের চাকে তৈরি কালো ও লাল মৃৎপাত্রের নিদর্শন রয়েছে। প্রাক ব্রোঞ্জের সময়কালের কথা মাথায় রেখে আমরা এই সিদ্ধান্তে আসতে পারি যে তারাই প্রথম রং করা মৃৎপাত্রের ব্যবহার শুরু করেছিল। এই মৃৎপাত্রেগুলি তাদের রান্না করার এবং খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ ও খাদ্য মজুত করার কাজে ব্যবহৃত হত।

তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতা কোটদিজি থেকে পরিণত হরপ্পা সভ্যতায় উত্তরণের ছবিটি যতটা স্পষ্ট বেলুচিস্তানে তা ততটা স্পষ্ট নয়। কোটদিজির সাথে পরিণত হরপ্পা সভ্যতার তুলনা টানলে বিষয়টি স্পষ্ট

হয়। যেমন কোটদিজি ও হরপ্পার উভয় স্থানেই প্রাকার ছিল, কিন্তু কোটদিজির প্রাকার অপ্রশস্ত অ বেশি দীর্ঘ নয়। অন্যদিকে হরপ্পার প্রাকার দীর্ঘ ও সুপরিকল্পিত। দুই প্রত্নক্ষেত্রের সিলমোহরের বিষয়ে একই কথা প্রযোজ্য। কোটদিজির সিলমোহর যেখানে লেখবিহীন সাদামাটা, পরিণত হরপ্পা সভ্যতার সিলমোহরে সেখানে লেখ উৎকীর্ণ রয়েছে এবং দৃষ্টিনন্দন। এই প্রসঙ্গে উল্লেখযোগ্য যে হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়ো, কালিবঙ্গান, ধোলাবিরা ও চানহুদাড়ো হরপ্পা সভত্যার এই পাঁচটি কেন্দ্রের আদি স্তরেও তাম্র প্রস্তর সংস্কৃতির নিদর্শন রয়েছে।

উপদ্বীপীয় ভারতে (Peninsular India) তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির মানুষ প্রথম বড়ো গ্রাম-বসতি গড়ে তোলে এবং নব্যপ্রস্তর সমাজের তুলনায় অনেক বেশি শস্য উৎপাদন করে। তাম্রপ্রস্তর সমাজের মানুষ পশ্চিম ভারতে যব, গম ও বিভিন্ন প্রকার ডাল উৎপাদন করত, অন্যদিকে দক্ষিন ও পূর্ব ভারতের মানুষ চাল উৎপাদন করত। এই শস্যের সঙ্গে তারা খাদ্য হিসাবে পশু, পাখির মাংস ও মাছ গ্রহন করত। পশ্চিম ভারতে যেমন প্রাণীর মাংস বেশি খাওয়া হত, তেমনি পূর্ব ভারতের প্রধান খাদ্য ছিল ভাত ও মাছ। পশ্চিম মহারাষ্ট্র ও পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ এবং দক্ষিণ-পশ্চিম রাজস্থানে এই সংস্কৃতির আরও অবশেষে আবিস্কৃত হয়েছে। মধ্যপ্রদেশের কয়েথ ও এরাণ এবং পশ্চিম মহারাষ্ট্রের ইনামগাও প্রত্নক্ষেত্রের বসতি প্রাকার পরিবেষ্টিত। সেই তুলনায় পূর্ব ভারতের চিরান্দ এবং পাণ্ডু রাজার ঢিবি-র বসতি নিকৃষ্ট ও নিম্নমানের। সমাধি দানের প্রক্রিয়াও বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রকম। মহারাষ্ট্রে মৃৎদেহের এই অবস্থান ছিল পূর্ব-পশ্চিম। এছাড়া পশ্চিম ভারতে যেখানে পূর্ণ সমাধি দেওয়া হত, পূর্বভারতে সেখানে আংশিক সমাধি দানের রীতি বিদ্যমান।

৯.৫ তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির সীমাবদ্ধতা

ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণক্ষেত্রে বিরাজমান তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির নানবিধ সীমাবদ্ধতা ছিল। তাম্রপ্রস্তর যুগের মানুষ গরু, ভেড়া, ছাগল গৃহে পালন করত, তাদের উঠানে বেধে রাখা হত। বস্তার জেলার গোন্ড উপজাতিরা গবাদি পশু দোহন করত না কারণ তারা মনে করত দুধ ছোটো প্রাণীর খাবার। এর ফলে তাদের খাদ্যে সীমাবদ্ধতা দেখা যায়। মধ্য ও পশ্চিম ভারতের সুতো উৎপাদনকারী কালো মাটিতে বসবাসকারী তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির মানুষ নিবিড়ভাবে ব্যাপক চাষ করত। এই তাম্রপ্রস্তর ক্ষেত্রে কোণ লাঙ্গল বা কোদাল পাওয়া যায়নি। বস্তুত কালো মাটিতে ব্যাপক চাষের জন্য লোহার সরঞ্জাম প্রয়োজন ছিল যা তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতিতে কদাচিৎ দেখা গেছে। পূর্ব ভারতে লাল মাটিতে বসবাসকারী তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির মানুষ এই একই সমস্যার মুখোমুখি হয়েছিল।

তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির একটি বড় দুর্বলতা হল অত্যধিক শিশু মৃত্যুর হার এবং মানুষের কম গড় আয়ু। বিষয়টি পশ্চিম মহারাষ্ট্রের বিশাল সংখ্যক শিশুর সমাধি দেওয়া থেকে পরিস্ফুট হয়। তারা খাদ্য উৎপাদনকারী অর্থনীতিতে বাস করেও অত্যধিক শিশু মৃত্যুর হার এড়াতে পারেনি। সম্ভবত শিশুদের পুষ্টির অভাব, চিকিৎসার অভাব এবং মহামারির কারণে এই ঘটনা ঘটেছিল। যে-কোনো কারনেই হোক তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির মানুষ এবং তাদের আর্থ-সামাজিক জীবন যাপন পদ্ধতি দীর্ঘ জীবনের অনুকূল ছিল না।

তাদের আরেক বড় সীমাবদ্ধতা হল উন্নত ধাতব অস্ত্র বা হাতিয়ার নির্মাণে অক্ষমতা। নানা ধরনের পাথরের অস্ত্র তৈরি করলেও এবং তামা গলানোর কৌশল জানলেও খুব কম সংখ্যক তামার হাতিয়ার বানাতে

সক্ষম হয়েছে। তাম্রপ্রস্তর যুগের মানুষ তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জের হাতিয়ারের উপর ভর করেই ক্রিট, মিশর, মেসোপটেমিয়া এবং সিন্ধু উপত্যকায় প্রাচীন সভ্যতা গড়ে তুলেছিল।

তাম্রপ্রস্তর যুগের মানুষ ব্রোঞ্জ যুগের মানুষের মতো শহরে বাস করত না এবং লিখতেও জানত না। অথচ এইসময় ভারতে সিন্ধু উপত্যাকায় উন্নত শহুরে সভ্যতা গড়ে উঠেছিল যা হরপ্পা সভ্যতা নামে খ্যাত। লক্ষ্যণীয় যে ভারতের বৃহৎ অংশ জুড়ে বিরাজমান তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতি হরপ্পা সভ্যতার থেকে বয়সে নবীন হলেও সিন্ধু বাসীদের মতো উন্নত প্রযুক্তিনির্ভর নাগরিক স্বাচ্ছন্দ্যের সাক্ষ্য রেখে যেতে পারেনি।

৯.৬ উপসংহার

ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে নব্যপ্রস্তর ও তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির যে বিস্তারিত সাক্ষ্য তুলে ধরা হল তার ভিত্তিতে বলা যায় যে, এই অভিজ্ঞতা মানবসমাজের বিবর্তনের সাক্ষী। তবে এই বিবর্তনের কোনো সর্বভারতীয় একমুখী গতি নেই। এই বিবর্তনের আঞ্চলিক বৈচিত্র্য সম্পর্কে তাই সর্বদা সচেতন থাকা জরুরি। তবে এ বিষয়ে কোন সন্দেহ নেই যে, এই সামাজিক বিবর্তনের চমকপ্রদ অধ্যায় হরপ্পা-সভ্যতার আমলেই দেখা গিয়েছিল। ইরফান হাবিব এই প্রসঙ্গে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ের ওপর আলোকপাত করেছেন। তাঁর মতে, নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির যে বিস্তৃত সাক্ষ্য উপমহাদেশ জুড়ে দেখা যায় তার প্রেক্ষিতে বলা যায় যে, উৎসের দিক থেকে এর মধ্যে সম্ভবত পুরোপুরি দেশীয় ছিল দক্ষিণের সংস্কৃতি। আধুনিক কর্ণাটক রাজ্য আর তার সঙ্গে অনধ্রপ্রদেশ আর তামিলনাড়ুর কিছু অংশ যোগ করলে যে অঞ্চল পাওয়া যায় সেটাই ছিল প্রধানত দাক্ষিণাত্যের নব্যপ্রস্তর যুগের সংস্কৃতির বিচরণ ক্ষেত্র।

৯.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসচর্চায় মেহেরগড় উৎখননের তাৎপর্য আলোচনা করো।

২. ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অংশে নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির প্রধান ক্ষেত্রগুলি সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখো।

৩. "তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতি" শব্দবন্ধ কারা প্রথম ব্যবহার করেছিলেন? এই সংস্কৃতির প্রধান বৈশিষ্ট্য আলোচনা করো।

৪. ভারতীয় উপমহাদেশে তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির প্রধানক্ষেত্র গুলি চিহ্নিত করো?

৯.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

রণবীর চক্রবর্তী, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব (প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৯।

ইরফান হাবিব, প্রাক-ইতিহাস, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০২।

Upinder Singh– A History of Ancient and Early Medieval India– Pearson– 2009.

R.S. Sharma– India's Ancient Past– OUP– New Delhi– 2005.

Raymond Allchin and Bridget Allchin– The Rise of Civilization in India and Pakistan– CUP– 1982.

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ), প্রথম খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

ভি গর্ডন চাইল্ড, হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন হিস্ট্রি, (ভাষান্তর তরুণ হাতি), দীপায়ন, কলকাতা, ২০১৪।

সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও অপরাজিতা ভট্টাচার্য, বিশ্ব সভ্যতা-প্রাচীন যুগ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৯।

ড. রতন কুমার বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (আদিপর্ব), প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, কলকাতা, ২০১৯।

একক : ১০ ◘ জীবনধারণ এবং বিনিময়ের ধাঁচ (Subsistence and patterns of exchange)

গঠন

১০.০ উদ্দেশ্য

১০.১ সূচনা

১০.২ নব্যপ্রস্তর পর্বের বস্তুগতগত জীবনযাত্রা

১০.২.১ মেহেড়গড়ের বস্তুগত জীবন

১০.২.২ অন্যান্য নব্যপ্রস্তর ক্ষেত্রের বস্তুগত জীবন

১০.৩ তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির বস্তুগত জীবন

১০.৪ আদিপর্বের খাদ্য উৎপাদকদের বস্তুগত সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য

১০.৫ বস্তুগত সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের অভিঘাত

১০.৬ উপসংহার

১০.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১০.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১০.০ উদ্দেশ্য

- নব্যপ্রস্তর ও তাম্রপ্রস্তর যুগের জীবনধারণ ও বিনিময়ের ধাঁচ অনুধাবন করা এই এককের উদ্দেশ্য।
- তাম্রপ্রস্তর যুগের বস্তুগত সংস্কৃতিকে ব্যাখ্যা করা।
- খাদ্যউৎপাদনের (আদিপর্ব) বস্তুগত সংস্কৃতিকে বোঝা।
- বস্তুগত সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের অভিঘাতকে অনুধাবন করা।

১০.১ সূচনা

নব্যপ্রস্তর পর্ব মানব ইতিহাসে সাধারণভাবে খাদ্য উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত। এই স্তরে মানুষ স্বয়ংসম্পূর্ণ গ্রামীণ সম্প্রদায় যারা খাদ্য উৎপাদন ও জনসংখ্যার ভারসাম্য পূর্ণমাত্রায় বজায় রাখতে সক্ষম। তবে এই পর্বে খাদ্য উৎপাদন কৌশল আবিষ্কারের সাথে সাথেই মানুষের শিকার-খাদ্যসংগ্রাহক জীবনের পূর্ণ পরিসমাপ্তি ঘটেছিল এমন মনে করার কোনো কারণ নেই। ভারতীয় উপমহাদেশের নব্যপ্রস্তর ও তাম্রপ্রস্তর সাংস্কৃতিক কেন্দ্র গুলি খুঁটিয়ে পর্যবেক্ষণ করলেই দেখা যাবে যে, অনেক ক্ষেত্রেই পশুপালন ও উদ্ভিদ সংরক্ষণের

কৌশল আয়ত্তকরণের সাথে সাথেই শিকার-খাদ্যসংগ্রাহক জীবনের ধারাও চলতে থাকে। উপিন্দর সিং লিখেছেন, বর্তমান একুশ শতকেও পৃথিবীর বিভিন্ন সম্প্রদায়ের মধ্যেও এই সমান্তরাল ধারা লক্ষ্য করা যায়। প্রত্নতাত্ত্বিক গবেষণায় উঠে আসা তথ্য থেকেও পরিষ্কার কৃষিকাজে অভ্যস্ত আদি পর্যায়ের বেশীরভাগ কেন্দ্রেই শিকার-খাদ্যসংগ্রহ ও খাদ্য উৎপাদনের জীবনধারা পাশাপাশি সক্রিয় ছিল। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, এই সমান্তরাল জীবনধারা আদিপর্বের খাদ্য উৎপাদক ও শিকারী-খাদ্যসংগ্রাহকদের পারস্পরিক আদান-প্রদানের সুস্পষ্ট স্বাক্ষরও তুলে ধরে। এই পরিপ্রেক্ষিতেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে ভারতীয় উপমহাদেশে নব্য ও তাম্রপ্রস্তর পর্বের বস্তুগত জীবনের আলোচনা।

১০.২ নব্যপ্রস্তর পর্বের বস্তুগতগত জীবনযাত্রা

ভারতীয় উপমহাদেশে নব্য প্রস্তর যুগের কৃষি সভ্যতার প্রাচীনতম নিদর্শন হল মেহেরগড় সভ্যতা। তাই মেহেড়গড়ের বস্তুগত জীবনের বিশ্লেষণ দিয়েই এই আলোচনা শুরু করা যায়—

১০.২.১ মেহেড়গড়ের বস্তুগত জীবন

মেহেড়গড় সভ্যতার প্রাচীনতম পর্বের সময়কাল মোটামুটি খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০০—৫০০০ অব্দ। এই পর্বেই মেহেরগড়ের মানুষ যব ও গমের চাষ শুরু করেছিল। উৎখননের পরে এই দুই শস্যদানা প্রত্নবস্তুর মধ্যে পাওয়া যায়। এর সাথে ছাগল, ভেড়া এবং কুঁজবিশিষ্ট ষাঁড়ের হাড়ের অস্তিত্ব প্রমাণ করে যা মেহেরগড়ের মানুষের জীবনে কৃষির সাথে গৃহপালিত পশুর অস্তিত্ব ছিল। গৃহপালিত পশুর মধ্যে প্রথমে ছাগলের সংখ্যাধিক্য থাকলেও পরে গরুর সংখ্যাধিক্য হয়। অনুমান করা হয় গরু বা বৃষ পালন তাদের কৃষিকাজের সহায়তা করেছিল। মেহেরগড়ের মানুষের কৃষিজীবন আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে প্রত্নস্থলে পেষাই করার পাথর ও জাঁতা আবিষ্কারের ফলে।

লক্ষ্যণীয় যে, মেহেরগড় সভ্যতার প্রথম পর্বেই ইটের তৈরি মাটির বাড়ির নিদর্শন পাওয়া যায়। এই ইটগুলি অবশ্য রোদে শুকানো চুল্লিতে পোড়ানো হয়। এই মাটির বাড়িগুলি সম্ভবত শস্য মজুত রাখার জন্য এবং বসবাসের জন্য নির্মিত হয়েছিল। এই বাড়িগুলির দেওয়াল কখনও এক সারি ইটের তৈরি আবার কখনো দুই-তিন সারি ইট দিয়ে তৈরি হত। বাড়ির ছাদ তৈরি হত নলখাগড়া ও লতাপাতার আচ্ছাদন দিয়ে। মেহেরগড়ে প্রাপ্ত বস্তু ও অবশেষে দেখে সেই যুগের কৃষিজীবী সমাজের ছবিটি স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

উপমহাদেশের প্রাচীনতম শস্যাগারের নিদর্শন মেহেরগড়েই বিরাজমান। শস্য সংরক্ষণের জন্য মৃৎ পাত্রের ব্যবহার মেহেরগড়ে এই পর্বে দেখা যায়নি। দৈনন্দিন জীবনে ব্যবহার্য জিনিসের মধ্যে এখানে পাথরের তৈরি ব্লেড, কুঠার, পুঁতি, বাটি, শিলনোড়া, জাঁতা বা হামানদিস্তা পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে শঙ্খবালা লাপিস লাজুলি ও নীলকান্ত মণির মতো মূল্যবান পাথর। ল্যাপিস লাজুলির মতো কিছু মূল্যবান পাথর দূর-দূরান্ত থেকে সংগ্রহ করা হত দেখে মনে হয় মেহেরগড়ের মানুষ বাণিজ্যিক সংযোগ গড়ে তুলেছিল।

মেহেরগড়ে প্রাপ্ত মূল্যবান পাথর, হস্তশিল্প এবং শস্য মজুত রাখার ঘর দেখে মনে হয় সমাজে শ্রেণীবৈষম্য ছিল। বিত্তশালী ক্ষমতাবান শ্রেণী জীবিত অবস্থায় যে মূল্যবান পাথর (নীলকান্তমণি, ল্যাপিস) ব্যবহার করত মৃত্যুর পর তাদের দেহাবশেষের সাথে সেগুলি সমাধিস্থ করা হত। সমাধি রচনার ক্ষেত্রেও এই শ্রেণীবৈষম্য

চোখে পড়ে। কোনো সমাধি তৈরি হত মাটি খুঁড়ে, আবার কিছু মানুষের জন্য তা তৈরি হত মাটির গর্তের ভিতর কাঁচা ইটের দেওয়াল তুলে।

মেহেরগড় সভ্যতার দ্বিতীয় পর্বে কৃষির উন্নতি তথা বিকাশের লক্ষণ স্পষ্ট হয়ে ওঠে, যখন আমরা দেখি শস্যের ভাঁড়ারগুলো আগের তুলনায় অনেক বড়ো আকার ধারণ করেছে এবং গম, বার্লি, কার্পাসের মতো পণ্যের চাষের জন্য সেচ ব্যবস্থার প্রবর্তন হয়েছে। আরেকটি বিষয় আমাদের সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে যে, খ্রিষ্টপূর্ব ৪০০০ সাল নাগাদ ছাগলের আকার বেশ ছোট হয়ে যাওয়া এবং ভেড়ার আকৃতি ছোট হতে শুরু করা। এটা বন্য পশুর গৃহে পালনের লক্ষণ। কৃষির উন্নতির আরেক প্রমাণ কৃষিকাজের হাতিয়ার কাস্তের উপস্থিতি। বস্তুত আমাদের এই উপমহাদেশে বিটুমিনে লাগানো কাস্তে পাথর হল কাস্তের প্রাচীনতম নিদর্শন।

দ্বিতীয় পর্বেও মেহেরগড়ে কাদামাটির বাড়ির নিদর্শন পাওয়া গেছে, যদিও ইটের মাপ আগের তুলনায় বড় ছিল। এই পর্যায়ে মেহেরগড় সভ্যতা লক্ষণীয় পরিবর্তন এল মৃৎশিল্পে। এই প্রথম মৃৎপাত্রের সন্ধান পাওয়া গেল। প্রথম দিকের মৃৎপাত্রগুলি হাতে গড়া, কুমোরের চাকায় নয়। মৃৎপাত্রগুলিকে আগুনে পুড়িয়ে ব্যবহারের উপযোগী করে তোলা হত। মৃৎপাত্রগুলি কালো ও লাল বর্ণের হত। মেহেরগড় সভ্যতার দ্বিতীয় পর্বের অন্তিম লগ্নে প্রথম কুমোরের চাকে মৃতপাত্র নির্মিত হয় বলে অনুমান। সম্ভবত কুমোরের চাকে মৃৎপাত্র তৈরির উন্নত কৌশল পশ্চিম এশিয়া থেকে এই উপমহাদেশে এসেছিল। এই পর্বে মানুষ উন্নত হাতিয়ার তৈরীর কৌশল যে আয়ত্ত করেছিল তা মসৃণ কুঠার দেখেই বোঝা যায়। এটি তাদের কারিগরি দক্ষতার প্রমাণ। একটি সমাধিতে এই মসৃণ কুঠারে নয়টি ফ্লিন্ট পাথরের জ্যামিতিক আকার বিশিষ্ট অস্ত্র ও ১৬ টি ছুরি পাওয়া গেছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে, এটি সম্ভবত কোনও কারিগরের সমাধি। দ্বিতীয় পর্বের মেহেরগড়ে আমরা অলংকার শিল্পের পরিণত রূপেরও পরিচয় পাই। মালাতে শঙ্খ, টারকোইজ, কর্নেলিয়ান এবং লাপিস লাজুলির ব্যবহার দেখা যায়।

মেহেরগড় সভ্যতার তৃতীয় পর্বে কর্ষিত শস্যেও বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। অন্তত চার প্রকার গমের চাষ, দুই সারির বার্লি আর ওট চাষের প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণ রয়েছে। অতিরিক্ত শস্য উৎপাদনের ফলে শস্যাগারের আয়তন ও সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছে এই পর্বে। দরজা-জানালা বিহীন একাধিক কক্ষ বিশিষ্ট বহু শস্যাগার এর নিদর্শন দেখা যায়। হস্তশিল্পের অভাবনীয় বিকাশ এই পর্বের অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মেহেরগড়ের প্রথম দুই পর্যায়ে যেখানে প্রাকৃতিক তামার টুকরো পাওয়া গেছে, সেখানে তৃতীয় পর্যায়ে তামা গলানোর উন্নত প্রযুক্তির প্রমাণও স্পষ্ট। অন্তত ১৪ টি মাটির মুচিতে তামার অবশেষ নিঃসন্দেহে তামা গলানোর সাপেক্ষে সুনির্দিষ্ট প্রমাণ। আকরিক তামা থেকে ব্যবহারযোগ্য তামায় রূপান্তরের উন্নত প্রযুক্তি তাদের আয়ত্তে এসেছিল। মেহেরগড় এর তৃতীয় পর্যায়ে মৃৎশিল্পে পরিবর্তন লক্ষ করা মতো। মৃৎপাত্র নির্মানের পদ্ধতিতে, সংখ্যায়, আকারে ও অলংকরণে পরিবর্তন লক্ষ্য করার মতো। এই পর্যায়ে সব মৃৎপাত্রই কুমোরের চাকে তৈরি হত এবং চুল্লিতে পোড়ানো হত। মৃৎপাত্রের বহিরঙ্গ অলংকরণ ও সুদৃশ্য নকশার প্রচলন বৃদ্ধি পায়। মৃৎপাত্রগুলি একরঙা, দুই রঙা ও তেরঙা ছিল। কালো, ধূসর ও লাল এই তিনটি রঙের মৃৎপাত্র দেখা যায়। পাথরের ব্যবহারও এই পর্বে অব্যাহত ছিল। পাথরের তৈরি কুঠার, কাস্তে, ব্লেড, পেষণ যন্ত্র পাওয়া গেছে। পাথরকে উত্তপ্ত করে যে স্টারটাইট (Startite) মন্ড পাওয়া যেত তা দিয়ে তারা পুঁতি তৈরি করত। এই পর্বের মেহেরগড়ে লাপিস লাজুলি, কর্নেলিয়ান, গার্নেট, টারকোইজ, নীলকান্তমণি প্রভৃতি মূল্যবান পাথর, শঙ্খ ও বিটুমিন নিয়ে কাজের প্রমাণ পাওয়া যায়।

এছাড়া পোড়ামাটির ভাস্কর্য বিশেষত্ব নগ্ন-অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি নির্মাণে তাদের শিল্পীসত্তার প্রকাশ ঘটেছে। মেহেরগড়এ মানুষের সমাজ ও সংস্কৃতি বদলের আরেক সাক্ষ্য হল নাম-মুদ্রা বা সিলমোহর প্রচলন। তামার এই সিলমোহরগুলি মেহেরগড়ে একটি প্রশাসনিক কাঠামো গড়ে ওঠার ইঙ্গিত বহন করে।

মেহেরগড় সংস্কৃতির তৃতীয় পর্বে চুল্লির ভগ্নাবশেষ, যন্ত্রশালা ও হস্তশিল্পের পরিনত অবস্থা দেখে মনে হয় সমাজে শ্রমবিভাজন ও শ্রেণীবিভাজন ছিল। এটি সামাজিক অগ্রগতির পরিচায়ক। একেকটি বিশেষ পেশায় নিযুক্ত মানুষ তাদের উৎপাদিত পণ্য ও সেবা বিনিময়ের মাধ্যমে জীবন ধারণ করত। হস্তশিল্পীরা পুঁতি, শঙ্খ ও দামি পাথর দিয়ে যে নানাবিধ কাজ করতো তা অনেক সময় দূর-দূরান্ত থেকে সংগ্রহ করতে হত। এই ভাবে তাদের বহির্বাণিজ্য গড়ে উঠেছিল। সম্ভবত এই বহির্বাণিজ্যে নিজেদের পণ্যকে চিহ্নিত করার জন্য তারা তামার সীলমোহর ব্যবহার করত। পুনর্বিকাশিত মেহেরগড় কখনও হরপ্পার নগর সভ্যতার স্তরে উন্নীত হতে পারেনি। এই পর্যায়ের মেহেরগড়ে কৃষিপ্রধান গ্রামীণ সমাজের বিকাশশীল জীবনের ছবি প্রতিভাত হয়।

১০.২.২ অন্যান্য নব্যপ্রস্তর ক্ষেত্রের বস্তুগত জীবন

অন্যান্য নব্যপ্রস্তর ক্ষেত্রের মধ্যে বুর্জাহোমে প্রথম মানুষের বসতি লক্ষ্য করা যায় আনুমানিক তিন হাজার খ্রীষ্টপূর্বে গহ্বরে। এই গহ্বরগুলি ছিল গোলাকার, বর্গাকার, আয়তাকার, ডিম্বাকার। গোলাকার গহ্বরগুলির মধ্যে সবচেয়ে বড়টির গভীরতা ৬.৩৯ মিটার, তলার দিকে এবং উপরের দিকে এর ব্যাস ৪.৫৭ মিটার এবং ২.৭৮ মিটার। গর্তের ভিতরে এবং ভূপৃষ্ঠের উপরে প্রবেশদ্বারের কাছে ছাই পাওয়া গেছে। যে গর্তগুল সংগ্রহাগার রূপে কাজ করত সেখানে প্রাণীর অস্থি পাওয়া গেছে। অনুমান করা হয় মানুষ শীতকালে গহ্বরে আশ্রয় নিত আর শীত শেষ হলে তারা গহ্বরের কাছাকাছি স্থানে বাস করত। বুর্জাহোমের মানুষরা কিভাবে জীবন নির্বাহ করত তা স্পষ্ট নয়; তবে অনুমান করা যায় শিকার তাদের বস্তুগত জীবনে এক গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। কর্ষিত পণ্যের মধ্যে যব, গম ও মসুরের নিদর্শন পাওয়া গেছে। বুর্জাহোমের প্রথম পর্যায়ের সমাধির কোন নিদর্শন মেলেনি।

বুর্জাহোমের দ্বিতীয় পর্বে নব্যপ্রস্তর যুগের যে সাক্ষ্য মেলে তা থেকে অনুমান করা যায় যে এখানকার মানুষ আর গহ্বরে বাস করত না, তারা মাটির উপর মাটির অথবা কাঁচা ইটের চালা ঘরে বাস করত। রেডিও কার্বন পদ্ধতি সময় নির্ধারণ করে বলা যায় যে এই পর্যায়ে ১৭০০ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত স্থায়ী হয়েছিল। এই যুগের শেষে একটি তামার তিরের ফলা আবিষ্কৃত হয়েছে। এই পর্যায়ের মৃৎপাত্রে বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। কুমোরের চাকে তৈরি কিছু মৃৎপাত্র পাওয়া গেলেও বেশিরভাগ মৃৎপাত্র ছিল হাতে গড়া। বুর্জাহোমের মৃৎপাত্রগুলি সিন্ধু কিংবা বালুচিস্তান ঘরানার অন্তর্ভুক্ত নয়। এগুলি প্রধানত ধূসর হলদেটে অথবা কালো রঙের বার্নিশ করা। মৃৎপাত্রগুলির তলার দিকের অনিয়মিত আকার অমসৃণ, অনুজ্জ্বল এবং অনিপুণ হাতের কাজ দেখে মনে হয় এগুলি হাতে গড়া এবং উন্মুক্ত অগ্নিক্ষেত্রে বা কুটোর আগুনে পোড়ানো, চুল্লিতে নয়। দ্বিতীয় পর্যায়ের বুর্জাহোমে অনেক সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই সমাধিগুলিতে মানুষের সাথে গরু, কুকুর, ভেড়া ও ছাগলের মত গৃহপালিত পশুর হাড় পাওয়া গেছে। পশুদের পৃথক সমাধিও পাওয়া গেছে। আরেকটি বিষয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছে। সেটি হল একটি সমাধিতে মানুষের হাড়ের সঙ্গে কুকুরের হাড় পাওয়া গেছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে প্রভু বা মনিবের সঙ্গে তার প্রিয় পশু সমাধিস্থ করার প্রচলন ছিল। বুর্জাহোমের এই সমাধিস্থল থেকেই পরবর্তীকালে তাদের ধর্মীয় বিশ্বাস গড়ে উঠেছিল।

বুর্জাহোমের মতো গুফাক্রলে আদিম পর্যায়ে মানুষ গহ্বরে বাস করত। গহ্বরগুলির তলা ও মাথার দিকটি যথাক্রমে চওড়া ও সরু। কোনও কোনও গহ্বরে আবার দুটি কক্ষ আছে। এখানে প্রাপ্ত প্রত্নবস্তুর মধ্যে পাথর, হাড় ও শিঙের তৈরি হাতিয়ার রয়েছে। কৃষিশস্যের মধ্যে এই যুগে যব, গম ও মসূরের ডাল চাষ হত। গুফাক্রালের প্রথম পর্যায়ে মৃৎপাত্রের কোন নিদর্শন পাওয়া যায়নি। এই পর্যায়ে বন্যপশুর দেহাবশেষ পাওয়া গেছে পরবর্তীকালে ভেড়া, ছাগল ও গরু প্রভৃতি গৃহপালিত পশু সেই স্থান গ্রহণ করে। এর থেকে বোঝা যায় বস্তুগত জীবনে এখানকার মানুষ পশু শিকার থেকে পশু পালনের বৃত্তি গ্রহণ করে এবং যব, গম, মুসুর প্রভৃতি রবিশস্যের চাষ শুরু করে। কার্বন ১৪ ডেটিং এর মাধ্যমে এই সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে অনুমানিক ২৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ১৬০০ খ্রীষ্টপূর্ব।

আসামের নব্যপ্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্রগুলি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সঙ্গে ভারতের সংযোগের ইঙ্গিত বহন করে। চাল আর সুতোর চিত্রবিচিত্র করা মাটির বাসনকোসন এই সংযোগের সূত্র। দেহজলি হেডিং (উত্তর কাছাড় পর্বতশ্রেণি) আর সরুটুরু (কামরূপ জেলা) তে শস্যদানা পেষাই করার ও শান দেবার বিভিন্ন যন্ত্র পাওয়া গেছে। আর পাওয়া গেছে সুতোয় চিত্রবিচিত্র করা হাতে গড়া মৃৎপাত্র।

দক্ষিণ ভারতের ক্ষেত্রে বলা যায়, এখানকার মানুষের বসতি সাধারণত গ্রানাইট পাহাড়ের উপরে অথবা নদী তীরবর্তী ও সংলগ্ন মালভূমি অঞ্চলে। তারা পাথরের কুঠার এবং এক ধরনের পাথরের ব্লেড ব্যবহার করত। আগুনে পোড়ানো মাটির মূর্তিগুলি দেখে মনে হয় তারা বিশাল সংখ্যক গবাদি পশু ছাড়াও ভেড়া ও ছাগল পালন করত। শস্য পেষার জন্য তারা পাথরের জাঁতা ব্যবহার করত। দক্ষিণ ভারতেই সবচেয়ে বেশি নব্যপ্রস্তর যুগের বসতি গড়ে উঠেছিল। কারণ এখানে পাথরের সহজলভ্যতা ছিল। এটিও বস্তুগত জীবনের এক গুরুত্বপূর্ণ দিক।

১০.৩ তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির বস্তুগত জীবন

নব্যপ্রস্তর পর্বের পর এবার উপমহাদেশের তাম্রপ্রস্তর পর্বের সংস্কৃতি গুলির বস্তুগত জীবনের দিকে আলোকপাত করা যেতে পারে। তাম্রপ্রস্তর যুগের মানুষ পাথরের তৈরি ছুরি, ছোটো ছুরি ইত্যাদি ছোটো হাতিয়ার ও যন্ত্র ব্যবহার করত। অনেক জায়গায় বিশেষ করে দক্ষিণ ভারতে পাথরের ছুরি তৈরির শিল্প বিকশিত হয়েছিল এবং পাথরের কুঠার তখনও ব্যবহৃত হত। এই প্রত্নক্ষেত্র গুলি পাহাড়ের খুব কাছে অবস্থিত ছিল। এখানকার কিছু বসতিতে বিশাল সংখ্যক তামার সামগ্রী পাওয়া গেছে। এটি রাজস্থানের বানাস উপত্যকার শুষ্ক অঞ্চলে অবস্থিত দুই প্রত্নক্ষেত্র অহর ও গিলান্দ সম্পর্কে প্রযোজ্য। অহর প্রত্নক্ষেত্রটি অন্যান্য প্রত্নক্ষেত্র থেকে আলাদা। অহর সংস্কৃতির মানুষ সমকালীন তাম্রপ্রস্তর যুগের কৃষি সংস্কৃতির মত ছিল না বললেই চলে। এখানকার সমস্ত হাতিয়ারই তামার তৈরি, যদিও এর ওপর ব্রোঞ্জের আস্তরণ ছিল। রাজস্থানের কাছেই তামার খনি থাকায় তামার সজলভ্যতা ছিল। এখানকার মানুষ শুরু থেকেই তামা গলানোর কৌশল ও ধাতুবিদ্যা বিষয়ে জ্ঞান আহরণ করেছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, অহরের প্রকৃত নাম তাম্বাবতী বা যেস্থানে তামা আছে। অহর সংস্কৃতির সময়কাল নির্দিষ্ট হয়েছে ২১০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত এবং গিলান্দকে এর আঞ্চলিক কেন্দ্র ধরা হয়। গিলান্দ-এ কিছু তামার টুকরো পাওয়া গেছে, কিন্তু এখানে পাথরের ছুরি তৈরির কারখানা ছিল। মহারাষ্ট্রের জোরওয়ে এবং চান্দোলিতে চ্যপ্টা আয়তকার তামার কুঠার পাওয়া গেছে। চান্দোলিতে তামার বাটালি পাওয়া গেছে।

তাম্রপ্রস্তর প্রত্নক্ষেত্রগুলিতে প্রচুর মৃৎপাত্র পাওয়া গেছে। প্রথমদিকে মৃৎপাত্রগুলি হাতে গড়া হত, পরে এগুলি কুমোরের চাকে তৈরি হয়। কালো ও লাল রঙের মৃৎপাত্রগুলি এখানে বহুল প্রচলিত ছিল। এগুলির গায়ে কখনও জ্যামিতিক নকশা, আবার কখনও প্রাকৃতিক অলঙ্করণ দেখা যায়। কিছু মৃৎপাত্রের গড়ণ ও অলঙ্করণে ইরানি মৃৎপাত্রের সঙ্গে সাদৃশ্য লক্ষ্য করা যায়। হয়তো ইরানের কোনো কারিগরের দল উত্তর-পশ্চিম ভারতে বসতি স্থাপন করেছিল নতুবা পারস্পরিক যোগাযোগ বা ভাব বিনিময়ের ফলেই এই মিল দেখা দিয়েছিল।

তাম্রপ্রস্তর যুগে বসবাসকারী দক্ষিণ পূর্ব রাজস্থান, পশ্চিম মহারাষ্ট্র এবং অন্যস্থানের মানুষ কৃষিকার্যের সাথে সাথে পশুপালন করত। তারা গরু, ভেড়া, ছাগল, শুয়োর ও মোষ প্রতিপালন করত এবং হরিণ শিকার করত। কিছু পশুর হাড় পাওয়া গেছে যার সঙ্গে ঘোড়া, গাধা বা বুনো গাধার সাদৃশ্য রয়েছে। এই যুগের মানুষ গরু-শুয়োর দুইই খেত এবং গম, চাল ও বাজরা চাষ করত। এছাড়া মসূর ডাল, মুগ ও মটর চাষ করত। নর্দমার তীরে নভডাটোলিতে বহু ধরনের শস্যের চাষ হত। আর কোণও স্থানে এত শস্য আবিষ্কৃত হয়নি। পূর্ব ভারতের বিহার ও পশ্চিমবঙ্গে মাছ ধরার বড়শি অ চাল পাওয়া গেছে। এর থেকে বোঝা যায় এখানকার তাম্রপ্রস্তর যুগের মানুষ ভাত মাছের উপরে নির্ভর করত। রাজস্থানের বানস উপত্যাকার বেশিরভাগ বসতিগুলিই কিন্তু গিলান্দ ও অহর প্রত্নক্ষেত্র প্রায় চার হেক্টর এলাকার উপর বিস্তৃত ছিল। তাম্র প্রস্তর যুগের মানুষ সাধারণত পোড়া ইটের সঙ্গে বিশেষ পরিচিত ছিল না। ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ পোড়া ইট কদাচিৎ ব্যবহৃত হয়েছে। এখানে মাঝে মাঝে কাদা ইটের বাড়ি নির্মিত হতে দেখা যায়, কিন্তু এখানকার বেশির ভাগ গৃহ-ই ডালপালার উপর কাদামাটির আস্তরণ দিয়ে নির্মিত। এপর্যন্ত যে ২০০ টি জোরওয়ে ক্ষেত্র আবিষ্কৃত হয়েছে তার মধ্যে গোদাবরী উপত্যাকার দাইমাবাদ-ই বৃহত্তম। প্রায় ২০ হেক্টর নিয়ে গঠিত এই কেন্দ্রটিতে ৪০০০ লোকের বাস ছিল। কাদামাটির দেওয়াল দিয়ে এই ক্ষেত্রটিকে সুরক্ষিত করার চেষ্টা হয়েছিল। দাইমাবাদ ব্রোঞ্জসামগ্রীর জন্য বিখ্যাত। এখানকার কিছু সামগ্রীর উপর হরপ্পা সংস্কৃতির প্রভাব লক্ষ করা যায়।

পশ্চিম মহারাষ্ট্রের ইনামগাঁও-এ যে আদি তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির নিদর্শন রয়েছে সেখানে বড় কাদা মাটির গৃহের ভিতরে উনুন এবং বৃত্তকার গর্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। পরবর্তী পর্যায়ে (১৩০০-১০০০) খ্রিষ্ট পূর্বাব্দে পাঁচটি কক্ষ বিশিষ্ট একটি বাড়ি পাওয়া গেছে যার চারটি আয়তকার এবং একটি বৃত্তকার। বসতির কেন্দ্রস্থলে এই বাড়ির অবস্থান দেখে মনে হয় এটি কোনও প্রাধানের গৃহ হবে। এই ঘরের সংলগ্ন একটি তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতি ক্ষেত্র ১০০ টিরও বেশি গৃহ ও বেস কয়েকটি সমাধি আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ক্ষেত্রটি পরিখা ও প্রকার দ্বারা সুরক্ষিত।

তাম্রপ্রস্তর যুগে হস্তশিল্প ও অন্যান্য শিল্পকর্মের বহু নমুনা পাওয়া গেছে। এই যুগের অভিজ্ঞ তাম্রকারদের ও প্রস্তরশিল্পীর দক্ষ হাতের বহু সামগ্রী পাওয়া গেছে। বিভিন্ন যন্ত্র, হাতিয়ার, অস্ত্র এবং তামার বালা আবিষ্কৃত হয়েছে। তারা আধি-দামা পাথরের (যেমন কর্নেলিয়ন, স্টেটাইট, কোয়ার্টজ, স্ফটিক) পুঁতি বানাত। কুল্লিতে হাতল-আলা সুন্দর আয়না পাওয়া গেছে। নাদারায় বালা পাওয়া গেছে। কোটদিজিতে পুতির ও পোড়ামাটির গয়না অ খেলনা পাওয়া গেছে। ডাম্বসাদাতে আকরিক শিসা পাওয়া গেছে। এই যুগের মানুষ সুতো কাটাতে ও বস্ত্র বুনতে পারত, কারণ মালবে চরকার টাকু পাওয়া গেছে। মহারাষ্ট্রের তুলোর ও সিল্কের সুতো পাওয়া গেছে। এর থেকে অনুমান করা যায় যে তারা বস্ত্রবয়নের কৌশল আয়ত্ত করেছিল। এছাড়া ইমানগাও-এ কুমোর, কর্মকার, গজদন্ত শিল্পী, চুন নির্মাতা ও পোড়ামাটির (টেরাকোটা) শিল্পীরা তাদের শিল্পকর্মের সঙ্গে যুক্ত

ছিল। তাম্রপ্রস্তর যুগে সামাজিক কাঠামো, শস্য উৎপাদন এবং মৃৎশিল্পে আঞ্চলিক বৈচিত্র্য লক্ষ্য করা যায়। পূর্বভারতে চাল উৎপাদন হত, পশ্চিম ভারতে যব ও গম।

এই যুগের মানুষদের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়া ও ধর্মবিশ্বাস সম্পর্কে কিছু ধারণা করা যায়। মহারাষ্ট্রে বাড়ির মেঝের তলায় উত্তর দক্ষিণ মুখ করে মৃতদেহের ভস্মাধার সমাধি দেওয়া হত। এই উদ্দেশ্যে তাদের হরপ্পা বাসীদের মতো কোনো পৃথক সমাধিক্ষেত্র ছিলনা। মৃতদেহের সাথে কিছু পাত্র ও কিছু তামার জিনিস সমাধি দেওয়া হত এই বিশ্বাসে যে পরলোকে এগুলি তার কাজে আসবে। তাম্র প্রস্তর যুগের পোড়ামাটির নারীমূর্তি গুলি দেখে মনে হয় এগুলি মাতৃকা দেবী রূপে পূজিত হত। কাঁচা মাটির তৈরি কিছু নারীর নগ্নমূর্তি পাওয়া গেছে। ইনামগাও-এ পশ্চিম এশিয়ার মতো মাতৃকা দেবীর মূর্তি পাওয়া গেছে। মালব ও রাজস্থানে পোড়া মাটির সাজানো ষাঁড় পাওয়া গেছে, যা তাদের ধর্ম বিশ্বাসের প্রতিফলন বলে মনে হয়।

বসতির ধরন ও সমাধি সংক্রান্ত আচার রীতিনীতি দেখে মনে হয় তাম্রপ্রস্তর সমাজে বৈষম্যের সূচনা হয়েছিল। মহারাষ্ট্রের জোরওয়ে বসতির ক্ষেত্রে স্তরবিন্যস্ত সমাজের ছবি স্পষ্ট হয়ে ওঠে। কিছু বসতি ২০ হেক্টর এলাকা নিয়ে গড়ে উঠেছিল। আবার কিছু বসতি মাত্র পাঁচ হেক্টর বা আরো কম এলাকার উপর গড়ে উঠেছিল। বসতির আয়তনের এই তারতম্য দেখে মনে হয় বৃহত্তর বসতিগুলি ছোট বসতিগুলিকে নিয়ন্ত্রণ করত।

১০.৪ আদিপর্বের খাদ্য উৎপাদকদের বস্তুগত সংস্কৃতির সাধারণ বৈশিষ্ট্য

নব্যপ্রস্তর যুগের প্রত্নক্ষেত্রগুলি ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন প্রান্তে আঞ্চলিক বৈচিত্র নিয়ে বিরাজমান ছিল। তাই আমাদের স্মরণে রাখা প্রয়োজন যে উপমহাদেশের সর্বত্র নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতি একই ধাঁচে গড়ে ওঠেনি এবং নব্যপ্রস্তর যুগের বৈশিষ্ট্য প্রতিটি প্রত্নক্ষেত্রে প্রতীয়মান হয় না। তবে সাধারণভাবে বলা যায়- নবপ্রস্তর যুগের এই প্রত্নক্ষেত্রগুলিতে বস্তুগত ক্ষেত্রে কৃষি সমাজের ছবি প্রতিভাত হয়। এর পাশাপাশি সেখানকার মানুষ তখন পাথর ও ধাতুর (তামার) ব্যবহারে দক্ষ হয়ে উঠেছিল। কুমোরের চাকে তৈরি মৃৎপাত্র থেকে তামা নিষ্কাশন সব কাজেরই নিদর্শন রয়েছে। মৃৎপাত্রের আকার ও অলংকরণে বৈচিত্র লক্ষ্য করা যায়। পোড়ামাটির ভাস্কর্য সালংকারা নগ্ন বা অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি গুলি সম্ভবত মাতৃকা উপাসনার ইঙ্গিত বহন করে। এই প্রত্নক্ষেত্রগুলিতে পুঁতি, পোড়ামাটির ও হাড়ের বালা পাওয়া যাওয়ায় মনে হয় অলংকার শিল্প বিকশিত হয়েছিল। বিলাস সামগ্রীর মধ্যে তামার গয়না পাওয়া গেছে। সবমিলিয়ে এক বৈচিত্র্যময় বস্তুগত সংস্কৃতির জগৎ। উপিন্দর সিং এ প্রসঙ্গে কতকগুলি গুরুত্বপূর্ণ বক্তব্য তুলে ধরেছেন। প্রথমত, তিনি লিখেছেন, মানুষের বাঁচার তাগিদে খাদ্যের প্রয়োজনীয়তা প্রশ্নাতীত। কিন্তু খাদ্য উৎপাদন ও ভোগের একটি সামাজিক তাৎপর্যও রয়েছে। তাঁর ভাষায় "...food items may be part of the systems of hospitality, gift giving, trade and social taboos." এ প্রসঙ্গে তিনি বুধিহাল প্রত্নকেন্দ্রের একটি চিত্রকলার দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন যেখানে খাদ্য উৎপাদনকে কেন্দ্র করে সম্প্রদায়গত জীবনের প্রতিচ্ছবি ফুটে ওঠে।

দ্বিতীয়ত, সাধারণভাবে খাদ্য উৎপাদকদের সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন সম্পর্কে আলোচনায় একথাও মনে রাখা দরকার যে, তার মধ্যেও নানারকম বৈচিত্র্য লক্ষ্যণীয়। কিছু কিছু ক্ষেত্রে দেখা গেছে অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠীর মধ্যে সরল সমাজব্যবস্থার নজির, অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত বৃহৎ কেন্দ্র গুলিতে ফুটে উঠেছে

জটিলতরসমাজ ব্যবস্থার চিহ্ন। বিভিন্ন সম্প্রদায়ের বস্তুগত জীবনের এই তারতম্যের পেছনে নিশ্চিতরূপে চালিকাশক্তি ছিল তাদের বসবাসের পরিবেশগত পরিস্থিতি ও তাকে মানিয়ে নেওয়ার প্রতিক্রিয়ার তারতম্য। হাতিয়ার তৈ, মৃৎপাত্র ও বাসস্থানের বিভিন্নতা শৈল্পিক ঐতিহ্য ও জীবনধারার ভিন্নতাকেই তুলে ধরে। সমাধি সংস্কৃতির রূপভেদও ভিন্নতর বিশ্বাস ও প্রথার ঐতিহ্যকেই মনে করিয়ে দেয়।

তৃতীয়ত, প্রায়শই এমন ধারণা লক্ষ্য করা যায় যে, খাদ্য উৎপাদকদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত কঠিন ও সংগ্রামপূর্ণ জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত থাকায় খাদ্যসংগ্রাহক পর্বের মানব সংস্কৃতিতে অবসর-বিনোদনের সুযোগ ছিল কম। কিন্তু এতটা সাধারণভাবে সাংস্কৃতিক পরিবর্তনকে ব্যাখ্যা করা অযৌক্তিক। বর্তমান কালের কৃষক সমাজের মতোই নব্যপ্রস্তর পর্বের খাদ্য উৎপাদক গোষ্ঠীকেও বস্তুগত জীবনযাত্রায় নানাবিধ প্রতিকূল পরিস্থিতির মোকাবিলা করতে হত। এই বিষয়টিও খেয়াল রাখা দরকার।

১০.৫ বস্তুগত সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের অভিঘাত

উপমহাদেশ জুড়ে আদিপর্বের খাদ্য উৎপাদনকারী মানবগোষ্ঠীর বৈচিত্র্যকে স্বীকার করেও খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদকের এই যাত্রাপথের সাধারণ অভিঘাতের দিকে এবার আলোকপাত করা যেতে পারে। এক্ষেত্রে প্রথমেই খেয়াল রাখা দরকার যে, খাদ্য সংগ্রাহক অনেক গোষ্ঠীর জীবনেই থিতু হবার প্রবণতা যেমন দেখা যায়, ঠিক তেমনই খাদ্য উৎপাদক ও পশুপালনের বস্তুগত জীবনে অভ্যস্ত অনেক মানবগোষ্ঠীর মধ্যেই পরিযানের প্রবণতা ফুটে ওঠে। তবে বেশিরভাগ গোষ্ঠীর মধ্যে স্থায়ী বসবাসের প্রবণতাই স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

পরিবর্তনশীল বস্তুগত জীবনের অভিঘাত মানুষের খাদ্যাভ্যাস ও শারীরিক অবস্থার ওপরেও প্রভাব ফেলেছিল। মানবদেহের অস্থি বিশ্লেষকরা এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করেছেন খাদ্য সংগ্রাহকদের সাথে আদিপর্বের খাদ্য উৎপাদনকারী জনগোষ্ঠীর খাদ্যাভ্যাসের তুলনামূলক বিশ্লেষণ করলেই দেখা যায় ভ্রাম্যমাণদের তুলনায় অপেক্ষাকৃত থিতু সামাজিক জীবন যাপনে অভ্যস্ত মানুষের মধ্যে রোগ ও মহামারীর প্রবণতা অনেক বেশি ছিল। আবার দীর্ঘকাল একস্থানে স্থায়ীভাবে বসবাসের মধ্য দিয়ে সংশ্লিষ্ট মানবগোষ্ঠী ও প্রাকৃতিক পরিবেশের একটা পারস্পরিক সম্পর্ক গড়ে ওঠে। অপেক্ষাকৃত থিতু জীবন ও কৃষি উৎপাদনের সঙ্গে সংযুক্ত খাদ্যাভ্যাসে অভ্যস্ত সমাজে প্রসূতি নারীদের জীবনেও ঝুঁকির প্রবণতাও অনেকটাই কম থাকে। তাছাড়া তুলনামূলক ভাবে শর্করা জাতীয় খাদ্যাভ্যাসের জনগোষ্ঠীর মধ্যে জন্মহারের একটা স্বাভাবিক গতিধারা পরিলক্ষিত হয়। যার নীটফল স্বরূপ জনসংখ্যার ব্যাপক বৃদ্ধি ঘটে এবং গোষ্ঠীগুলির স্বাভাবিক বয়সের তালিকাতেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন তুলে ধরে।

খাদ্য উৎপাদনকারী সমাজজীবনে নতুন ধরণের হাতিয়ারের চাহিদাও খুব স্বাভাবিক একটি ঘটনা। কিন্তু প্রচলিত বস্তুগত জীবনে এই প্রবণতা এক গুরুত্বপূর্ণ প্রভাব ফেলে এবং মহিলা, শিশু ও বয়স্কদের কর্মধারাতেও রদবদল ঘটায়। খাদ্য গ্রহণের স্বাভাবিক প্রবণতাতেও একধরণের বদল লক্ষ্য করা যায়। খাদ্যসংগ্রাহকদের মধ্যে সাধারণত স্বল্প সময়ে যতটা বেশি সম্ভব খাদ্যগ্রহণের প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও খাদ্য উৎপাদকদের বস্তুগত জীবনে ভবিষ্যৎ সঞ্চয়ের একটা প্রবণতা লক্ষ্য করা যায়, যার মূলে নিহিত থাকে ভবিষ্যৎ উৎপাদন ও ঝুঁকি থেকে নিরাপদে থাকার ভাবনা।

পরিবর্তিত বস্তুগত সাংস্কৃতিক জীবনে নারীদের অবস্থানেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে। নৃতাত্ত্বিকদের গবেষণা থেকে বলা যায় প্রাথমিকপর্বের খাদ্য উৎপাদন বিশেষত বীজ সংগ্রহ ও তার যথাযথ পরিচর্যার ক্ষেত্রে মেয়েরাই মুখ্য ভূমিকা নিত। তাছাড়া খাদ্য সংরক্ষণের তাগিদ যে সমাজের সাধারণ বৈশিষ্ট্য সেই সমাজের মৃৎপাত্র উৎপাদনের কাজে মেয়েদের ভূমিকা ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। এ বিষয়ে আরো গবেষণার গুরুত্ব মেনে নিয়েও বলা যায়, ভিন্ন বস্তুগত পটভূমিতে মেয়েদের সাংস্কৃতিক অবস্থানের এই রদবদল নিঃসন্দেহে এক অনন্য তাৎপর্যের দাবি রাখে।

১০.৬ উপসংহার

ভারতীয় উপমহাদেশের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির বস্তুগত জীবনের যে ছবি আমরা আলোচনা করলাম তার ভিত্তিতে বলা যায় এই পর্বের বস্তুগত জীবনের মূল নিহিত ছিল কৃষিকাজের মধ্যে। তথাপি, বিশেষায়িত শিল্প ও দূরপাল্লার বিনিময়ের দৃষ্টান্তও মেহেরগড়ের মত প্রত্নকেন্দ্রের সাক্ষ্য থেকে স্পষ্ট। কুনঝুন ও গণেশ্বর কেন্দ্র বিকশিত সুনির্দিষ্ট শিল্পকেন্দ্রের প্রমাণ দেয়। আবার মূল বসতির বাইরেও বেশ কিছু শিল্পকেন্দ্র বিবিধ অর্থনৈতিক কার্যকলাপের কথাও তুলে ধরে। এই প্রবণতা থেকে স্পষ্ট সচেতন ও বিবেচনা প্রসূত কোন গোষ্ঠীর সিদ্ধান্তেই বিভিন্ন ধারার কার্যকলাপের সিদ্ধান্ত গৃহীত হত। আবার নব্যপ্রস্তর পর্বের মানুষরা যে বিভিন্ন নাগরিক সাংস্কৃতিক জনগোষ্ঠীর সাথে নিয়ত আদান-প্রদান চালাতো তার নজিরও বিরল ছিল না। সর্বোপরি, স্থায়ী গ্রামীণ জীবনে অধিকাংশ জনগোষ্ঠীর বসবাস যেখানে ঘটতো, সেখানে তাদের পরস্পরের মধ্যে ভাববিনিময় ও আদান-প্রদানের যে নিজস্ব জগৎ যে গড়ে উঠবে তাতে আশ্চর্যের কিছু নেই।

১০.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. ভারতীয় উপমহাদেশে নব্যপ্রস্তর পর্বের বস্তুগত সাংস্কৃতিক জীবনধারার একটি রূপরেখা অঙ্কণ করো।

২. মেহেরগড় সভ্যতায় বস্তুগত সংস্কৃতির পরিবর্তনের প্রধান দিকগুলি চিহ্নিত করো।

৩. খাদ্য সংগ্রাহক থেকে খাদ্য উৎপাদনের বস্তুগত সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের মূল অভিঘাত গুলি কী কী ছিল?

৪. ভারতীয় উপমহাদেশে তাম্রপ্রস্তর পর্বের প্রধান কেন্দ্রগুলিতে বস্তুগত সংস্কৃতির কেমন পরিবর্তন ঘটেছিল?

১০.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

রণবীর চক্রবর্তী, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব (প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৯।

ইরফান হাবিব, প্রাক-ইতিহাস, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০২।

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ), প্রথম খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

ভি গর্ডন চাইল্ড, হোয়াট হ্যাপেন্ড ইন হিস্ট্রি, (ভাষান্তর তরুণ হাতি), দীপায়ন, কলকাতা, ২০১৪।

সিদ্ধার্থ গুহ রায় ও অপরাজিতা ভট্টাচার্য, বিশ্ব সভ্যতা-প্রাচীন যুগ, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ২০১৯।

ড. রতন কুমার বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (আদিপর্ব), প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, কলকাতা, ২০১৯।

Upinder Singh– A History of Ancient and Early Medieval India– Pearson– 2009.

R.S. Sharma– India's Ancient Past– OUP– New Delhi– 2005.

Raymond Allchin and Bridget Allchin– The Rise of Civilization in India and Pakistan– CUP– 1982.

একক : ১১ ◘ হরপ্পা সভ্যতা---উৎস, বসতি বিস্তার এবং নগর পরিকল্পনা (The Harappan Civilization—Origins, settlement pattern and town planning)

গঠন

১১.০ উদ্দেশ্য

১১.১ সূচনা

১১.২ হরপ্পা সভ্যতা: সাম্প্রতিক চর্চা ও পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি

১১.৩ হরপ্পা সভ্যতার সূত্রপাত

১১.৪ হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার

১১.৫ হরপ্পা সভ্যতার নগর বিন্যাসের মুখ্য বৈশিষ্ট্য

১১.৬ উপসংহার

১১.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১১.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১১.০ উদ্দেশ্য

- এই এককের উদ্দেশ্য হল সার্বিক ভাবে হরপ্পা সভ্যতার উপর আলোকপাত করা।
- হরপ্পা সভ্যতার তিনটি মৌলিক দিকের উপর বিশেষ আলোকপাত এই এককে করা হবে-
  - ➢ হরপ্পা সভ্যতার উৎস সন্ধান
  - ➢ হরপ্পা সভ্যতার বসতি বিস্তার
  - ➢ হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনা

১১.১ সূচনা

বিংশ শতকের প্রারম্ভে হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কার আদি পর্বের ভারত ইতিহাস চর্চায় এক যুগান্তকারী পদক্ষেপ। কালের গর্ভে এই সভ্যতা বহুকাল ধরেই ছিল লোকচক্ষুর অন্তরালে, ফলে এর আবিষ্কারের পূর্বে

মনে করা হত যে ভারতীয় ইতিহাস ও সংস্কৃতির সূচনা হয়েছে আর্যসভ্যতার সময় থেকে। কিন্তু এখন এই ধারণা সম্পূর্ণ পরিবর্তিত হয়েছে। হরপ্পা সংস্কৃতির আবিষ্কার ভারতীয় সংস্কৃতির দিগন্তকে প্রসারিত করে তার প্রাচীনত্ব ও মৌলিকত্ব প্রতিষ্ঠিত করেছে এবং অন্ততঃ পাঁচ হাজার বছরের ভারতীয় সভ্যতা প্রাচীনত্বের দিক দিয়ে মিশর-ব্যাবিলিন-আসিরিয়ার- সমকক্ষতা অর্জন করেছে।

১১.২ হরপ্পা সভ্যতা: সাম্প্রতিক চর্চা ও পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি

বিগত আট-নয় দশক ধরে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পাসহ বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রে একাধিকবার উৎখননের ফলে হরপ্পা সভ্যতা সম্পর্কে নিত্য-নতুন বহু তথ্যের সাথে আমরা পরিচিত হতে পেরেছি। যার ফলে হরপ্পা সভ্যতা সম্পর্কে বহুল প্রচলিত দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যে নানা পরিবর্তন ঘটেছে। আবার একইসঙ্গে নতুন তথ্যের সংযোজন হরপ্পা সভ্যতা সম্পর্কে গবেষকদের কৌতূহল আরো বাড়িয়ে দিয়েছে, উস্কে দিয়েছে নতুন বিতর্ক।

হরপ্পা সভ্যতার আবিষ্কারের একেবারে প্রাথমিকপর্ব থেকেই মেসোপটেমীয় সভ্যতার সাথে হরপ্পা সভ্যতার সংযোগের মধ্যে দিয়ে এই সভ্যতার কালনির্ণয়ের প্রচেষ্টা লক্ষ্য করা যায়। অনেক প্রত্নতাত্ত্বিকই উক্ত দুই সভ্যতার মধ্যে তুলনায় বিশেষ আগ্রহ দেখান। এই সূত্রেই হরপ্পা সভ্যতার উৎপত্তি, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক ব্যবস্থার প্রকৃতি নিয়ে একাধিক বিতর্ক শুরু হয়। পরবর্তীকালে গবেষকরা, অনেক সতর্কভাবে বিষয়টি নিয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন এবং গভীর পর্যালোচনার পর সিদ্ধান্তে আসেন যে, মেসোপটেমীয় ঐতিহ্য থেকে মুক্ত হয়ে স্বতন্ত্রভাবে হরপ্পা সভ্যতার ইতিহাস বিশ্লেষণ করাই শ্রেয়।

হরপ্পা সভ্যতা বিষয়ক প্রচলিত ইতিহাসচর্চায় আরও একটি বিষয় বিশেষগুরুত্ব পায়। তা হল এই সভ্যতার নাগরিক চরিত্র বিষয়ে বিতর্ক। মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা- এই দুই প্রত্নকেন্দ্রই সেখানে বিশেষ গুরুত্ব পায়। হরপ্পা সংস্কৃতির প্রথম উৎখননকৃত কেন্দ্র হিসেবে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার গুরুত্ব স্বীকার করেও আধুনিক গবেষকরা উল্লেখ করেছেন যে, সাম্প্রতিক উৎখননের ফলে আরো অনেক প্রত্নক্ষেত্রের সন্ধান মিলেছে, আকৃতির বিচারে ও বৈশিষ্ট্যের অনন্যতায় যাদের গুরুত্ব কোনো অংশেই কম নয়। এ প্রসঙ্গে তাঁরা উল্লেখ করেছেন চোলিস্তানের দুই প্রত্নক্ষেত্র লুরিওয়ালা ও গনেরিওয়ালা, হরিয়ানার রাখিগরহি এবং গুজরাটের ধোলাবিরার কথা। গবেষকরা অনেক ছোট ছোট প্রত্নক্ষেত্রের দিকেও দৃষ্টিপাত করেছেন যার মধ্যে নগরের পাশাপাশি, গ্রামীণ ক্ষেত্রও রয়েছে। করাচির নিকটবর্তী আলহাদিনো যার মধ্যে অন্যতম। মাত্র ৫ হেক্টর আয়তন বিশিষ্ট একটি গ্রামীণ প্রত্নকেন্দ্র হলেও, হরপ্পা সভ্যতার প্রায় সকল বৈশিষ্ট্য এক্ষেত্রে বিদ্যমান। একইরকম গুরুত্বপূর্ণ আরেকটি ক্ষেত্র হলো হরিয়ানার বালু, যেখানে সাম্প্রতিক উৎখননে এক সমৃদ্ধ ও বৈচিত্র্যপূর্ণ উদ্ভিজ্জ অবশেষের সন্ধান মিলেছে। সবমিলিয়ে, বলা যায় হরপ্পার বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্র থেকে পাওয়া তথ্য আজ বৈচিত্র্য ও প্রাচুর্যে পরিপূর্ণ এবং হরপ্পা সভ্যতার অন্তর্গত গ্রামীণ ও নগর কেন্দ্রের মধ্যে যে এক ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ গড়ে উঠেছিল সে সম্পর্কেও আমরা ধীরে ধীরে নতুন তথ্যের আলোকে জানতে পারছি।

হরপ্পা সভ্যতার কেন্দ্র গুলির মধ্যে কিছু সাধারণ বৈশিষ্ট্য দেখা গেলেও, এই প্রত্নকেন্দ্র গুলির মধ্যে বিশেষ কিছু আঞ্চলিক স্বাতন্ত্র্যও লক্ষণীয়। হরপ্পার বিভিন্ন কেন্দ্রের বসতির রূপরেখা কিংবা সেখানকার উৎপাদিত ফসলের বৈচিত্রের মধ্যেও এই স্বতন্ত্রতা ধরা দেয়। একইভাবে বলা যায়, বিভিন্নকেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত কারিগরী দ্রব্যের বৈচিত্রের কথাও। যেমন, আলহাদিনো থেকে হরপ্পীয় মৃৎপাত্রের মাত্র ১ শতাংশ নমুনা পাওয়া গেছে।

আবার কালিবঙ্গানের সিটাডেল এলাকায় কাদামাটির ইটের তৈরি উঁচু মঞ্চ বেষ্টিত স্থানের সন্ধান মিলেছে (অনেকের মতে যজ্ঞের চুল্লি) যা অন্যত্র দেখা যায় না। বিভিন্ন কেন্দ্রের সমাধি ক্ষেত্রের মধ্যেও তারতম্য ছিল লক্ষণীয়। এগুলি থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে, খাদ্যাভ্যাস, কারিগরী শিল্প, ধর্মীয় বিশ্বাস, সামাজিক রীতি ইত্যাদি নানা ক্ষেত্রে বৈচিত্র্য হরপ্পা সভ্যতার একান্ত বৈশিষ্ট্য, তাই এগুলিকে বাদ দিয়ে হরপ্পা সভ্যতার ইতিহাসচর্চা অসম্পূর্ণ হতে বাধ্য।

সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চা ও গবেষণায় এই সভ্যতার বিভিন্ন ইমারতের গঠন ও বৈশিষ্ট্য নতুন ভাবনাকে উস্কে দিয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োয় প্রাপ্ত বৃহৎ শস্যাগার আদৌ শস্য সংরক্ষণের জন্য ব্যবহৃত হত কিনা- সে বিষয়েও গবেষকরা সন্দিহান। তবে তাৎপর্যপূর্ণ দিক হলে এই ধরনের বিশ্লেষণ আমাদের আরও একবার ভাবতে বাধ্য করেছে হরপ্পার প্রচলিত সামাজিক ও রাজনৈতিক গঠন প্রকৃতি সম্পর্কে। শুধুতাই নয়, প্রত্নতত্ত্বের মধ্যেই নিত্য-নতুন উৎখনন হরপ্পা সভ্যতার সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্যকে নতুন ভাবে তুলে ধরতে প্রয়াসী হয়েছে। মার্কিন ও পাকিস্তানী একদল প্রত্নতাত্ত্বিকের অক্লান্ত প্রচেষ্টা এ বিষয়ে আমাদের জ্ঞানের পরিধিকে আরও বিস্তৃত করেছে। আগেরকার উৎখননের তুলনায়, এই পর্বের উৎখননে অনেক বেশি বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি ব্যবহৃত হচ্ছে, যেখানে নৃতত্ত্বের অন্তর্ভুক্তি ও ব্যাপক মাত্রায় ব্যবহার হরপ্পা সভ্যতা সম্পর্কে অনেক অজ্ঞাত তথ্যকে আলোকিত করার পাশাপাশি পরবর্তী গবেষণার দিগন্তকেও প্রসারিত করেছে। হরপ্পীয় জনতার দেহাবশেষ বিশ্লেষণের মাধ্যমে প্রত্নতাত্ত্বিকরা যে হাল আমলে হরপ্পীয়দের খাদ্যাভ্যাস ও স্বাস্থ্য সম্পর্কে নানা বিষয় ঐতিহাসিকদের দৃষ্টিতে নিয়ে আসছেন, তাই এতে আর আশ্চর্যের কিছু নেই।

১১.৩ হরপ্পা সভ্যতার সূত্রপাত

সভ্যতার সূত্রপাত বিষয়ক আলোচনা বরাবরই জটিল ও বিতর্কিত একটি বিষয়। হরপ্পা সভ্যতাও এর ব্যতিক্রম নয়। বিংশ শতকের বিশের দশকে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পার প্রত্নতাত্ত্বিক ধ্বংসাবশেষ আবিষ্কারের সময়কাল থেকেই এই সভ্যতার পরিবর্তিতরূপ প্রত্নতাত্ত্বিকদের ভাবিয়ে তুলেছে শুরুতে এই সভ্যতা কীরকম ছিল? কোথা থেকেই বা এর সূত্রপাত হল? ক্রমে তাঁরা এ বিষয়ে চিন্তাভাবনা শুরু করেন। সেইসময় কোনো প্রমাণ সামনে না থাকা সত্ত্বেও জন মার্শাল সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, ভারতের মাটিতেই সিন্ধু সভ্যতার এক বিরাট পূর্ব বৃত্তান্ত নিহিত আছে। অন্যদিকে এর বিপরীত মত দিয়েছেন 'diffusionist' বা 'প্রসারণতত্ত্বের' প্রবক্তারা। ই. যে. এইচ. ম্যাকে মনে করেন, সুমের থেকে আগত মানুষের অভিপ্রয়াণই হরপ্পা সভ্যতার মূল কারণ। এই তত্ত্বের আরো দুই প্রবক্তা হলেন, ডি. এইচ. গর্ডন এবং এস. এন. ক্রামার। মার্টিমোর হুইলার মানুষের অভিপ্রয়াণের পরিবর্তে ভাবাদর্শের অভিপ্রয়াণের মধ্যে হরপ্পা সভ্যতার উৎস অনুসন্ধান করেছেন। তাঁর মতে খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় সহস্রাব্দে সমগ্র পশ্চিম এশিয়ার বাতাবরণে সভ্যতার যে ভাবাদর্শের উপস্থিতি পরিলক্ষিত হয় হরপ্পা সভ্যতার স্রষ্টারা নিশ্চিতভাবেই তাকে অনুসরণ করেছিলেন। একথা ঠিকই যে, মিশর বা হরপ্পীয় সভ্যতার কয়েক শতক আগেই মেসোপটেমিয়া সভ্যতায় নগরজীবনের অস্তিত্ব পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু তা থেকে এটা মনে করা ভুল হবে যে, পরবর্তীকালের সভ্যতা গুলি প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে পূর্ববর্তী সভ্যতার অনুকরণ করেছিল। ভুললে চলবে না যে, মেসোপটেমীয় এবং হরপ্পা সভ্যতার মধ্যে বিভিন্ন বিষয়ে পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট। এ প্রসঙ্গে পৃথক লিখন শৈলী, ব্রোঞ্জের ব্যাপক ব্যবহার, বসতি বিন্যাসের ছক কিংবা সেচের কাজে

ব্যবহৃত খাল খননের কথা বলাই যায়। সুতরাং, হরপ্পা সভ্যতার সূত্রপাতের সংযোগ বিদেশের মাটিতে কিংবা বিদেশী সূত্রে খোঁজা ও প্রমাণ করা কার্যত কঠিন ও অবাস্তব।

হরপ্পা সভ্যতার সূত্রপাত অনুসন্ধানে দেশীয় যোগসূত্র প্রতিষ্ঠায় বিভিন্ন পুরাতাত্ত্বিক গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছেন। যার মধ্যে অন্যতম ননীগোপাল মজুমদার। মার্শালের অনুমানকে সঠিক প্রমাণ করে তিনি সিন্ধু-প্রদেশে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নস্থল অনুসন্ধানকালে এমন কতকগুলি প্রত্নবস্তু উদ্ধার করেন যে, তার ভিত্তিতে বোঝা যায় যে, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদাড়োর চেয়েও পুরনো তাম্র-প্রস্তর যুগের সভ্যতা ছিল। আম্রিতে প্রাপ্ত পুরাবস্তুর অনুরূপ বস্তু গাজীশাহতে পাওয়া গেলে প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমানের ভিত্তি আরো সুদৃঢ় হয়। পরবর্তীকালে স্যার মার্টিমোর হুইলার হরপ্পার বিশেষ একটি স্থানে (যা 'AB' টিবি বলে পরিচিত) বেশ কিছু মৃৎপাত্র পান। এর ভিত্তিতে প্রাক-হরপ্পীয় পর্বের সভ্যতা সম্পর্কে আরও নিশ্চিন্ত হওয়া যায়।

স্বাধীনতা-উত্তর পর্বে ভারত ও পাকিস্তানের প্রত্নতাত্ত্বিকদের প্রচেষ্টায় হরপ্পা সভ্যতার অনুসন্ধান আরো কিছুটা অগ্রসর হয়। ১৯৫৫-৫৭ সাল নাগাদ পাকিস্তানের প্রত্নতাত্ত্বিক এফ. এ. খান সিন্ধু প্রদেশের খয়েরপুর জেলায় কোটডিজিতে প্রত্নতাত্ত্বিক অনুসন্ধান চালান। এর ফলে প্রথম প্রাক-সিন্ধু সভ্যতা পর্বের প্রাকার বিশিষ্ট একটি জনবসতি আবিষ্কার করা সম্ভব হয়। দেখা যায়, কিছু কিছু মৃৎপাত্রের আকৃতি ও বৈশিষ্ট্য পরবর্তী সিন্ধুসভ্যতা পর্বেও অনুসৃত হয়েছিল, অর্থাৎ প্রাক হরপ্পা পর্বের সঙ্গে পরবর্তী হরপ্পা সভ্যতার একটি ধারাবাহিক যোগসূত্র ছিল। ফরাসি প্রত্নতাত্ত্বিক জে. এল. ক্যাসালের নেতৃত্বে সিন্ধুপ্রদেশের আম্রিতে এবং ভারতীয় পুরাতাত্ত্বিক বি. বি. লাল ও বি. কে. থাপার ১৯৬০ এর দশকে অধুনা শুষ্ক ঘাঘর নদীর খাতে কালিবঙ্গানে অনুসন্ধান চালিয়েও এইরকম ফললাভ করেন। এর মধ্যে দিয়ে ভারতীয় উপমহাদেশে প্রাক-হরপ্পা সভ্যতার অস্তিত্ব সম্পর্কে আরও নিশ্চিত হওয়া সম্ভব হয়।

প্রাক-হরপ্পা সংস্কৃতি ও পরিণত হরপ্পা সংস্কৃতির সাদৃশ্য বিষয়ে প্রথম জোরালো অনুসন্ধান করেন পুরাতাত্ত্বিক অমলানন্দ ঘোষ। তিনি রাজস্থানে প্রাক-হরপ্পা সংস্কৃতি নিয়ে গভীর অনুসন্ধান চালান। সোথি সংস্কৃতির মৃৎপাত্র ও ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য প্রাক-হরপ্পীয় ও পরিণত হরপ্পীয় প্রত্নক্ষেত্রের সাদৃশ্যের সাক্ষ্য তুলে ধরে দাবী করেন সোথি সংস্কৃতিকে 'প্রায়-হরপ্পীয়' সংস্কৃতি বা 'Proto-Harappan' বলে উল্লেখ করাই যুক্তিযুক্ত। অমলানন্দ ঘোষের গবেষণার গুরুত্ব অস্বীকার না করেও বলা যায় যে, শুধুমাত্র মৃৎপাত্রের সাদৃশ্যের সাক্ষ্য থেকে এত বড় সিদ্ধান্তে আসা অনুচিত এবং সোথি সংস্কৃতির ওপর অত্যাধিক গুরুত্ব দিতে গিয়ে অধ্যাপক অমলানন্দ ঘোষ হরপ্পীয় সংস্কৃতির সঙ্গে সোথি সংস্কৃতির অনেক বৈসাদৃশ্যকে উপেক্ষা করে গিয়েছেন।

বিস্তৃত সিন্ধু উপত্যকা ও উত্তর বালুচিস্তানের বিভিন্ন কেন্দ্রে ব্যাপক ও বহুমাত্রিক অনুসন্ধান চালান রফিক মুঘল। তিনি মৃৎপাত্র থেকে শুরু করে পাথরের আয়ুধ, ধাতবদ্রব্য, স্থাপত্য ইত্যাদি নানা বিষয়ের ওপর গভীর পরীক্ষা-নিরীক্ষার ভিত্তিতে প্রাক হরপ্পা ও পরিণত হরপ্পা পর্বের পারস্পরিক সম্পর্ক নিয়ে জোরালো বক্তব্য তুলে ধরেন এবং দাবী করেন 'প্রাক হরপ্পা পর্ব প্রকৃতপক্ষে হরপ্পীয় সংস্কৃতির আদি তথা প্রস্ফুটন কাল। তাই 'প্রাক-হরপ্পীয়' শব্দবন্ধের পরিবর্তে তিনি 'আদি-হরপ্পীয়' শব্দবন্ধ ব্যবহার করাই যুক্তিযুক্ত বলে মনে করেন। আসলে হরপ্পা সভ্যতার মতো জটিল নগরাশ্রয়ী সমাজজীবন কোন হঠাৎ গজিয়ে ওঠা ঘটনা নয়, তার আদি পর্ব থেকে ক্রমবিকাশের একটি ধারা আছে। বিকাশিত পর্বটি অতিক্রান্ত হলে সংস্কৃতির পরবর্তীর পর্যায়টি দৃষ্টিগোচর

হয়। তাই হরপ্পা সভ্যতার পত্তন, বিকাশ এবং বিলয়ের মতো অতি জটিল সামাজিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক প্রক্রিয়াগুলি উপমহাদেশে বিরাজমান পরিস্থিতিতেই বিচার করতে হবে।

ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের নব্যপ্রস্তর ও তাম্রাশ্মীয় সংস্কৃতিভুক্ত প্রত্নক্ষেত্রের (মেহেরগড়, কিলিগুল মহম্মদ) জীবনযাত্রাতেই যে এই সভ্যতার আদিপর্বের সন্ধান পাওয়া যাবে সে সম্পর্কে প্রত্নতাত্ত্বিকরা মোটামুটি নিশ্চিত। তবে সাম্প্রতিককালে হরপ্পা প্রত্নক্ষেত্রে জে. এম. কিনোয়ার এবং মেডো যে নতুন উৎখনন করেছেন তার ভিত্তিতে আদিপর্ব থেকে পরিণত হরপ্পা পর্বের সংস্কৃতি সুলভ জীবনযাত্রার চমৎকার নিদর্শন ফুটে উঠেছে। কিনোয়ার ও মেডোর উৎখনন থেকে বোঝা যায় যে, হরপ্পার অস্তিত্ব অন্তত খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩০০ তে বিদ্যমান ছিল। সেটি ছিল হরপ্পার সূচনাপর্ব এবং এক বিশাল নগরাশ্রয়ী সমাজ ও সংস্কৃতির মুখ্যকেন্দ্র হিসেবে হরপ্পা আবির্ভূত হয়নি। প্রাচীনতম পর্বে হরপ্পা ছিল একটি গ্রামীণ বসতি মাত্র। বাসিন্দারা প্রধানত কুটিরবাসী, কুটিরগুলিতে কাঠের খুঁটি ব্যবহার করা হয়েছিল। মাটি লেপা বাখারি কিংবা কঞ্চি দিয়ে দেওয়াল তৈরি হয়েছিল। কাদামাটির ইট কোথাও কোন ইমারত নির্মাণের জন্য ব্যবহৃত হয়নি। প্রাচীনতমপর্বের মৃৎপাত্র হাতে তৈরি, কুমোরের চাকা ব্যবহারের কোন নিদর্শন নেই। রাভি নদীর তীরে অবস্থিত এই প্রত্নস্থলের প্রাচীনতম পর্ব 'রাভিস্তর' বলে কিনোয়ার ও মেডো অভিহিত করেছেন, যার সময়সীমা খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ২৮০০। এর পরবর্তীস্তরটি 'কোট দিজি' পর্ব বলে আখ্যাত। যার সময়সীমা খ্রীষ্টপূর্ব ২৮০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০০। এই পর্বে হরপ্পার বসতিতে লক্ষণীয় পরিবর্তন ঘটে। হরপ্পার আয়তন এই পর্বে ২৫ হেক্টার, গ্রামীণ বসতির তুলনায় যা যথেষ্টই বড়। গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল, এই পর্বেই হরপ্পার বসতিবিন্যাসে পরিকল্পনার ছাপ লক্ষ্য করা যায়। এই পর্বে রাস্তাঘাট উত্তর-দক্ষিণ ও পূর্ব-পশ্চিম দুই ভাবে বিন্যস্ত, যা হরপ্পার পরিণত পর্বে আরো প্রকট হয়। কাদামাটি দিয়ে তৈরি ইট যে এই পর্বে ইমারত গঠনের জন্য লাগানো হল তাই নয়, ইটের দৈর্ঘ্য, প্রস্থ ও উচ্চতার অনুপাত ৪:২:১। এই অনুপাত হরপ্পা সভ্যতার বিকাশিত পর্যায়েও অটুট ছিল। শুধু তাই নয়, বসতির সুরক্ষার জন্য বেষ্টনী প্রাকার ও কাদামাটির তৈরী বৃহৎ মঞ্চ পীঠিকা প্রত্নস্থলটির পরিবর্তনশীল চরিত্রের পরিচায়ক। কারিগরী শিল্পোৎপাদন বৃদ্ধি ও বৈচিত্রেও চমকপ্রদ, ধাতব শিল্পের মধ্যে সোনা ও তামার প্রয়োগ বিশেষ উল্লেখের দাবী রাখে। অলংকার শিল্পের ক্ষেত্রে অবশ্যই দেখা যায় মাল্যদানা ও বলয়। তাছাড়া কুমোরের চাকায় নির্মিত মৃৎপাত্রগুলিও আগের পর্বের তুলনায় প্রযুক্তিগত দিক দিয়ে অনেকটাই অগ্রসর। এই পর্বের মৃৎপাত্রে উজ্জ্বল লাল রঙের আস্তরণ লাগানো হয়েছে এবং তাছাড়া কালো রং দিয়ে নকশার প্রচলনও ছিল। বিশেষ উল্লেখ্য বিষয় হল 'কোট দিজি' সাংস্কৃতিক পর্বে হরপ্পাতে সীলমোহরের ব্যবহারের সূচনা ও ওজনের নির্দিষ্ট বাটখারার উদ্ভব। নিঃসন্দেহে ২৮০০-২৬০০ খ্রীষ্টপূর্বে হরপ্পা বিভিন্ন কারিগরী সামগ্রী উৎপাদনের কেন্দ্র ছিল এবং ওজনের বাটখারার ও সীলমোহরের উপস্থিতি থেকে অনুমান করা যায় হরপ্পা বিপণন ও বাণিজ্যেও অংশ নিতে শুরু করেছিল। বলাবাহুল্য, কোট দিজি সাংস্কৃতিক পর্বে হরপ্পাতে যে সমাজ উদ্ভূত হয়, তা শুধুমাত্র কৃষিভিত্তিক গ্রামীণ সমাজ ছিল না, এটি ছিল তার থেকে জটিলতর সমাজ। এই সমাজের কৃষি বহির্ভূত খাতে জড়িত গোষ্ঠীগুলির সক্রিয় ভূমিকা যথেষ্ট উজ্জ্বল। আর একথা অনুমান করা ভুল হবে না যে, স্থায়ী বসতির প্রান্তে বা বাইরে থাকতো পশুপালক গোষ্ঠী, যারা কৃষিকর্ম, যাতায়াত প্রভৃতির জন্য অপরিহার্য প্রাণী সম্পদের যোগান দিত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, নগরাশ্রয়ী সমাজব্যবস্থার দিকে হরপ্পার যে যাত্রা শুরু হয়েছিল 'কোট দিজি' স্তরেই, সে বিষয়ে আমাদের প্রথম সচেতন করেছিলেন রফিক মুঘল। পরবর্তীকালে কিনোয়ার ও মেডোর অনুসন্ধান সেই ধারণাকেই আরও দৃঢ় ভিত্তি প্রদান করে। রণবীর চক্রবর্তী তাই যথার্থই লিখেছেন

যে, হরপ্পার প্রত্নস্থল রাভি পর্ব থেকে কোট দিজি পর্ব পর্যন্ত (খ্রীষ্টপূর্ব ৩৩০০- খ্রীষ্টপূর্ব ২৬০০) যে বদল ঘটেছিল, তাকে উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম এলাকার সামগ্রিক সাংস্কৃতিক পরিস্থিতিতেই স্থাপন করা যুক্তিযুক্ত। অতএব, বিশাল, দীর্ঘস্থায়ী এবং জটিল যে নগরাশ্রয়ী সমাজ ও সংস্কৃতি হরপ্পা-সভ্যতায় দেখা যায়, তার প্রস্তুতিপর্ব খুঁজতে হবে ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম ভাগে উদ্ভূত হরপ্পা সভ্যতার আদিপর্বেই।

অবশ্য আদি ও পরিণত হরপ্পা পর্বের সংস্কৃতিক ধারাবাহিকতার ব্যাপক প্রমাণ বা সাক্ষ্য থাকা সত্ত্বেও বিভিন্ন রূপে 'বহিরাগত প্রভাবের তত্ত্ব' হরপ্পা সভ্যতার সূত্রপাত প্রসঙ্গে এখনো বিদ্যায়তনিক চর্চায় উঠে আসে। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিকরা এ প্রসঙ্গে প্রায়শই সুমেরীয় প্রভাবের কথা বলে থাকে। ল্যামবার্গ-কার্লোভস্কি জানিয়েছেন, খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ নাগাদ তুর্কমেনিয়া, সিয়েস্তান এবং দক্ষিণ আফগানিস্তানের মধ্যে যে নাগরিক যোগসূত্র গড়ে উঠেছিল হরপ্পার নগরায়ণের বিকাশে তা চালিকা শক্তির ভূমিকা নিয়েছিল। অন্যদিকে শিরিন রত্নাগর মনে করেন, ইন্দো-মেসোপটেমীয় বাণিজ্য হরপ্পা সভ্যতার উদ্ভব ও পতনে এক মুখ্য উপাদান রূপে কাজ করেছিল। পর্যাপ্ত তথ্যের অভাবে এই ধরনের বক্তব্যগুলি মেনে নেওয়া কঠিন। বরং তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল, পরিণত হরপ্পা পর্বের বেশ কিছু বৈশিষ্ট্যই যে আদি হরপ্পা পর্বে পরিলক্ষিত হয়েছে তাই নয়, বিভিন্ন হরপ্পীয় প্রত্নক্ষেত্রের মধ্যে আদিপর্ব থেকেই একইধরনের সাংস্কৃতিক সমরূপতা প্রত্নতাত্ত্বিকদের অবাক করে দিয়েছে। ব্রিজেৎ ও রেমন্ড অলচিন (অলচিন দম্পতি) যাকে 'Culture Convergence' বা 'সাংস্কৃতিক সমধর্মিতা' আখ্যা দিয়েছেন। শুধু তাই নয় সামাজিক ও রাজনৈতিক প্রক্রিয়াতেও এক ধরনের নিয়ন্ত্রণ-ও পরিকল্পনার ছাপ আদি ও পরিণত পর্বের ধারাবাহিকতায় মিলেছে। উপিন্দর সিং এর পাশাপাশি আরো একটি বৈশিষ্ট্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করেছেন, তা হল ব্যাপক মাত্রায় প্রাপ্ত 'শৃঙ্গ বিশিষ্ট উপাস্য'র উপস্থিতি। আদি হরপ্পা পর্বের সাথে যুক্ত একাধিক প্রত্নক্ষেত্রের মৃৎপাত্র, কলসের চিত্রণে যার উপস্থিতি স্পষ্ট। যা থেকে অনুমান করা ভুল হবে না যে একধরনের সাংস্কৃতিক সমধর্মিতা হরপ্পীয় জনতার ধর্মীয় বিশ্বাস ও প্রতীকের ক্ষেত্রেও ছড়িয়ে পড়েছিল।

এখন খুব স্বাভাবিক ভাবেই প্রশ্ন উঠবে এই সাংস্কৃতিক সমধর্মিতার মূল চালিকাশক্তি ঠিক কি ছিল? আদি হরপ্পীয় পর্ব থেকে পরিণত হরপ্পীয় পর্বের উত্তরণে প্রধান উপাদানই বা কী ছিল? মেসোপটেমীয় বাণিজ্যের কথা এ প্রসঙ্গে উঠে এলেও এই বাণিজ্যকে অত্যাধিক গুরুত্ব দিতে অধিকাংশ প্রত্নতাত্ত্বিকই নারাজ। অধ্যাপক দিলীপকুমার চক্রবর্তী দুটি উপাদানকে এক্ষেত্রে গুরুত্ব দিয়েছেন- একটি হল- কারিগরী জীবনের ব্যাপক প্রসার এবং অপরটি হল- খাল কেটে সেচ ব্যবস্থার সূচনা। অধ্যাপক চক্রবর্তীর মতে, উত্তর-পূর্ব রাজস্থানের গনেশ্বরকেন্দ্রের তাম্রধাতুশিল্পের ব্যাপকতা আরাবল্লী জুড়ে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দের শেষপাদ থেকে গড়ে উঠেছিল বা অন্যভাবে বললে, পরিণত সিন্ধু সভ্যতা পর্যায়ের বেশ কিছু আগে থেকে। ঘঘর-হাক্রা প্রবাহ ধরে আদি সিন্ধু সভ্যতা পর্যায়ের সংস্কৃতির জন্যই দরকার ছিল এই ব্যাপক তাম্রশিল্প এবং এটিই ছিল ঘঘর-হাক্রা প্রবাহের নিকটতম তামার উৎস। অধ্যাপক চক্রবর্তীর যুক্তি , কোন একটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ কারিগরী ক্ষেত্রের এত প্রয়োজন থাকার অর্থ একটাই- সমাজ পাল্টাছিল। অন্যদিকে নদীতে খাল কেটে সেচ ব্যবস্থার সৃষ্টিকে সিন্ধু সভ্যতার আদি থেকে পরিণত পর্যায়ে উত্তরণের একটি বড় কারণ বলে উল্লেখ করলেও, এর সমর্থনে তিনি কোনো প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারেননি। উপিন্দর সিং অবশ্য মনে করেন, এই উত্তরণের চালিকা শক্তি সম্ভবত, একটি নতুন নির্ধারক রাজনৈতিক নেতৃত্ব, সামাজিক সংগঠনের তাৎপর্যপূর্ণ পরিবর্তন অথবা নতুন ভাবাদর্শের উদ্ভবের মধ্যেই নিহিত ছিল, কিন্তু দুর্ভাগ্যবশত পর্যাপ্ত প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্যের অভাবে এ বিষয়ে চূড়ান্ত সিদ্ধান্তে আসা কঠিন।

১১.৪ হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার

ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তে সিন্ধুসভ্যতার উদ্ভব হয়েছিল এবং প্রথম দু'টি শহর হরপ্পা এবং মহেঞ্জোদারোর ভৌগোলিক অবস্থান প্রত্নতাত্ত্বিকদের বিস্মিত করে। কারণ শহর দু'টি চারশো মাইল দূরে অবস্থিত হলেও একই সংস্কৃতির অন্তর্গত। সুতরাং সহজেই মনে করা যেতে পারে যে এই সভ্যতা কোনমতেই স্থানীয় বা আঞ্চলিক নয়, এমন কী ক্ষুদ্র ভৌগোলিক এলাকার মধ্যেও সীমাবদ্ধ নয়। পরবর্তীকালের ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন স্থানে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের দ্বারা সিন্ধু সভ্যতার ভৌগোলিক বিস্তার ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হচ্ছে। এর ফলে সিন্ধুসভ্যতা সম্বন্ধে পুরাতন মতামতগুলি পরিত্যক্ত হচ্ছে এবং নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য প্রমাণের ভিত্তিতে পুনর্মূল্যায়ন করা প্রয়োজন হয়ে উঠেছে।

এখন পর্যন্ত প্রায় দু'শো পঞ্চাশটি নতুন কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়েছে এবং হরপ্পীয় সভ্যতা ও সংস্কৃতি আধুনিক ভারতীয় উপমহাদেশের অবিভক্ত পাঞ্জাবপ্রদেশ, সিন্ধুপ্রদেশ, বেলুচিস্তান, গুজরাট, রাজস্থান এবং আধুনিক উত্তরপ্রদেশের উত্তর-পশ্চিম সীমান্তের সামান্য অংশ, উত্তরের জম্মুপ্রদেশ থেকে দক্ষিণের নর্মদা নদীর মোহানা পর্যন্ত বিস্তৃতও; পশ্চিমে বেলুচিস্তানের মাকারন উপকূল থেকে উত্তর-পূর্ব অঞ্চলে মরুট পর্যন্ত বিস্তৃত। ত্রিভূজাকৃতি এই এলাকা প্রায় ৯৯,৬০০ বর্গকিলোমিটার এলাকা জুড়ে প্রসারিত এবং আধুনিক পাকিস্তানের চেয়ে আয়তনে বড়। নিশ্চিতভাবেই এটি প্রাচীন মেসোপটেমিয়া এবং মিশরের থেকে অনেক বৃহৎ আকারের সভ্যতা ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় বা তৃতীয় সহস্রাব্দে এত বড় সভ্যতার অস্তিত্ব আর কোথাও খুঁজে পাওয়া যায় না।

সিন্ধুপ্রদেশে ননীগোপাল মজুমদারের অনুসন্ধানের ফলে নতুন হরপ্পার সংস্কৃতি-বিশিষ্ট কেন্দ্র আবিষ্কৃত হয়। ফলে দক্ষিণে হায়দ্রাবাদ (সিন্ধু) থেকে উত্তরে জ্যাকোবাবাদ অবধি সিন্ধু নদীকে অনুসরণ করে এক বিস্তীর্ণ অঞ্চল হরপ্পীয় সভ্যতার অন্তর্ভুক্ত হয়। এদের অধিকাংশই সিন্ধু বা তার উপনদীগুলির ধারে অবস্থিত এবং সামান্য কয়েকটি শহর বাদ দিয়ে অধিকাংশ ছিল গ্রামীণ সংস্কৃতির কেন্দ্র। মহেঞ্জোদারোর দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত চানহু-দারো ছিল একটি গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্র এবং প্রায় একই দূরত্বে আম্রি প্রত্নক্ষেত্রটি অবস্থিত। প্রাক্-হরপ্পীয় সংস্কৃতি আলোচনায় আম্রি এক উজ্জল নাম।

এ ছাড়াও, আফগানিস্তানের উত্তর-পূর্বে অক্ষু নদীর উপত্যকায় শর্তুগাই পরিণত হরপ্পীয় সভ্যতার একটি কেন্দ্র এবং শর্তুগাইকে ধরা হলে হরপ্পীয় সভ্যতার সীমা ভারতীয় উপমহাদেশের স্বাভাবিক ভৌগোলিক সীমা অতিক্রম করে আরও বহু দূর বিস্তৃত হয়। স্বতন্ত্র এবং বিচ্ছিন্ন হরপ্পীয় অঞ্চলাটিকে অধ্যাপক দিলীপ কুমার চক্রবর্তী মূল সভ্যতার মধ্যে না ধরে একটি "বাণিজ্যিক উপনিবেশ" বলে গণ্য করতে ইচ্ছুক।

স্বাধীনতার পর নতুন প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে পশ্চিম উপকূলে হরপ্পীয় সভ্যতা বিস্তৃত হয়েছে প্রায় ৮০০ মাইল সমুদ্র-উপকূল অঞ্চলে সিন্ধু এলাকার মধ্যে যুক্ত হয়েছে; সৌরাষ্ট্র (কাথিয়াওয়ার) থেকে কাম্বে উপসাগর অবধি প্রায় ৪০টি কেন্দ্র আবিষ্কার করা গেছে। কিম প্রণালীর উপর গেট্রভ মহেঞ্জোদারো থেকে প্রায় ৫০০ মাইল দক্ষিণ-পূর্বে অবস্থিত সিন্ধু সভ্যতার দক্ষিণতম প্রসারণ। এই অঞ্চলকে মার্টিমোর হুইলার সৌরাষ্ট্র প্রদেশ বলে অভিহিত করেছেন। এই অঞ্চল মূল সভ্যতার কেন্দ্র থেকে এত দূরে অবস্থিত হয়েও সভ্যতার বৈশিষ্ট্যগুলি বজায় রাখতে সক্ষম হয়েছিল।

গুজরাট ব্যতীত, রাজস্থান, হরিয়ানা, পাঞ্জাব এবং উত্তরপ্রদেশের গঙ্গা যমুনা দোয়াব অঞ্চলে হরপ্পীয় সভ্যতার চিহ্নযুক্ত অঞ্চল পাওয়া যায়। পূর্বে কোশাম্বী প্রমুখ অধ্যাপকবৃন্দ গাঙ্গেয় উপত্যকার সমভূমিতে সিন্ধুসভ্যতা কেন প্রবেশ করেনি তার নানারকম ব্যাখ্যা দিয়েছিলেন। কিন্তু উত্তরপ্রদেশের মেরুট জেলায় আলমগীরপুরে সিন্ধুসত্যতার কেন্দ্র আবিষ্কৃত হ'লে গাঙ্গেয় ভূমিতে অনুপস্থিতির ব্যাখ্যাগুলি ভুল বলে প্রমাণিত হল। আলমগীরপুরের পূর্বে আর কোনও হরপ্পা সভ্যতার প্রত্নক্ষেত্র নেই। ফলে হরপ্পা সভ্যতা গাঙ্গেয় উপত্যকার সামান্য অংশে ছড়িয়ে পড়েছিল।

হরপ্পীয় সভ্যতার অন্তর্গত ভৌগোলিক অঞ্চলে শহরের লোকসংখ্যা মুষ্টিমেয়। অধ্যাপিকা নয়নজ্যোত লাহিড়ীর মতে, প্রত্যেকটি শহরের অবস্থানগত গুরুত্ব রয়েছে। এদের মধ্যে নিঃসন্দেহে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পাঞ্জাবে অবস্থিত হরপ্পা, সিন্ধুপ্রদেশে অবস্থিত মহেঞ্জোদারো। হুইলারের মতে, এই দু'টি শহর বোধ হয় যৌথভাবে রাজধানীর কাজ করত। তার মতের স্বপক্ষে পরবর্তী ইতিহাস থেকে নানা দৃষ্টান্ত তুলে ধরেছেন। তৃতীয় গুরুত্বপূর্ণ শহর চানহু-দারো বোধহয় প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্র ছিল। চতুর্থ শহর লোথাল কাম্বে উপসাগরের তীরে অবস্থিত একটি নৌ বন্দর। উত্তর রাজস্থানে অবস্থিত কালিবঙ্গান পঞ্চম শহর। হরিয়ানা প্রদেশের হিসার জেলায় অবস্থিত বানওয়ালী চার্চ গুরুত্বপূর্ণ শহর। হরপ্পা সভ্যতার পরিণত এবং সমৃদ্ধতম রূপ এই ছয়টি শহরে দেখতে পাওয়া যায়। এ ছাড়াও, উপকূলবর্তী শহর সুরকাজেনডর এবং সুরকোটডাতে পরিণত হরপ্পীয় সভ্যতা লক্ষ্য করা যায়।

হরপ্পা সভ্যতার বিস্তারের আলোচনার পর পরবর্তী যে সমস্যা আমাদের ভাবিত করে তা হল এর সময়। দু'টি দিকে থেকে সমস্যাটিকে দেখা দরকার। প্রথম দিকটি হল সময়ের ব্যাপ্তি অর্থাৎ সর্বনিম্ন সময় এবং সর্বোচ্চ সময়; বলা বাহুল্য এই দু'টি সময়কাল আনুমানিক, যথার্থ ঐতিহাসিক সময় নয়। দ্বিতীয় দিকটি হল পদ্ধতিগত দিক, অর্থাৎ কোনপদ্ধতি অনুসারে সময় নির্ণয় করা যাবে। এখানেও বিভিন্ন ভাবনার অবকাশ আছে।

হরপ্পীয় সভ্যতার কোন কেন্দ্রেই লোহা পাওয়া যায়নি, সুনিশ্চিতভাবে এটি লৌহপূর্ব যুগের সভ্যতা, মধ্যপ্রাচ্যে প্রায় সর্বত্র খ্রীষ্টপূর্ব দুই সহস্রাব্দের মাঝামাঝি লোহার প্রচলন হয়; তাহলে ঐ সময়ের কিছু আগে বা পরে সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংসপ্রাপ্ত হয়েছে বলে মনে করা যেতে পারে। এই সময়টি আনুমানিক ১৭৫০ খ্রীঃ পূঃ বলে ধরা যেতে পারে। উচ্চতর সময় সীমাটিও এইরকম আনুমানিক। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে মহেঞ্জোদারোর সাতটি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। সাতটি স্তরের বিকাশের জন্য এক হাজার বৎসর নির্দিষ্ট করলে উপরের সীমা ২৭৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দে গিয়ে দাঁড়ায়, যদিও এই সময়সীমাকে আরও পেছিয়ে নিয়ে গিয়ে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে অনেকে নিয়ে যাচ্ছেন।

দ্বিতীয়তঃ দু'টি দিক থেকে পদ্ধতিগত বিষয়টি আলোচনা করা যায়। প্রথমটি হ'ল আধুনিক রেডিও কার্বন পদ্ধতি, দ্বিতীয়টি হ'ল তুলনামূলক পদ্ধতি। বিভিন্ন কারণে প্রত্নতাত্ত্বিকরা তুলনামূলক পদ্ধতিকে বেশী পছন্দ করেন। হরপ্পা সভ্যতার পরিণত পর্যায়ে মেসোপটেমিয়া, সুমের ও এলামের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্ক ছিল ২৬০০ খ্রীঃ পূঃ সিন্ধু এলাকায় তৈরী কার্নেলিয়ানের পুঁতি মেসোপটেমিয়াতে পাওয়া গেল। সুতরাং ২৬০০ খ্রীঃ পূঃ বা তার কিছু আগে থেকেই সিন্ধুসভ্যতার অস্তিত্ব পাওয়া গেল। সুতরাং সেই দিক থেকে ২৭০০/২৮০০ খ্রীঃ পূঃ বা তারও সামান্য আগে সিন্ধুসভ্যতার অস্তিত্ব ছিল। বিভিন্ন প্রত্নতত্ত্ববিদ বিভিন্ন প্রমাণের ভিত্তিতে হরপ্পীয় সভ্যতার তারিখ নির্ণয় করেছেন। মার্শাল ৩২৫০-২৭৫০ খ্রীঃ পূর্বাব্দের মধ্যে সিন্ধু সভ্যতার সময়কে

সীমাবদ্ধ করেছেন; অন্যদিকে ম্যাকের মতে এই সময়সীমা খ্রীঃ পূঃ ২৮০০-২৫০০। উভয়ের মতামতকেই আধুনিক প্রত্নতাত্ত্বিকবিদ্‌রা সমালোচনা করেছেন। হুইলারের মতে হরপ্পীয় সভ্যতা ২৫০০-১৫০০ খ্রীঃ পূঃ অবধি স্থায়ী ছিল এবং আধুনিক রেডিও-কার্বন পদ্ধতি অনুসারে পরীক্ষা করে ডি. পি. আগরওয়াল প্রায় একই মত দিয়েছেন। তাঁর মতে, হরপ্পা সভ্যতার স্থায়িত্বকাল ২৩০০-১৭০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ। সুতরাং এই সব বিভিন্ন আলোচনার পরিপ্রেক্ষিতে একথা সহজেই বলা চলে যে হরপ্পীয় সভ্যতার ভৌগোলিক সীমানা এবং সময়ের পরিধি উভয়ই অত্যন্ত বিস্তৃত ছিল।

১১.৫ হরপ্পা সভ্যতার নগর বিন্যাসের মুখ্য বৈশিষ্ট্য

হরপ্পা সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছে তার নগরকেন্দ্রিকতার মধ্য দিয়ে। কিন্তু অন্যান্য বৈশিষ্ট্যের ন্যায় হরপ্পা সভ্যতার নগর ইতিহাস চর্চারও প্রধান সীমাবদ্ধ হল লিখিত উপাদানের অপ্রতুলতা, কারণ হরপ্পা সভ্যতায় ব্যবহৃত লিপির পাঠোদ্ধার এখন সম্ভব হয়নি। তাই মূলত প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতেই হরপ্পার নগর পরিকল্পনার মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি আমাদের সামনে যথাসম্ভব স্পষ্ট হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রথম নগরায়ণ দেখা যায় হরপ্পা সভ্যতার পরিণত পর্যায়েই। তাই হরপ্পা সভ্যতার প্রধান ও প্রসিদ্ধতম পরিচিতি তার নগর গুলির কারণেই। মহেঞ্জোদাড়ো (২০০ হেক্টর) ও হরপ্পার (১৫০ হেক্টর) ন্যায় বৃহত্তম নগর যেমন এই সভ্যতায় দেখা যায়। তেমনি ধোলাবিরা (৬০ হেক্টর), লোথাল ও কালিবঙ্গান (১১.৫ হেক্টর) এর ন্যায় অপেক্ষাকৃত ছোট ও চানহুদারো (৪.৭ হেক্টর) মত ক্ষুদ্রতর বসতির প্রকৃষ্ট নজিরও লক্ষ করা যায়। এর দ্বারা বোঝা যায় যে, হরপ্পার নগরগুলির ক্ষেত্রে উচ্চাবচক্রম বজায় ছিল। এছাড়াও নগর বিন্যাসের সাধারণ বৈশিষ্ট্যগুলি হরপ্পা সভ্যতার সর্বত্রই দেখা গেলেও তাদের উপস্থিতি কেবলমাত্র ছকে বাঁধা যান্ত্রিক পদ্ধতিতে ঘটেনি। এখানেই নিহিত রয়েছে হরপ্পা সভ্যতার নগর বিন্যাসের মুখ্য বৈশিষ্ট্যের মৌলিকতা।

হরপ্পা সভ্যতার নগর বিন্যাসের প্রাথমিক বৈশিষ্ট্য হল নগরগুলির বসতিটি দুটি স্পষ্ট ও পৃথক এলাকায় বিভক্ত। শহরগুলির উঁচু এলাকা পুরাতাত্ত্বিক পরিভাষায় সিটাডেল' বা তথাকথিত 'অ্যাক্রোপলিস' বলে পরিচিত। বসতির এই অংশটি একটু সুউচ্চ, কৃত্রিম ঢিবির উপর নির্মিত। মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা, লোথাল, কালিবঙ্গান- সহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সিটাডেল এলাকাটি আয়তকার। এই উঁচু এলাকায় সাধারণত থাকত গুরুত্বপূর্ণ ইমারত যা জনজীবনের সঙ্গে জড়িত। এই ইমারত গুলি সচরাচর সাধারণ বাসগৃহ নয়। নগরগুলির প্রধান বসতি এলাকাটি শহরের নিম্নতম অংশে অবস্থিত ছিল। এই অংশের ইমারত গুলির মধ্যে বসতবাড়ির সংখ্যাধিক লক্ষ্য করা যায়। সিটাডেল বা দুর্গ নগরীটি অধিকাংশ ক্ষেত্রেই নগরের পশ্চিম বা উত্তর-পশ্চিম দিকে অবস্থিত। আর নিম্ন এলাকা বা প্রধান বসতি অঞ্চলটি থাকতো পূর্ব বা দক্ষিণ-পূর্বাংশে। প্রাচীন নগরায়ণের অন্যতম প্রধান বৈশিষ্ট্য সুউচ্চ প্রাচীর নির্মাণ, হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনাও তার ব্যতিক্রম নয়, হরপ্পীয় নগর গুলির সিটাডেল এলাকা প্রাচীর দ্বারা সুরক্ষিত। হরপ্পা মহেঞ্জোদাড়োর প্রায় সর্বত্র এই প্রাকার লক্ষ্য করা যায়। হরপ্পাতে প্রাকারের কোথাও কোথাও প্রহরীদের নজর রাখার জায়গাও দেখা যায়। সিটাডেল এলাকায় কখনও কখনও তোরণও লক্ষ্য করা যায়। এই জাতীয় তোরণদ্বার হরপ্পার সিটাডেলের উত্তর ও পশ্চিম দিকে দেখা যায়। প্রাকার ছাড়াও পরিখাও সিটাডেলের চারপাশে ব্যবহার করা হত। বাড়তি সুরক্ষার জন্য এই জাতীয় পরিখার প্রয়োজন ছিল।

হরপ্পা সভ্যতায় নগরগুলির সিটাডেল এলাকাতেই ছিল মূলতঃ প্রধান প্রধান ইমারত গুলি। নগরের সামূহিক জীবনযাত্রার প্রয়োজনেই এগুলি নির্মিত হয়। এই জাতীয় ইমারত গুলির মধ্যে অবশ্যই উল্লেখ্য মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পাতে অবস্থিত শস্যাগার দুটি। হরপ্পার শস্যাগারটি রাভী নদীর প্রাচীন খাতের কাছে অবস্থিত। শস্যাগারের ভিতরে রয়েছে দুই সারি মঞ্চ, প্রতিটি সাড়িতে ছয়টি মঞ্চ অর্থাৎ মোট ১২ টি মঞ্চ বা পীঠিকা। প্রতিটি পীঠিকা ৫০ফুটশ্র২০ফুট। দুই সারি পীঠিকার মাঝে ২৩ ফুট চওড়া চলাচলের জায়গা। শস্যাগারে হাওয়া চলাচলের জন্য ঘুলঘুলিও ছিল। যার ফলে সংরক্ষিত শস্য শুষ্ক ও তাজা থাকত। এই ইমারতের দক্ষিণে আছে একটি বৃহৎ পীঠিকা যাতে দেখা যায় বেশ কয়েকটি গর্ত। মার্টিমোর হুইলার হরপ্পাতে উৎখননের সময় এই গর্তের মধ্যে পান গম, যবের দানা, শস্যের খোসা ও খড়। তাঁর অনুমান শস্যাগারের সংরক্ষিত শস্যাদি এই গর্তের মধ্যে পেষণ করা হতো, শস্য ঝাড়াই বাছাই করার উদ্দেশ্যে। পীঠিকার দক্ষিণে ছিল দুই সারি ক্ষুদ্র বাসগৃহ। হুইলারের অনুমান, এগুলি শস্যগারে শস্য পেষণকারী কুলি মজুরদের বাসস্থান ছিল। সামগ্রিক দিক থেকে হুইলার তাই এই শস্যাগারটিকে 'Granary Complex' বলে অভিহিত করেছেন। হরপ্পার থেকে প্রায় ৪০০ মাইল দূরে অবস্থিত হলেও মহেঞ্জোদাড়োর শস্যাগারটিও আয়তন ও আকৃতিতে হরপ্পার শস্যাগারের মতোই। দুটি শস্যাগারের নির্মাণ পরিকল্পনার এই সামঞ্জস্যতার মধ্যে দিয়ে হরপ্পা সভ্যতার অর্থনৈতিক জীবনে সাযুজ্য আনার পক্ষে উপযোগী দক্ষ প্রশাসনের উপস্থিতিই স্পষ্ট হয়ে ওঠে। মহেঞ্জোদাড়োতে সিটাডেল এলাকায় অবস্থিত বিখ্যাত জলাধার, যা সম্ভবত স্নানাগার হিসেবে ব্যবহৃত হত। আয়তাকার এই জলাধারে ওঠা-নামার জন্য দুইদিকে ধাপে ধাপে সোপান শ্রেণি তৈরি করা হয়। জলাধারের চারপাশে ছিল খিলানযুক্ত অলিন্দ। কয়েকটি কক্ষও জলাধারের কাছে নির্মিত হয়েছিল। অন্যান্য গুরুত্বপূর্ণ ইমারতের মতোই জলাধারটিও পোড়ানো ইটের তৈরী। এটি সম্ভবত নগরের সম্ভ্রান্ত ও বিশিষ্ট ব্যক্তিদের ব্যবহারের উদ্দেশ্যে নির্মিত হয়েছিল।

মহেঞ্জোদাড়োতে সিটাডেল এলাকার দক্ষিণভাগে অবস্থিত ছিল আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ ইমারত। প্রায় ৭৫০ বর্গমিটার আয়তন বিশিষ্ট ও ২০টি স্তম্ভ বিশিষ্ট এই বিশাল ইমারতটি সাধারণ বাসগৃহ নয়, কোনোও বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ উপলক্ষে (ধর্মীয়, উৎসবাদি) এই ইমারতে বিশিষ্ট ব্যক্তিদের সমাবেশ ঘটত। মহেঞ্জোদাড়োর এর মতোই ধোলাবিরার সিটাডেল এলাকার উত্তরাংশেও একটি বৃহৎ জলাধারের অস্তিত্ব দেখা যায়। ১২.৮০ মিটার প্রশস্ত এই জলাধারের সাথে যুক্ত ছিল ২৪ মিটার দীর্ঘ একটি প্রণালী। ধোলাবিরার নগর পরিকল্পনা হরপ্পা সভ্যতার অন্যান্য শহর থেকে একটু স্বতন্ত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ধোলাবিরা নগরটি তিনটি অংশে বিভক্ত- উঁচু এলাকা ও নীচু এলাকার প্রধান বসতির মাঝে অবস্থিত মধ্যাঞ্চল বা 'Middle Town'। আবার কালিবঙ্গানে নগরটি প্রধানত দু'ভাগে বিভক্ত হলেও, সিটাডেল এলাকাটিও দুটি ভাগে বিভক্ত। এছাড়া লোথালের সিটাডেল এলাকাটি নগরের পশ্চিমাংশের নয়, দক্ষিণ-পূর্ব দিকে অবস্থিত। রণবীর চক্রবর্তী যথার্থই বলেছেন, লোথালকে যদি হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম প্রধান নগর বন্দর হিসাবে দেখা যায়, তাহলেই লোথালের ভিন্নতর এইরূপ নগরবিন্যাসের যুক্তি খুঁজে পাওয়া সম্ভব।

হরপ্পা সভ্যতার শহরগুলির নিম্ন এলাকাটিতে থাকত মূল বসতি। এই অংশের বসতবাড়ি গুলির আকার ও আয়তনের বৈচিত্র প্রচলিত সামাজিক তারতম্যের স্পষ্ট ইঙ্গিত দেয়। মহেঞ্জোদাড়োয় প্রাপ্ত একটি বাসগৃহের আয়তন প্রায় ৩০০ বর্গমিটার। বাসগৃহটিতে অন্তত ২৭ টি ঘর ছিল আর ছিল একটি অঙ্গিনা। এতগুলি ঘর সমেত আঙ্গিনাওয়ালা বাসগৃহটি নিঃসন্দেহে কোনো সম্পন্ন নগরবাসীর। মহেঞ্জোদাড়োয় অপর একটি বাসগৃহে উপরে ওঠার সিঁড়ির অবশেষ পাওয়া যায়। এই বাসগৃহে অন্ততঃ দোতলা বা তার বেশী উঁচু ছিল। এই প্রকার

গৃহের বাসিন্দারা সন্দেহাতীত ভাবেই সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। বানাওয়ালিতে উৎখনন চালিয়ে বিশ্ট, শহরের নীচু এলাকায় বৈঠকখানা ও স্নানাগার সমেত যে বাসগৃহের সন্ধান পান তার সমৃদ্ধির ভিত্তিতে বিশ্ট এটিকে কোন ধনী বণিকের বাসগৃহ বলে চিহ্নিত করেন। সাধারণ বাড়িগুলিতে অবশ্যই দেখা যায় একটি করে আঙ্গিনা ও আঙ্গিনার চারপাশে কয়েকটি ঘর। তবে বাড়িগুলিতে রান্নাঘরের সংখ্যা একটি হওয়ায় পুরাতাত্ত্বিকদের অনুমান বাসিন্দাদের হেঁশেল অভিন্ন ছিল এবং এই অনুমান সঠিক হলে হরপ্পা সভ্যতায় যৌথ পরিবারের অস্তিত্ব থাকা সম্ভব। আর হরপ্পার মজুরদের বাসস্থান হিসেবে যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রকোষ্টগুলোকে দেখা যায়, সেগুলি ঐসকল বাসিন্দাদের দীনতার চিত্রই তুলে ধরে। সামগ্রিকভাবে হরপ্পা সভ্যতায় মাঝারি মাপের বাড়ির সংখ্যাই ছিল বেশি, যার ভিত্তিতে এ. এল. ব্যাশাম মন্তব্য করেছেন যে, সমসাময়িক মিশর বা সুমারের তুলনায় সিন্ধু উপত্যকায় মধ্যবিত্তের সংখ্যা ছিল বেশি।

নগরাশ্রয়ী হরপ্পা সভ্যতার বাসগৃহের আরেকটি উল্লেখযোগ্য দিক হলো শৌচাগার ও স্নানাগারের প্রাচুর্য, যা পৌরজীবনে স্বাস্থ্য ও পরিছন্নতা সম্বন্ধে সচেতনতার স্পষ্ট পরিচয় দেয়। মহেঞ্জোদাড়োর নীচু এলাকার দুই হাজার বাসগৃহের জন্য ছিল অন্ততঃ ৭০০টি কূপ। হরপ্পার কূপে বাহুল্য না থাকলেও প্রতিটি বাড়িতেই শৌচাগারের ব্যবস্থা ছিল।

হরপ্পা সভ্যতার নগরায়ণের একটি অতুলনীয় দিক হল, পয়ঃপ্রণালীর ব্যাপক ব্যবহার। প্রধান প্রধান পয়ঃ প্রণালীর মাধ্যমে বাসগৃহগুলির সাথে সংযুক্ত। পরিছন্নতা সচেতন একটি পৌরশাসন ব্যবস্থার সক্রিয় উপস্থিতির সাক্ষ্য নিয়ে বিরাজ করছে নগরের পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা। ব্যাশামের মতে, রোমান সভ্যতার পূর্বে অন্য কোন প্রাচীন সভ্যতায় এত উন্নত ও পরিণত পয়ঃপ্রণালী ব্যবস্থা ছিলনা। ডি. ডি. কোশাম্বীর মতে, এই ব্যবস্থাই সমসাময়িক অন্যান্য সভ্যতা থেকে সিন্ধু সভ্যতাকে পৃথক করেছিল। বস্তুতঃ পয়ঃপ্রণালী ব্যবহারে সমসাময়িক অন্য কোন সভ্যতাই হরপ্পা সভ্যতার সমকক্ষ ছিল না।

হরপ্পা সভ্যতার নগর বিন্যাসের আরো একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য হল তার রাস্তাঘাট। মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা, কালিবঙ্গান, চানহুদারো প্রভৃতি প্রতিটি বসতিতেই রয়েছে বেশ কয়েকটি প্রশস্ত প্রধান সরণী যা, সাধারণতঃ উত্তর-দক্ষিণে বিন্যস্ত। তুলনায় কম চওড়া রাস্তা ও সরু গলি চলে গিয়েছে পূর্ব-পশ্চিম বিন্যাস করে। পথঘাটের এরকম পরিকল্পনার দরুন অধিকাংশ নগরের ভিত্তি নকশা চৌখুপী কাটা অর্থাৎ দাবার বোর্ড এর মতো আকার নিয়েছে। শহরের মূল বসতি এলাকা পথঘাটের বিন্যাসের কারণে যে, কয়েকটি মহল্লায় বিভক্ত ছিল তাও সহজেই বোঝা যাচ্ছে।

১১.৬ উপসংহার

হরপ্পা সভ্যতার নগর বিন্যাসের মূখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি বিশ্লেষণ করে পন্ডিতদের অনুমান, এই নগরগুলির গঠনে, সৌন্দর্য বৃদ্ধি বা স্থাপত্য শিল্প বিকাশের তুলনায় ব্যবহারিক সুবিধার দিকেই বেশি নজর দেওয়া হয়। মার্টিমোর হুইলার তার 'The Indus Civilization' গ্রন্থে বলেছেন যে, সিন্ধু নগরগুলির অধিবাসীরা ছিল বাণিজ্যজীবী বুর্জোয়া এবং সিন্ধু নগরগুলির জীবনযাত্রাতেও বুর্জোয়া সভ্যতার ছাপ স্পষ্টভাবেই দেখা যায়। সৌন্দর্য অপেক্ষা আরাম ও স্থায়িত্বের দিকেই নগরবাসীদের দৃষ্টি ছিল বেশি, তাই নগরগুলির বাসগৃহগুলিকে মজবুত করে তৈরি করা হলেও সেগুলির স্থাপত্য ও ভাস্কর্য ছিল যথেষ্ট নিম্নমানের।

হরপ্পা সভ্যতার নগরবিন্যাসের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি আলোচনার মধ্য দিয়ে নগর পরিকল্পনা ও নগর জীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিতটিও স্পষ্টভাবেই উপলব্ধি করা যায়। এইচ. ডি. শাঙ্খালিয়া তার 'Pre-Historic Civilisation of India' তে স্পষ্টতই বলেছেন যে সিন্ধু নগরগুলিতে পৌর শাসন নিশ্চিতভাবেই বেশ কড়া ছিল। নতুবা শহরের রাস্তাঘাট ও গৃহনির্মাণে এরূপ শৃঙ্খলা কখনোই পালিত হতো না।

হরপ্পা সভ্যতার নগরবিন্যাসের মুখ্য বৈশিষ্ট্যের আলোচনার মধ্য দিয়েই হরপ্পা সভ্যতার প্রচলিত সামাজিক বৈশিষ্ট্যের দিকেও বিশেষভাবে আলোকপাত করা যায়। মহেঞ্জোদাড়ো, হরপ্পা সহ প্রায় সকল নগরগুলিতে নিম্নশহর ও সিটাডেল বা তথাকথিত 'অ্যাক্রোপলিস' অবস্থানগত বিভেদ এই সামাজিক তফাতেরই ইঙ্গিত বহন করে। অধিকাংশ পণ্ডিতের অনুমান সমাজ ও প্রশাসন সংগঠনের শীর্ষে ছিলেন পুরোহিত শাসক। এছাড়াও নগরাশ্রয়ী সমাজ ও সভ্যতা বিশিষ্ট মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন বণিক সম্প্রদায়। তারপরে অবশ্যই উল্লেখ্য নগরাশ্রয়ী সমাজের অপরিহার্য উপাদান কারিগর ও পেশাদারী ব্যক্তিবর্গ। আর একথাও অনুমান করা সঙ্গত যে, উপরোক্ত গোষ্ঠীগুলির তুলনায় অনেকটাই হীন অবস্থা ছিল মজুর ও শ্রমিকদের। বলাবাহুল্য, হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনার ইতিহাস চর্চাই এই অনুমানে কোন দ্বিধার অবকাশ রাখে না।

১১.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. হরপ্পা সভ্যতার উৎপত্তি সম্পর্কে বিভিন্ন মতামতগুলি আলোচনা করো।

২. হরপ্পা সভ্যতার বিস্তার সম্পর্কে কী জান?

৩. হরপ্পা সভ্যতার নগর পরিকল্পনার মুখ্য বৈশিষ্ট্য গুলি কী ছিল? এর মধ্যে দিয়ে প্রচলিত সামাজিক জীবনের কেমন ছবি ধরা পড়ে?

৪. সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চার আলোকে হরপ্পা সভ্যতা বিষয়ক পরিবর্তিত দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরো।

৫. টীকা লেখঃ হরপ্পা সভ্যতার নামকরণ বিতর্ক।

১১.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

রণবীর চক্রবর্তী, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব(প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৯।

ইরফান হাবিব, সিন্ধু সভ্যতা, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০৪।

Upinder Singh– A History of Ancient and Early Medieval India– Pearson– 2009.

R.S. Sharma– India's Ancient Past– OUP– New Delhi– 2005.

Raymond Allchin and Bridget Allchin– The Rise of Civilization in India and Pakistan– CUP– 1982.

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, প্রথম খণ্ড, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ), প্রথম খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

ড. রতন কুমার বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (আদিপর্ব), প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, কলকাতা, ২০১৯।

শিরীণ রত্নাগর, হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০৩।

D D Kosambi– An Introduction to the Study of Indian History– Popular Prakashan– Bombay– 1956.

Romila Thapar– Early India- From The Origins to Circa A.D. 1300– London– 2002.

একক : ১২ ◘ কৃষিজ ভিত্তি—কারিগরি শিল্প (Agrarian base—Craft productions)

গঠন

১২.০ উদ্দেশ্য

১২.১ সূচনা

১২.২ কৃষি উৎপাদনের ভিত্তিভূমি

১২.৩ কৃষি উৎপাদনশীলতা প্রসারের কারণ

১২.৪ কৃষিজ উৎপাদনের বৈচিত্র্য

১২.৫ কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি

১২.৬ কৃষি উপকরণ ও শস্যাগার

১২.৭ প্রাণী সম্পদের ব্যবহার

১২.৮ কারিগরি শিল্প

১২.৯ উপসংহার

১২.১০ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১২.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১২.০ উদ্দেশ্য

- এই এককের উদ্দেশ্য হল হরপ্পা সভ্যতার কৃষিকাজ, কৃষি অর্থনীতি ও কারিগরি শিল্পকে অনুধাবন করা।
- কৃষি অর্থনীতির বিকাশ, বিস্তার ও বৈশিষ্ট্যসমূহ এই এককের মূল আলোচ্য বিষয়বস্তু।
- কৃষি অর্থনীতি ব্যতীত প্রাণী সম্পদ ও কারিগরি শিল্প-ও এই এককের অন্যতম অনুধাবনযোগ্য বিষয়।

১২.১ সূচনা

হরপ্পা সভ্যতার প্রধান বৈশিষ্ট্যই হল তার নগরকেন্দ্রিকতা। হরপ্পার অর্থনৈতিক জীবনের ক্ষেত্রেও নগরের ভূমিকাই অধিকাংশ প্রকট। নগর জীবনকে কেন্দ্র করে হরপ্পার অর্থনীতি অনেকাংশে গড়ে উঠলেও শিল্প ও বাণিজ্যের পরিচয় দিলেই এই সভ্যতার সম্পূর্ণ অর্থনৈতিক চালচিত্র ধরা পড়েনা কারণ কৃষি অর্থনীতির সাফল্য

না ঘটলে হরপ্পা সভ্যতার উন্নত নগরাশ্রয়ী জীবন অস্তিত্ব বজায় রাখা সম্ভব হতো না। তাই এই সভ্যতার অর্থনৈতিক জীবন যাত্রার আলোচনায় শিল্প ও বাণিজ্যের আলোচনার পাশাপাশি কৃষি অর্থনীতির দিকটিও বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ব্রিজেৎ ও রেমণ্ড অলচিন লিখেছেন, "In the Mature Harapan period there is considerable volume of information available concerning animal husbandry and agriculture. It appears to have been extraordinarily like that of recent centuries in the Indus valley."

১২.২ কৃষি উৎপাদনের ভিত্তিভূমি

প্রাক আধুনিক নগরাশ্রয়ী অন্যান্য সংস্কৃতির মতোই হরপ্পা সভ্যতার বস্তুগত সংস্কৃতিও প্রধানত কৃষি ভিত্তিক। কিন্তু মনে রাখতে হবে যে, সিন্ধু উপত্যকায় কৃষিজীবী সমাজের আবির্ভাব ঘটেছিল হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর মত নগরের উদ্ভবের আগেই। খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ সহস্রাব্দে কিলি গুল মহম্মদ(কোয়েটা, পাকিস্তান), ও সন্নিহিত অঞ্চলে কৃষিপ্রধান গ্রামীণ সংস্কৃতির পরিচয় মিলেছে। এই সংস্কৃতিতে অবশ্য নগরজীবনের কোন চিহ্ন নেই। মেহেরগড় উৎখনন থেকে প্রাক হরপ্পা পর্বে নগরজীবনের অস্তিত্ব জানা গেছে। কৃষি অর্থনীতির বিকাশ ছাড়া এই জাতীয় স্থানীয় গ্রামীণ ও নগরসুলভ অর্থনীতির বিকাশ ঘটা সম্ভব নয়। তবে খাদ্যোৎপাদন ব্যবস্থার সম্যক পরিচয় হরপ্পা সভ্যতার আগে সেভাবে চোখে পড়ে না।

১২.৩ কৃষি উৎপাদনশীলতা প্রসারের কারণ

হরপ্পা সভ্যতার উন্নত কৃষি ব্যবস্থার সাক্ষ্য দিয়েছে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখনন থেকে উদ্ধার করা বিভিন্ন শস্যের দানা। এর মধ্যে গম, যব, মুগ, মসূর, সর্ষের মত রবি শস্য যেমন আছে তেমনই পাওয়া গেছে বাজরা, তুল, তিল, ধানের মতো খারিফ শস্য। এই সমৃদ্ধ কৃষি উৎপাদনশীলতার মূলে কী কী কারণ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিয়েছিল তা নিয়ে নানা মতামত লক্ষ্য করা যায়। অনুমান।করা হয় যে, হরপ্পা সভ্যতা উন্মেষ ও বিকাশের পর্বে সেখানে কৃষির অনুকূল পরিবেশ বিরাজ করছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ৫৫১০-২২৩০ এই সময়কালে সিন্ধু উপত্যকায় এখনকার তুলনায় অনেক বেশি বৃষ্টিপাত হওয়ায় সেখানে আর্দ্র পর্ব স্থায়ী হয়। ঐ অঞ্চলে ঘন অরণ্য ছিল। তাছাড়া বর্ষাকালে সিন্ধু ও তার শাখা নদীগুলি ঐ উপত্যকায় প্রচুর পলিমাটি বয়ে নিয়ে আসতো।নদীগুলির নাব্যতা কৃষিকাজের জলের অভাবও মেটাতো। এই সামগ্রিক অনুকূল পরিবেশ বজায় থাকায় সিন্ধু উপত্যকায় হরপ্পা সভ্যতার পরিণত পর্বে, পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পর্বের তুলনায় অনেক বেশি পরিমাণ খাদ্যশস্য উৎপাদিত হতো। ইরফান হাবিব অবশ্য এই অনুকূল পরিবেশের তত্ত্বকে সেভাবে গুরুত্ব দিতে নারাজ। তাঁর মতে, কৃষি হাতিয়ারের মৌলিক অগ্রগতিই হরপ্পা সভ্যতার কৃষি অগ্রগতির মূল কারণ ছিল। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, প্রাচীন সিন্ধও সংস্কৃতির সময়কালে লাঙলের উপস্থিতি কৃষি হাতিয়ারের সাক্ষ্য বহন করে। শুধু সিন্ধু উপত্যকাই নয়, বানাওয়ালি ও জাওয়াইয়ালায় কাদামাটির লাঙলের আবিষ্কারও কৃষি হাতিয়ারের অগ্রগতির কথাই প্রমাণ করে। ল্যামব্রিকের গবেষণাও কৃষি অগ্রগতির বিষয়টিই তুলে ধরে।

১২.৪ কৃষিজ উৎপাদনের বৈচিত্র্য

হরপ্পা সভ্যতার বিস্তীর্ণ এলাকা জুড়ে কৃষিজ উৎপাদনের বৈচিত্র্য পরিলক্ষিত হয়। রণবীর চক্রবর্তী লিখেছেন, হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর ধ্বংসাবশেষের মধ্যে দুই রকম গমের দানা পাওয়া গেছে। গম কালিবঙ্গানেও আবিষ্কৃত হয়েছে। ধানের ফলন অবশ্য হরপ্পা সভ্যতার সর্বত্র দেখা যায় না, তার প্রমাণ কেবলমাত্র গুজরাটের রংপুর ও লোথালে প্রত্ন স্থলে পাওয়া গেছে। আবার তিল কার্পাসের মত অর্থকরী শস্যের দানাও পাওয়া গেছে, যা কেবলমাত্র ফসলের বৈচিত্র্য নয়, উন্নত কৃষি উৎপাদনের নজির বহন করে। উপিন্দর সিং দেখিয়েছেন, আদি ও পরিণত পর্বের হরপ্পা সভ্যতার কৃষি উৎপাদনশীল অর্থনীতির বিস্তৃত সাক্ষ্য ফুটে উঠেছে হরিয়ানার বালু''তে। বিভিন্ন ধরণের খাদ্যশস্যের পাশাপাশি সেখানে বিবিধ সব্জি ও ফল উৎপাদনের নজির পাওয়া গেছে। হাবিব লিখেছেন, মসূর ডালের উৎপাদনও যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ছিল। কারণ, গবাদিপশুর সংখ্যা বৃদ্ধি সত্ত্বেও জনসংখ্যা ক্রমশ বেড়ে যাওয়ায় মাথাপিছু মাংসের সংস্থান কমে যাওয়া স্বাভাবিক। সেই পরিস্থিতিতে মসূর ডাল সম্ভবত প্রোটিনের চাহিদা মেটাতো। মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া এক টুকরো কাপড়ের অস্তিত্ব থেকে পণ্ডিতরা গবেষণায় দেখিয়েছেন যে, এই কাপড়ের তুলো ভারতীয় কার্পাসজাত। যার ভিত্তিতে একথা বলাই যায় যে, হরপ্পীয়রা কার্পাসের মত পণ্যশস্যও উৎপাদন করতো।

১২.৫ কৃষি উৎপাদন পদ্ধতি

সিন্ধু অঞ্চলের কৃষি গবেষক ল্যামব্রিকের মতে, সিন্ধু উপত্যকায় এখনও কৃষি উৎপাদনের যে সাবেকি পদ্ধতি দেখা যায়, হরপ্পীয়দের উৎপাদন ব্যবস্থার সঙ্গে ও তার খুব বেশি ফারাক ছিল না। একথা মেনে নিলে বলতে হয় যে হরপ্পীয়দের কৃষিজ সাফল্য অনেকাংশে সম্ভব হয়েছিল সিন্ধুনদের নিকটবর্তী ভূখণ্ডের উর্বরতার দরুন। সিন্ধু উপত্যকার জমিতে প্রাপ্ত বর্ষায় সিন্ধুনদের যে পলিমাটি সঞ্চিত হয় তা ঐ এলাকার উর্বরতা বজায় রাখতে ও বাড়াতে বিশেষ সহায়ক হয়েছিল। ল্যামব্রিকের মতে, এখনকার মতোই হরপ্পীয়রা গম ও যব রবিশস্য হিসাবে এবং তিল ও কার্পাস খারিফ শস্য হিসাবে ফলাতেন। রবি শস্যের তুলনায় যেহেতু খারিফ শস্য ফলাতে বেশি জল দরকার, তাই সম্ভবত, হরপ্পা সভ্যতায় নদীর প্রধান খাতের সন্নিহিত ভূখণ্ডের চারপাশে আল ও পাড় দিয়ে জল সংরক্ষণের ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। রণবীর চক্রবর্তী একসময় লিখেছিলেন, কৃষি উৎপাদনের জন্য নির্দিষ্ট কোনো সেচ প্রকল্প ছাড়াই হরপ্পা সভ্যতায় সম্ভবত প্রাকৃতিক পরিবেশকে ব্যবহার করে সেচের জল ব্যবহার করা হত। ফেয়ারসার্ভিস মন্তব্য করেছিলেন, আলাহদিনোর কূপ ও নিকাশী নালী সম্ভবত সেচব্যবস্থার সাথে যুক্ত ছিল। কিন্তু এ সম্পর্কে আরো গবেষণা জরুরি। অবশ্য, এইচ পি ফ্রাঙ্কফোর্ট হরিয়ানা অঞ্চলে একটি ক্ষুদ্রমাত্রায় খাল ব্যবস্থার চিহ্ন খুঁজে পেয়েছেন এবং ঘর্ঘর-হাক্রা অঞ্চলের কিছু প্রাচীন খালেরও সম্ভবত হরপ্পীয় পর্বের সাথে যোগসূত্র ছিল। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভূ-পৃষ্ঠের অভ্যন্তরে সঞ্চিত জলকে কূপের মধ্যে সংরক্ষিত করা ও তার ব্যবহারের দিক থেকে হরপ্পা সভ্যতা এগিয়ে ছিল। গ্রামের ভেতর কাঁচা ইদারা খনন করা হত, সম্ভবত সেচের কাজে ব্যবহারের জন্যই। হাবিবের মতে, নদী, সরোবর এবং বাঁধ দেওয়া জলাধারের ওপর পাথরের বিপরীত ওজন যুক্ত কাঠামোর ভিত্তিতে লিভারের সাহায্যে সম্ভবত জল তোলা হত। মহেঞ্জোদারোর সিলমোহরেও এইরকম যন্ত্রের ছবি দেখা যায়। আফগানিস্তানের শোর্টুঘাই -এর কাছে কোকচা নদী থেকে জল তোলার জন্য সিন্ধুবাসীদের তৈরি সেচনালীর চিহ্ন পাওয়া গেছে। সম্ভবত এ সবই কৃষিকাজের সঙ্গে যুক্ত ছিল।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী মনে করেন, মহেঞ্জোদারো-হরপ্পার সেচপ্রকল্পে খালের বড় রকমের ভূমিকা ছিল। সবমিলিয়ে বলা যায় সিন্ধুবাসীদের জীবনে এক উন্নত কৃষিকাঠামো গড়ে উঠেছিল।

১২.৬ কৃষি উপকরণ ও শস্যাগার

হরপ্পা সভ্যতার কৃষি উৎপাদনের উপকরণ নিয়েও পণ্ডিতমহলে মতপার্থক্য দেখা যায়। দীর্ঘদিন ধরে হরপ্পা সভ্যতায় লাঙল ব্যবহারের স্পষ্ট নজির জানা ছিল না। তাই ডি. ডি. কোশাম্বী অনুমান করেছিলেন যে হরপ্পা সভ্যতায় লাঙল ছাড়াই ফসল উৎপাদন করা হতো এবং নিড়ানি জাতীয় কোনো উপকরণ দ্বারাই জমিকে চাষের উপযোগী করে তোলার রেওয়াজ ছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক উৎখননের ফলে কালিবঙ্গানে পাওয়া গেছে একটি প্রাচীন কৃষিক্ষেত্রের অবশেষ যেখানে একই সঙ্গে আড়াআড়ি ও লম্বালম্বি লাঙল ব্যবহারের নজির লক্ষণীয়। ল্যামবিকের মতে একই জমিতে দুই প্রকার ফসল ফলানোর উদ্দেশ্যে লম্বালম্বি ও আড়াআড়ি লাঙল চালনা করা হয়েছিল। বানাওয়ালি ও গনেরিওয়ালাতে আবিষ্কৃত পোড়া মাটির লাঙ্গলের মডেল থেকেও হরপ্পা সভ্যতায় লাঙ্গল ব্যবহারের স্পষ্ট প্রমাণ পাওয়া গেছে। এই সব প্রমাণের ভিত্তিতে রণবীর চক্রবর্তী বলেছেন যে হরপ্পা সভ্যতার মতো বহুবিস্তৃত নগরকেন্দ্রিক সভ্যতায় লাঙলের ব্যবহার থাকাই স্বাভাবিক। কারণ নিড়ানি দিয়ে প্রচুর পরিমাণ ফসল ফলানো দুরূহ। অথচ যথেষ্ট পরিমাণ কৃষিজ উদ্বৃত্ত ছাড়া হরপ্পা সভ্যতার বিস্তৃত নগর জীবনের স্বাচ্ছন্দ্য ধরে রাখা অসম্ভব ছিল। হরপ্পা সভ্যতার কৃষি সমৃদ্ধির অন্যতম শ্রেষ্ঠ প্রমাণ মিলেছে হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোতে আবিষ্কৃত দুইটি শস্যাগারের আবিষ্কারের মাধ্যমে। যদিও হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো এই দুটি নগরীর মধ্যকার ব্যবধান ছিল প্রায় ৪০০ মাইল। কিন্তু দুটি শস্যাগারের আকার ও আয়তনের সমরূপতা হরপ্পীয় অর্থনৈতিক জীবনে দক্ষ প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ছাপ বহন করে। রাভী নদীর তীরে অবস্থিত হরপ্পার শস্যাগারটির ভিতরে রয়েছে দু"সারি মঞ্চ। প্রতিটি সারিতে ৬টি মঞ্চ অর্থাৎ মোট ১২টি মঞ্চ রয়েছে। দুই সারি মঞ্চের মাঝে রয়েছে ২৩ ফুট চওড়া চলাচলের জায়গা। শস্যাগারে হাওয়া-বাতাস আসার জন্য ঘুলঘুলি ছিল যার ফলে শস্যাগারে সংরক্ষিত শস্য শুষ্ক তাজা থাকত। এই শস্যাগারে যে গোলাকার গুলি পাওয়া গেছে সেখানেই সম্ভবত গম, যব, ইত্যাদির দানা পেষণ ও ঝাড়াই-মারাই করা হতো বলে মার্টিমোর হুইলার মনে করেন। এই শস্যাগারে ছোট ছোট দুই সারি ঘরও পাওয়া গেছে। হুইলারের বিচারে যেগুলি কুলিমজুরদের বাসস্থান। সামগ্রিকভাবে তাই হুইলার শস্যাগারটির অর্থনৈতিক তাৎপর্য বিশ্লেষণ করে 'Granary Complex' বলে অভিহিত করেছেন। শস্যাগারে আনীত শস্য সম্ভবত রাজস্ব হিসেবে গ্রহণ করা হতো। স্টুয়ার্ট পিগট ও হুইলারের মতে এই শস্যাগারটি আধুনিক ব্যাংকের মতোই লেনদেন করত। মহেঞ্জোদারোতেও এর একটি দোসর পাওয়া গেছে। চারশো মাইল ব্যবধানে অবস্থিত হওয়া সত্ত্বেও দুই নগরের শস্যাগারের আয়তন অনুরূপ হওয়ার ঘটনা অর্থনৈতিক জীবনে নিয়ন্ত্রণের ছাপ বহন করে।

১২.৭ প্রাণী সম্পদের ব্যবহার

হরপ্পার কৃষি ব্যবস্থার সাথে অঙ্গাঙ্গী ভাবে যুক্ত ছিল প্রাণীসম্পদের ব্যবহার। উৎখনন থেকে ছাগল, ভেড়া, শুকর, বৃষ, মহিষ প্রভৃতি গৃহপালিত পশুর অস্থি পাওয়া গেছে। আমরি উৎখনন থেকে গণ্ডারের অস্থিও আবিষ্কৃত হয়েছে। এই ব্যাপক প্রাণীসম্পদ হরপ্পা সভ্যতার কৃষিব্যবস্থাকে আরো সাবলীল করেছিল একথা বলাই বাহুল্য।

১২.৮ কারিগরি শিল্প

হরপ্পার নগররাশ্রয়ী অর্থনীতির একটি বিশিষ্ট দিক তার কারিগরি শিল্পোৎপাদন ব্যবস্থা। মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা, লোথাল, কালিবঙ্গানের মত প্রধান প্রধান নগর নিঃসন্দেহে কারিগরি শিল্পোৎপাদন কেন্দ্র হিসাবে সক্রিয় ছিল। হরপ্পার মতো বড় শহরে দক্ষ পেশাদারি কারিগররা যে বিভিন্ন সামগ্রী তৈরি করতেন তার তথ্যনিষ্ঠ বর্ণনা দিয়েছেন নয়নজ্যোত লাহিড়ী। হরপ্পীয় কারিগরি শিল্পের মধ্যে পাথর ও ধাতুর (লোহা বাদে) যৌথ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। মনে রাখা দরকার ভারতীয় উপমহাদেশের প্রথম নগরায়ণের সাক্ষী হরপ্পা সভ্যতা বস্তুত তাম্রপ্রস্তর যুগেরই অভিব্যক্তি। ফলে হরপ্পীয়রা পাথর দিয়ে নানাবিধ উন্নত হাতিয়ার গড়লেও, তারা ধাতুর ব্যবহার বিশেষত তামা এবং তামা ও টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জের নানাবিধ সামগ্রী তৈরি করতো। ইররফান হাবিব লিখেছেন, পাথরের পরিবর্তে তামার তৈরি যন্ত্রপাতির বেশি ব্যবহারের পিছনে তামার হাতিয়ারের সহনশীলতাই মূল কারণ ছিল না, এর প্রধান কারণ হল এদের সাহায্যে আরো সূক্ষ্মভাবে পাথরের হাতিয়ার কাটা যায়। ফলে সে হাতিয়ার আরো বেশি কার্যকরী হয়ে ওঠে। সিন্ধুবাসীরা সচেতনভাবেই ব্রোঞ্জের ব্যবহার করতো। কারণ ব্রোঞ্জ অনেক বেশি নমনীয় অথচ শক্ত। ফলে আরো উন্নত ছুরি, কুঠার ও বাটালি তৈরি সম্ভব হল। ইট বাঁধানো চুল্লীতে তামা গলানো হত। হরপ্পায় ১৬ টি তামা গলানোর অগ্নিকুন্ড আবিষ্কৃত হয়েছে। লোথালে মিলেছে তাম্রকারদের কর্মশালা। তামার তৈরি শিল্পসামগ্রীর মধ্যে প্রধান ছিল বর্শা, ছুরি, ক্ষুর, বাটালি, কাস্তে, কুঠার, তীরের ফলা, বঁড়শি, কলস, করাত, প্রদীপ ইত্যাদি। শৌখিন সামগ্রীর মধ্যে অন্যতম ছিল দর্পণ। অন্যদিকে ব্রোঞ্জ দিয়ে তারা ছুরি, কুঠার, করাত ইত্যাদি হাতিয়ারের পাশাপাশি খেলনা, প্রদীপ, মূর্তি, বাসন, ও নানাবিধ অলংকার তৈরি করতো। ব্রোঞ্জের সামগ্রী তৈরির জন্য হরপ্পীয়রা রাজস্থানের ক্ষেত্রী থেকে তামা ও আফগানিস্তান থেকে টিন সংগ্রহ করতো। সিন্ধু উপত্যকার অন্যান্য ধাতুর মধ্যে সোনার গহনা, পুঁতি, রূপোর বাসন ও গহনা পাওয়া গেছে। সোনা ও রূপোর অলংকারের মধ্যে গলার হার, কানের দুল, কোমরবন্ধ, নূপুর, বালা ও আংটি ছিল অন্যতম।

তামা ও ব্রোঞ্জের ব্যাপক ব্যবহার সত্ত্বেও বলতেই হয়, সংখ্যায় ও ভরে পাথরের তৈরি হাতিয়ার তামা ও ব্রোঞ্জকে ছাপিয়ে গিয়েছিল। চার্ট পাথর দিয়েই এই হাতিয়ারগুলি মূলত তৈরি হত, যার প্রধান উৎস ছিল উত্তর-সিন্ধের রোহরি পর্বতশ্রেণি। এখানকার বেশিরভাগ কারখানাই সিন্ধুর খুব কাছে ছিল। যার ভিত্তিতে অনুমান করা যায় যে, পাথরের তৈরি হস্তশিল্পকর্মগুলি নৌকায় মহেঞ্জোদারো ও অন্যত্র পাঠানো হত।

যে গুরুত্বপূর্ণ মৌল উপাদানগুলিকে সিন্ধুর 'প্রধান-পণ্য' শিল্প বলা যায় তাদের মধ্যে অন্যতম আরেকটি হল কাঠ। যদিও হরপ্পীয় দারুশিল্পের উৎপাদিত কোনো সামগ্রী সেভাবে পাওয়া যায় নি। তবে খেলনার মত কিছু কাদামাটির, এমনকি ব্রোঞ্জের প্রতিরূপ পাওয়া গেছে। যার ভিত্তিতে দারুশিল্প সম্পর্কে আলোকপাত করা যায়। অনেক তামার হাতি আরে কাঠের হাতলের প্রয়োজন হত। তবে কাঠের গাড়ি বিশেষ মনোযোগের দাবি রাখে। বিভিন্ন প্রতিরূপ বিশ্লেষণের পর পণ্ডিতদের অভিমত, তামার যন্ত্রপাতির ভিত্তিতে গাড়ি তৈরির প্রক্রিয়ায় প্রভূত উন্নতি হলেও গাড়ির কাঠামোকে সংযুক্ত করার জন্য কাঠের গজাল ও দড়ি ব্যবহৃত হতো। চানহুদাড়ো থেকে প্রাপ্ত চক্রনাভিযুক্ত চাকার একটি রঙিন প্রতিরূপে দেখা যায় যে, তিনটি পৃথক কাঠের টুকরো দিয়ে চাকা বানানো হত, যাতে নিরেট হওয়া সত্ত্বেও চাকাটি খুব ছোট হওয়ার প্রয়োজন হত না। নৌকার প্রতিরূপ বিরল। একটি ভগ্ন মৃৎপাত্রের ওপর আঁচড় কেটে আঁকা একটি নৌকো দেখতে পাওয়া যায়। সিন্ধু দারুশিল্পীরা যে পাল-তোলা নৌকো তৈরি করতে পারতো এটি তার একমাত্র প্রমাণ।

হরপ্পীয় কারিগরি শিল্পের আরেকটি উল্লেখ্য দৃষ্টি আকর্ষণকারী দিক হল হরপ্পীয় কারিগরদের তৈরি মৃৎপাত্র। অধিকাংশ পাত্রই কুমোরের চাকায় তৈরি। পোড়ানোর পর পাত্রগুলিতে গোলাপী রং ধরত এবং তার উপরে দেওয়া হতো উজ্জ্বল লাল রঙের প্রলেপ। মৃতপাত্রের অলঙ্করণে সাধারণত কালো রঙ ও জ্যামিতিক নকশা বেশি ব্যবহার করা হত। তবে অশ্বত্থ গাছের পাতা, ফুলের পাপড়ি, ময়ূর ও মাছের ছবিও কখনও কখনও মৃৎপাত্রের গায়ে আঁকা হয়েছে। পায়াযুক্ত থালা ও সরু ক্রিম রঙের পানপাত্র আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। শেষোক্ত পানপাত্রে কখনও কখনও হরফ উৎকীর্ণ থাকতে দেখা যায়। সম্ভবত কারিগরের নাম পানপাত্রে খোদাই করার রেওয়াজ ছিল, যদিও ঐ হরফ এখনও পড়া যায় নি। মৃৎপাত্রগুলি সমাধিক্ষেত্রেও ব্যবহৃত হত। রণবীর চক্রবর্তীর মতে সামগ্রিকভাবে হরপ্পীয় মৃৎপাত্র গুলিতে প্রায় একঘেয়ে ধারাবাহিকতা দেখা যায় এবং মাটির পাত্রগুলি নিতান্তই আটপৌরে প্রয়োজনে নির্মিত ও বিলাস ব্যসনের জন্য বিশেষ বাসন চোখে পড়ে না।

পোড়ামাটির তৈরি ছোট ছোট শিল্পদ্রব্যের মধ্যে বিপুল সংখ্যক নারী, পুরুষ, পশু, গাড়ি ও অন্যান্য বস্তু রয়েছে। এগুলির বেশিরভাগ খেলনা। অন্যগুলি সম্ভবত দেবমূর্তি বা উপ-দেবতা। এগুলো প্রস্তুত করা সহজ এবং অনেকগুলি সম্ভবত ঘরোয়াভাবে তৈরি।

হরপ্পার সভ্যতার কারিগরি উৎপাদনের আলোচনা অনেকটাই অসম্পূর্ণ থেকে যায় বয়ন শিল্পের কথা না বললে। হাবিবের মতে, সিন্ধুবসতি এলাকায় আবিষ্কৃত পোড়ামাটি ও চূর্ণমিশ্রের তৈরি অসংখ্য তকলি থেকে বোঝা যায় যে, হাতে সুতো কাটা বহুল প্রচলিত ছিল। সম্ভবত ধনী ও দরিদ্র, প্রতিটি গৃহস্থালীতেই এটি নারীর দৈনন্দিন কাজকর্মের অন্তর্ভুক্ত ছিল। মেহেরগড়ে কার্পাসের প্রাচীনতম ফলনের কথা জানা গেলেও বস্ত্র নির্মাণের প্রাচীনতম নিদর্শন এসেছে মহেঞ্জোদারো থেকে। বস্ত্র শিল্পের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল সূচি শিল্প যার প্রমাণ মিলেছে মহেঞ্জোদারো থেকে পাওয়া একটি পুরুষ মূর্তিতে যেখানে শাল জাতীয় যে উত্তরীয় দেখানো হয়েছে তাতে তিনকোনা নকশার কাজ স্পষ্ট।

হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম প্রধান কারিগরি শিল্প ছিল ইট তৈরি করা। কাদামাটির ইট ও চুল্লিতে পোড়ানো ইট দুই-ই ব্যবহৃত হত। বহু ক্ষেত্রেই ইট গুলির মাপ প্রায় অনুরূপ। ইমারত, বসতবাড়ি ও জল নিকাশির নানা কাজে ইটের ব্যাপক ব্যবহার হরপ্পা সভ্যতার অর্থনীতিকে প্রকৃত অর্থেই নাগরিক চরিত্র দান করেছে।

সিন্ধুবাসীরা কূপ নির্মাণেও দক্ষতা দেখিয়েছিল। সেগুলি গোলাকৃতি করার জন্য কীলকাকার ইট ব্যবহৃত হয়েছিল। প্রবেশপথ ও নালির ওপর প্রলম্বিত ছাদ স্থাপন করা হয়। কিন্তু প্রকৃতঅর্থে আর্চ ও ভূগর্ভস্থ কুঠরির কোন ধারণা তাদের ছিল না।

হরপ্পা সভ্যতার চূড়ান্ত পর্বে দেখা যায় অসংখ্য মূল্যবান হস্তশিল্প, যেগুলি মূলত বিলাসদ্রব্যের উৎপাদনে যুক্ত ছিল। সিন্ধু উপত্যকায় সোনার বিভিন্ন অলংকার ও সোনার পুঁতি পাওয়া গেছে। এছাড়া পাওয়া গেছে রূপোর বাসনপত্র ও গহনা। হরপ্পীয় কারিগররা কখনও কখনও ধাতু গলিয়ে ছাঁচে ঢেলে আবার কখনও ধাতু পিটিয়ে পাত বের করে গহনা প্রস্তুত করতো। তারা সোনা, তামা, শঙ্খ, স্টিয়াটাইট পাথর, জেড পাথর, নীলকান্ত মণি, হাতির দাঁত প্রভৃতি উপকরণ দিয়ে পুঁতি তৈরি করতো। চানহুদারোতে পুঁতি প্রস্তুত কারকদের নির্মাণশালা আবিষ্কৃত হয়েছে। এখানে যে ছোট্ট তুরপুণ পাওয়া গেছে সেটি সম্ভবত কর্ণেলিয়ান ও অকীক পাথরে ছিদ্র করার কাজে ব্যবহৃত হতো। কর্ণেলিয়ান পাথরে আঁচড় কেটে নকশা তৈরি করার ক্ষেত্রে হরপ্পীয়রা

বিশেষজ্ঞ ছিল। নানাবিধ পুঁতি ও তা দিয়ে গহনা তৈরির কাজে কারিগররা দক্ষতা দেখিয়েছেন। বিশ্ট হরিয়ানার বানাওয়ালিতে উৎখননের পর একটি বড় ইমারতের মধ্যে বহু সংখ্যক পুঁতি তৈরি ও আধা তৈরি অবস্থায় পেয়েছিলেন। এর বেশিরভাগ ছিল কর্ণেলিয়ান পাথরের, আর কিছু ছিল সোনা ও লাপিস লাজুলির মতো মূল্যবান সামগ্রীর। এই ইমারতেই বিশ্ট, একটি চুল্লী ও সূক্ষ্ম ওজন মাপার বাটখারা পেয়েছেন। এই সব নিদর্শণের ভিত্তিতে বিশ্ট যথার্থভাবেই এই ইমারতটিকে পুঁতি তৈরির কারখানা হিসাবে চিহ্নিত করেন। লোথালেও পুঁতিশিল্পের কারখানা ছিল। আর শঙ্খশিল্পের কেন্দ্র ছিল চানহুদারো, নাগেশ্বর, বালাকোট, ধোলাবিরা, লোথাল ও রঙপুরে। গহনা বা অলংকার শিল্পের ক্ষেত্রে হরপ্পা সভ্যতার মানুষ সম্ভবত কর্ণাটক থেকে সোনা সংগ্রহ করতো। উচ্চ সিন্ধু উপত্যকার বালুকণাতেও স্বর্ণরেণু পাওয়া যেত। তামা ও সীসা আসতো রাজস্থান থেকে আর রূপোর জোগান দিত আফগানিস্তান, পারস্য ও আর্মেনিয়া। সীলের ওপর খোদিত পশুর মধ্যে হাতির সংখ্যাধিক্য থাকলেও সিন্ধু সভ্যতায় সম্ভবত হাতির দাঁত দুষ্প্রাপ্য ও মহার্ঘ্য ছিল। অন্যদিকে বালা, পুঁতি, পাত্রাধার, চাকতি প্রস্তুতিতে এবং ভিতরের অলঙ্করণে অন্য সমুদ্র-ঝিনুক ব্যাপকভাবে ব্যবহৃত হতো। বালাকোট, ধোলাবিরা ও নাগেশ্বরের এলাকাগুলিতে কিংবা এর নিকটবর্তী অঞ্চলে ঝিনুকের কাজ যে করা হত, তার অনেক প্রমাণ পাওয়া গেছে।

সবশেষে, আরেকটি হস্তশিল্পের কথা উল্লেখ করতে হয় তা হল, ওজনের বাটখারা প্রস্তুতি। প্রধানত চার্ট ঘনকের আকারে এগুলি প্রস্তুত করা হত। এরকম প্রচুর ঘনকের সন্ধান মিলেছে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায়। আমাদের জানা সবচেয়ে ভারী বাটখারাটি প্রায় ১০.৯ কিলোগ্রাম এবং সবচেয়ে হালকাটি হল ৪৫.১ সেন্টিগ্রাম। চানহুদারোর কর্মশালায় দেখা যায় নিখুঁত ওজনের বাটখারা তৈরি করার জন্য কেমন করে এদের কাটা হত। দৈর্ঘ্য মাপার জন্য অংশাঙ্কিত স্কেল প্রস্তুত করা হয়েছিল। এদের মধ্যে তিনটি টিকে ছিল, ঝিনুকের (মহেঞ্জোদারো), ব্রোঞ্জের (হরপ্পা) এবং হাতির দাঁতের (লোথাল)। সম্ভবত দৈর্ঘ্য পরিমাপের ভিন্ন ভিন্ন পদ্ধতি চালু থাকায় স্কেলগুলির মধ্যে কোন সমরূপতা ছিল না।

১২.৯ উপসংহার

হরপ্পা সভ্যতার কৃষি উৎপাদনশীলতার সুবিস্তৃতি ও কারিগরি উৎপাদনশীলতার বৈচিত্র্য থেকে একটি বিষয় পরিষ্কার যে, প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণ ছাড়া এই সুশৃঙ্খল পরিবেশ অসম্ভব ছিল। তবে নগর ও ব্যবসা-বাণিজ্য নিয়ে সাম্প্রতিক গবেষণায় যতটা জোর দেওয়া হচ্ছে সেই তুলনায় হরপ্পা সভ্যতার কৃষি অর্থনীতি নিয়ে আলোচনা তুলনামূলক কম। কিন্তু একথা অনস্বীকার্য যে, বিশাল নগরাশ্রয়ী হরপ্পা সভ্যতায় নগরজীবন যতই গুরুত্বপূর্ণ হোক না কেন, খাদ্য যোগানের নিরিখে গ্রামীণ এলাকার গুরুত্ব সংশয়াতীত। এই পরিপ্রেক্ষিতেই তাই কৃষি অর্থনৈতিক আলোচনা জরুরি হয়ে পড়ে। অন্যদিকে কারিগরি শিল্পের ক্ষেত্রে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের বিষয়ে খেয়াল রাখতে হবে, একটি বিশেষ সামগ্রী একটি অঞ্চলে উৎপন্ন হবার পর বৃহত্তর এলাকায় তার সরবরাহের ক্ষেত্রে পরিকল্পনা ও নিয়ন্ত্রণের সম্ভাবনা অস্বীকার করা কঠিন। অবশ্য এই নিয়ন্ত্রণের চরিত্র সম্পর্কে নানা মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। হরপ্পীয় লেখ-র পাঠোদ্ধার সম্ভব হলে এ বিষয়ে আমাদের ধারণা আরো স্পষ্ট হবে।

১২.১০ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. হরপ্পা সভ্যতার বস্তুগত জীবনে কৃষি উৎপাদনশীলতার গুরুত্বকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

২. হরপ্পা সভ্যতার কৃষি অর্থনীতি সম্পর্কে একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখো।

৩. 'কারিগরি শিল্পের ক্ষেত্রে হরপ্পীয়দের অবদান ছিল অতুলনীয়'— এ প্রসঙ্গে তোমার অভিমত কী?

৪. হরপ্পা সভ্যতার কৃষি অর্থনীতি ও কারিগরি উৎপাদনশীলতার প্রেক্ষাপটে প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণের ইঙ্গিত পাওয়া যায় কি?

১২.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

রণবীর চক্রবর্তী, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব (প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৯।

ইরফান হাবিব, সিন্ধু সভ্যতা, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০৪।

Upinder Singh– A History of Ancient and Early Medieval India– Pearson– 2009.

R.S. Sharma– India's Ancient Past– OUP– New Delhi– 2005.

Raymond Allchin and Bridget Allchin– The Rise of Civilization in India and Pakistan– CUP– 1982.

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, প্রথম খণ্ড, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ), প্রথম খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

ড. রতন কুমার বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (আদিপর্ব), প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, কলকাতা, ২০১৯।

শিরীণ রত্নাগর, হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০৩।

D D Kosambi– An Introduction to the Study of Indian History– Popular Prakashan– Bombay– 1956.

Romila Thapar– Early India- From The Origins to Circa A.D.1300– London– 2002.

একক : ১৩ ◘ বাণিজ্য (Trade)

গঠন

১০.০ উদ্দেশ্য

১৩.১ সূচনা

১৩.২ বাণিজ্যের প্রকারভেদ

১৩.২.১ স্থানীয় গ্রাম-শহর বাণিজ্য

১৩.২.২ সভ্যতার অভ্যন্তরীণ দূরগামী বাণিজ্য

১৩.২.৩ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

১৩.৩ বাণিজ্যিক যোগাযোগের মাধ্যম

১৩.৪ বণিকের জীবনযাত্রা

১৩.৫ উপসংহার

১৩.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১৩.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১৩.০ উদ্দেশ্য

- হরপ্পা সভ্যতার বাণিজ্য ও বাণিজ্যিক অর্থনীতি এই এককের আলোচ্য বিষয়বস্তু।
- এই এককে হরপ্পা সভ্যতার বাণিজ্যিক অর্থনীতির তিন ধরনের প্রকারভেদের কথা আলোচনা করা হবে-
  - ➢ স্থানীয় স্তরের বাণিজ্য
  - ➢ অভ্যন্তরীণ দূরপাল্লার বাণিজ্য
  - ➢ বৈদেশিক বা আন্তর্জাতিক বাণিজ্য
- বাণিজ্যিক যোগাযোগের মাধ্যম ও বণিক শ্রেণির জীবনযাত্রাও এই এককে বোঝার চেষ্টা হবে।

১৩.১ সূচনা

হরপ্পার নগরাশ্রয়ী অর্থনৈতিক জীবনের বিশেষ উল্লেখযোগ্য দিক তার বাণিজ্য। বাণিজ্যিক সমৃদ্ধি ছাড়া এই সুদূর বিস্তৃত নাগরিক সভ্যতার অস্তিত্ব বজায় রাখা কঠিন ছিল। উন্নত কৃষি ব্যবস্থার সাথে ওতপ্রোতভাবে

জড়িয়ে ছিল বাণিজ্যিক বিকাশ। ব্রিজেৎ ও রেমণ্ড অলচিন তাই যথার্থই লিখেছেন, হরপ্পা সংস্কৃতির বিশদ সামাজিক কাঠামোর এবং জীবনযাত্রার মান উন্নত যোগাযোগ ব্যবস্থা ও বাণিজ্যের মাধ্যমেই বজায় রাখা সম্ভব হতো। তাঁদের ভাষায়, "In the Harappan culture the elaborate social structure and the standard of living must have been maintained by a highly developed system of communication and trade."

১৩.২ বাণিজ্যের প্রকারভেদ

হরপ্পা সভ্যতার মানুষের জীবনে বাণিজ্যর গুরুত্ব শুধুমাত্র হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর শস্যাগারের দ্বারাই প্রমাণিত হয় না, প্রমাণিত হয় বিভিন্ন সীলমোহর, বিস্তৃত অঞ্চল ব্যাপী একই হরফ, একই লিখনশৈলী এবং ওজন ও পরিমাপের একই একক দ্বারা। এই বাণিজ্যকে তিন স্তরে বিচার করা যেতে পারে—স্থানীয় গ্রাম-নগর বাণিজ্য, সভ্যতার অভ্যন্তরীণ দূরগামী বাণিজ্য এবং অন্যান্য এলাকার সঙ্গে বাণিজ্য।

১৩.২.১ স্থানীয় গ্রাম-শহর বাণিজ্য

হরপ্পীয় স্থানীয় বাণিজ্যিক চরিত্রকে বুঝতে হলে প্রথমেই এর নাগরিক জীবনের দিকে তাকাতে হবে। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারোর শস্যাগারের সনাক্তকরণ যদি সঠিক হয় তাহলে বলতে হবে যে, এই দুই নগরের সঙ্গে যুক্ত অসংখ্য গ্রাম থেকে দেয় খাজনা হিসাবে সরকারি আধিকারিকদের সংগৃহীত দানাশস্য এই শস্যাগারে মজুত করা হতো। মহেঞ্জোদারোর শস্যাগারটি সিটাডেল এলাকায় অবস্থিত। কিন্তু হরপ্পায় এটি ছিল বাইরে, তবে নিম্ন শহর থেকে যথেষ্ট দূরে এবং সিটাডেল এলাকার কাছে। এখানে মজুত দানাশস্য মূলত সিটাডেলে বন্টনের জন্য রাখা হত। গাড়ি, জলযান, মালবাহী বলদ, এমকি সম্ভবত মানুষের পিঠেও শস্য বহন করে বণিক বা শস্যবাহকদের আনা বস্তাবন্দী দানাশস্যে সাধারণ বাসিন্দাদের চাহিদা পূরণ হত।

ইরফান হাবিব লিখেছেন, স্থানীয় বাণিজ্যের আরেকটি উৎস ছিল নগরের হস্তশিল্পীদের কাছে শিল্পের কাঁচামাল সরবরাহ করা। বালাকোট, ধোলাবিরা, নাগেশ্বর এবং লোথালের সমুদ্র ঝিনুকের কর্মশালাগুলিতে সেই কাহিনী বিবৃত হয়েছে। এইসব নগর বসতির পার্শবর্তী সমুদ্রতটে অবস্থিত স্থানগুলি থেকেই নিশ্চিতভাবে সমুদ্র ঝিনুক ওখানে আসতো। অনুরূপে লোথালে প্রাপ্ত কর্ণেলিয়ান ও অর্কীক পাথরে তৈরি পুঁতির কাঁচামাল ভারুচের কাছে নর্মদার একটু দক্ষিণের বিখ্যাত রতনপুরা খনি থেকে আসতো। সুক্কুরের কাছে সিন্ধুনদের দুপাশে অবস্থিত কর্মোদ্যোগের সাথে মহেঞ্জোদারো থেকে সিন্ধুর নিম্নাঞ্চলে চার্ট-ছুরির বিপুল চাহিদা মেলালে তবেই বিষয়টি ব্যাখ্যা করা যায়। অবশ্য এক্ষেত্রে প্রস্তুতির বেশিরভাগ কাজটি সম্ভবত খনি অঞ্চলেই সম্পন্ন হত।

১৩.২.২ সভ্যতার অভ্যন্তরীণ দূরগামী বাণিজ্য

হরপ্পা সভ্যতার অভ্যন্তরীণ নানা অংশে বিভিন্ন পণ্যদ্রব্যের মধ্যে শৈলীর সমরূপতা একটি দূরগামী বাণিজ্যের ছবি মনে করিয়ে দেয়, যে বাণিজ্যে অঞ্চলের বিভিন্ন প্রান্তের সর্বত্র রুচির ও ফ্যাশনের মান সযত্ন প্রয়াসে একই রাখা হত। পণ্য পরিবহনের চেয়ে মূল অঞ্চল থেকে বিভিন্ন স্থানে কারিগরদের অধিক স্থানান্তরণেই

অনেকক্ষেত্রে পণ্যের মানের এই সমরূপতা বজায় রাখা সম্ভব হত। হরপ্পা ও মহেঞ্জোদারো থেকে পোড়া ইট কালিবঙ্গান বা লোথালে পরিবহনের মাধ্যমে আনা যায় নি। এখানকার মানুষ নিজস্ব দক্ষতায় চুল্লীতে ইট পোড়ানোর কাজ সম্পন্ন করেছিল। তাই বলা যায় যে কোন পরিস্থিতিতেই সস্তা সামগ্রীর ক্ষেত্রেও সিন্ধু শৈলীর প্রভাব অটুট ছিল। সীল গুলি মূলত ব্যক্তি-মালিকের জন্য নির্মিত হওয়ায় সেগুলি স্থানীয়ভাবে নির্মিত হবার সম্ভাবনাই প্রবল ছিল। অবশ্য এদের ওপরে খোদিত চিত্র বা লিপিতে সাদৃশ্যের চিত্র বিদ্যমান।

অনেক দূরদেশে পণ্যরপ্তানির সাক্ষ্যও মোটেই অপ্রতুল নয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, হরপ্পার কারীগররা কারিগরি শিল্পে যে ধাতু ব্যবহার করত সেগুলি হরপ্পার ভৌগোলিক সীমানার মধ্যে পাওয়া যেত না সেগুলি আসতো দূরবর্তী অঞ্চল থেকে বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে। যেমন হরপ্পায় ব্যবহৃত সোনা আসতো সম্ভবত কর্নাটকের কোলার স্বর্ণ খনি থেকে। হাবিব অবশ্য এই মত মানেন নি। তাঁর মতে, সিন্ধুর দুই তীরে এবং উপনদীগুলির মধ্যে ও হিমালয় পার্বত্য প্রদেশে যেখানে স্বর্ণচূর্ণ সংগৃহীত হত সম্ভবত সেখান থেকেই সিন্ধু ধাতুকরদের জন্য সোনা আসতো। রূপা আসত আফগানিস্তান থেকে, তামার প্রাপ্তিস্থান ছিল রাজস্থানের ক্ষেত্রী অঞ্চল। অন্যান্য মূল্যবান পাথরের মধ্যে জেড পাথর পাওয়া যেত পশ্চিম এশিয়ায়, অ্যাগেট, চেলসেডনী ও কার্ণেলিয়ান আনা হত সম্ভবত সৌরাষ্ট্র ও পশ্চিম ভারত থেকে। আর লাপিস লাজুলি পাওয়া যেত বদখশান এলাকায়। নানা ধাতু ও দামি পাথরের প্রতিষ্ঠন বিচার করে অলচিন দম্পতি মনে করেন যে ধাতুর ব্যবহার নিশ্চিত করার জন্যই এক বৃহৎ এলাকা জুড়ে হরপ্পা সভ্যতার বাণিজ্য চলত।

অভ্যন্তরীণ দূরগামী বাণিজ্যে সিন্ধু নদীপথে পরিবহন সহজতর ছিল। অধুনা শুষ্ক ঘর্ঘর-হাক্রা নদীর বাহাওয়ালপুর পর্যন্ত প্রবাহিত নিম্ন স্রোতেও যাওয়া-আসা চলতো। দক্ষিণে সিন্ধুর শাখানদী পূর্ব নারা এবং লোথালের কাদাজলের প্রবাহের মধ্যে অন্তত বর্ষার মরশুমে জলপথে যোগাযোগ সম্ভব ছিল। এই পথে ছোট ছোট নৌকা গুলি পণ্যসম্ভার নিয়ে আসতো। দূরবর্তী স্থলপথে পণ্যপরিবহন করতো গাড়ি ও মালবাহী বলদ। তবে জলপথের তুলনায় তা ব্যয়বহুল ছিল। তবে বণিকদের ব্যক্তিগত উদ্যোগেই সমস্ত দূরপাল্লার বাণিজ্য চলতো এমন সম্ভাবনাই প্রবল।

যাই হোক, ইরফান হাবিব মনে করেন, স্থানীয় ও দূর-পাল্লার এই ব্যাপক বাণিজ্যে একটি প্রশ্ন স্বাভাবিক ভাবেই উঠে আসে -কেমন করে পণ্য দ্রব্য ক্রয়-বিক্রয় হতো? এর উত্তরে তিনি লিখেছেন, সিন্ধু এলাকার সর্বত্র বাটখারার সমরূপতা বজায় রাখার তাগিদ থেকে বোঝা যায়, নিশ্চয়ই ওজন অনুসারে তখন অনেক পণ্যের মূল্য নির্ধারিত হত। কিন্তু এমন কোনো মুদ্রাব্যবস্থা ছিল না যার নির্ধারিত এককে পণ্য দ্রব্যের মূল্য নির্দিষ্ট করা যায়। কোনও কোনও লেনদেনে হয়তো নির্দিষ্ট পরিমাণ শস্যদানা কিংবা কিছু অর্কীক বা কর্ণেলিয়ান পাথর মূল্য হিসাবে ব্যবহৃত হত। যেভাবেই হোক না কেন, এই ব্যাপক সিন্ধু বাণিজ্য নিছক বাট্টা' ব্যবস্থার ওপর নির্ভর করে চলতে পারে না বলেই হাবিবের দৃঢ় বিশ্বাস। তবে, কিছু সীল পণ্য নিদর্শণ মুদ্রা' হিসাবে ব্যবহারের সম্ভাবনার কথাও তিনি তুলে ধরেছেন, যেখানে অপঠিত লিপিরসঙ্কেতে হয়তো কোনো একটি পণ্যের মূল্য নির্দেশ করা হত।

ব্রিজেৎ ও রেমণ্ড অলচিন হরপ্পার বাণিজ্যিক প্রক্রিয়ায় সিলমোহরগুলিকে ঐকটি প্রয়োজনীয় উপাদান হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। তাঁদের মতে সিলমোহরগুলি দুটি প্রধান তথ্য পরিবেশন করে- প্রথমত, সিলমোহরগুলিতে প্রায়শই কোনো বস্তুর সম্মুখে একটি প্রাণীকে চিত্রিত হতে দেখা যায়, যাকে একজন পরিচালক বা নির্দিষ্ট একটি নিশান বা মান হিসাবে গণ্য করা যেতে পারে। দ্বিতীয় হল একটি লেখ, যা একটি বা দুটি থেকে এক ডজন

পর্যন্ত মুদ্রিত শব্দচিত্র বা ভাবলিপিতে পরিবর্তিত হতে দেখা যায়। অনেকগুলি সিলমোহরে পরিবেশিত তথ্যের মধ্যে সংখ্যার উল্লেখ আছে।

১৩.২.৩ আন্তর্জাতিক বাণিজ্য

হরপ্পা সভ্যতার মূল সীমারেখার বাইরের এলাকার সাথেও হরপ্পীয় নগরগুলির এক সমৃদ্ধ বাণিজ্যের জগৎ গড়ে উঠেছিল। ঘড়ির কাঁটার বিপরীত ঘূর্ণনের দিক থেকে দেখলে এক্ষেত্রে প্রথমেই উল্লেখ্য আমেদাবাদের দৈমাবাদের খ্রীস্টপূর্ব ১৯০০-১৭০০ অব্দের কালসীমার পরবর্তী সিন্ধু বসতির কথা। এই অঞ্চলে যে সামান্য কটি সীলমোহর ও সিন্ধু লেখনী পাওয়া গেছে তা থেকে অনুমান করা যায় যায় যে, অন্ততপক্ষে গোদাবরী উচ্চ অববাহিকার সাথে হরপ্পা সভ্যতার প্রাচীন বাণিজ্যিক যোগাযোগ অবশ্যই ছিল। এর উত্তরে মধ্যপ্রদেশের উজ্জয়িনীর কাছে কায়থা সাংস্কৃতিক অঞ্চলে (সম্ভবতঃ ২৪০০ খ্রীঃ পূঃ) তিনটি ধনভাণ্ডার আবিষ্কৃত হয়েছে, যার দুটি কর্ণোলিয়ান ও অকীক পুঁতির এবং একটি স্টিয়াটাইটের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র পুঁতির এগুলি এসেছিল সম্ভবত সিন্ধু অঞ্চলের বিভিন্ন কর্মশালা থেকেই।

উত্তর-পূর্ব রাজস্থান এবং মেবারে অবস্থিত তামার ভাণ্ডারের কারণে রাজস্থান সম্ভবত সিন্ধু সভ্যতার বহির্বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করতো। উত্তর-পূর্ব রাজস্থানে গণেশ্বর ও যোধপুরে গৈরিক রঙের মৃৎপাত্র সংস্কৃতির এলাকাগুলি আধুনিক ক্ষেত্রীর কাছে অবস্থিত ছিল। সিন্ধু সভ্যতার প্রয়োজনীয় তামার অংশ এখান থেকেই আসতো। গণেশ্বর ও যোধপুরার মৃৎপাত্রে সিন্ধু প্রভাবের চিহ্ন স্পষ্ট।

হরপ্পা সভ্যতার মণিকাররা উত্তরের কাশ্মীর থেকে জেড পাথর পেত আর কাশ্মীরে ঐ পাথর পর্যায়ক্রমে কারাকোরাম পর্বতমালার ওপরে ঝিংজিয়াং(চীন) খোটান অঞ্চল থেকে আমদানি করা হতো। অন্যদিকে কাশ্মীরও হরপ্পীয় নগরগুলি থেকে পেত কার্ণেলিয়ান ও অকীক পাথর। এছাড়া উত্তর আফগানিস্তানের পঞ্জশির উপত্যকার প্রাচীন খনি গুলি থেকে প্রয়োজনীয় রূপো সংগৃহীত হতো এই উত্তর আফগানিস্তানেরই শোরতুঘাই এর নীলকান্ত মনির সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার অকীক ও কার্ণেলিয়ান-এর বিনিময় হতো। চানহুদারোর কারিগররা যে নীলকান্তমণি নিয়ে কাজ করতো সেগুলি নিশ্চিতরূপে শোর্টুঘাই এর ভেতর দিয়ে আমদানি হতো।

হরপ্পীয় নগরগুলির বহির্বাণিজ্যের জগতে আরো দূরদেশের প্রসঙ্গে তুর্কমেনিস্তানের কথা বলা যায়। এখানকার আলতাইন দেপের নামাজগা সংস্কৃতির সমসাময়িক পর্বে একটি সিন্ধু সীল পাওয়া গেছে। এছাড়াও সেখানে পাওয়া চিত্রবিচিত্র রেখাঙ্কিত কর্ণেলিয়ান পুঁতি ও হাতির দাঁত সম্ভবত সেখানে ভারতীয় বণিকরাই নিয়ে গিয়েছিল। অন্যদিকে মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পায় আবিষ্কৃত ব্যাকট্রীয় (উত্তর-পূর্ব আফগানিস্তান) উটের সম্ভাব্য দেহাবশেষ থেকে সিন্ধু অববাহিকার দক্ষিণ এশিয়া বণিকদের অনুবর্তী সার্থবাহের সংকেত মেলে।

প্রত্ন-এলামাইট সংস্কৃতির (খ্রীষ্টপূর্ব ৩১০০-২১০০) অঞ্চলগুলির সঙ্গে এর বাণিজ্যের পরিমাণ কতটা ছিল, তাও অনিশ্চিত। এই সংস্কৃতির মূল কেন্দ্র দক্ষিণ-পশ্চিম এশিয়ার সুসায় অবস্থিত ছিল। সুসা এবং মধ্য ইরানের তেপে ইয়াহিয়ার এলামাইট অঞ্চলে পরিণত সিন্ধু পর্বের সীলমোহর আবিষ্কৃত হয়েছে। এ থেকে অনুমান করা যায় যে ভারতীয় নাবিকরা সে স্থানে পৌঁছে গিয়েছিল। অবশ্য ঠিক কোন সামগ্রীর বাণিজ্য চলতো তা স্পষ্ট নয়।

হরপ্পা সভ্যতার দূরপাল্লার বাণিজ্য যে পশ্চিম এশিয়াতেও প্রসারিত ছিল, তার প্রকৃষ্ট প্রমাণ পশ্চিম এশিয়ার পুরাবস্তু দ্বারা সমর্থিত। ১৯২৩ সালে সি. জি. গ্যাড মেসোপটেমিয়ার উর থেকে ২৪টি সিলমোহর আবিষ্কার করেন। সেগুলি আকারে হরপ্পীয় সিলমোহরের মতোই। এগুলি সিন্ধু-উপত্যকা ও টাইগ্রীস-ইউফ্রেটিস উপত্যকার মধ্যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক সম্পর্কের প্রতিই ইঙ্গিত দেয়। মার্টিমোর হুইলারের মতে, প্রাচীন মেসোপটেমিয়াতে হরপ্পীয়দের নিয়মিত বসতি গড়ে উঠলেও আশ্চর্য হবার কিছুই নেই। পুরাতাত্ত্বিক এই নিদর্শনের সাথে পশ্চিম এশিয়া থেকে প্রাপ্ত কুইনফর্ম লেখতেও আক্কাদের রাজা সারগনের সময়ে দূরপাল্লার বাণিজ্যের উল্লেখ আছে তিনটি অঞ্চল মেলুহা, মগন ও তিলমুন বা দিলমুন এর সাথে। হুইলার, অলচিন সহ বেশিরভাগ পণ্ডিতরা মনে করেন, মেলুহা হল- নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা, মগন হল- মারকান উপকূল (মগন বলতে সাম্প্রতিক গবেষকরা ওমান অঞ্চলকে বোঝান) আর তিলমুন বা দিলমুন হল- পারস্য উপসাগরে বাহরিন অঞ্চল। এই অনুমান সত্যি হলে বলা যায় যে, মেসোপটেমিয়া ও হরপ্পা সভ্যতার মধ্যে সামুদ্রিক বাণিজ্যে পারস্য উপসাগর ও বাহরিন অঞ্চলের ভূমিকা ছিল গুরুত্বপূর্ণ। মেসোপটেমিয়ার লেখতে মেলুহা থেকে আগত জাহাজ ও মেলুহা ভাষার দোভাষীর কথাও উল্লেখ আছে যা উভয় অঞ্চলের বাণিজ্যিক ঘনিষ্ঠতাকেই প্রমাণ করে। মেলুহা বা নিম্ন সিন্ধু উপত্যকা থেকে সোনা, রূপা, লাপিস-লাজুলি, ময়ূর ও কাঠ রপ্তানি করা হতো বলে মেসোপটেমিয়ার লেখগুলিতে বলা হয়েছে। এগুলির মধ্যে লাপিস লাজুলি ছাড়া বাকিগুলি খাঁটি ভারতীয় পণ্য।

রোমিলা থাপার অবশ্য মেলুহা, দিলমুন ও মগন -এর শনাক্তকরণ সম্পর্কে ভিন্ন মত পোষণ করেন। তাঁর ধারণা হরপ্পা সভ্যতায় দ্রাবিড় ভাষা চালিত ছিল। ফলে তিনি মেলুহা, দিলমুন, মগন এই স্থাননাম গুলিকে দ্রাবিড়ীয় ভাষা তত্ত্বের মাধ্যমে শনাক্ত করার চেষ্টা করেন। তিনি উক্ত তিন অঞ্চলকে গুজরাট সৌরাষ্ট্র উপকূলবর্তী এলাকায় সনাক্ত করেন। কিন্তু এই মতের কঠোর সমালোচনা করেন গোবিন্দকুট্টি ও ড্যুরিং কাসপার্স। ড্যুরিং কাসপার্স তাঁর দীর্ঘ গবেষণায় প্রমাণ করতে চেয়েছেন সমুদ্র বাণিজ্যের দ্বারা হরপ্পা সভ্যতা ওমান, বাহরিন ও সুমের অঞ্চলের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। হরপ্পা সভ্যতায় সুমেরীয় বণিকদের উপস্থিতির দিকেও তিনি ইঙ্গিত করেছেন। যাই হোক, মেসোপটেমীয় সভ্যতার সঙ্গে হরপ্পা সভ্যতার বাণিজ্যিক সম্পর্ক যে অনেকাংশেই সমুদ্রবাহিত, অর্থাৎ তা যে আরব সাগর ও পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় প্রচলিত ছিল পুরাতত্ত্বের ভিত্তিতে তার পক্ষে রায় দিয়েছেন শিরীন রত্নাগর। অন্যদিকে গুজরাটের লোথালে কাদামাটির ইটের তৈরী পীঠিকা পাওয়া গেছে যাকে পুরাতাত্ত্বিক এস. আর. রাও পোতাশ্রয়ের ধ্বংসাবশেষ বলে মনে করেন। যার ভিত্তিতে তাঁর অনুমান গুজরাটের উপকূলে অবস্থিত লোথাল, সমুদ্র বাণিজ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নিত। তাছাড়া পারস্য উপসাগরে ব্যবহৃত বোতামের ন্যায় যে সিলমোহর পাওয়া গেছে তা থেকেও অনুমান করা অসঙ্গত নয় যে পারস্য উপসাগরীয় এলাকায় বাণিজ্যিক লেনদেনের মাধ্যমে এগুলি লোথালে আসত।

হরপ্পা সভ্যতার সঙ্গে অন্যান্য বহির্ভারতীয় অঞ্চলের বাণিজ্যিক তথা সাংস্কৃতিক যোগাযোগ শুধুমাত্র জলপথনির্ভর ছিল না। ব্যাক্ট্রিয়াতে হরপ্পার তৈজস আবিষ্কারের কৃতিত্বাধিকারী ভি. সারিয়ানিডি মনে করেন, ব্যাক্ট্রিয়া হয়ে এই যোগাযোগ স্থলপথে ইরান পর্যন্ত প্রসারিত ছিল। বর্তমান তুর্কমেনিস্তানের অলতিন টেপে হরপ্পার গজদন্ত সামগ্রী প্রাপ্তির ভিত্তিতে বলা যায় আফগানিস্তান, ইরানের কিছু অংশ এবং তুর্কমেনিস্তানের সঙ্গে হরপ্পার যোগসূত্র স্থলপথে আবিষ্কৃত হয়েছিল। এই কারণে শিরীন রত্নাগরের ধারণা যে হরপ্পা সভ্যতার দূরপাল্লার বাণিজ্য প্রধানত জলপথ বাহিত ছিল তার সঙ্গে দিলীপ চক্রবর্তী সহমত হতে পারেন নি।

মেসোপটেমিয়া তথা পশ্চিম এশিয়া অঞ্চলের সঙ্গে সমৃদ্ধ বহির্বাণিজ্যের মাধ্যমে হরপ্পা সভ্যতায় কোন কোন সামগ্রী এসেছিল নিদর্শনের অপ্রতুলতায় সে সম্পর্কে নিশ্চিত করে বলা কঠিন। রামশরণ শর্মার মতে, হরপ্পীয় বৈদেশিক বাণিজ্য কমবেশি বিলাসসামগ্রীর মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল এবং তা সাধারণ মানুষের অর্থনৈতিক জীবনের উপর বিশেষ প্রভাব ফেলতে পারেনি। তবে দিলীপ কুমার চক্রবর্তীর গবেষণা থেকে জানতে পারি বালুচিস্তানে উত্তর আফগানিস্তানের পাথরের এবং সোনার জিনিস কিছু পাওয়া গেছে। মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া গেছে ওমানের এক ধরনের পাথর বাটি, মেসোপটেমিয়ায় জাঁতা, সিলমোহর এবং লোথালে পাওয়া গেছে পারস্য উপসাগরীয় সিলমোহর।

১৩.৩ বাণিজ্যিক যোগাযোগের মাধ্যম

নগরাশ্রয়ী সমাজ ও সংস্কৃতির সঙ্গে বাণিজ্যিক ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক নিয়ে দ্বিমত নেই। কিন্তু মনে রাখতে হবে এই বাণিজ্যিক যোগাযোগ নির্ভরশীল যাতায়াত ও যোগাযোগের সুযোগ সুবিধার ওপর। জলপথের যানবাহনের প্রসঙ্গ ইতিপূর্বেই আলোচিত। স্থলপথে যাতায়াতের জন্য যে যানবাহন প্রচলিত ছিল তার আভাস পাওয়া যায় শকট-জাতীয় যানের পোড়ামাটির তৈরি অনুকৃতি থেকে। মালপত্র আনা-নেওয়ার জন্য ব্যবহৃত হত দুই চাকা লাগানো চওড়া শকট। কখনো কখনো চারচাকা যুক্ত শকটের অনুকৃতিও দেখা যায়। তৃতীয় একপ্রকার শকট অনেকটা এক্কাগাড়ির মতো দেখতে ছিল, অপেক্ষাকৃত হালকা। এক্কাজাতীয় বাহনে দুই-চার জন যাত্রী যেতে পারতো। রণবীর চক্রবর্তী লিখেছেন, যেহেতু শকট জাতীয় চাকায় "স্পোক" দেখা যায় না, তাই হরপ্পা সভ্যতায় চাকা নিরেট ছিল বলেই মনে হয়। শকট চলার সময় চাকার যে দাগ মাটিতে দেখা যায় তাতে দুই চাকার দাগের মধ্যে ব্যবধান ১.০৭ মিটার। অর্থাৎ শকটগুলি মাঝারি মাপের ছিল। বিরাট শকট প্রচলনের চিহ্ন চোখে পড়ে না।

১৩.৪ বণিকের জীবনযাত্রা

হরপ্পা সভ্যতার বাণিজ্যিক অবস্থার আলোচনায় বিশেষ গুরত্বের দাবি রাখে বণিকের জীবনযাত্রা। তথ্যের অপ্রতুলতা এক্ষেত্রে একটি সীমাবদ্ধতা। তবুও হরিয়ানার বানাওয়ালিতে খননকার্যের ভিত্তিতে বিশ্ট বহু গুরুত্বপূর্ণ আবিষ্কারের সঙ্গে একটি গৃহের অবশেষও খুঁজে পান। হরপ্পা সভ্যতার পরিণত রূপ বানাওয়ালিতে দেখা যায়। শহরের নিচু এলাকায় অবস্থিত এই বাড়িটিতে বৈঠকখানার মত একটি বসার ঘর ছিল, ঘরটির মেঝে ইট দিয়ে বাঁধানো। কয়েকটি সীলমোহর ও ওজনের বাটখারাও উদ্ধার করা হয় বাড়িটি থেকে। বাড়ির মেঝেতে অর্ধ-প্রোথিত জালাজাতীয় বেশ কয়েকটি পাত্রও দেখা যায়। বাড়িটির স্নানাগারে হাত ধোওয়ার জন্য উঁচুতে একটা জায়গা ছিল। সম্ভবত হাত ধোয়ার বেসিন জাতীয় সরঞ্জামটির পাশেই নালী, ব্যবহৃত জল নালী দিয়ে বেরিয়ে গিয়ে পড়তো রাস্তায় রাখা আরো একটি ভাণ্ডের ভিতর। বিশ্ট ইমারতটিকে বণিকদের বাসগৃহ বলেই অনুমান করেছিলেন। নিঃসন্দেহে যা সমৃদ্ধির চিহ্ন বহন করে।

১৩.৫ উপসংহার

সব মিলিয়েই বলতে পারি, হরপ্পীয় বাণিজ্য বিশেষত, বহির্বাণিজ্যের জগত ছিল সুবিস্তৃত। ব্রিটিশ বাণিজ্যের মতো এই বাণিজ্য হয়তো সুবিশাল হরপ্পা সাম্রাজ্য গড়ে তুলতে পারেনি, কিন্তু বহির্বাণিজ্যিক জগতের বিশালত্ব

সংশয়াতীত। সাম্প্রতিককালে হরপ্পার বাণিজ্য নিয়ে প্রত্নতাত্ত্বিকদের মধ্যে আগ্রহের সৃষ্টি হয়েছে এবং হরপ্পীয় বাণিজ্য নিয়ে তাঁরা নানারকম মতামত প্রকাশ করেছেন। হরপ্পা সভ্যতায় বাণিজ্যের ভূমিকা আলোচনা করতে গিয়ে শিরীন রত্নাগর হরপ্পাকে মেসোপটেমিয়ার উপনিবেশ বলে অভিহিত করেছেন। হরপ্পার শ্রমজীবী জনগণ মেসোপটেমিয়ার মন্দির ও বণিকশ্রেণির চাহিদা মেটানোর জন্য উৎপাদন করতো বলে তিনি মনে করেন। অধ্যাপক বি.এন. পাণ্ডে এবং দিলীপকুমার চক্রবর্তী তাঁর সাথে একমত হতে পারেন নি। অধ্যাপক চক্রবর্তী হরপ্পীয় বাণিজ্যের —সংগঠিত ও অসংগঠিত দুটি চরিত্র ছিল বলে মনে করেন। হরপ্পা ও মেসোপটেমিয়ার অন্তর্বর্তী উপজাতীয় গোষ্ঠীরা বাণিজ্য প্রক্রিয়ায় অংশ নিতেন। যাই হোক, হরপ্পীয় লেখ-র পাঠোদ্ধার হলে এবিষয়ে আরো নিশ্চিত সিদ্ধান্তে আসা যাবে।

১৩.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. হরপ্পা সভ্যতার অর্থনৈতিক জীবনে বাণিজ্যিক কার্যকলাপের ভূমিকাকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

২. হরপ্পীয় জনগণের অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যের জগৎ কেমন ছিল?

৩. হরপ্পা সভ্যতার দূরপাল্লার বাণিজ্যের গতি-প্রকৃতি বিশ্লেষণ কর।

৪. স্থানীয় কারিগরদের কাঁচামাল যোগানের লক্ষ্যই ছিল হরপ্পীয়দের বাণিজ্যের মূল চালিকাশক্তি'—এই মত কী সমর্থনযোগ্য?

৫. টীকা লেখঃ হরপ্পা সভ্যতার স্থানীয় বাণিজ্য।

৬. টীকা লেখঃ হরপ্পা সভ্যতার দূরপাল্লার বাণিজ্য।

৭. মেসোপটেমিয়ার সাথে হরপ্পীয়দের বাণিজ্যিক সম্পর্ক আদৌ গড়ে উঠেছিল কি? তোমার উত্তরের স্বপক্ষে যুক্তি দাও।

১৩.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

রণবীর চক্রবর্তী, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব(প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।

রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, আনন্দ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৬।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৯।

ইরফান হাবিব, সিন্ধু সভ্যতা, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০৪।

Upinder Singh– A History of Ancient and Early Medieval India– Pearson– 2009.

R.S. Sharma– India's Ancient Past– OUP– New Delhi– 2005.

Raymond Allchin and Bridget Allchin– The Rise of Civilization in India and Pakistan– CUP– 1982.

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, প্রথম খণ্ড, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ), প্রথম খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

ড. রতন কুমার বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (আদিপর্ব), প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, কলকাতা, ২০১৯।

শিরীণ রত্নাগর, হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০৩।

D.D. Kosambi– An Introduction to the Study of Indian History– Popular Prakashan– Bombay– 1956.

Romila Thapar– Early India- From The Origins to Circa A.D. 1300– London– 2002.

একক : ১৪ ◘ সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠন (Social and Political Organization)

গঠন

১৪.০ উদ্দেশ্য

১৪.১ সূচনা

১৪.২ শ্রেণিবিভাজনের উপস্থিতি ও বিতর্ক

১৪.৩ বিকশিত গোষ্ঠীতন্ত্রের ইঙ্গিত

১৪.৪ বণিক ও পুরোহিতের প্রভাব

১৪.৫ নারীদের অবস্থা

১৪.৬ রাজনৈতিক কাঠামো

১৪.৬.১ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় চরিত্র

১৪.৬.২ রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের সমালোচনা

১৪.৬.৩ কৌমসমাজ ও রাষ্ট্রীয় সমাজ কাঠামোর মধ্যবর্তী স্তর

১৪.৬.৪ সাম্প্রতিক চর্চা ও নতুন সম্ভাবনা

১৪.৭ উপসংহার

১৪.৮ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১৪.৯ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

একক ১৪.০ উদ্দেশ্য

- এই এককের উদ্দেশ্য হল হরপ্পা সভ্যতার সামাজিক ও রাজনৈতিক সংগঠনকে অনুধাবন করা।
- সামাজিক বিকাশ এর ধারাকে বিশ্লেষণ করা হবে নিম্নলিখিত বিষয়গুলির কথা মাথায় রেখে-
  - ➢ শ্রেণি কাঠামোর বিকাশ
  - ➢ গোষ্ঠীতন্ত্রর বিকাশ
  - ➢ বণিক ও পুরোহিত সম্প্রদায়ের ধর্মীয়-সামাজিক প্রভাব
  - ➢ নারীদের সামাজিক অবস্থান

- এই এককে হরপ্পা সভ্যতার রাজনৈতিক সংগঠন হিসেবে রাষ্ট্র'র বিকাশ সম্পর্কিত বিতর্ক আলোচনা করা হবে।
- এই এককের অন্যতম উদ্দেশ্য হল এই বিষয়ে নতুন গবেষণার সঙ্গে শিক্ষার্থীদের পরিচয় করিয়ে দেওয়া।

১৪.১ সূচনা

নগরাশ্রয়ী হরপ্পা সভ্যতার অন্যান্য অনেক বৈশিষ্ট্যের মতোই এই সভ্যতার সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোও একাধারে চিত্তাকর্ষক ও বিতর্কিত। বস্তুত হরপ্পা সভ্যতার সামাজিক সংগঠনের ইতিহাস চর্চার প্রধান সমস্যাই হল লিখিত উপাদানের অপ্রতুলতা। অন্যান্য অনেক বিষয়ের মতোই তাই প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের সতর্ক ব্যবহারের মাধ্যমেই এ বিষয়ে আমাদের আলোচনা বাঞ্ছনীয়।

১৪.২ শ্রেণিবিভাজনের উপস্থিতি ও বিতর্ক

হরপ্পা সভ্যতার সমাজজীবনের আলোচনার প্রথমেই যে বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে তা হল, শ্রেণি বিভাজনের ধারণা। ব্রিজেৎ ও রেমণ্ড অলচিন লিখেছেন, "There are many indications that by the Mature Indus period urban society had evolved considerable social stratification and division." এ.ডি. পুসলকার হরপ্পার সমাজকে চার ভাগে ভাগ করেছেন। এরা হল যোদ্ধা, বণিক, কারিগর ও শ্রমিক। তিনি পুরোহিত, চিকিৎসক, দৈবজ্ঞ ও যাদুকরদের শিক্ষিত শ্রেণি বলে চিহ্নিত করেছেন। অন্যদিকে তরবারির ব্যবহার, দুর্গ-প্রাকারের অস্তিত্ব দেখে যোদ্ধা শ্রেণির অস্তিত্ব অনুমান করেছেন। তৃতীয় শ্রেণিতে তিনি রেখেছেন বণিক, স্থপতি, স্বর্ণকার, শঙ্খশিল্পী, তক্ষক প্রমুখ বণিক ও শিল্পী কারিগরদের। তাঁর মতে চতুর্থ শ্রেণির অন্তর্ভুক্ত হল চর্মকার, চাষি, জেলে, মজদুর, ভৃত্য প্রমুখ শ্রমিক শ্রেণি।

অধ্যাপক পুসলকারের এই অভিমত না মানলেও হরপ্পীয় সমাজে যে শ্রেণিবৈষম্য ছিল একথা মানতেই হবে। বস্তুত অধিকাংশ পণ্ডিতই হরপ্পা সভ্যতায় নগর পরিকল্পনা ও নগরজীবনে শৃঙ্খলা ও নিয়ন্ত্রণের প্রসঙ্গে একমত, আর নগর পরিকল্পনার ধাঁচ খুঁটিয়ে লক্ষ্য করলেই আমরা বুঝতে পারবো হরপ্পীয় সমাজে শ্রেণি পার্থক্য বিরাজমান ছিল এবং ধনী ও দরিদ্রের মধ্যে ছিল বিরাট ব্যবধান। ইরফান হাবিব লিখেছেন, হরপ্পীয় বাসগৃহগুলির বিশাল একাংশ পোড়া ইটে নির্মিত। এর চারদিকে প্রশস্ত অঙ্গিনা, নিজস্ব কূপ স্থানের পাটাতন, শৌচাগার, বিশাল বিশাল কক্ষ, আর একধারে সম্ভবত ভৃত্য বা দাসদের থাকবার স্থান, এর সঙ্গে মহেঞ্জোদাড়ো বা হরপ্পার কুলি বসতির বিপুল বৈসাদৃশ্য চোখে পড়ে। হাবিব মনে করেন, সিন্ধু সমাজে দাস প্রথা বেশ লক্ষণীয় মাত্রায় বর্তমান ছিল, যার প্রমাণ বহন করছে সিন্ধু অঞ্চল (মেলুহা) থেকে মেসোপটেমিয়ায় রপ্তানীকৃত সামগ্রীর মধ্যে দাসের অন্তর্ভুক্তি। শুধু তাই নয়, হাবিব আরো মনে করেন যে, গ্রামের উপর বিপুল পরিমাণ খাজনা ধার্য করা গেলে তবেই শহর টিকে থাকতে পারে তাই একথা অনুমান করা যেতেই পারে যে, স্থানীয় শাসকদের মাধ্যমেই সে খাজনার অংশ সংগৃহীত হতো, যারা নিজেরাই সম্ভবত মধ্যস্বত্বভোগী হয়ে উঠেছিল। করাচীর কাছে "আল্লাহদিনো"র ক্ষুদ্র জনপদে সোনার তাল ও গহনা, রূপার গহনা এবং অর্কীক পুঁতিতে পূর্ণ একটি বয়াম হয়তো এমন কোন স্থানীয় শাসকের সম্পদের সাক্ষ্যই তুলে ধরে। অলচিন দম্পতি মনে করেন একদল শাসক শ্রেণি ছিল যারা সম্ভবত প্রশাসক ও পুরোহিতের যুগ্ম দায়িত্ব পালন করতো।

১৪.৩ বিকশিত গোষ্ঠীতন্ত্রের ইঙ্গিত

হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত প্রচুর সীলমোহরও প্রচলিত সামাজিক তারতম্যের আরেকটি সূচক। এই সীলগুলি থেকে বোঝা যায় যে, ব্যক্তিগত সম্পত্তির ধারণা এমন সর্বস্তরে বিস্তৃত ছিল যাতে প্রত্যেক ধনী ব্যক্তির নিজের সম্পত্তিতে সীলের চিহ্ন অংকন করার প্রয়োজন হতো। মহাদেবন কৃত প্রধান দুটি শহরের বর্ণনাক্রমিক সূচীতে দেখা গেছে যে, আমাদের জ্ঞাত সীলের ৬৮ু এসেছে মহেঞ্জোদাড়ো থেকে আর ১৯ু শতাংশ এসেছে হরপ্পা থেকে। এই তথ্য থেকে বোঝা যায় যে, যেসব অস্থাবর সম্পত্তির ওপর সীলের মুদ্রা অঙ্কিত করার প্রয়োজন হতো সেগুলি মূলত শহরেই কেন্দ্রীভূত ছিল। অন্যদিকে কিনোয়ারের সঙ্গে একমত হয়ে যদি বলা যায় যে, সীলের ওপর অঙ্কিত প্রাণী ছিল গোষ্ঠী প্রতীক, তাহলে একথা বলা ভুল হবে না যে, সিন্ধু সমাজের উচ্চশ্রেণির মানুষজন একটি বিকাশিত গোষ্ঠীতন্ত্রের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৪.৪ বণিক ও পুরোহিতের প্রভাব

নগরাশ্রয়ী হরপ্পীয় সমাজে বিশিষ্ট মর্যাদায় অধিষ্ঠিত ছিলেন বণিকরা এবং তারা ছিলেন সম্পত্তিবান মালিকশ্রেণির অন্তর্ভুক্ত। একথা শুধু যে, অনুমান তা মোটেই নয়। হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো ও লোথালের শস্যাগার বিপুল সম্পদের কেন্দ্রীভবন-এর সাক্ষ্য বহন করে। ইতিপূর্বেই আমরা দেখেছি, দূরবর্তী মেসোপটেমিয়া ও উত্তর আফগানিস্তানের শোর্টুঘাই উপনিবেশের সঙ্গে আমদানি-রপ্তানি চলতো। সুনিয়ন্ত্রিত ওজন, পরিমাপ পদ্ধতি ও বাণিজ্যের উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত লিপি ও সিলমোহর গুলি এই বাণিজ্যের সাক্ষ্য বহন করে। এসব দেখে বোঝাই যায় হরপ্পীয় সমাজে বণিক শ্রেণির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। লোথালের বাণিজ্য পণ্যে মুদ্রিত সীলমোহরেও তা প্রমাণিত হয়। একইরকম তাৎপর্যপূর্ণ হল, পুরোহিতদের অবস্থান। সিন্ধুবাসীদের জীবনে ধর্মীয় জীবনের গুরুত্বকে মাথায় রাখলে সমাজে পুরোহিতদের গুরুত্বের প্রসঙ্গ চলে আসে। মহেঞ্জোদারোর স্নানাগার সম্ভবত ধর্মীয় উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হত। তাই অনুমান করা ভুল হবে না যে, ধর্মীয় আচারের অনুষঙ্গ রূপে পুরোহিত শ্রেণির প্রাধান্য সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল। এর পাশাপাশি মহেঞ্জোদাড়োর তথাকথিত ভবনটিকে হুইলার যদি সঠিকভাবেই 'মন্দির' বলে শনাক্ত করে থাকেন, তাহলে সেখানে যেসব ইউনিকর্ন সীল এবং তার সাথে যেসব অন্যান্য সীল পাওয়া গেছে সেগুলি নিশ্চিতভাবেই পুরোহিতের সম্পত্তি ছিল। সমকালীন অন্যান্য সভ্যতার সাথে তুলনার ভিত্তিতে বলা যায়, অন্যান্য সভ্যতার মতোই হরপ্পীয় সমাজেও যে, ধর্মীয় জীবনে কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠাকারী শ্রেণি, যথেষ্ট ক্ষমতাবান ছিল তাতে অবাক হওয়ার কিছুই নেই। তবে, হরপ্পীয় সীলমোহরের সবচেয়ে শক্তিমান অধিকারী ছিল সম্ভবত সমকালীন শাসকগোষ্ঠীর সদস্যবর্গ। মহেঞ্জোদারো ও হরপ্পা থেকে পাওয়া তামার অস্ত্রশস্ত্র ও সামগ্রীর দুটি মজুত-ভান্ডারের প্রতি অ্যাসকো পারপোলা দীর্ঘদিন পূর্বেই আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলেন। প্রথমটিতে আবিষ্কৃত দুটি কুঠারের পাতের ওপর সাতটি অক্ষর বিশিষ্ট খোদিত লিপির সঙ্গে অন্যত্র পাওয়া একটি সীলের বেশ মিল রয়েছে। অন্যটিতে একটি বাঁকানো ছোরা ও কুঠারের পাতের ওপর একইরকম তিনটি অক্ষর সম্বলিত লিপি রয়েছে। এই লিপিচিহ্ন গুলি সম্ভবত তাদের অধিকারীর নাম ও পদবী বহন করছে, যারা সে যুগের গণ্যমান্য কেউ হবেন। এই অস্ত্র গুলির মালিক ছিলেন তারাই এবং তারা ও তাদের উত্তরাধিকারীরাই নিশ্চিতভাবে এগুলি ব্যবহার করতেন।

উপরোক্ত সাক্ষ্য ও ইতিপূর্বে হরপ্পা সভ্যতার অর্থনীতি বিষয়ক আলোচনার মেলবন্ধনের ভিত্তিতে তাই বলা যায় যে, সেখানে কৃষক, পশুপালক, যাযাবর, দাস, শহুরে দরিদ্র, কারিগর, বণিক, পুরোহিত এবং তৎসহ তাদের ওপর নির্ভরশীল যোদ্ধা, করণিক এবং ভৃত্য সকলের সমন্বয়ে একটি সুবিকশিত শ্রেণিসমাজ বিদ্যমান ছিল। রণবীর চক্রবর্তী যাকে, এক জটিল 'বহুবিভাজিত সমাজব্যবস্থা' বলেছেন, নগরাশ্রয়ী সমাজে যা থাকাই স্বাভাবিক, আর এই প্রেক্ষাপটেই আমরা হরপ্পা সভ্যতার রাজনৈতিক সংগঠন তথা রাষ্ট্রীয় চরিত্রের আলোচনায় প্রবেশ করতে পারি। অবশ্য তার আগে একবার দেখে নেওয়া যেতে পারে হরপ্পীয় সমাজে নারীদের অবস্থা।

১৪.৫ নারীদের অবস্থা

যেকোনো আমলের সমাজজীবনের আলোচনায় নারীদের অবস্থা বিশেষ গুরুত্বের দাবি রাখে। হরপ্পা সভ্যতাও তার ব্যতিক্রম নয়। হরপ্পা সংস্কৃতিতে অসংখ্য নারীমূর্তির অস্তিত্ব দেখে অনেকেই হরপ্পীয় সমাজকে মাতৃতান্ত্রিক আখ্যা দিয়েছেন। ইরফান হাবিব লিখেছেন যে, হরপ্পার সমাধিক্ষেত্রে একই বংশতালিকাভুক্ত নারীদের যেভাবে সমাধিস্থ করা হয়েছিল এবং বাসগৃহে যেরকম কাদামাটির মাতৃদেবীর উপস্থিতি দেখা গেছে তা থেকে অনুমান করা যায় যে, সেসময় মাতৃতান্ত্রিক ব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। আধুনিক গবেষকরা অবশ্য এ বিষয়ে আরেকটু সতর্ক থাকতে চান। একথা বোধহয় অস্বীকার করার উপায় নেই যে, মাতৃদেবী উপাসনার সামাজিক অভিঘাত বেশ জটিল একটি বিষয়। উপিন্দর সিং লিখেছেন মাতৃদেবীর উপাসনার এই ধারায় নারীদের আরাধনা করার দৃষ্টান্ত ফুটে উঠলেও বাস্তবে এর ভিত্তিতে প্রমাণ করা কঠিন যে, মেয়েদের সামাজিক মর্যাদা বিশেষত সাধারণ মেয়েদের অবস্থা সেইসময় উচ্চে ছিল কিংবা তারা খুব ক্ষমতাবান ছিলেন। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, হরপ্পীয় কেন্দ্রের বিভিন্ন স্থানে প্রাপ্ত মূর্তিগুলি সবই কিন্তু মাতৃদেবীর কথা বলে না, এর মধ্যে অনেকগুলিই রয়েছে সাধারণ, পার্থিব নারীর। টেরাকোটা কর্মরত নারীর মূর্তি খুবই কম। নৌসারো থেকে পাওয়া একটি মূর্তিতে দেখা যায় একজন নারীকে শস্যদানা চূর্ণ করতে। যার ভিত্তিতে বলা যায় সেইসময় মেয়েরা খাদ্যোৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে যুক্ত ছিল। প্রাচীন সমাজ ব্যবস্থায় প্রসূতি মায়েদের জীবনের ঝুঁকির কথা অনস্বীকার্য। অনেকগুলো টেরাকোটা মূর্তি মিলেছে প্রসূতি মেয়েদের। হরপ্পায় সাম্প্রতিক উৎখননে একটি সমাধিক্ষেত্রে একই সাথে মহিলা ও শিশুর দেহাবশেষ থেকে বোঝা যায় সেইসময় জন্মকালে সম্ভবত মা ও শিশুর মৃত্যুর নজির বিরল ছিল না। আবার সিন্ধু উপত্যকার বাসগৃহে প্রাপ্ত অসংখ্য তকলি থেকে অনুমান করা যায় যে, নারীরাই হাতে সুতো কাটতো। শ্রমসাধ্য ঘরের এই কাজ মেয়েদের জন্য বরাদ্দ ছিল। আর দূরপাল্লার বাণিজ্য, কৃষিকাজ, শিল্পকর্ম ইত্যাদি পুরুষদের দ্বারা সম্পন্ন হত। যার ভিত্তিতে সমাজে পুরুষ প্রাধান্যের সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না, তবে নিশ্চিত প্রমাণের অভাবে এ ক্ষেত্রে স্থির সিদ্ধান্তে আসা কঠিন।

১৪.৬ রাজনৈতিক কাঠামো

কোন সমাজের রাজনৈতিক কাঠামোকে বুঝতে গেলে সংশ্লিষ্ট সমাজে ক্ষমতার বিন্যাস ও সামাজিক নেতৃত্বের মতো গুরুত্বপূর্ণ বিষয়গুলির প্রতি সজাগ দৃষ্টি দেওয়া প্রয়োজন। হরপ্পা সভ্যতার রাজনৈতিক সংগঠনের প্রকৃতি বিশ্লেষণে যে বিতর্ক দেখা যায় তার দুটি মাত্রা আছে। একটি হল- রাষ্ট্রের উপস্থিতি ও অনুপস্থিতি বিষয়ক এবং অপরটি হলো যদি রাষ্ট্রের উপস্থিতি থেকে থাকে, তবে তার চরিত্র কেমন ছিল। এ প্রসঙ্গে

উপিন্দর সিং আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন, তাহল এই যে, সাংস্কৃতিক সমরূপতা বা ঐক্যবদ্ধতা যে সবসময় রাজনৈতিক একীকরণের সমার্থক হবে- এমনটা ভাবার কোনো কারণ নেই, তাই হরপ্পা সভ্যতায় একটি নয়, একাধিক রাষ্ট্রের অস্তিত্বও যদি থেকে থাকে তাতেও অবাক হওয়ার কিছু নেই। বলাবাহুল্য, এই প্রশ্নটিও গবেষক ও ঐতিহাসিকদের ভাবিয়ে তুলেছে।

১৪.৬.১ কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় চরিত্র

হরপ্পা সভ্যতার রাজনৈতিক কাঠামো প্রসঙ্গে একেবারে প্রাথমিক পর্যায়ে মতামত রেখেছিলেন স্টুয়ার্ট পিগট এবং তার বক্তব্যকে অনেকাংশেই সমর্থন করেছিলেন বলেছেন মার্টিমোর হুইলার। পিগট বলেছিলেন হরপ্পীয় রাস্ট্র চরিত্রগতভাবে ছিল একটি অতিমাত্রায় কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্য, যার নিয়ন্ত্রণে ছিলেন একজন পুরোহিত রাজা এবং এই সাম্রাজ্যের দুই প্রধান ক্ষমতাকেন্দ্র ছিল নিঃসন্দেহে মহেঞ্জোদাড়ো ও হরপ্পা। হরপ্পা সভ্যতার ব্যাপক বিস্তৃতি সত্ত্বেও সংস্কৃতির মূল লক্ষণ গুলি, যথা- লিখনশৈলীর সমরূপতা, ওজন পরিমাপের সমতা ইত্যাদি যেভাবে প্রায় সমানভাবে বজায় ছিল তা থেকেও আমরা এক দক্ষ প্রশাসনের ইঙ্গিত পাই। কিন্তু প্রশ্ন হল, এই ভৌগোলিক প্রসারের রাজনৈতিক মাত্রা নিয়ে। সম্প্রতি ইরফান হাবিবও মন্তব্য করেছেন যে, যেভাবে হরপ্পা সংস্কৃতি অতি দ্রুত এক বিশাল এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল, তা কেবলমাত্র যুদ্ধ জয়ের দ্বারাই সম্ভব ছিল। হাবিবের মতে, হরপ্পীয় রাষ্ট্রের চরিত্র নির্ধারণের ক্ষেত্রে দুটি প্রধান বৈশিষ্ট্যের দিক খেয়াল রাখা দরকার। এগুলি হল- (১) রাষ্ট্রীয় নিয়ন্ত্রণী ক্ষমতার গভীরতা এবং (২) প্রতিষ্ঠানগত সদৃশ্যতা। দুটি ক্ষেত্রেই কেন্দ্রশাসিত কোন নিয়ন্ত্রণের উপস্থিতি অনিবার্য। অন্যভাবে বলা যায়, হরপ্পীয় রাষ্ট্র ছিল এমন একটি রাষ্ট্র যার মূল কেন্দ্রীয় অংশে প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি প্রতিভাত হয়েছিল এবং তারপর একের পর এক অন্যান্য অঞ্চলগুলি অধিকারের মাধ্যমে হরপ্পীয় সংস্কৃতির মূল বৈশিষ্ট্য গুলি সেখানেও সম্প্রসারিত হয়। হাবিব আরো বলেছেন, ভিন্ন ভিন্ন অঞ্চলের সর্বত্র, বিজয়ীরা শুধুমাত্র যে নিজেদের দৃষ্টিভঙ্গী নির্মাণ করেছিল তাই নয়, নিজেদের উপভোগের জন্য প্রয়োজনীয় সামগ্রী এবং বিলাসিতার উপকরণের আহরণের জন্য নিজেদের চাহিদাও প্রতিষ্ঠিত করেছিল। এইভাবেই গড়ে উঠেছিল 'সিন্ধু সাম্রাজ্য'। রণবীর চক্রবর্তী অবশ্য মনে করেন যে, উৎখনন থেকে পাওয়া অস্ত্রশস্ত্র সংখ্যায় অত্যন্ত কম বলে হরপ্পা সভ্যতার সামরিক সংগঠন ও আগ্রাসী মনোভাব সম্পর্কে নিশ্চিত ও স্থির সিদ্ধান্তে আসা কঠিন।

১৪.৬.২ রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের সমালোচনা

বিংশ শতকের ৬০ এর দশক থেকেই হরপ্পা সভ্যতায় রাষ্ট্রীয় অস্তিত্ব সম্পর্কে নানাবিধ সমালোচনা লক্ষ্য করা যায়। ওয়াল্টার ফেয়ারসার্ভিস জানান যে, হরপ্পা সভ্যতায় না ছিল কোনও সাম্রাজ্য, না ছিল কোন রাষ্ট্রের উপস্থিতি, এ প্রসঙ্গে তিনি পুরোহিত রাজতন্ত্র, ক্রীতদাস ব্যবস্থা, স্থায়ী সেনাবাহিনী ও দরবারি আধিকারিকদের অনুপস্থিতির কথা তুলে ধরেন। তার মতে, মহেঞ্জোদাড়োকে প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গুরুত্ব না দিয়ে, একটি উৎসব অনুষ্ঠানের কেন্দ্র হিসেবেই আমাদের দেখা উচিত। শুধু তাই নয় হরপ্পা সভ্যতার প্রচলিত নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলাকে তিনি কোনও নাগরিক প্রশাসনিক নিয়ন্ত্রণে হিসেবে দেখতে রাজী ছিলেন না, বরং তিনি মনে করেন যে, একটি সুবিন্যস্ত গ্রামীণ প্রশাসনিক ব্যবস্থাযই ছিল হরপ্পীয়দের যাবতীয় নিয়ন্ত্রণ ও শৃঙ্খলার মূল চালিকাশক্তি। পরবর্তীকালে, অবশ্য ফেয়ারসার্ভিস নিজের মতামত খানিকটা সংশোধন করে হরপ্পা সভ্যতায় কেন্দ্রীয় নিয়ন্ত্রণের

উপস্থিতি ও শ্রেণি কাঠামোর পক্ষে মত দিলেও, একথা মানতে একেবারেই নারাজ ছিলেন যে, এই নিয়ন্ত্রণের পিছনে সামরিক শক্তি বা বলপ্রয়োগের কোন ভূমিকা ছিল। তাঁর স্পষ্ট মত ছিল একধরনের আত্মনির্ভরতা, ধর্মীয় বিশ্বাস ও ঐতিহ্যই হরপ্পীয়দের সামাজিক আচার আচরণের সংগঠনে নির্ণায়ক ভূমিকা নিয়েছিল।

১৪.৬.৩ কৌমসমাজ ও রাষ্ট্রীয় সমাজ কাঠামোর মধ্যবর্তী স্তর

হরপ্পা সভ্যতার রাজনৈতিক ব্যবস্থা সম্পর্কে আরেকরকম মতামত তুলে ধরেছেন এস. সি. মালিক। মালিকের মতে, পর্যাপ্ত পরিমাণ শাসকীয় স্থাপত্য ও সর্বোচ্চ/সর্বজনমান্য উপাস্য দেবতার অনুপস্থিতি একটি শক্তিশালী, কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রীয় অস্তিত্বের ধারণাকে কার্যত নস্যাৎ করে দায়। বরং হরপ্পীয় রাজনৈতিক কাঠামোকে এলমান সার্ভিস বর্ণিত কৌমতান্ত্রিক সমাজ ও পূর্ণ নাগরিক রাষ্ট্রীয় সমাজের মধ্যবর্তী পর্যায় বা 'Chiefdom Stage' বলে অভিহিত করাই যুক্তিযুক্ত।

১৪.৬.৪ সাম্প্রতিক চর্চা ও নতুন সম্ভাবনা

পরবর্তীকালে, আরো অনেক গবেষকই হরপ্পা সভ্যতার রাজনৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণে সচেষ্ট হয়েছেন এবং তাদের লেখাতেও কেন্দ্রীভূত হরপ্পীয় সাম্রাজ্যের উপস্থিতি ও তার বিরোধিতা এই দুই বিপরীতধর্মী মতামতই ঘুরে ফিরে এসেছে। যেমন- শিরিন রত্নাগর নানাবিধ প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য ও সমকালীন অন্যান্য সংস্কৃতির সঙ্গে পারস্পরিক মেলবন্ধনের নিরিখে হরপ্পীয় সম্রাজ্যের চরিত্রকে বুঝতে চেয়েছেন। অন্যদিকে এই ধরনের প্রবনতার তীব্র বিরোধিতা পরিলক্ষিত হয়েছে জিম শাফার এর বক্তব্যে। শাফার হরপ্পা সভ্যতায় প্রচলিত সমরূপতার ধারণা নিয়েই প্রশ্ন তুলেছেন এবং সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, এই ধরনের মিল/সাদৃশ্যের পিছনে একটি শক্তিশালী, কেন্দ্রীভূত শাসনের উপস্থিতিকে খুঁজতে যাওয়ার কোনো কারণ নেই, কারণ এর মূলে ছিল সম্ভবত, একটি সুগঠিত, অভ্যন্তরীণ বাণিজ্যিক যোগসূত্র। প্রাচীন ইজিপ্ট ও মেসোপটেমীয় সভ্যতার সাথে তুলনা করে তিনি এ প্রসঙ্গে হরপ্পা সভ্যতায় বিশালকার রাজকীয় সমাধি, রাজপ্রাসাদ এবং মন্দির ও সুচিহ্নিত সামাজিক ভেদাভেদের অনুপস্থিতির দিকে আলোকপাত করেছেন। একইসঙ্গে তিনি একথাও মনে করিয়ে দিয়েছেন যে, হরপ্পা সভ্যতার বিভিন্ন কেন্দ্র থেকেই যে সকল হরপ্পীয় প্রত্নবস্তু মিলেছে, তার মধ্যে বহু মূল্যবান ধাতুর কারিগরি দ্রব্য, সীলমোহরও ছিল- যেগুলি কিন্তু শুধুমাত্র সম্ভ্রান্ত কার্যগৃহ বা মুষ্টিমেয় কিছু স্থাপত্যকেন্দ্র থেকেই পাওয়া যায়নি, অপেক্ষাকৃত কম গুরুত্বপূর্ণ গ্রামীণ এলাকা থেকেও এগুলি মিলেছে। যার ভিত্তিতে এ কথা বলা যেতেই পারে যে, হরপ্পা সভ্যতা সম্পদ বণ্টনে একধরনের সাম্যতা বজায় ছিল এবং নগরবাসী কিংবা গ্রামবাসী উভয় ক্ষেত্রেই সম্পদ যথাযথ ভাবে বন্টিত হত, আর এই প্রবনতা নিশ্চিতভাবেই কেন্দ্রীভূত সাম্রাজ্যের ধারণার বিপরীত কথাই বলে।

সাম্প্রতিককালের গবেষকদের অবশ্য বক্তব্য হল, হরপ্পা সভ্যতায় রাষ্ট্রকাঠামোর অস্তিত্বকে অস্বীকার করা কঠিন। বিশেষত, সমকালীন মিশরীয় বা মেসোপটেমীয় সভ্যতার সাথে তুলনা করে সুচিহ্নিত আর্থ-সামাজিক তারতম্য কিংবা বিশালাকার রাজকীয় স্থাপত্যের অনুপস্থিতির ভিত্তিতে হরপ্পা সভ্যতার রাষ্ট্র কাঠামোর উপস্থিতিকে সম্পূর্ণ নস্যাৎ করে দেওয়া ঠিক নয়। বরং এগুলির ভিত্তিতে একথা বলা যেতে পারে যে, হরপ্পীয় রাষ্ট্র একান্তভাবেই ছিল স্বতন্ত্র। উপিন্দর সিং লিখেছেন যে, যোগাযোগ ব্যবস্থা, কারিগরি দ্রব্যের সুনির্দিষ্ট মান, প্রত্নকেন্দ্রগুলির বিশেষত্ব, নাগরিক কর্মে শ্রমিকের নিরন্তন যোগান, শোর্টুঘাই তে বহিরাগত বাণিজ্যিক কেন্দ্র

স্থাপন- এগুলি সবই একধরনের অর্থনৈতিক জটিলতা ও রাষ্ট্র কাঠামোর উপস্থিতিকেই চিহ্নিত করছে। তাই সংস্কৃতিক সমরূপতা ও সভ্যতার সর্বত্র একই ধরণের লিখন শৈলীর ব্যাপক প্রচার ও বিভিন্ন ধরনের ভাষার প্রচলন যদি থেকে থাকে তাতে আশ্চর্য হবার কিছু নেই। সামাজিক তারতম্যের মাত্রা থেকে একরনের শ্রেণি বৈষম্যের ইঙ্গিতও পাওয়া যায়। সিটাডেল এলাকায় অবস্থিত কোনও বৃহদায়তন আবাস সম্ভবত প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবেও কার্যকরী থাকতেই পারে। সুতরাং একধরনের কেন্দ্রীভূত নিয়ন্ত্রণের ছাপ হরপ্পা সভ্যতার সাক্ষ্য থেকেই প্রতিভাত হয়। কিন্তু গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল- এই নিয়ন্ত্রণের মাত্রা কেমন ছিল এবং কার দ্বারাই বা এই নিয়ন্ত্রণ কার্যকরী হত- এই প্রশ্নগুলির উত্তর ঐতিহাসিক ও প্রত্নতাত্ত্বিকরা নানাভাবে দিয়েছেন।

জ্যাকবসন জানিয়েছেন যে, হরপ্পীয় রাষ্ট্র ছিল একটি প্রাথমিক রাষ্ট্র, যার বেশকিছু বৈশিষ্ট্য লক্ষ্যণীয়। যেমন- পৌরাণিক চরিত্র বিশিষ্ট সার্বভৌম কর্তৃত্বের উপস্থিতি, অপরিণত একটি সামরিক কাঠামোর আপাত সক্রিয়তা এবং খুবই দুর্বলভাবে গড়ে ওঠা আর্থিক স্তরভেদ। আবার পসেহল বলেছেন, হরপ্পীয় সমাজ ছিল খুবই উচ্চমাত্রায় শৃঙ্খলিত এবং একটি শক্তিশালী কাঠামো বিশিষ্ট, যার শাসনভার ছিল একটি সংসদের হাতে, একজন রাজার হাতে নয়। অন্যদিকে কিনোয়ারের বক্তব্য হল, হরপ্পীয় রাষ্ট্র গড়ে উঠেছিল প্রতিদ্বন্দ্বী মনোভাবাপন্ন বিভিন্ন নাগরিক শ্রেণির সমন্বয়ে, যাদের মধ্যে ছিল- বণিক, ধর্মীয় নিয়ন্ত্রক এবং জমি ও জীবনযাত্রার বিভিন্ন স্তর নিয়ন্ত্রণকারী ব্যক্তিরা। এদের মধ্যে অবশ্য প্রভাব ও নিয়ন্ত্রণের তারতম্য ছিল লক্ষণীয়। কিনোয়ার আরো উল্লেখ করেছেন যে, চতুর্ভূজ সীলমোহরে খোদিত বিভিন্ন জন্তুর প্রতিকৃতি টোটেমীয়' ঐতিহ্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়। যার ভিত্তিতে বলা যায় হরপ্পীয় সভ্যতায় অন্তত দশ ধরনের কৌম বা সম্প্রদায়ের উপস্থিতি ছিল এবং এক একটি জন্তু/পশু এক একটি কৌম বা সম্প্রদায়ের প্রতিনিধিত্বের সূচক। তবে যে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই তা হল, অধিকাংশ সীলমোহরে ইউনিকর্নের উপস্থিতি। মহেঞ্জোদাড়োতে প্রায় ৬০ শতাংশ এবং হরপ্পায় ৪০ শতাংশ। শিরিন রত্নাগর এত ব্যাপকমাত্রায় ইউনিকর্নের প্রতিকৃতির উপস্থিতি থাকে সিদ্ধান্তে এসেছিলেন যে, এটি সম্ভবত হরপ্পীয় শাসকবর্গের প্রতিকৃতিই ছিল। কিনোয়ার অবশ্য বলেছেন, ইউনিকর্ন কৌম সম্ভবত অভিজাত বা বণিকদের প্রতিনিধিত্ব করতো, প্রচলিত শাসক কাঠামোয় যাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। আর সংখ্যায় অপেক্ষাকৃত কম পাওয়া অন্যান্য জন্তুর প্রতিকৃতি যুক্ত সীলমোহর গুলির মধ্যে কোনও একটি সম্ভবত ছিল হরপ্পীয় শাসন ক্ষমতা কাঠামোর সর্বোচ্চে থাকা প্রধান ক্ষমতাবান শাসকের।

১৪.৭ উপসংহার

পরিশেষে, হরপ্পা সভ্যতার সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর বিশ্লেষণের ভিত্তিতে বলা যায় যে, সামাজিক ও রাজনৈতিক কাঠামোর চরিত্র সম্পর্কে ঐতিহাসিরা একমত নন। এ বিষয়ে তাই সরাসরি শ্রেণি বৈষম্যের নজির ছিল বা কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্র কাঠামো গড়ে উঠেছিল তেমনটা বলা ঠিক হবে না। নিত্যনতুন গবেষণায় এ বিষয়ে নতুন নতুন বিষয় উঠে আসছে এবং পুরনো ধারণাগুলো কঠিন প্রশ্নের মুখে পড়ছে। সেরকমই কয়েকটি প্রসঙ্গের উল্লেখ করে এই আলোচনা শেষ করা যায়। সাম্প্রতিক ইতিহাসচর্চায় আরো একটি বিষয় এপ্রসঙ্গে উঠে এসেছে। তা হলো এই যে, বৃহদায়তন মহেঞ্জোদাড়ো প্রত্নকেন্দ্রের পাশাপাশি রাখিগরাহি, লুরিওয়ালা, গনেরিওয়ালা এবং ধোলাবিরার মত বড় প্রত্নকেন্দ্রের উপস্থিতি থেকে বেশ কিছু প্রশ্ন উঠে এসেছে- এগুলি কি প্রাদেশিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল, যা একটি রাজনৈতিক নিয়ন্ত্রণে গাঁথা ছিল? নাকি এগুলি ছিল পৃথক পৃথক রাজ্যের রাজধানী? কিংবা এগুলি নগররাষ্ট্র ছিল না তো? দীর্ঘকাল পূর্বের গবেষণায় উচ্চমাত্রার

কেন্দ্রীভূত রাষ্ট্রের ব্যাখ্যাতেই সীমাবদ্ধ থাকার প্রবণতা পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু এখনকার গবেষকরা উক্ত প্রশ্নগুলিকে সামনে রেখে হরপ্পীয় শাসন কাঠামোয় বিকেন্দ্রীকরণ প্রবণতার পক্ষেই অধিকমাত্রায় বিশ্বাসী। তাই শেষবিচারে বলা যায়, হরপ্পীয় সাম্রাজ্য, নাকি বিচ্ছিন্ন বা সংযুক্ত রাজ্যের সমষ্টি- কোনও প্রবণতাকেই একমাত্র সঠিক বলা যাচ্ছে না। আবার এমন সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যাচ্ছে না যে, হরপ্পা সভ্যতায় আসলে ছিল বিভিন্ন রাষ্ট্রের উপস্থিতি, যাদের ছিল নিজস্ব নিজস্ব রাজনৈতিক সংগঠন।

১৪.৮ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. হরপ্পা সভ্যতার সমাজ কি শ্রেণিভিত্তিক ছিল?

২. হরপ্পা সভ্যতার সামাজিক গড়নের ওপর একটি নাতিদীর্ঘ প্রবন্ধ লেখ।

৩. হরপ্পীয় সমাজ ছিল মাতৃতান্ত্রিক'—তুমি কি এই মত সমর্থন করো।

৪. সাম্প্রতিক গবেষণার আলোকে হরপ্পা সভ্যতার রাজনৈতিক কঠামো সম্পর্কে আলোচনা করো।

১৪.৯ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

রণবীর চক্রবর্তী, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব (প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।

রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, আনন্দ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৬।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৯।

ইরফান হাবিব, সিন্ধু সভ্যতা, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০৪।

Upinder Singh– A History of Ancient and Early Medieval India– Pearson– 2009.

R.S. Sharma– India's Ancient Past– OUP– New Delhi– 2005.

Raymond Allchin and Bridget Allchin– The Rise of Civilization in India and Pakistan– CUP– 1982.

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, প্রথম খণ্ড, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ), প্রথম খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

ড় রতন কুমার বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (আদিপর্ব), প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, কলকাতা, ২০১৯।

শিরীণ রত্নাগর, হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০৩।

D D Kosambi– An Introduction to the Study of Indian History– Popular Prakashan– Bombay– 1956.

Romila Thapar– Early India- From The Origins to Circa A.D. 1300– London– 2002.

একক : ১৫ ◘ ধর্ম বিশ্বাস ও আচার; শিল্পসৃজন (Religious beliefs and practices—art)

গঠন

১০.০ উদ্দেশ্য

১৫.১ সূচনা

১৫.২ ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার

১৫.২.১ মাতৃদেবীর উপাসনা

১৫.২.২ পুরষ দেবতার উপস্থিতি

১৫.২.৩ লিঙ্গ ও যোনি উপাসনা

১৫.২.৪ বিবিধ প্রাণির উপাসনা

১৫.২.৫ বৃক্ষ উপাসনা

১৫.২.৬ জল ও আগুনের ব্যবহার

১৫.২.৭ অন্ত্যেষ্টি প্রক্রিয়া

১৫.২.৮ ধর্মীয় চরিত্র নির্ধারণ

১৫.৩ হরপ্পীয় লিপি

১৫.৪ শিল্পসৃজন

১৫.৫ উপসংহার

১৫.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১৫.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১৫.০ উদ্দেশ্য

- এই এককের উদ্দেশ্য হল হরপ্পা সভ্যতার ধর্মীয়-সাংস্কৃতিক উপরিকাঠামো সম্পর্কে আলোচনা করা।
- আলোচনার প্রথম বিষয়বস্তু হল এই সভ্যতার ধর্ম বিশ্বাস, ধর্মীয় জীবন ও ধর্মাচরণ পদ্ধতি।
- আলোচনার দ্বিতীয় বিষয়বস্তু হল হরপ্পা সভ্যতার শিল্পকলা ও সাংস্কৃতিক সৃজনশীলতা সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।

১৫.১ সূচনা

হরপ্পা সভ্যতার মধ্য দিয়েই এই উপমহাদেশে যেমন প্রথম নগরজীবনের অভিজ্ঞতা লক্ষ্য করা যায় তেমনি এই নগরশ্রয়ী সংস্কৃতিতেই প্রথম দেখা যায় লিখিত হরফের ব্যবহার ও শিল্পসৃজনের জন্য পাথরের প্রয়োগ। হরপ্পা সভ্যতার সাংস্কৃতিক জীবনের মুখ্য দিক ফুটে উঠেছে সাক্ষরতা ও শিল্প সৃষ্টির মধ্যে দিয়ে। তবে নিঃসন্দেহে হরপ্পা সভ্যতার সাংস্কৃতিক জীবনের সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ দিক হরপ্পীয় জনগণের ধর্মীয় ধ্যানধারণা। বিশেষতঃ পরবর্তীপর্বের ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসে হরপ্পীয় ধর্ম বিশ্বাস কতটা প্রভাব ফেলেছিল বা আদৌ কোন প্রভাব ফেলেছিল কিনা, ইত্যাদি নানা প্রসঙ্গের মধ্যে দিয়েই হরপ্পা সভ্যতার সাংস্কৃতিক জীবনের ইতিহাসচর্চা প্রাণবন্ত চরিত্র লাভ করেছে।

১৫.২ ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার

হরপ্পা সভ্যতার সাংস্কৃতিক জীবনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক হল তার ধর্মীয় ধ্যানধারণা। কিন্তু হরপ্পা লিপির নির্ভরযোগ্য পাঠোদ্ধার না হওয়ায় এই সভ্যতার ধর্মীয় জীবন সম্পর্কে আমাদের জ্ঞান ভাণ্ডার অনেকটাই সীমিত। হরপ্পায় প্রাপ্ত আর মৃৎশিল্পীদের রেখে যাওয়া শিল্পদ্রব্য থেকেই মূলত এই সভ্যতার ধর্মীয় জীবনের আভাস মেলে। অবশ্য কিছু স্থাপত্যের ধ্বংসাবশেষ আছে। যেগুলির কোন ধর্মীয় তাৎপর্য আছে কিনা তা নিশ্চিতভাবে বলা সম্ভব নয়, তবে একটি কথা মনে রাখতে হবে যে, সেইসময় ধর্মীয় ক্ষেত্রে কোন একটিমাত্র বিশ্বাস প্রথা বিরাজমান ছিল না। জনসমষ্টির বিভিন্ন অংশে বিভিন্ন পূজা-আচার এবং দেবদেবী ছিল, এমনটা হতেই পারে।

১৫.২.১ মাতৃদেবীর উপাসনা

হরপ্পা সভ্যতার ধর্ম নিয়ে মৌলিক চর্চা শুরু হয়েছিল ১৯৩১ সালে জন মার্শালের হাত ধরে। একথা ঠিক যে আধুনিক গবেষণার আলোকে মার্শালের অনেক বক্তব্যই আজ মেনে নেওয়া কঠিন, তথাপি হরপ্পীয় ধর্মের কয়েকটি গুরুত্বপূর্ণ বৈশিষ্ট্যকে শনাক্তকরণে প্রশংসনীয় উদ্যোগ নিয়েছিলেন তিনি। হরপ্পীয় লেখ-র পাঠোদ্ধার হলেই এই বিষয়ে আরো সুস্পষ্ট ধারণা লাভ সম্ভব হবে। যাই হোক, হরপ্পা সভ্যতায় প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে যে বহুসংখ্যক পোড়ামাটির তৈরি নগ্ন ও অর্ধনগ্ন নারীমূর্তি মিলেছে বেশিরভাগ পণ্ডিত মনে করেন সেগুলি সম্ভবত আরধ্য মাতৃকাদেবীর মূর্তি। বিপুল সংখ্যাধিক্যের কারণে একথা বলাও অসঙ্গত নয় যে হরপ্পা সভ্যতার ধর্মীয় জীবনে মাতৃকামূর্তির উপাসনা নিত্যনৈতিক হয়ে দাঁড়ায়। মাতৃকামূর্তির উন্নত স্তনযুগল ও গুরুনিতম্বকে দৃশ্যমান করে তোলার চেষ্টা হয়েছে। কারণ, মাতৃকামূর্তিগুলি সাধারণত প্রজননের অধিষ্ঠাত্রী দেবী হিসেবে পূজিত হতেন। অর্থাৎ উর্বরতার একটা ধারণাও এক্ষেত্রে যুক্ত ছিল। উপিন্দর সিং লিখেছেন এই ধরণের অনুমানের ক্ষেত্রে অনেকগুলি বিষয় সক্রিয় ছিল—১. কৃষিভিত্তিক সমাজের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে জড়িয়ে থাকা উর্বরতার ধারণা, ২. সমকালীন অন্যান্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির সঙ্গে নিয়ত আদান-প্রদান, ৩. পরবর্তী হিন্দু ধর্মীয় বাতাবরণে মাতৃকাদেবীর উপাসনার দৃষ্টান্ত, ৪. ব্যাপক সংখ্যায় টেরাকোটা নারীমূর্তির প্রাপ্তি ও ৫. বেশকিছু সীলে ইঙ্গিতপূর্ণ চিত্রের প্রতিফলন। শেষোক্ত উপাদানটির

নজির হিসাবে একটি সীলের উল্লেখ করা যায়। যেখানে একটি নারীর যোনি থেকে একটি গাছ বেরিয়ে আসছে, যাকে অনেকেই শাকম্ভরী' দেবীর দ্যোতক বলে মনে করেন। খেয়াল রাখা দরকার উৎখননের ফলে প্রাপ্ত সকল নারীমূর্তির মধ্যেই দেবত্ব আরোপ করা ঠিক হবে না, মূর্তিগুলির যথার্থ শৈল্পিক বিশ্লেষণ ও তাদের প্রাপ্তিস্থানের প্রেক্ষাপটকেও এক্ষেত্রে মাথায় রাখা দরকার। এ প্রসঙ্গে আলেকজান্দ্রা আর্দেলিনিউ-জানসেন -এর গবেষণার কথা উল্লেখ করা যায়। তিনি হরপ্পা সভ্যতার টেরাকোটা নারীমূর্তিগুলির প্রকারভেদ ও বৈচিত্রের দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল যেসমস্ত বৈশিষ্ট্যের আলোকে প্রায়শই হরপ্পীয় নারী মূর্তিগুলিকে ধর্মীয় চরিত্র প্রদানের রেওয়াজ দেখা যায়, তেমন মূর্তিগুলির দেখা হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো এবং বানাওয়ালিতে প্রচুর সংখ্যায় পাওয়া গেলেও, কালিবঙ্গান, লোথাল, সুরকোৎদা কিংবা মিথাথল এর মতো প্রত্নকেন্দ্রে অনুপস্থিত।

১৫.২.২ পুরষ দেবতার উপস্থিতি

হরপ্পীয়দের আরধ্য পুরুষদেবতার মধ্যে বিশেষ আকর্ষণের বিষয় মহেঞ্জোদারোতে প্রাপ্ত একটি সীলমোহরে উৎকীর্ণ উপবিষ্ঠ এক পুরুষের মূর্তি, এই পুরুষমূর্তিটি জোড়াসনে উপবিষ্ঠ ও তার তিনটি মুখ দৃশ্যমান। ত্রিকোণাকৃতি শিরোভূষণ তাঁর মাথায় এবং তাঁকে ঘিরে রয়েছে বেশ কিছু বন্যপ্রাণী। এই মূর্তিটিকে মার্টিমোর হুইলার আদি শিব' বলে উল্লেখ করেন। সম্প্রতি এই মূর্তিটিকে বৈদিক রুদ্র শিবের মূর্তি হিসাবেও সনাক্ত করা চেষ্টা হয়েছে। কিন্তু এই মত নির্দধিায় মেনে নেওয়া অসম্ভব। রণবীর চক্রবর্তীর মতে, এই পুরুষমূর্তিটিকে পশুপতি শিব বলা যায় না। কারণ- 'পশু' শব্দটি যে কোনো প্রাণিকে বোঝায় না, তার প্রকৃত অর্থ গৃহপালিত প্রাণী, অথচ, সীলমোহরে উৎকীর্ণ দৃশ্যে দেখা যায়, বাঘ, হাতি, গণ্ডার প্রভৃতি বন্যপ্রাণীকে। তাই জোড়াসনে উপবিষ্ঠ পুরুষমূর্তিটিকে সরাসরি পশুপতি শিবের আদিরূপ বলে শনাক্ত করা কঠিন। বরং, আলোচ্য মূর্তিটির সাথে প্রাক-এলামীয় (খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০-২৭৫০) সংস্কৃতির মিল খুঁজে পাওয়া যায়। প্রাক-এলামীয় সীলমোহরে জোড়াসনে বসে থাকা ক্ষুরযুক্ত নর-বৃষভ উৎকীর্ণ রয়েছে। তাই আলোচ্য মহেঞ্জোদারোর মূর্তিটি যদি এলামীয় প্রভাবে সৃষ্টি হয়ে থাকে, তাহলে অবাক হওয়ার কিছু নেই।

১৫.২.৩ লিঙ্গ ও যোনি উপাসনা

সিন্ধু উপত্যকায় প্রাপ্ত বহুসংখ্যক লিঙ্গ ও বৃত্তাকার পাথরের বস্তু লিঙ্গ ও যোনি উপাসনার ইঙ্গিত দেয়। জর্জ ডালেস সহ অনেকে এই বস্তুগুলিকে লিঙ্গ ও যোনি বলে মানতে নারাজ। কিন্তু সম্প্রতি কালিবঙ্গানে যোনিপীঠের ওপর লিঙ্গ সদৃশ এক পোড়া মাটির ফলক পাওয়া যাওয়ায় ঐ বস্তুগুলিকে লিঙ্গ ও যোনি রূপে মেনে নেওয়ার পক্ষে যুক্তি দৃঢ় হয়েছে।

১৫.২.৪ বিবিধ প্রাণির উপাসনা

হরপ্পা সভ্যতার ধর্মীয় জীবনে যে দিক নিয়ে কোন বিতর্ক নেই তা হল, বিবিধ প্রাণীর উপাসনা। যে প্রাণীগুলি অধিকাংশ সিলমোহরে উৎকীর্ণ, সেই একশৃঙ্গ চতুষ্পদ প্রাণীগুলিকে অধিকাংশ পুরাতাত্ত্বিক 'ইউনিকর্ন' আখ্যা দিয়েছেন। মাত্র একটি শৃঙ্গ প্রাণিটির কপাল থেকে উদ্গত, প্রাণির সম্মুখে তিন-থাক বিশিষ্ট একটি আধার, যাতে সম্ভবত আরাধ্য প্রাণিটির জন্য প্রদত্ত খাদ্য বা পানীয় রাখা হত। কখনও কখনও প্রাণিটির

সম্মুখে দীপদান বা ধূপদানও দেখা যায়। এমন প্রাণি বাস্তবে দেখা যায় না, কিন্তু হরপ্পা সভ্যতার ধর্মীয় ধ্যান-ধারণায় কাল্পনিক এক শৃঙ্গ ইউনিকর্নের বিশেষ মর্যাদা রয়েছে। সিলমোহরে অন্তত ৯৫টি ক্ষেত্রে বৃষের প্রতিকৃতি দেখা যায়। যার দ্বারা বোঝা যায়, হরপ্পা সভ্যতায় বৃষের ধর্মীয় তাৎপর্য ছিল। কিন্তু সীলমোহরে কখনও গাভীর মূর্তি দেখা যায় না। ধর্মীয় জীবনে গাভীর গুরুত্বের কোন প্রমাণ জানা নেই। মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া একটি ভাস্কর্যে, ভেড়া-বৃষ-হাতির শরীরের বিভিন্ন অংশে সমাহারে একটি যৌথ ও বিচিত্র প্রাণীমূর্তি দেখা যায়। একটি সীলে উৎকীর্ণ আছে শৃঙ্গযুক্ত ব্যাঘ্রমূর্তি, যার ওপরে আছে সশৃঙ্গ এক নারীর প্রতিকৃতি।

১৫.২.৫ বৃক্ষ উপাসনা

হরপ্পা সভ্যতার ধর্মীয় জীবনে বৃক্ষপূজারও সম্ভবত তাৎপর্য ছিল। অশ্বত্থ গাছ ও অশ্বত্থ পাতার দৃশ্যায়ন, সীলমোহরে ও মৃৎপাত্রে প্রায়ই দেখা যায়। একটি সীলে অশ্বত্থ গাছ ও অশ্বত্থ পাতা তো আছেই, তদুপরি একজোড়া একশৃঙ্গ ইউনিকর্নের মাথাও উৎকীর্ণ হয়েছে। মহেঞ্জোদারোতে পাওয়া একটি সীলমোহরে আছে অশ্বত্থ বৃক্ষের মধ্যে এক দেবতা, একটি মৎস্য প্রতিম-প্রতীক, একটি বৃহৎ ছাগল এবং দেবতার ডান দিকে হাঁটু মুড়ে বসা একজন মানুষ, সম্ভবত উপাসক। সীলমোহরের একেবারে নিচের দিকে আছে সারি দিয়ে দন্ডায়মান ৭টি নারীর মূর্তি। এটির ধর্মীয় তাৎপর্য অস্বীকার করা কঠিন। বিশেষ করে এই সাত নারী কি বৃক্ষপূজায় পৌরোহিত্য করছেন? সেই সম্ভাবনাও উড়িয়ে দেওয়া যায় না। চানহুদারোতে একটি বয়াম আবিষ্কৃত হয়েছে, যেটি ইটের কারুকাজের মধ্যে বসানো ছিল।এর মধ্যে পাওয়া গেছে বিশোর্ধ এক নারীর করোটি। এটি নিশ্চয়ই কোনো বলির শিকার। হাবিবের অনুমান, এক মঙ্গলময় দেবতার উদ্দেশ্যে উৎসর্গীকৃত উপাচার সঞ্চিত রাখার জন্য নির্মিত ঐ বয়াম আর সেই কারণেই সম্ভবত করোটি তার মধ্যে রক্ষিত ছিল।

১৫.২.৬ জল ও আগুনের ব্যবহার

ধর্মীয় চেতনা ও ক্রিয়াকলাপে জলের নিয়মিত ব্যবহার আমাদের নজর এড়ায় না। এক্ষেত্রে মহেঞ্জোদারোতে বিখ্যাত জলাশয়টি ও ব্যবহার হয়ে থাকতে পারে। যদিও হাবিব মনে করেন, সিন্ধু মানুষজন স্বাস্থ্যের প্রয়োজনে নয়, প্রধানত ধর্মীয় প্রয়োজনেই জল ব্যবহারে আগ্রহী ছিল, তেমন যুক্তি এখনো সংশয়পূর্ণ। হরপ্পা সংস্কৃতির কোনও কোনও স্থানে কাদামাটির প্রলেপ লাগানো ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র গর্ত আবিষ্কৃত হয়েছে। সেগুলির কয়েকটির মধ্যে পোড়া কার্বন খণ্ড পাওয়া গেছে, এগুলি হোমকুণ্ড' হিসাবে বর্ণিত। হাবিব মনে করেন, খনন-করা অন্যান্য স্থানে, এমনকি প্রসিদ্ধ মহেঞ্জোদারোয় ও হরপ্পায় এরকম কোনো হোমকুণ্ড' আবিষ্কৃত হয় নি। তাই এই গর্তগুলির সত্যিই যদি কোনো ধর্মীয় তাৎপর্য থাকেও, তবে তা নিশ্চিতরূপেই একান্তভাবে আঞ্চলিক কোনো ধর্মীয় আচার। অবশ্য, কলিবঙ্গানের উঁচু এলাকায় ইষ্টক নির্মিত সুউচ্চ পিঠীকার ওপর ডিম্বাকৃতি ধাঁচা দেখা যায়। এর মধ্যে ছাই ও মৃতপশুর অস্থির সন্ধান পাওয়া গেছে। এর কাছেই ছিল একটি কূপ ও স্নানাগার। অলচিন দম্পতির ব্যাখ্যা যে কালিবঙ্গানে পশুবলি, একপ্রকার অগ্নি-আশ্রয়ী ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ এবং স্নান-প্রক্ষালনের রীতি প্রচলিত ছিল। তবে অধুনা কোন কোন পুরাবিদ এর ভিত্তিতে ঋকবৈদিক যজ্ঞ ও পশুবলি নির্ভর ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপে পরিচয় হরপ্পা সভ্যতাতে দেখতে আগ্রহী হলেও, সেই ধারণা ভিত্তিহীন।

১৫.২.৭ অন্ত্যেষ্টি প্রক্রিয়া

হরপ্পীয়দের ধর্মীয় বিশ্বাসে সম্ভবত পরলোকের অস্তিত্ব ছিল। তাই হরপ্পা সভ্যতার সাংস্কৃতিক জীবনে অন্ত্যেষ্টি প্রক্রিয়ার ধারণাও গুরুত্বপূর্ণ। হরপ্পা সভ্যতায় মৃত্যু ও মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সম্বন্ধে সাক্ষ্য বহন করছে এই অন্ত্যেষ্টি প্রক্রিয়া। এই সভ্যতায় মৃতদেহ সৎকারের প্রধান প্রক্রিয়া ছিল সমাধি, মৃতদেহ দাহ করার প্রথা জনপ্রিয় ছিল না। নগরাশ্রয়ী ও সুপরিকল্পিত জীবনযাত্রার পক্ষে উপযুক্ত সমাধি ক্ষেত্রের ব্যবস্থা রাখা এই সভ্যতার অন্যতম বৈশিষ্ট্য। মহেঞ্জোদারো, লোথাল ও কালিবঙ্গানে চারটি প্রধান নগরকেন্দ্রে সমাধিক্ষেত্রের সন্ধান মিলেছে। সাধারণত পূর্ণাঙ্গ শায়িত সমাধি দেখা যায়, যেগুলির মৃতদেহের মাথা থাকত উত্তরমুখে। সমাধিতে মৃতদেহের সঙ্গে রাখা হত বিবিধ তৈজস, যেমন- মৃৎপাত্র ও বিভিন্ন প্রকার অলংকার। সমাধির জন্য কফিন সদৃশ আধারের অবশেষে পাওয়া গেছে হরপ্পার সমাধিতে। হরপ্পার সমাধিক্ষেত্র ২টি, 'আর-৩৭' ও সমাধিক্ষেত্র 'এইচ'। কালিবঙ্গানে কখনও কখনও ইটের তৈরি সমাধিকক্ষ দেখা যায়। লোথালের সমাধি ক্ষেত্রে রয়েছে পাশাপাশি শায়িত এক নারী ও এক পুরুষের কঙ্কাল। যুগ্ম সমাধির নজির অবশ্য লোথাল ভিন্ন হরপ্পা সভ্যতার অন্যত্র খুঁজে পাওয়া যায় না। মৃত ব্যক্তির অস্থি মাটিতে গর্ত খুঁড়ে রেখে দেওয়ার প্রথাও প্রচলিত ছিল।

১৫.২.৮ ধর্মীয় চরিত্র নির্ধারণ

হরপ্পা সভ্যতার ধর্মের চরিত্র নির্ধারণে পণ্ডিতমহলে নানামত লক্ষ্য করা যায়। দিলীপকুমার চক্রবর্তী লিখেছেন, যেহেতু এই সভ্যতার লিপি আমরা পড়তে পারি না, তাই এই সভ্যতার ধর্ম নিয়ে আমাদের ধারণাতে কিছুটা অনুমান থাকবেই। তবে যেটুকু বুঝতে পারা যায় তাতে পরবর্তীযুগের ধর্মীয় চেতনার সাথে একটা গোত্রীয় সাদৃশ্য সহজেই ধরা পড়ে। বর্তমানের দেবদেবীদের সঙ্গে মেলানোর চেষ্টাতে লাভ নেই, কারণ দেবতাদের গুরুত্ব ঐতিহাসিক পরিপ্রেক্ষিতে পরিবর্তিত হয়। তবে ভারতীয় ধর্মের ইতিহাসের ধারা থেকে একেবারে বাইরে এনে এই ধর্মকে দেখায়ও কোনও লাভ নেই।

ইরফান হাবিবের মতে, পশুর আকৃতি বিশিষ্ট আত্মা এবং পবিত্র পিপুল গাছ এইসব নিয়ে হরপ্পার সরকারি ধর্ম' গড়ে উঠেছিল, যার উৎসমূল নিহিত ছিল প্রাচীনতর সময়কালের প্রকৃতিবাদী বিশ্বাসের মধ্যে। তখনও মানুষকে সর্বদাই জঙ্গলে, ঘন অরণ্যে বিপজ্জনক বন্য পশুর মুখোমুখি দাঁড়াতে হতো। তখনও ঘন বসতিপূর্ণ এলাকার একেবারে গা ঘেঁষে ছিল গহীন অরণ্য। কাজেই সেই সময়কালে প্রাচীন বিশ্বাসের মূল তার প্রাসঙ্গিকতা হারায় নি। পৌরাণিক এবং প্রকৃতিবাদের বিকশিত ভাণ্ডারে, শ্রুতিতে, মুখের কথায় প্রজন্ম পরম্পরায় প্রাচীন বিশ্বাস তখনও তার অস্তিত্ব বজায় রাখতে পেরেছিল। ঋগ্বেদের ধর্ম বা রীতি-আচারের সঙ্গে এর কোনো সাদৃশ্য খুঁজে পাওয়া যায় না। সিন্ধু সভ্যতার অবসানের প্রায় ১৮০০ বছরের অনেক পরে হিন্দুধর্মে এইসব অভ্যাস এবং ধর্মীয় প্রথা রয়ে গেছে—এমন অনুমানের ভিত্তিতে যদি কোনো দাবি তবে তাকে অতিরিক্ত গুরুত্ব দেওয়া যায় না।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য মনে করেন, পারিপার্শকি সাক্ষ্য থেকে অনুমান করা যায় যে, ভারতের প্রাচীনতম ধর্মব্যবস্থা মূলত মাতৃকাপূজা, তৎসংশ্লিষ্ট লিঙ্গ ও যোনিপূজা এবং দার্শনিক যৌন-দ্বৈতের ধারণা, অর্থাৎ সৃষ্টির মূলে পুরুষ ও স্ত্রী আদর্শের সংযোগ এবং যোগসাধনা প্রভৃতিকে কেন্দ্র করে গড়ে উঠেছিল। এগুলির কোনটিই কোনটির থেকে বিচ্ছিন্ন নয়। এবং সেই হিসাবে সামগ্রিকভাবে এগুলির দ্বারা এমন একটি ধর্মীয় ঐতিহ্যের সৃষ্টি হয়েছিল। যাকে আমরা আদিম তান্ত্রিক ঐতিহ্য আখ্যা দিতে পারি।

বস্তুত হরপ্পা সভ্যতার ধর্মীয় বিশ্বাস ও আচার-আচরণ বিশ্লেষণকালে মনে রাখতে হবে এক্ষেত্রে হরপ্পীয়রা একধরণের বৈচিত্র্যময় রূপ তুলে ধরেছিল। পরবর্তীকালের হিন্দুধর্মের আতস কাঁচে ফেলে তাকে বিচার করা ভুল হবে। তাৎপর্যপূর্ণ বিষয় হল যদিও হরপ্পা সভ্যতার ধর্মীয় জীবনের অনেক বৈশিষ্ট্যের মধ্যে পরবর্তীকালের ধর্মীয় রীতিনীতির বেশ কিছু বৈশিষ্ট্য ফুটে উঠেছিল তথাপি মন্দির ভিত্তিক উপাসনার নজির কার্যত অনুপস্থিত। হরপ্পা সভ্যতার কোনও ইমারতকেই নির্দ্বিধায় মন্দির বা দেবালয় বলে চিহ্নিত করা যায় না। এই দিকটিও ভীষণ গুরুত্বপূর্ণ।

১৫.৩ হরপ্পীয় লিপি

হরপ্পা সভ্যতায় সাক্ষরতার অস্তিত্ব নিয়ে কোন বিবাদ নেই। কিন্তু এই সভ্যতায় ব্যবহৃত লিপির পাঠোদ্ধার এখনও করা যায়নি। এই লিপির ব্যবহার প্রধানত দেখা যায় সীলমোহরের ওপর। খ্রিস্টপূর্ব ২৫০০ থেকে খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০ পর্যন্ত এই লিপি নিয়মিত ব্যবহার করা হয়েছিল। পৃথিবীর প্রাচীনতম চারটি লিপির মধ্যে অন্যতম হরপ্পা সভ্যতার লিপি। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে হরপ্পীয় লিপি সম্বলিত প্রায় ৪০০০ সিলমোহর পাওয়া গেছে। সেই সিলমোহরে উৎকীর্ণ লেখগুলি আয়তনে ক্ষুদ্র। এক একটি লেখতে পাঁচটির বেশী হরফ নেই। খুব সম্ভবত প্রশাসনিক নির্দেশাবলী ও বাণিজ্যিক তথ্যাদি তুলে ধরার জন্য অতি সংক্ষিপ্ত বয়ান সীলমোহরে উৎকীর্ণ হত। হরপ্পা সভ্যতার বৃহত্তম লেখটি পাওয়া গেছে ধোলাবিরা থেকে, ১৮ অক্ষর সম্বলিত। এই লেখটির হরফগুলি বেশ বড়ো। যার উদ্দেশ্য ছিল পাঠকের দৃষ্টি আকর্ষণ করা। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান যে, এটি ধোলাবিরা শহরের একটি বিলুপ্ত ফলক, আধুনিক সাইন বোর্ডের সঙ্গে যা তুলনীয়। সূক্ষ্ম পাথরের টুকরো কেটে বড় বড় লিপিচিহ্ন বানিয়ে এবং খুব সম্ভব কাঠের ফলকের ওপর লাগিয়ে এটি তৈরি করা হয়েছিল। যার ভিত্তিতে দিলীপকুমার চক্রবর্তী মনে করেন, শুধুমাত্র সীলমোহর, মৃৎপাত্র ও তামার ফলকের ওপর লিপির ব্যবহার সীমাবদ্ধ ছিল— একথা মেনে নেওয়া কঠিন।

হরপ্পীয় লিপির উৎপত্তি নিয়েও কিছুটা ধোঁয়াশা রয়েছে। দিলীপকুমার চক্রবর্তী মনে করেন, মৃৎপাত্রে উৎকীর্ণ চিহ্নের ধারা সিন্ধু সভ্যতার আদিপর্বেই যথেষ্ট ছিল এবং কোথাও কোথাও পরিণত সিন্ধু লিপির সঙ্গে তাদের যথেষ্ট মিল ছিল। যাই হোক, এই লিপির পাঠোদ্ধার নিয়ে পণ্ডিতমহলে বিতর্ক লক্ষ্য করা যায়। লেখার পদ্ধতি, ভাষা, চিহ্ন ইত্যাদি নানা বিষয়ে ভিন্ন ভিন্ন মত লক্ষ্য করা যায়।

অ্যাসকো পারপোলা ও ইরাবথম মহাদেবন-এর গুরুত্বপূর্ণ সাম্প্রতিক গবেষণার দ্বারা এইটুকু অত্যন্ত বোঝা গেছে যে হরপ্পীয় লিপি লেখা হত ডানদিক থেকে বামদিকে। অর্থাৎ তা চরিত্রে অন্যতম প্রধান ভারতীয় লিপি ব্রাহ্মী থেকে পৃথক। কারণ, ব্রাহ্মী লিপি লেখা হয় বাম দিক থেকে ডানদিকে। দিলীপকুমার চক্রবর্তীর মতে, এ প্রসঙ্গে 'বুস্ট্রফেডন' পদ্ধতির কথা বলেছেন। তাঁর অনুমান, অক্ষর ও ধারণা-ব্যঞ্জক—এই দুই রীতির মাঝামাঝি কোনো রীতি সম্ভবত ব্যবহার করা হতো। এ বিষয়ে আরো গবেষণা জরুরি। উৎসাহী বিদ্বানদের কয়েকটি প্রচেষ্টার কথা এখানে উল্লেখ করা যেতে পারে। দিলীপকুমার চক্রবর্তী এক্ষেত্রে আকর্ষণীয় দুটি দৃষ্টান্তের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথমটি, ১৯৬০ এর দশকের কলকাতার এক স্বামীজীর। তিনি দাবি করেছিলেন তান্ত্রিক চিহ্নের সঙ্গে সিন্ধু লিপির বিশেষ মিল পাওয়া যায়। দ্বিতীয়টি হল, ১৯৯৪ সালের ভাগলপুরের এক আঞ্চলিক পরিবহন অধিকর্তার কথা। তাঁর বক্তব্য ছিল, সাঁওতাল পরগনার রাজমহল পাহাড়ে স্থানীয় অধিবাসীরা তাঁদের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে যে সমস্ত মাঙ্গলিক বা ধার্মিক চিহ্ন ব্যবহার করে তার সঙ্গে সিন্ধু সভ্যতার লিপিচিহ্নের

যথেষ্ট মিল রয়েছে। যাই হোক এই পরিসরে সাক্ষরতার ধারণাটিও আলোচনা করে নেওয়া যায়। হরপ্পা সমাজের গুরুত্বপূর্ণ কয়েকটি গোষ্ঠী যদি সাক্ষর হয়ে থাকেন, তাহলে আরও অনুমান করা চলে সাক্ষরগোষ্ঠীর পক্ষে গণিত ও জ্যামিতি জ্ঞান থাকাও সম্ভব। কারণ, নানা প্রকার হিসাব রাখার জন্য সাক্ষরতা ও গণিতের প্রয়োগ একসাথে ঘটে থাকাও সম্ভব। তাছাড়াও সুবৃহৎ অট্টালিকা নির্মাণের ক্ষেত্রেও জ্যামিতিক ধারণা সক্রিয় থাকতেই পারে।

হরপ্পা সভ্যতার লিপি সাধারণত দৈনন্দিন ব্যবহার করতেন প্রশাসক, বণিক ও ধর্মীয় গোষ্ঠীর প্রধানরা। রণবীর চক্রবর্তী লিখেছেন যে, হরপ্পার সমাজ জীবনে সাক্ষরতার প্রসার কি পরিমানে ঘটেছিল, তার আভাস দেওয়া শক্ত হলেও একথা বলা যায় যে প্রায় ৬০০ বছর ধরে একই হরফ হরপ্পা সভ্যতার বিস্তৃত এলাকায় ধারাবাহিকভাবে প্রচলিত ছিল। অতএব, একটি নির্দিষ্ট লিপির দীর্ঘমেয়াদি অস্তিত্ব হরপ্পা সভ্যতায় সাংস্কৃতিক সংহতি প্রতিষ্ঠা করতে সহায়ক হয়েছিলেন। উপিন্দর সিং তাই যথার্থই লিখেছেন ''The evidence of a common script all over the vast Harappan culture zone shows a high level of cultural integration. The virtual disappearance of the script by c. 1700 BCE suggests both a close connection of writing with city life and the lack of sufficient downward percolation of writing."

১৫.৪ শিল্পসৃজন

হরপ্পা সভ্যতার সাংস্কৃতিক জীবনের আরেকটি বিস্ময়কর দিক হল তার শিল্পসামগ্রী। বিশেষত, পাথর ও ধাতুর (ব্রোঞ্জ) প্রয়োগ। রণবীর চক্রবর্তী লিখেছেন, শিল্প সৃজনের জন্য এই দুই মাধ্যমের প্রয়োগের ক্ষেত্রে হরপ্পা সভ্যতার কোন পূর্বসূরী নেই। তথাপি, প্রথম থেকেই এই দুই মাধ্যমের ওপর শিল্পীদের নিয়ন্ত্রণ ও দক্ষতা আমাদের অবাক করে। একইসঙ্গে হরপ্পীয় শিল্পীরা পোড়ামাটির ভাস্কর্য সৃষ্টিতেও ছিলেন সিদ্ধহস্ত। একথা অবশ্য ঠিকই যে, হরপ্পা সভ্যতার কোনো বিশালায়তন ভাস্কর্য ও মূর্তি নির্মাণের নজির নেই। কিন্তু কি মানবমূর্তির ক্ষেত্রে, কি জীবজন্তুর মূর্তির ক্ষেত্রে রূপারোপের যে দক্ষতা শিল্পীরা দেখিয়েছেন তা আমাদের চমৎকৃত করে। প্রথমে আসা যাক পাথরের শিল্পকলার আলোচনায়। পাথরের মূর্তিগুলি নরম চুনাপাথরে নির্মিত। এগুলি আকারে খুব বড় নয়, পূর্ণায়বও নয়। মহেঞ্জোদাড়ো থেকে পাওয়া লাল বেলে পাথরের পুরুষ মূর্তিটি তার সাক্ষর বহন করেছে। উচ্চতায় ৯.৩ সেন্টিমিটার এই নগ্ন পুরুষ মূর্তিটির বলিষ্ঠ বক্ষ, সুগোল স্কন্ধ, মসৃণ পৃষ্ঠদেশ, গভীর নাভী দুটি আকর্ষণ না করে পারে না, মূর্তিটির মস্তক ও দুই হাত পৃথকভাবে মোড়া হয়েছিল; কারণ মস্তকবিহীন, হস্তবিহীন, এই মূর্তিটির ঘাড়ে ও কাঁধের দু'পাশে গোলাকৃতি গর্ত রয়েছে। মস্তক ও হস্ত সঞ্চালনের উপায় থাকায় মূর্তিটিতে গতিময়তা আরোপ করতে শিল্পী সক্ষম হয়েছেন। মহেঞ্জোদারোতেই পাওয়া গেছে আরেকটি ছোট মূর্তি। যার উচ্চতা ১৭ সেমি., শরীরের নিম্নাংশ ভাঙা। মূর্তিটির চোখ আধবোঁজা, পরনে ত্রিপত্রাকার অলংকরণের পোশাক। মুখের অভিব্যক্তির নিপুণ প্রকাশ বিস্ময় জাগায়। মূর্তিটির মাথায় চুল ও মুখে দাড়ি সুবিন্যস্ত। সবচেয়ে লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্য হল এর দাড়ির ধরণ। অনেকেই মনে করেন মূর্তিটি মেসোপটেমীয় ফ্যাসনের কথা মনে করিয়ে দেয়। সাধারণভাবে এটিকে পুরোহিত-রাজা' নামে ভূষিত করার প্রবণতা লক্ষ্য করা গেলেও, ইরফান হাবিব মনে করেন, একমাত্র আধবোঁজা চোখদুটি ছাড়া একে যোগী' নাম দেওয়ার আর কোনো যৌক্তিকতা থাকতেই পারে না। এই মূর্তিটির তেমন নামকরণের আর কোনো অতিরিক্ত

বাস্তব উপাদান নেই। হরপ্পা থেকে পাওয়া দুটি ভাস্কর্য নিদর্শন বিখ্যাত। একটি কালো-ধূসর পাথরের ছোট একটি পুরুষ দেহ-গলার দিকে একটি ছিদ্র-মাথাটি আলাদা লাগানো ছিল। তা ছাড়া হাতের জায়গাও তাই। স্পষ্টতই হাত দুটিও আলাদা লাগানো হয়েছিল। বাঁ পা-টি ভাঙা কিন্তু ওঠানো অবস্থায় এবং ডান দিকে বাঁকানো। ডান পা-টি মাটিতে। সব মিলিয়ে মূর্তিটির নৃত্য ভঙ্গিমা ও ভাব দেখলে নটরাজের নৃত্য ভঙ্গিমার কথাই মনে আসে। হরপ্পা থেকেই ছোট একটি লাল পাথরের পুরুষ দেহ পাওয়া গেছে। এখানেও গলা, হাত ও পা ভাঙা। কিন্তু এর বলিষ্ঠ অথচ সুকুমার গড়ন পরবর্তীকালের ভারতীয় ভাস্কর্যের কথাই মনে করিয়ে দেয়।

মানব মূর্তিতে রেখার গতিময়তার অসামান্য নমুনা রয়েছে মহেঞ্জোদাড়োর প্রসিদ্ধ নর্তকীর মূর্তিতে, নগ্ন এই নারীমূর্তির সহাস্যবদন ও বিস্ফারিত চক্ষুতে মোহময় আবেদন লক্ষ্য করা যায়। ব্রোঞ্জ নির্মিত এই নর্তকীর মূর্তিতে হাত ও পা শিল্পায়তভাবে দীর্ঘায়িত, যা ভাস্কর্যটিকে একটি বিশেষ গতি দিয়েছে। নর্তকীটির বাম হাঁটুর ভাজ ও কোমরে ডান হাত রাখার নান্দনিক আবেদন অনস্বীকার্য। হরপ্পা সভ্যতার অন্তিম পর্বে 'দেমাবাদে' নির্মিত হয়েছিল ব্রোঞ্জের কয়েকটি পশুমূর্তি- মহিষ, হাতি এবং গণ্ডার। হরপ্পীয় শিল্পীরা পশুগুলির পেশীনির্ভর দৈহিকশক্তি যেভাবে ফুটিয়ে তুলেছিলেন, তা তারিফ যোগ্য।

হরপ্পা সভ্যতার প্রস্তর ও ধাতব ভাস্কর্যের তুলনায় অনেক বেশী পাওয়া গেছে পোড়ামাটির ভাস্কর্য। যার অন্তর্গত মাতৃকামূর্তি, পাখি এবং বিবিধ প্রাণীর মূর্তি। পোড়ামাটির মূর্তিগুলির বেশিরভাগ নগ্নপ্রায় নারীমূর্তি। হরপ্পা সভ্যতার মাতৃকামূর্তিতে অলংকারের আধিক্য দেখা যায়। আবার কিছু কিছু নারীমূর্তিতে সামাজিক জীবনের প্রতিচ্ছবি লক্ষ্য করা যায়। যেমন, স্তন্যদায়িনী মা বা হামাগুড়ি দেওয়া শিশু ইত্যাদি। জীব-জন্তুর মধ্যে পোড়ামাটির তৈরি বৃষ ও হাতির রূপকল্পনায় ঠাসবুনট গড়ন ও পেশিশক্তির প্রকাশ সার্থকভাবে ঘটেছে। এর পাশাপাশি গতির ছন্দ লক্ষ্য করা যায়, হাতিটির লম্বা শুঁড়ের রূপায়ণে। ভাস্কর্য সৃষ্টিতে কৌতুক রস ফুটিয়ে তুলতে হরপ্পীয় শিল্পীরা যে দক্ষ ছিলেন, তার পরিচয় পাওয়া যায় পোড়ামাটির বানরের ভাস্কর্যে, যা সম্ভবত ছিল ক্রীড়ার সামগ্রী। হরপ্পীয় শিল্পীদের সৃজনপ্রতিভার আরও সাক্ষ্য নিয়ে উপস্থিতি বহু সীলমোহর। যেখানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অত্যন্ত সীমাবদ্ধ ও সংকীর্ণ পরিসরে বিবিধ জীবজন্তুর প্রতিকৃতি দৃশ্যমান। এ ক্ষেত্রে বিশেষ উল্লেখ্য বৃষের প্রতিকৃতিগুলি। বৃষের প্রবল শক্তি ও দৃঢ়তা দেখা যাবে তার চারটি পা ও কাঁধের রূপায়ণে। আবার কোমল ও পেলব রূপায়ণ ফুটে উঠেছে প্রাণিটির কুঁজ, গলকম্বল ও পুচ্ছের আকৃতিতে। একথা বলা ভুল হবে না যে, শিল্পীরা সম্ভবত তাদের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা থেকেই এসব প্রাণির ছবি উৎকীর্ণ করেছেন। একটি সীলে এমন এক বীরপুরুষের ছবি চিত্রিত হয়েছে যিনি দুটি বাঘের সঙ্গে যুদ্ধরত। প্রায় একইরকম ছবি আমরা মেসোপটেমীয় সীলমোহরেও দেখতে পাই। সেখানে গিল গ্যামাসের সঙ্গে দুটি সিংহের যুদ্ধ দেখানো হয়েছে। এর থেকে মনে হয় হরপ্পীয় শিল্পীদের মধ্যেও মেসোপটেমীয় শিল্পের প্রভাব পড়েছিল। সীলমোহরের সংকীর্ণ পরিসরে রিলিফ ভাস্কর্যের মধ্যেও শিল্পী হস্তীমূর্তিতে সার্থকভাবে এনেছেন বর্তুলাকার আভাস এবং লম্বমান শুঁড় ও চন্দ্রাকৃতি গজদন্তদ্বয়ের রূপায়ণে গতিময় রেখার পরিচয়।

ইরফান হাবিবের মতে হরপ্পীয় শিল্পকলার যে নিদর্শন পাওয়া যায়, তার ভিত্তিতে বোঝা যায় যে, হরপ্পীয় শিল্পীরা হয়ত একান্তভাবে ক্ষুদ্রাকার কোন বস্তুতে কাজ করত। কোন বিশাল ভাস্কর্য নেই, নেই প্রকাণ্ড কোন কালজয়ী- কোন বিস্ময়কর শিল্প। মূলতঃ এই বিশিষ্টতাই মেসোপটেমিয়া ও মিশরীয় শিল্প থেকে হরপ্পীয় শিল্পকে পৃথক করে রাখে, এর অর্থ এমনও হতে পারে যে, শিল্পীরা রাষ্ট্র কিংবা বিশাল ধর্মীয় প্রতিষ্ঠানের জন্য কাজ করত না। মূলতঃ কোন ব্যক্তিমানুষের ফরমাসেই তাদের শিল্প সৃষ্টি।

১৫.৫ উপসংহার

পরিশেষে হরপ্পা সভ্যতার সাংস্কৃতিক জীবনের আলোচনার মূল্যায়নে বলতে পারি যে, এই সভ্যতার সংস্কৃতি, সভ্যতার পতনের সাথে সাথেই তার গুরুত্ব হারিয়ে যায়নি। বরঞ্চ ভারতীয় সভ্যতার ও সংস্কৃতির বিকাশে হরপ্পীয় সংস্কৃতির প্রভাব অনস্বীকার্য। কিন্তু এই গুরুত্বের তাৎপর্য বিশেষত ধর্মীয় বিশ্বাসের জগৎকে শুধুমাত্র পরবর্তী হিন্দুধর্মের আলোকে বিচার করা অযৌক্তিক হবে। আবার সাংস্কৃতিক কোনো উত্তরাধিকার না রেখেই হরপ্পা সভ্যতা বিলুপ্ত হয়েছিল, এই সিদ্ধান্তও আধুনিক গবেষণার আলোকে যুক্তিসংগত নয়। বরং বলা ভালো, যে মিশ্র সাংস্কৃতিক ধারা সমন্বিত হয়ে ভারতীয় সংস্কৃতি গড়ে উঠেছিল তার মধ্যে হরপ্পীয় সংস্কৃতি নিজস্ব স্থান করে নিয়েছিল। এই সংস্কৃতির চরিত্র নিয়ে বিতর্ক আছে। হরপ্পীয় লেখ-র পাঠোদ্ধার হলে আশা করা যায় এবিষয়ে আরো স্বচ্ছ ধারণা লাভ করা সম্ভব হবে।

১৫.৬ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. হরপ্পা সভ্যতার ধর্মজীবন সম্পর্কে কী জান?

২. হরপ্পীয় ধর্মজীবন কি মাতৃতান্ত্রিক ছিল?

৩. হরপ্পা সভ্যতার ধর্মের চরিত্রকে তুমি কীভাবে ব্যখ্যা করবে?

৪. টীকা লেখঃ হরপ্পা সভ্যতার লিপি।

৫. শিল্পকলাচর্চায় হরপ্পীয়রা কতটা সৃজনশীলতার পরিচয় তুলে ধরেছিলেন?

৬. হরপ্পা সভ্যতার সাংস্কৃতিক জীবনের মুখ্য বৈশিষ্ট্যগুলি চিহ্নিত করো।

১৫.৭ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

রণবীর চক্রবর্তী, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব(প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।

রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, আনন্দ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৬।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৯।

ইরফান হাবিব, সিন্ধু সভ্যতা, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০৪।

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, প্রথম খণ্ড, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ), প্রথম খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি- প্রাচীন ভাতীয় প্রেক্ষাপট, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৫।

ড. রতন কুমার বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (আদিপর্ব), প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, কলকাতা, ২০১৯।

শিরিন রত্নাগর, হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০৩।

D D Kosambi– An Introduction to the Study of Indian History– Popular Prakashan– Bombay– 1956.

Romila Thapar– Early India- From The Origins to Circa A.D. 1300– London– 2002.

Upinder Singh– A History of Ancient and Early Medieval India– Pearson– 2009.

R.S. Sharma– India's Ancient Past– OUP– New Delhi– 2005.

Raymond Allchin and Bridget Allchin– The Rise of Civilization in India and Pakistan– CUP– 1982.

একক : ১৬ ◘ নাগরিক পর্বের পতন (The problem of urban decline)

গঠন

১৬.০ উদ্দেশ্য

১৬.১ সূচনা

১৬.২ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তত্ত্ব

১৬.৩ ভূমিকম্পনজনিত বিধ্বংসী বন্যা

১৬.৪ ঊষরতার বৃদ্ধি

১৬.৫ মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়

১৬.৬ অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা

১৬.৭ রাজনৈতিক ব্যখ্যা

১৬.৮ গতানুগতিকতা

১৬.৯ বহিরাগত আক্রমণ

১৬.১০ উপসংহার

১৬.১১ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১৬.১২ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১৬.০ উদ্দেশ্য

- এই এককের উদ্দেশ্য হল হরপ্পা সভ্যতার নাগরিক পর্বের পতনের প্রক্রিয়া ও কারণসমূহকে অনুধাবন করা।
- চার ধরনের কারণের কথা আলোচিত হবে-
  - ➢ প্রাকৃতিক বিপর্যয়
  - ➢ মনুষ্যসৃষ্ট কারণ
  - ➢ অর্থনৈতিক-রাজনৈতিক কারণ
  - ➢ বিদেশি আক্রমণ

১৬.১ সূচনা

হরপ্পা সভ্যতার অবসানের প্রহর তার আবির্ভাবের মতোই প্রহেলিকাময়। এর পূর্ববর্তী প্রাচীন সংস্কৃতির মধ্যে যেমন এর অনেক অতি প্রয়োজনীয় বৈশিষ্ট্যের কোন পূর্বাভাস বা নজির দেখতে পাওয়া যায় না, তেমনই শেষ প্রহরে এর অনেক বৈশিষ্ট্য একই রকম আকস্মিকতায় যেন অদৃশ্য হয়ে গিয়েছিল। প্রায় দীর্ঘ ৬০০ বছর উজ্জ্বল অস্তিত্বের পর অনুমানিক ১৭৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে কিছুটা অকস্মাতই এই সভ্যতার বিলুপ্তি ঘটেছিল। একটি অনাগরিক পরিবেশ এবং নিরক্ষতায় সমাপতিত হয়ে এই সভ্যতার অবক্ষয়ের পালা এগিয়ে চলে। বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক ও ঐতিহাসিকগণ ভিন্ন ভিন্ন কারণ দিয়ে হরপ্পা সভ্যতার পতনের প্রক্রিয়াকে ব্যাখ্যা করতে চেয়েছেন। তবে সিন্ধু লিপির পাঠোদ্ধার না হওয়ায় এবং পণ্ডিত মহলের মতবিরোধ থাকায় হরপ্পা সভ্যতার পতন নিয়ে এখনও পর্যন্ত কোন নিশ্চিত সিদ্ধান্তে পৌঁছানো সম্ভব হয়নি।

১৬.২ প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তত্ত্ব

হরপ্পা সভ্যতার পতনের পতনের ব্যাখ্যায় সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হল- 'প্রাকৃতিক বিপর্যয়ের তত্ত্ব'। প্রাকৃতিক দুর্যোগের ঘটনাগুলির মধ্যে প্রবল ভূমিকম্প, নিয়ত বন্যা, জমিতে লবণের ভাগ বৃদ্ধি, রাজপুতানার মরুভূমির সম্প্রসারণ এবং সিন্ধুনদের গতিপথ পরিবর্তন প্রভৃতি ঘটনাগুলি উঠে এসেছে। মহেঞ্জোদারোয় জলবিজ্ঞান বিষয়ক গবেষণার পর অনেকে বলেছেন যে- সুদূর অতীতে এই নগরের কাছে ভয়াবহ ভূমিকম্পের উৎসস্থল ছিল, এর ফলেই এই নগরী ধ্বংস হয়েছিল। প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে প্রাপ্ত নরকঙ্কালগুলি ক্ষতবিক্ষত এবং এগুলির সৎকার হয়নি, ভূমিকম্পের ধারণা এর থেকেই সৃষ্টি। কিন্তু ভূমিকম্পের ফলে হরপ্পা শহর ও সিন্ধু অঞ্চলের অন্যান্য নগরগুলিও যে ধ্বংস হয়েছিল, এমন কোন প্রমাণ নেই।

১৬.৩ ভূমিকম্পনজনিত বিধ্বংসী বন্যা

এম. আর. সাহানি, আরনস্ট ম্যাকে, রাইকস প্রমুখ পণ্ডিতদের মতে ভূমিকম্পনজনিত বিধ্বংসী বন্যা হরপ্পা সভ্যতার পতনের পেছনে বড় ভূমিকা পালন করেছিল। মহেঞ্জোদারোতে খননকার্যের ফলে অনুমান করা সম্ভব হয়েছে যে, কমপক্ষে তিনবার এখানে ব্যাপক বন্যা দেখা দেয়, যার হাত থেকে শেষপর্যন্ত এই নগরীকে রক্ষা করা যায় নি। এই মতের প্রবক্তাদের যুক্তি মহেঞ্জোদারোতে যে বন্যা বিধ্বংসী রূপে দেখা দিত তার প্রত্যক্ষ কিছু প্রমাণও পাওয়া যায়। খননকার্যের ফলে দেখা গেছে যে বন্যার হাত থেকে রেহাই পাওয়ার জন্য বাড়ি গুলি কাঁচা ইটের বদলে পাকা ইট দিয়ে তৈরি হয়েছিল। এছাড়া বন্যার জল যাতে নগর দুর্গকে ধ্বংস না করতে পারে সেজন্য প্রায় ৪৫ ফুট চওড়া একটি বাঁধও দেওয়া হয়েছিল। মহেঞ্জোদারো ছাড়াও সাহানির মতে, লোথালের কাছে 'কোলহ' নামে একটি স্থানে জমাট পলিমাটির অবস্থিতির এই স্থানটিতেও বন্যার আক্রমণকে প্রমাণ করে। চানহুদারো ধ্বংসের পেছনে বন্যার প্রধান ভূমিকার কথা জোর দিয়ে বলেছেন ম্যাকে। অন্যদিকে লোথাল, দেশলপার ও রঙপুর বন্যার ফলে ধ্বংস হয়েছিল বলে অনুমান করেন এস. আর. রাও।

কিন্তু এমনই এক বন্যা দেখা দিয়েছিল যাতে একের পর এক পাঞ্জাব, সিন্ধু ও গুজরাট একেবারে প্লাবিত হয়ে গেল,- এমন প্রস্তাবনা নির্দ্বিধায় বিশ্বাস করা কষ্টকর। এইচ. টি. ল্যামব্রিক বন্যাতত্ত্বের সমর্থনে উল্লেখিত সমস্ত যুক্তিগুলো সযত্নে খণ্ডন করেছেন।

১৬.৪ ঊষরতার বৃদ্ধি

গুরদীপ সিং হরপ্পা সভ্যতার পতনে ভিন্ন একটি চিত্র তুলে ধরেছেন। তিনি ঐ সভ্যতার বিভিন্ন অঞ্চলে ক্রমশ বৃষ্টিপাত হ্রাসের সূত্র ধরে আবহাওয়া শুষ্কতর হয়ে ওঠার ওপর জোর দেন। অর্থাৎ তিনি 'ক্রমবর্ধমান ঊষরতার' কথা বলেছেন। উত্তর রাজস্থানে কয়েকটি লবনাক্ত হ্রদ থেকে সংগৃহীত পরাগ রেণুর নমুনা সংক্রান্ত গবেষণার ভিত্তিতে তিনি দাবি করেছেন যে, প্রায় ২২৩০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে বৃষ্টিপাতের পরিমাণ ক্রমশ কমে আসার ফলে আবহাওয়ার 'আর্দ' পর্বের স্থলে 'শুষ্ক' দশা শুরু হয়েছিল। এই কারণেই সিন্ধুর লোকালয় এমন বিপুল পরিমাণ প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘনিয়ে এসেছিল যে, তার আঘাত এই সভ্যতা আর সামলে উঠতে পারেনি। তিনি মনে করেন এরই সূত্র ধরে সরস্বতী নদী শুকিয়ে যায়—এর অববাহিকা তথা হরপ্পীয়দের এলাকায় প্রবল প্রাকৃতিক বিপর্যয় ঘটে। ঐ একই গবেষণার অপর একটি ভাষ্যে ভি. এল. মিশ্র বলেছেন যে, কম বৃষ্টিপাতের জন্য এই ঘটনা ঘটেনি। আসলে যমুনা ও শতদ্রুর খাতে ঘগ্গরের জলধারা দ্রুত অপসৃত হওয়ায় ক্রমশ ঘগ্গর-হাক্রা নদীখাতটি শুষ্ক হয়ে যায়। আর এটিই হরপ্পা সভ্যতার পতনের কারণ। রাজস্থানের হ্রদসংক্রান্ত পরবর্তী গবেষণায় দুটি ভাষ্যই খণ্ডন করা হয়েছে। এই গবেষণায় বরং দেখা যায় যে, কোনো সুস্পষ্ট আর্দ এবং রুক্ষ পর্বকাল শনাক্ত করা যাচ্ছে না। বর্তমানকালের এই ঊষর পর্ব বস্তুত ৪২০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকেই শুরু হয়েছিল। এমনকি বৃষ্টিপাতের পরিমাণ যদি খুব কমে গিয়েও থাকে, কিংবা ঘগ্গর-হাক্রা নদী তেমন প্রবল প্রতাপে যদি নাও প্রবাহিত হয় তবুও সেই ঘটনা দুটি হরপ্পা সভ্যতার এত পরবর্তী সময়ে ঘটেছিল যে, এই সভ্যতার ধ্বংস প্রক্রিয়ায় তাদের কোন ভূমিকা ছিল না।

১৬.৫ মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়

ডব্লিউ. এ. ফেয়ারসার্ভিস হরপ্পা সভ্যতার পতনের প্রাকৃতিক দুর্যোগের যুক্তির পরিবর্তে 'মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ের' কথা বলেছেন। তাঁর মতে, সিন্ধুবাসীদের বেপরোয়া ভূমিকর্ষণ, ক্রমবর্ধমান চারণ ক্ষেত্রের ব্যবহার, অরণ্যাদি বিনষ্ট করার পরিণতিতে সেই স্থানের মৃত্তিকা সেইসময়ের জনগোষ্ঠীকে বিশেষত, নগর অঞ্চলের মানুষদের আর জীবনযাপনের উপকরণ সরবরাহ করতে পারেনি, যার ফলে হরপ্পা সভ্যতার পতন ঘনিয়ে আসে। কিন্তু ইরফান হাবিব বলেছেন যে, সিন্ধু লোকালয় প্রতিবর্গ কিলোমিটারে ৬ জনের বেশী ঘন ছিল না, তাই এত স্বল্প ঘনত্বের কোন লোকালয় তার অপর্যাপ্ত জমিকে এত শীঘ্র অনুর্বর করে তুলতে পারে, এমন কথা কল্পনা করা কঠিন। তাছাড়া, সেইসময়ের মানুষ 'ঝুম' পদ্ধতিতে কৃষিকাজ করত, সুতরাং সেইক্ষেত্রে তারা একস্থান থেকে অন্যস্থানে সরে যেতে পারত। তাই হরপ্পা সভ্যতার পতনের মনুষ্যসৃষ্ট বিপর্যয়ের তত্ত্ব মেনে নেওয়া কঠিন।

১৬.৬ অর্থনৈতিক ব্যাখ্যা

হরপ্পা সভ্যতার পতনের পশ্চাতে অর্থনৈতিক ব্যাখ্যাও উঠে এসেছে। বহু প্রত্নতাত্ত্বিক হরপ্পা সভ্যতার পতনে সেখানকার ভেঙে পড়া কৃষি ব্যবস্থাকে দায়ী করেছেন। তাঁদের মতে, প্রথম থেকেই গাঙ্গেয় উপত্যকায় কৃষি অর্থনীতি প্রসারিত না হওয়ায় অর্থনৈতিক জীবনে জড়ত্ব প্রকট রূপ নিয়েছিল। এই পশ্চাৎপদতার পেছনে সম্ভবত প্রধান কারণ ছিল লৌহ ও লৌহজাত উপকরণের সঙ্গে হরপ্পীয়দের সংযোগের অভাব। ফলে লৌহ নির্মিত লাঙলের ব্যবহার বা লৌহজাত কুঠার ও অন্যান্য অস্ত্রাদির মাধ্যমে বনজঙ্গল পরিষ্কার করে বৃহত্তর এলাকায় ব্যাপক পরিমাণে কৃষি উৎপাদন ঘটানো সম্ভব হয় নি। এছাড়া নদীর জলকে বেঁধে তা জমিতে সেচের কাজে ব্যবহারের যে রেওয়াজ বহুকাল ধরে চলে আসছিল। শেষের দিকে তা ভেঙে পড়ার সম্ভাবনা উজ্জ্বল। যার ফলে কৃষিজাত উৎপাদন ব্যবস্থা ব্যাহত হয়।

অর্থনৈতিক অবনমনের আরেকটি সূচক রূপে বাণিজ্যের কথাও অনেকে তুলে ধরেছেন। তাঁদের মতে হরপ্পা সভ্যতার নগরগুলি বাণিজ্যের ক্ষেত্রে পূর্ব গৌরবকে ধরে রাখতে পারে নি। পশ্চিম এশিয়ার সঙ্গে যে ঘনিষ্ঠ বাণিজ্যিক লেনদেন দীর্ঘকাল চলে আসছিল তা ক্রমেই ক্ষীয়মান হয়ে আসে। উভয় সভ্যতার প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকে এই ধরণের অনুমান সম্ভব হয়েছে। বাণিজ্যিক লেনদেন হ্রাস পাওয়ার ফলে অর্থনৈতিক জীবনে জড়ত্বের ছায়া প্রকট হয়। ইরফান হাবিব এই যুক্তির বিপক্ষে দুটি বক্তব্য পেশ করেছেন। প্রথমত, সিন্ধু-মেসোপটেমিয়ার বাণিজ্যিক আদান-প্রদান এত ব্যাপক মাত্রায় ছিল কিনা যাতে সমগ্র সিন্ধু অববাহিকার নাগরিক শিল্পে তা বিরাট কোনো উৎপাদন প্রবাহ সঞ্চারিত করেছিল, সে বিষয়টি মোটেই পরিষ্কার নয়। দ্বিতীয়ত, হাবিবের মতে, এমন যুক্তিও তুলে ধরা যায় যে সিন্ধু নাগরিক অর্থনীতি ভেঙে পড়ার কারণেই মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে হরপ্পীয় বাণিজ্য বন্ধ হয়ে যায়, এর বিপরীত প্রতিক্রিয়ায় নয়।

১৬.৭ রাজনৈতিক ব্যাখ্যা

হরপ্পা সভ্যতার অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের সাক্ষ্য হিসাবে রাজনৈতিক কারণকেও অস্বীকার করা যায় না। এ প্রসঙ্গে হাবিব লিখেছেন যে, সিন্ধু অববাহিকায় প্রতিষ্ঠিত একটি মুল কেন্দ্রীয়রাষ্ট্র যদি প্রাথমিক ভাবে আশেপাশের অঞ্চলগুলিকে আপনশক্তিতে জয় করে না নিত, তাহলে সিন্ধু সভ্যতা এত প্রসারতা অর্জন করতে পারতো না। তাছাড়া একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায় যে, সিন্ধু রাষ্ট্র বা রাষ্ট্রগুলির গ্রামীণ জনগোষ্ঠীর ওপর খাজনা ধার্য না করা হলে, সিন্ধুনগর গুলিতে আদৌ কোন অস্তিত্ব থাকত না। তাই শাসকশ্রেণীর অভ্যন্তরীণ কলহে কিংবা সামরিক শক্তির ভরকেন্দ্রের আপাত স্থানান্তঃকরণের ফলে, যদি সেই ক্ষমতা গোপনে ক্ষয়ে যায়, তাহলে যে খাজনার আধারের ভিত্তিতে শাসক, বণিক, কারিগর ও অন্যান্য নাগরিকদের এত প্রতাপ, এত সমৃদ্ধ তা আর নগর লাভ করতে পারে না। হাবিবের মতে, মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা এবং লোথালে সময়ের সঙ্গে সঙ্গে প্রশাসনিকক্ষয়ের অবশ্যম্ভাবী পরিণতিতে শেষমুহূর্তের দিকে এগিয়ে চলার যে লক্ষণগুলি চোখে পড়ে, সেটি একেবারে নির্ভুল ভাবে এমনই কোন উদ্ভূত পরিস্থিতির সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ হতে পারে। এমন এক দুর্বল হয়ে পড়া, সম্ভবত বিভিন্ন অংশে বিভাজিত সিন্ধু সাম্রাজ্যের ধ্বংসের ক্ষেত্রে বাইরের কোনও শক্তির প্রসঙ্গও উপেক্ষা করা কঠিন।

১৬.৮ গতানুগতিকতা

হরপ্পা সভ্যতার অভ্যন্তরীণ অবক্ষয়ের আরেকটি দৃষ্টান্ত রূপে হরপ্পীয়দের সেকেলে মানসিকতাকেও দায়ী করা হয়। বলা হয় গতানুগতিক জীবনধারায় তারা অভ্যস্ত হয়ে উঠেছিল। পুরনো প্রথা বা সংস্কৃতির দুর্বলতাকে অপসারিত করে তাকে অধিকতর উন্নত করার মানসিকতা তাদের ছিল না। আসলে হরপ্পীয়রা প্রচলিত বিষয়গুলিকেই আঁকড়ে ধরেছিল, কোনও উদ্ভাবনী শক্তির পরিচয় তারা দেয় নি। সমকালীন মিশরীয় ও মেসোপটেমীয় সভ্যতার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকলেও কৃষি, বাণিজ্য, অস্ত্র নির্মাণ প্রভৃতি ক্ষেত্রে হরপ্পীয়রা ঐ সভ্যতা গুলির কাছ থেকে কিছু গ্রহণ করে নি।

১৬.৯ বহিরাগত আক্রমণ

এই সমস্ত নানা কারণে অভ্যন্তরীণ দিক থেকে ক্ষয়ে পড়া হরপ্পা সভ্যতা নাগরিকপতনে বহিরাগত আক্রমণকেও উপেক্ষা করা চলে না। এ প্রসঙ্গে ইরফান হাবিব লিখেছেন যে, সিন্ধু সভ্যতা ধ্বংস হওয়ার ঠিক পরবর্তী সময়ের দুটি ঘটনা বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ প্রথমত, যে হেলমান্দ সভ্যতা শাহর-ই-সোকতা এবং মাণ্ডিগাকের মতো দুটি প্রধান নগরীতে বেশ শক্তিশালী রাষ্ট্রের নানান চিহ্ন রেখে গিয়েছে, খ্রীষ্টপূর্ব ২২০০ সালের অল্প কিছুদিন পরেই সেই সভ্যতা হঠাৎ শেষ হয়ে গেল, তার নগরী দুটিও প্রধানত পরিত্যক্ত হল। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে, সিন্ধু সভ্যতার আরেক ঘনিষ্ঠ প্রতিবেশী, অবশিষ্ট কোট-দিজি সংস্কৃতি, রেহমান ধেরিতে বিস্তৃত আধা-নাগরিক জনবসতি সমেত খ্রীষ্টপূর্ব প্রায় ২০০০ সময়কালে শেষ হয়ে যায় আর অন্যান্য সব জনবসতির মধ্যে গুমলার অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী লোকালয় ও রানা ঘুণ্ডাই-তে অবস্থিত অন্য আরেকটি বসতি প্রচন্ড হিংস্রতায় যেন ধ্বংস করা হয়। এইসমস্ত তথ্য থেকে হাবিব মনে করেন যে, সম্ভবত পশ্চিম থেকে কোন আক্রমণ সভ্যতার ওপর আছড়ে পড়েছিল। মহেঞ্জোদারোর শেষ পর্বে প্রত্নতাত্ত্বিক উৎখননের ফলে এই বহিরাগত হিংস্র আক্রমণের চিহ্ন আবিষ্কৃত হয়েছে। মহেঞ্জোদারোতে ৩৮ টির বেশী নরকঙ্কাল অত্যন্ত অস্বাভাবিক স্থানে পড়ে থাকতে দেখা গেছে। কোন একটি একেবারে নিঃসঙ্গ অবস্থায় পড়ে আছে, আবার কতগুলি একসঙ্গে বাসভবনে, রাস্তায় শায়িত। যেন মনে হয়, একদল আক্রমণকারী কিংবা বণিকদের হিংস্রতার শিকার হয়েছিল তারা। এই সিদ্ধান্ত বহুল সমালোচিত হলেও এছাড়া আর কোন যুক্তিগ্রাহ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায়নি। এই সকল তথ্য এবং হরপ্পায় 'H' নম্বর কবরস্থানের প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে, মার্টিমোর হুইলার এই সিদ্ধান্তে উপনীত হয়েছেন যে, পশ্চিম থেকে আসা আক্রমণকারীদের আঘাতেই হরপ্পা সভ্যতার চূড়ান্ত পতন ঘটেছিল এবং এই আক্রমণকারীরা ছিল বৈদিক আর্য। এই মতের পক্ষাবলম্বনকারীদের ধারণা আরো জোরালো হয়েছে মহেঞ্জোদারোর ঐ একই স্তরে একটি সুন্দর ও মজবুত তামার কুঠার প্রাপ্তি থেকে। বৈদিক আর্যদের পক্ষে বলা হয় যে, হরপ্পা সভ্যতা পতনের আনুমানিক সময়কাল ও ঋগ্বেদ রচনার আনুমানিক সময়কালের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে। এছাড়া ঋগ্বেদে 'হরি-গুপিয়' নামে যে যুদ্ধক্ষেত্রের কথা আছে তাকে এই মতের প্রবক্তরা হরপ্পার সঙ্গে অভিন্ন বলে মনে করেন। আর্যদেবতা ইন্দ্র কর্তৃক শত্রুদের "পুর" বা নগর ধ্বংসের বিষয়টিকে এই যুক্তির সমর্থনে পেশ করা হয়। এর সঙ্গে গর্ডন চাইল্ড হরপ্পা 'H' সমাধিক্ষেত্রের প্রসঙ্গ তুলে ধরে এই সমাধিক্ষেত্রকে আক্রমণকারী আর্যদের বলে উল্লেখ করেছেন। চানহুদারোর দ্বিতীয় ও তৃতীয় স্তর থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে আগন্তুক বা বাইরে থেকে আসা কোনো সংস্কৃতির পরিচয় পাওয়া যায় বলে মার্টিমোর হুইলার মনে করেন। স্টুয়ার্ট পিগটও

এই মতে বিশ্বাসী। এঁরা উভয়েই মনে করেন যে, বহিরাগত এক জাতির আক্রণে নিশ্চয়ই এই সভ্যতার পতন হয়। এই বহিরাগতদের তাঁরা আর্য বলেই শনাক্ত করেছেন। এছাড়াও হরপ্পা সভ্যতার শেষ পর্যায়ে তাঁরা এমন কিছু নিদর্শন খুঁজে পেয়েছেন যেগুলি থেকে অনুমান করা যায় যে, নগরবাসীরা যেন কোনো বহিরাগতদের হাত থেকে আত্মরক্ষার জন্য ব্যস্ত।

উপরোক্ত তত্ত্বকে একেবারে অভ্রান্ত বলে মেনে নেওয়া কঠিন। এক্ষেত্রে দুটি সীমাবদ্ধতা স্পষ্ট লক্ষ্য করা যায়—প্রথমত, হরপ্পা সভ্যতার শেষ পর্বে কয়েকটি মাথার খুলিতে অস্ত্রাঘাতের চিহ্ন এবং বিচ্ছিন্ন ও বিক্ষিপ্তভাবে ছড়িয়ে থাকা কঙ্কাল থেকে জোর করে কখনও বলা যাবে না যে, কেবল আক্রমণকারীদের দ্বারাই সমগ্র সভ্যতা নিশ্চিহ্ন হয়ে গিয়েছিল। বাইরে থেকে কোনো জাতি এসে সমস্ত নগর ও নগরবাসীদের হত্যা করে বিশাল সভ্যতার বিনাশ ঘটালো—এমন ধারণা খুব একটা বাস্তবসম্মত নয়। পর্যাপ্ত ও পরিপূরক তথ্য ছাড়া এই তত্ত্ব মেনে নেওয়া কঠিন। উপরন্তু আক্রমণকারীরা যে আর্য ছিল তার কোনও নিশ্চিত প্রমাণ নেই। সবচেয়ে বড় কথা হল আর্যদের আগমনের বিষয়ে কোনো প্রত্যক্ষ প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শনের অনুপস্থিতি। এ প্রসঙ্গে এ. এল. ব্যাশাম একটি বিষয়ের প্রতি আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন। তাঁর মতে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় সহস্রাব্দে বৃহত্তর আকারে একশ্রেণির রথারোহী যাযাবরদের আন্দোলনের দাপটে এই বিশাল সভ্যতা হয়তো ক্ষয়প্রাপ্ত হয়েছিল। তিনি আরো বলেছেন যে, এই ধরণের যাযাবর আন্দোলন তৎকালীন সভ্য জগতের চেহারাটাকে বদলে দিয়েছিল। অবশ্য ব্যাশামের এই বক্তব্য যে সর্বাংশে সত্য তা নিঃসন্দেহে বলা কঠিন। দ্বিতীয়ত, গর্ডন চাইল্ড, স্টুয়ার্ট পিগট প্রমুখ পণ্ডিতগণ শুধুমাত্র কয়েকটি প্রত্নকেন্দ্রের নিদর্শন থেকে এবং ঋগ্বেদের দু-একটি পরোক্ষ প্রমাণের ভিত্তিতে আর্যদের আক্রমণকে সমগ্র হরপ্পা সভ্যতার পতনের জন্য দায়ী করেছেন। বলাবাহুল্য, হরপ্পা, মহেঞ্জোদারো, চানহুদারো ছাড়াও এই বৃহত্তর সভ্যতার অন্যান্য এলাকাগুলিতে ধ্বংসের প্রকৃত ব্যাখ্যা এই তত্ত্ব থেকে পাওয়া যায় না। তাছাড়া খেয়াল রাখা দরকার বর্তমানে পাওয়া অসংখ্য ক্যালিব্রেটেড কার্বন গণনার সাহায্যে সিন্ধু সভ্যতার প্রধান অংশগুলির অবসানের যে সময়কারল নির্মিত হয়েছে, কোন অবস্থাতেই সেটি খ্রিস্টপূর্ব ১৯০০ সালের পরে নয়। কিন্তু, সবচেয়ে প্রাচীন বৈদিক রচনা, ঋকবেদের প্রাচীনতম উপাদানের চেয়ে ঐ অবসানের সময়কাল কিছু না হলেও ৪০০ বছরেরও পুরনো।

১৬.১০ উপসংহার

সামগ্রিক আলোচনার ভিত্তিতে তাই স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে, নগরশ্রয়ী হরপ্পা সভ্যতার অবিলুপ্তির কার্যকরণ নির্ণয় করা যথেষ্ট কঠিন ও বিতর্কিত একটি বিষয়। তবে এক্ষেত্রে আমাদের মনে রাখতে হবে হরপ্পা সভ্যতার মতো বৃহদায়তন একটি সভ্যতার পতনে কোন একটি বিশেষ কারণকে দায়ী করাটা যেমন ঠিক হবে না তেমনই দীর্ঘকাল ধরে একধরণের অবক্ষয়ের ধারা যে হরপ্পা সভ্যতাকে বিশেষত এই সভ্যতার নাগরিক সমৃদ্ধিকে নিঃশব্দে গ্রাস করে নিচ্ছিল সে বিষয়টিও খেয়াল রাখা দরকার। ইরফান হাবিব লিখেছেন, ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পরই মহেঞ্জোদারো, হরপ্পা এবং লোথালের মত কোথাও কোথাও প্রশাসনিক ব্যবস্থা ক্ষয়ে যাওয়ার সংকেত পাওয়া যেতে থাকে। দৃষ্টান্ত স্বরূপ বলা যায়, মহেঞ্জোদারোর বাসভবনগুলি রাস্তার এলাকা দখল করে নিতে থাকে, ভেঙ্গে-যাওয়া নিকাশী নালী মেরামত করা বন্ধ হয়, বাসগৃহের অভ্যন্তর একটি, দুটি এবং তারপর একাধিক অংশে বিভক্ত হয়ে জবড়জং চেহারা নেয়। কালিবঙ্গান ও বানাওয়ালির মতো অন্যান্য শহরগুলি দ্রুত পরিত্যক্ত হয়ে যায়। সমগ্র সিন্ধু অববাহিকায় কোনো উত্তরাধিকারী সংস্কৃতির বসতিও নজরে

আসে না, একমাত্র ক্ষুদ্র বসতি কুডওয়ালা থের ব্যতীত। সিলমোহরে খোদিত লিপি এবং ভগ্ন মৃৎপাত্রের নকশা অতি দ্রুত বিরল হয়ে যায় এবং সঙ্গে সঙ্গে একেবারে হারিয়ে যায় সিন্ধু লিপি। সেই সঙ্গে সীল ও প্রস্তরফলকে খোদিত পবিত্র প্রাণি এবং দেবমূর্তিও অদৃশ্য হয়ে যায়। এমনকি যে গুজরাটে কিছুদিন পর্যন্ত বিশিষ্ট সিন্ধু সীলের পরম্পরা অব্যাহত ছিল, তাও নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়। পোড়া মাটির বিশিষ্ট মূর্তিগুলি, বিশেষ করে এদের মধ্যে মাতৃদেবী' মূর্তি আর দেখতে পাওয়া যায় না। কিছু কিছু কারিগরী বিদ্যা যেমন-স্টিয়াটাইট পাথর কাটা কিংবা পাথরের দ্রব্য নির্মাণ বা সচেতনভাবে তামার সঙ্গে টিন মিশিয়ে ব্রোঞ্জ তৈরি করা—এ সবই ক্রমশ বিলীয়মান হতে থাকে কিংবা চিরতরে অবলুপ্ত হয়। সিন্ধু বাটখারার ব্যবহার কার্যত বন্ধ হয়ে যায়। বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সিন্ধু মৃৎশিল্পের স্থান অধিকার করে নেয় অন্য আঙ্গিকের শিল্পদ্রব্য, সাধারণভাবে সেগুলি একটু অমসৃণ ধাঁচের। সবমিলিয়ে এক অ-নাগরিক পরিবেশ ও নিরক্ষরতায় সমাপতিত হয়ে অবশেষে নগরশ্রয়ী হরপ্পা সভ্যতা পতনের কোলে ঢলে পড়ে।

১৬.১১ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. হরপ্পা সভ্যতার পতনকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

২. হরপ্পা সভ্যতার পতনে অভ্যন্তরীণ অবক্ষয় না বহিরাগত আক্রমণ কোনটি বেশি গুরুত্বপূর্ণ ছিল?

৩. টীকা লেখোঃ হরপ্পা সভ্যতার পতনে পরিবেশ বিপর্যয়ের তত্ত্ব।

৪. তুমি কি মনে করো যে রক্ষণশীল মনোভাব হরপ্পা সভ্যতার পতনের একটি অন্যতম কারণ?

১৬.১২ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

রণবীর চক্রবর্তী, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব(প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।

রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, আনন্দ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৬।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৯।

ইরফান হাবিব, সিন্ধু সভ্যতা, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০৪।

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, প্রথম খণ্ড, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ), প্রথম খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি- প্রাচীন ভাতীয় প্রেক্ষাপট, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৫।

ড. রতন কুমার বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (আদিপর্ব), প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, কলকাতা, ২০১৯।

শিরিন রত্নাগর, হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০৩।

D D Kosambi– An Introduction to the Study of Indian History– Popular Prakashan– Bombay– 1956.

Romila Thapar– Early India- From The Origins to Circa A.D. 1300– London– 2002.

Upinder Singh– A History of Ancient and Early Medieval India– Pearson– 2009.

Nayanjot Lahiri (ed.)– The Decline and the Fall of the Indus Civilization– Permanent Black– 2000.

R.S. Sharma– India's Ancient Past– OUP– New Delhi– 2005.

Raymond Allchin and Bridget Allchin– The Rise of Civilization in India and Pakistan– CUP– 1982.

একক : ১৭ ◘ পরবর্তী হরপ্পা সংস্কৃতি (The late/post-Harappan traditions)

গঠন

১৭.০ উদ্দেশ্য

১৭.১ সূচনা

১৭.২ ঝুকর সংস্কৃতি

১৭.৩ সিমেট্রি-'H' সংস্কৃতি

১৭.৪ উত্তর ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্র

১৭.৫ গুজরাট

১৭.৬ বিলুপ্তি নয়, ধারাবাহিকতা

১৭.৭ বস্তুগত জীবনে অভিঘাত

১৭.৮ উপসংহার

১৭.৯ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১৭.১০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১৭.০ উদ্দেশ্য

- এই এককের উদ্দেশ্য হল পরবর্তী হরপ্পা সংস্কৃতি সম্পর্কে শিক্ষার্থীদের অবহিত করা।
- চার ধরনের সংস্কৃতির কথা এই এককে আলোচিত হবে-
  - ঝুকর সংস্কৃতি
  - সিমেট্রি-'H' সংস্কৃতি
  - উত্তর ভারতের সংস্কৃতির ধারা
  - গুজরাট
- হরপ্পা সংস্কৃতির ধারাবাহিকতা ও বস্তুগত অভিঘাত আলোচ্য বিষয়ের মধ্যে আসবে।

১৭.১ সূচনা

হরপ্পা সভ্যতার নগরজীবনের সমৃদ্ধ চিত্রের অবসানের সাথে সাথেই হরপ্পা সংস্কৃতির সম্পূর্ণ বিলুপ্তি ঘটেনি, বরং পরবর্তী সংস্কৃতির মধ্য দিয়েই হরপ্পীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা অটুট ছিল। পরিণত সিন্ধু সভ্যতা তথ্য হরপ্পা সভ্যতার নিদর্শন যে সমস্ত অঞ্চলে ফুটে উঠেছিল তার সর্বত্রই পরবর্তী ধাপে অর্থাৎ পরবর্তী হরপ্পা পর্যায়ে আলাদা আলাদা সংস্কৃতি চিহ্ন লক্ষ্য করা যায়। এইসব অঞ্চলের সংস্কৃতির পরিবর্তিত রূপ এক না হলেও, এই সংস্কৃতিগুলি যে স্তর-পরম্পরায় হরপ্পা সংস্কৃতির নানা চিহ্ন বহন করে তা সহজেই বোঝা যায়, যে সাক্ষ্যের ভিত্তিতে বলাই যায় হরপ্পা সভ্যতার নাগরিক পর্বের পতনের পরই এই সভ্যতার আকস্মিক বিলুপ্তি ঘটে নি, বরং এই চিত্র পরিবর্তিত সংস্কৃতি গুলির মাধ্যমে হরপ্পীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতারই সার্থক পরিচায়ক।

১৭.২ ঝুকর সংস্কৃতি

পরবর্তী হরপ্পা সংস্কৃতি পর্যায়ে পরিণত হরপ্পা সভ্যতার অন্যতম কেন্দ্র বালুচিস্তানের ছবি কিছুটা অস্পষ্ট। বালুচিস্তানের কোয়েটা অঞ্চলে যে সংস্কৃতির ধারা পূর্বেই শুরু হয়েছিল তা খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ অব্দের পরবর্তী কাল পর্যন্ত পরিবর্তিত রূপেই টিকে ছিল। এর সাক্ষ্য পাওয়া গেছে পিরক নামক একটি কেন্দ্র থেকে। পরিণত হরপ্পা সভ্যতার পরিচায়ক কিছু মৃৎপাত্রও এই স্তর থেকে পাওয়া গেছে। দক্ষিণ বালুচিস্তানে পুরনো কুল্লি সংস্কৃতির ধারাই প্রবাহিত ছিল। সিন্ধু প্রদেশে এই সময়ে যে সংস্কৃতি চালু ছিল তার নাম 'ঝুকর সংস্কৃতি'। এই সংস্কৃতির তিনটি পর্যায় দেখা গেছে। এই তিনটি পর্যায়েই পরিণত হরপ্পা সভ্যতার মৃৎপাত্র পাওয়া যায়। প্রত্নতাত্ত্বিকদের অনুমান ঝুকর সংস্কৃতি শুধু একটি অতিরিক্ত মৃৎপাত্রের ধারা, যা পরিণত হরপ্পা সভ্যতার অংশ হিসেবেই এই অঞ্চলে শুরু হয়েছিল। স্তর-পরম্পরায় কোন হঠাৎ পরিবর্তন বা থেমে যাওয়া নেই। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় হল এই যে, পরিণত হরপ্পীয় পর্যায়ের চৌকো সীলমোহরের ব্যবহার প্রায় এই পর্বে নেই, তার পরিবর্তে এমন এক ধরনের সিলমোহরের ব্যবহার দেখা যায় যা গোলাকার তাছাড়া লিপিচিহ্নতে ব্যবহার শুধু মৃৎপাত্রের ওপর উৎকীর্ণ। ওজন এবং পোড়ামাটির নারীমূর্তিও এই পর্বে অনেক কম পাওয়া গেছে।

১৭.৩ সিমেট্রি-'H' সংস্কৃতি

পরবর্তী হরপ্পা পর্বে পাকিস্তানের পাঞ্জাবে যে সংস্কৃতি বিদ্যমান ছিল তা হরপ্পায় প্রাপ্ত একটি সমাধিক্ষেত্রের নামানুসারে 'সিমেট্রি-'H'-সংস্কৃতি' নামে পরিচিত। এই সংস্কৃতিতে ব্যবহৃত মৃৎপাত্র এই সিমেট্রি ছ সমাধিতেই প্রথম পাওয়া যায়। দিলীপকুমার চক্রবর্তীর মতে, এই সংস্কৃতির মৃৎপাত্র গুলি বিশেষ বৈশিষ্ট্যপূর্ণ। এগুলি মোটামুটি উজ্জ্বল লাল প্রলেপের ওপর কিছুটা মোটা সাবলীল চিত্রকর্মে পূর্ণ। এই চিত্রকর্ম গুলি হল- ময়ূর, লম্বা এবং ছড়ানো শিং ওয়ালা লম্বা শরীরের ষাঁড়, ফুল ইত্যাদির। হরপ্পায় সাম্প্রতিক উৎখননের ফলে এই সংস্কৃতি বিশদ ভাবে বোঝা গেছে। পরিণত হরপ্পা সভ্যতার পর্যায় এবং এই সংস্কৃতির সময়ক্রমে একটি ক্রমিক পরিবর্তন সূচনাকারী ৪নং কাল আছে। পরিণত পর্বের মতোই পাকা ইট, ড্রেন সবই আছে এই সিমেট্রি 'H' সংস্কৃতিতে তবে তা ছোট হয়ে আসছে। হরপ্পার এই পর্যায়ের বিশদ বিবরণ এখনও পাওয়া যায় নি, তবে চেলিস্তান অঞ্চলে, খগগর-হাফরা উপত্যকাতে এই সংস্কৃতির অন্তত ৫০ টি কেন্দ্রের অস্তিত্ব পাওয়া গেছে, এর ভিতরে

২৬ টি কেন্দ্রের আয়তন সম্পর্কে যে ধারণা পাওয়া গেছে তা থেকেও হরপ্পীয় সাংস্কৃতিক ধারার নিরবচ্ছিন্নতার চিত্র ফুটে উঠেছে।

১৭.৪ উত্তর ভারতের বিভিন্ন ক্ষেত্র

১৯৮৪ পর্যন্ত ভারতীয় পাঞ্জাব, হরিয়ানা, উত্তর প্রদেশ, হিমাচল প্রদেশ, দিল্লী, চন্ডীগড়- এই সমস্ত অঞ্চলে হরপ্পা সভ্যতার পরবর্তী পর্যায়ের অন্তত ৫৮০ টি কেন্দ্র পাওয়া গেছে। এই কেন্দ্রগুলির মৃৎপাত্রের ধারা এবং পরিণত হরপ্পীয় মৃৎপাত্রের ধারার ঘনিষ্ঠতা সহজেই অনুমিত হয়। হরিয়ানার বনোয়ালী থেকে মৃৎপাত্র ছাড়াও, কাদামাটির বাড়ি, 'ফেঁয়স' দিয়ে বানানো গয়না, ভালো পাথরের পুঁতি, কিছু তামার জিনিস, পোড়া মাটির জিনিস ইত্যাদির সাক্ষ্য থেকেও হরপ্পীয় ঐতিহ্যের ধারাবাহিকতা প্রমাণিত হয়, এছাড়াও পাঞ্জাবের সাংঘোল থেকে মাটির ঘরের চিহ্ন, উনুন, কাঁচা ইটের বাড়ি, শস্য রাখার গর্ত এবং 'অগ্নিবেদী' পাওয়া গেছে। দাধরীতে পুরো বসতিটাই মাটির বড়ো ভিত বানিয়ে তার উপর ঘর-বাড়ী বানানো। এখানে তামা। পোড়ামাটির ষাঁড়, 'ফেঁয়স' এর বালা এবং কার্নেলিয়ান ও লাপিস লাজুলি পাথরের পুঁতি পাওয়া গেছে। পাঞ্জাবের মেহেরোনাতে এই স্তর থেকে বিভিন্ন জাতের যব ও গম, মসুর ডাল এবং আঙুর পাওয়া গেছে। রোহিরাতে এছাড়াও ছোলা, জোয়াব, এবং খেজুর পাওয়া গেছে। আবার উত্তর প্রদেশের সাহারানপুরে হুলাস কেন্দ্রটি থেকে পরবর্তী হরপ্পা পর্যায়ে কৃষিশস্যের নমুনা হিসাবে যব ও গম তো বটেই, তাছাড়াও ধান, দুই বা তিন প্রকারের বাজরা, 'ওটস', বিভিন্ন রকমের মুগ এবং মটর, তুলা, এবং বড়ো কাঠবাদাম, ও আখরোট ফল পাওয়া গেছে। এই সকল শস্যের ভিত্তিতে স্পষ্টই বোঝা যাচ্ছে যে, ঘগগর-হাকরা উপত্যকা থেকে পশ্চিম উত্তর-প্রদেশ পর্যন্ত পরবর্তী হরপ্পা পর্যায়ের কেন্দ্রগুলি আয়তনে ছোট হলেও কৃষির প্রাচুর্যে বলীয়ান। পুরাতাত্ত্বিক দিক থেকে যদি এই কেন্দ্রগুলির বিস্তৃতির সাক্ষ্য আমরা দেখি তাহলে দেখা যায় ঘগগর-হাকরা উপত্যকার পুরনো অঞ্চল থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকার দিকে, দোয়াব পর্যন্ত একটি বসতি বিস্তারের ঢেউ লক্ষ্য করা যায়।

১৭.৫ গুজরাট

হরপ্পা সংস্কৃতির অন্যতম প্রধানকেন্দ্র গুজরাটে পরবর্তী হরপ্পা পর্বের পরিবর্তনের চিত্র বোঝা যায় লোথালের ৫নং পর্যায় থেকে। যাকে লোথালের খননকর্তা 'লোথাল বি' বলেছেন, এই স্তরে মৃৎপাত্রের ধরণে কিছু পরিবর্তন, মাটি ও বেত দিয়ে তৈরি সাধারণ ঘর-বাড়ি, বড় চার্ট পাথরের ব্লেড এর পরিবর্তে অন্য পাথরের ছোট ব্লেড, পাথরের পুঁতির পরিবর্তে পোড়ামাটির পুঁতি, চার্ট বা অ্যাগেট পাথরের ওজনের পরিবর্তে নিম্নমানের পাথরের বড়ো ওজন ইত্যাদি লক্ষ্য করা যায়। লিপি চিহ্নসমেত স্টিয়াটাইট এর চৌকো সিলমোহর অবশ্য এই পর্যায়েও ব্যবহৃত হয়েছিল। রোজডি নামক একটি কেন্দ্রেও এই পর্যায়ের সাক্ষ্য আছে। এই রোজডি কেন্দ্রটি নদীর দিক ছাড়া, পাথরের ১.৫-২ মিটার চওড়া দেয়াল দিয়ে ঘেরা। প্রথমে সমান্তরালভাবে বড়ো বড়ো ব্যাসল্ট পাথরের অগভীর ভিতের ওপরে সাজিয়ে- মাঝখানের জায়গাটি মাটি পাথরের টুকরো ইত্যাদি দিয়ে ভর্তি করে দেয়ালটা করা। পশ্চিম দিকে আছে একটি দুর্গদ্বার, যা দুটি বেষ্টনী যোগ করে এই স্তরে সুরক্ষিত করা হয়েছিল। রোজডি কেন্দ্রটির বসতিটির আয়তন প্রায় ৭ হেক্টর। এখানে কয়েকরকম জোয়ার, বাজরা ছাড়াও গম, সর্ষে, কয়েকরকম ডাল, কুল, ঔষধি জাতীয় উদ্ভিদ, বুনো ঘাস ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এছাড়া কিছু

তামার জিনিসও মিলেছে। গুজরাটে পরবর্তী হরপ্পা পর্যায়ের আরো বহু কেন্দ্রে পাওয়া গেছে যার মধ্যে বেট দ্বারকা অন্যতম। সমুদ্রমগ্ন এই স্থানটিতে খনন করে পাথরের দেওয়াল, মৃৎপাত্র, একটি লিপিহীন সিলমোহর ইত্যাদি বের করা হয়েছে। যার তারিখ খ্রীস্টপূর্ব ১৭৫০। একটি মৃৎপাত্রে লিপিও উৎকীর্ণ পাওয়া যায়। গুজরাটে হরপ্পার অন্তিম পর্যায়ের বৈশিষ্ট্য হলো উজ্জ্বল চকচকে লাল বর্ণের এক ধরনের মৃৎপাত্র। এই প্রকার মৃৎপাত্র ছোট-বড়ো বহুকেন্দ্রে পাওয়া গেছে। অনেক ক্ষেত্রে এই মৃৎপাত্রে হরপ্পীয় লিপিও উৎকীর্ণ আছে, যার থেকে সহজেই বোঝা যায় যে সেগুলি হরপ্পীয় ঐতিহ্যেরই বাহক।

১৭.৬ বিলুপ্তি নয়, ধারাবাহিকতা

দিলীপকুমার চক্রবর্তীর মতে, সব মিলিয়ে বালুচিস্থান, সিন্ধুপ্রদেশ, পাঞ্জাব, চোলিস্তান, দোয়াবের উত্তর প্রান্ত পর্যন্ত অঞ্চল ও গুজরাট- এই বিস্তীর্ণ অঞ্চলে যেখানে আদি এবং পরিণত হরপ্পা সভ্যতার চিহ্ন পাওয়া গেছে, সেখানে পরবর্তী হরপ্পা পর্যায়ের চিত্রটি অনেকাংশে আঞ্চলিক। কিন্তু কোথাও হরপ্পা সভ্যতার ধারা নষ্ট হয়ে যাচ্ছে না, যদিও খুব কমে আসছে। আবার কোথাও কোথাও যেমন- গুজরাট, এবং ভারতীয় পাঞ্জাব, হরিয়ানা, দোয়াবে আয়তনে কেন্দ্রগুলি ছোট হয়েছে কিন্তু তাদের সংখ্যা অনেক বেশি। তিনি আরো বলেছেন যে, হরপ্পীয় লিপির সঙ্গে পরিণত হরপ্পা সভ্যতার মৃৎপাত্র শৈলীর সঙ্গে, এবং অপরাপর কিছু বৈশিষ্ট্যের সঙ্গে পরবর্তী হরপ্পা পর্যায়ের কেন্দ্রগুলির যোগসূত্র অটুট রয়েছে। গুজরাটে কিছু কিছু বড়ো কেন্দ্রও ছিল যা পরবর্তী হরপ্পা পর্যায়ে বাণিজ্যিক যোগাযোগের ও ঐতিহ্যবাহী। সব মিলিয়ে যে চিত্রটা বেরিয়ে আসে তা পরিণত হরপ্পা সভ্যতার পতনের নয়, বরং পরিবর্তনের।

অধ্যাপক দিলীপ কুমার চক্রবর্তী পরবর্তী হরপ্পা সংস্কৃতির বিভিন্ন কেন্দ্রগুলির প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য বিশ্লেষণ করে এক ভৌগোলিক ব্যাখ্যাও তুলে ধরেছেন এবং সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, নগরজীবনের অবসান হলেও হরপ্পা সংস্কৃতি সম্পূর্ণ বিলুপ্ত হয়নি, তার রূপেরই শুধু পরিবর্তন ঘটেছিল এবং এই উপমহাদেশের গাঙ্গেয় উপত্যকা এবং রাজস্থান, মধ্যপ্রদেশ দাক্ষিণাত্যের সংস্কৃতির স্রোতে এই পরবর্তী হরপ্পা সংস্কৃতির ধারা মিলে গিয়েছিল।

পরবর্তী হরপ্পা সংস্কৃতির যে চিত্র আমরা পেলাম তার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসাটা যুক্তিযুক্ত যে, শেষ পর্যায়ে হরপ্পার সভ্যতার নগর জীবন যথেষ্টই পাল্টে যায়। মহেঞ্জোদারোতে এবং অন্যত্র একেবারে শেষ পর্যায়ে বাড়িঘরের খারাপ, কিছুটা দরিদ্র ও ঘিঞ্জি অবস্থার কথা প্রায় সকল খননকারীই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর পাশাপাশি আবার ছোট ছোট কেন্দ্রের সংখ্যা ও বেড়ে যায়। গুজরাটে তো এই পর্যায়ে বেট দ্বারকা, রোজডি ইত্যাদির মতো নগরেও দেখা মেলে। তবে এই পর্যায়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য হলো দোয়াবের দিকে ঝুঁকে পড়া আর গুজরাট থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থান, মালোয়া অধিত্যকা এবং দক্ষিণাত্যের দিকে এই সংস্কৃতির প্রবাহমানতা। বস্তুত এই পর্বে সমৃদ্ধ নগরজীবনের পরিবর্তে 'বি-নাগরিকীকরণ' চিত্রই সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু জনজীবনের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি কখনোই ঘটেনি। হরপ্পা সভ্যতার এই পরিবর্তনে যে কারণটি হরপ্পা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হল ঘগগর-সরস্বতী প্রবাহ অর্থাৎ প্রাচীন স্বরস্বতীর ব্যাপক শুকিয়ে আসা। একথা ঠিক যে, হরপ্পা সভ্যতা একদিনে তার বিস্তৃতির সমগ্র অঞ্চলে ছড়ায়নি, চোলিস্তানে শুরু হয়ে তা বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়েই বালুচিস্তান থেকে দোয়াব আর জম্মু থেকে তাপ্তি মোহনা পর্যন্ত ছড়িয়েছে। কিন্তু তা হলেও বলতে হয় যে, এই সভ্যতার প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক কারণে অর্থাৎ

নদীভিত্তিক সভ্যতার উৎস যে জল প্রবাহ তা শুকিয়ে আশায় সভ্যতার রাষ্ট্রব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত টাল সামলাতে পারেনি এবং যখন তা পারেনি, তখন তার নাগরিক জীবন থাকারও কোন প্রশ্ন ওঠেনা। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় যে এই ব্যাখ্যাতে সভ্যতার অবলুপ্তি নেই, তার পরিবর্তন আছে, 'বি-নাগরিকীকরণ' আছে। বি-নাগরিকীকরণ হলেই কিন্তু কোনো জনজীবনপ্রবাহ নিঃশেষ হয়ে যায় না, প্রবাহটি শুধু মোড় পাল্টায়। হরপ্পা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একথা সত্য। পরবর্তী পর্বে এই সংস্কৃতির ধারায় হরপ্পীয় ঐতিহ্য অটুট ছিল।

১৭.৭ বস্তুগত জীবনে অভিঘাত

সিন্ধু সভ্যতার পতনের পরে নাগরিক জীবনের অন্তর্ধান সহ ৫০০ বছরের মধ্যে পার্থিব জীবনের দিকে তাকালে নানা পরিবর্তনের কথা আমরা জানতে পেরেছি। প্রথমেই কংষির কথা বলা যায়। কৃষিক্ষেত্রে, খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০-১৫০০ এই কালপর্বে আগের চেয়ে অনেক বেশি সংখ্যক বিভিন্ন জাতীয় উৎপাদিত শস্যের উপস্থিতি চিহ্নিত করা যায়। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল- গম, বার্লি, ওট, ছোলা, ডাল, কড়াইশুঁটি, বিন, তিসি, জোয়ার, রাগি, বাজরা কার্পাস, তিল অন্যতম। এইসব শস্য এমন সব স্থানে প্রথমবার দেখা গেল, যেখানে আগে তাদের চাষ করা হয়নি। পরবর্তী বিভিন্ন তাম্র প্রস্তর সংস্কৃতিতে এইসব খাদ্যশস্যের অনেকগুলি বেশ বিস্তৃত এলাকাজুড়ে চাষ করা হয়েছে। সেই বিচারে সিন্ধু সভ্যতার সময়কাল থেকে পরবর্তীকালে দৃষ্টান্তমূলক একটি পরিবর্তন ঘটে গেছে। খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ সালের পূর্বে যদি বিন্ধ্যাচল, বিহার এবং বাংলায় ধান উৎপাদিত হয়ে থাকে, তবে পরবর্তী সময়ে পশ্চিম মধ্যপ্রদেশ, রাজস্থান, উত্তরপ্রদেশ এর পশ্চিমাংশ, পাঞ্জাব, কাচ্চি সমতল, কাশ্মীর এবং সোয়াটেও ধান উৎপাদিত হয়েছিল। গুজরাট, মহারাষ্ট্র এবং দক্ষিণ ভারতে প্রধান 'খারিফ' শস্য হিসাবে এর স্থানটি পূর্ণ করেছে জোয়ার, ভুট্টা, বিশেষত 'রাগি'। প্রধান 'রাগি' শস্য দু'টি, গম এবং বার্লি একই রকমভাবে বাংলা ছাড়া অন্যান্য অঞ্চল সমূহ ছড়িয়ে পড়েছিল। অবশ্য বাংলা বছরে দুই বা ততোধিক বার ধান চাষ করা হতো, যাতে 'রবি' শস্য উৎপাদনের প্রয়োজন না পড়ে; গুজরাটে মসূর বা মটর 'রবি' শস্যের কাজ চালিয়ে দিত। অবশ্য দক্ষিণ ভারতে পরিস্থিতি কেমন ছিল সে বিষয়ে কোনো স্পষ্ট ধারণা আমাদের নেই।

ইতিপূর্বে হরপ্পা সভ্যতায় খুবই সীমাবদ্ধ সংখ্যক শস্য উৎপাদিত হতো এবং অনেক খাদ্যশস্য এমন মরশুমে চাষ করা হতো যেটা হয়তো তার পক্ষে অনুকূল নয়। সে কারণে সেখানে 'রবি' এবং 'খারিফ' ফসল এর ভারসাম্য প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি। কিন্তু এখন তা অনেকখানি সংশোধিত হয়েছে দেখা গেল। আজকের সময়কালের আগে যখন জমির চাহিদা এত তীব্র ছিল না, তখন আলাদা আলাদা কৃষিক্ষেত্রে 'খারিফ' ও 'রবি' শস্য উৎপাদনের রীতি প্রচলিত ছিল। বছরের অন্যান্য সময় ক্ষেত্রগুলি অকর্ষিত থাকতো। তখনো আবর্তিত শস্য উৎপাদনের জটিল ব্যবস্থা আমাদের চোখে পড়ছে না। এমন পরিস্থিতিতে পৃথক 'রবি' এবং 'খারিফ' শস্য বোনার জন্য প্রত্যেকটি কৃষকের অনেকখানি জমি প্রয়োজন হল। এর সঙ্গে আবার নতুন যে শস্য অর্থাৎ ধানের উৎপাদন শুরু হলো, তার জন্য অনেক বেশি জলের প্রয়োজন হতো। এই সব কারণেই হয়ত উপস্থিত কৃষি অঞ্চল থেকে নতুন কোন ক্ষেত্রে জনসমষ্টি স্থানান্তরণ উৎসাহিত হলো। সময়ের এই কালপর্বের শতদ্রু এবং গঙ্গার অন্তর্বর্তী উপ-পার্বত্য ক্ষেত্রের নিকটে লোকালয়য়ের সংখ্যা বৃদ্ধি এবং ঘঘর ও হাক্রা উপত্যকার তুলনামূলক অনুর্বর অঞ্চলে জনবসতি বিরল হওয়া, এই দুই ঘটনাকে ঐ স্থানান্তরণের সূত্রে ব্যাখ্যা করা যায়।

প্রাথমিকভাবে সিন্ধু অববাহিকা থেকে ছড়িয়ে পড়া তামার ব্যবহার গিরিমাটি- রঞ্জিত মৃৎশিল্প (OCP) এবং রাজস্থানের বানাস সংস্কৃতি ইত্যাদি প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ২৮০০ থেকে বা বলা যায় খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সময়কালের পর থেকেই পূর্ণমাত্রায় প্রতিষ্ঠিত। স্থানীয় তামার যথেষ্ট ব্যবহারে এই আপাতদৃষ্টিতে এটা সম্ভব হয়েছিল। এখান থেকে তামার ব্যবহার ছড়িয়ে পড়ে দক্ষিণের দিকে মধ্যপ্রদেশে সেখানকার কায়াথা সংস্কৃতিতে (খ্রীষ্টপূর্ব ২৪০০-১৮০০) এবং মহারাষ্ট্রের মালওয়া সংস্কৃতিতে (খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০-১৪০০)। দক্ষিণ ভারতেও অল্প কয়েকটি তামার সামগ্রী পাওয়া গিয়েছিল বটে, কিন্তু সেখানে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ সময়কালের আগে তামার ব্যাপক ব্যবহার শুরু হয়নি। রাজস্থানের আরো পূর্বে উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম এলাকার 'তামার ভান্ডার' এর সঙ্গে সম্ভবত 'OCP'-র সংস্কৃতির (ক্যা. খ্রিষ্টপূর্ব ২০০০) সংযোগ ছিল; বিহারে ধাতু দেখা দিল খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০ সময়কালে (ক্যা.) এবং পশ্চিম বাংলায় ১৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে (ক্যা.)।

সিন্ধু উপত্যকার পূর্বাঞ্চলে তামার ব্যবহার প্রসঙ্গে দুটি প্রধান বিষয় মনে রাখতে হবে। প্রথমত, ব্রোঞ্জের সামগ্রী তখনো খুবই কম এবং বস্তুর 'তামার ভাণ্ডার' এর মধ্যে সেগুলোর একটিও নেই। তামার সঙ্গে অন্যান্য পদার্থের সংকর প্রস্তুতির ক্ষেত্রে সিন্ধু ধাতুবিদ্যা বেশি আর কোনো অগ্রগামিতার সন্তান নেই। দ্বিতীয়ত, কুঠার এবং অন্যান্য হাতিয়ার ও অস্ত্রশস্ত্র সাধারণত চ্যাপ্টা আকারের, কখনো কখনো এদের হাতল নজরে পড়ে। সেই সময় পশ্চিমী সীমান্ত প্রদেশ এবং সিন্ধে যেমন কোটর যুক্ত কুঠার দেখা যেত, সেরকম কুঠারের কোনো চিহ্ন নেই।

ধাতুবিদ্যা সঙ্গে সঙ্গে অন্যান্য প্রকরণগত কৌশলও স্থানীয় এলাকায় ছড়িয়ে পড়েছিল, যেমন দ্রুত ঘুর্ণায়মান চাকে তৈরি মৃৎপাত্র এবং চিনামাটি-প্রস্তুতি। কিন্তু প্রযুক্তির স্তর সিন্ধু সভ্যতায় সাধারণভাবে অনেক বেশি নিম্নতর ছিল। নির্মাণকার্যে পোড়া ইট বিরল হয়ে উঠেছিল। অনেক হস্তশিল্প যেমন পাথরের পণ্যসামগ্রী প্রস্তুতি অন্তর্হিত হয়েছে এবং মূল্যবান পাথর থেকে পুঁতি তৈরি এতই কমে গিয়েছিল যে তারা কোন তাৎপর্য ছিল না। স্টিয়াটাইট সীলের স্থানে এল পোড়ামাটির সীল। তবে সে সীল একই উদ্দেশ্যে ব্যবহৃত হতো কি না সেটা পরিষ্কার নয়। মেসোপটেমিয়ার সঙ্গে বাণিজ্যিই কেবল গ্রহণ লেগেছিল তা নয়, দেশের মধ্যেও লক্ষণীয় মাত্রায় দূরপাল্লার বাণিজ্যের কোন বিশ্বাসযোগ্য প্রমাণ পাওয়া যায় না।

নগর-উত্তর পর্বে হরপ্পা সভ্যতার পর যে বস্তুগত পরিস্থিতির উদ্ভব হল, তাতে অগ্রগতি এবং অধোগতি দু''টিরই লক্ষণ প্রতিভাত হয়। অগ্রগতির চিহ্ন হল উদ্ভাবিত শস্যের বৃদ্ধি, যার ফলে একটি পূর্ণ মাত্রার দোফসলী কৃষিকাজের সূত্রপাত হলো। তাম্রপ্রস্তর সংস্কৃতির প্রসারণের শেষাবধি এই উৎপাদন প্রক্রিয়া দেশের বেশিরভাগ স্থানেই দখল করে নেয়। কয়েকটি বিশেষ হস্ত-শিল্প ও দক্ষতা এবং প্রযুক্তির প্রসারের ফলে এমনটা ঘটলো। নাগরিক জীবন ক্ষয়ে যাওয়ায় (বি-নগরায়ণ), শিল্পদক্ষতার অবনতি, বাণিজ্যের স্রোত শুকিয়ে যাওয়া- এইসব হলো অধোগতির প্রকাশ। আমরা জানি, কৃষি যখন যথেষ্ট উদ্বৃত্ত উৎপন্ন করতে পারে তখন নগর-বিপ্লব সম্ভব হয়। কিন্তু যেসব তথ্য এখন আমাদের হাতে এল তাতে একটু খটকা লাগে। দো-ফসলী কৃষি এবং তামার ব্যবহার ছাড়িয়ে পড়া সত্ত্বেও নগরজীবনের এমন অধোগতি এতে বিস্মিত হবারই কথা। অবশ্য আমাদের একথা মনে রাখতে হবে যে বৃহৎ পরিমাণে কৃষি উদ্বৃত্ত, হস্ত শিল্পের কারিগরির প্রসার এগুলো যদিও নগরের উদ্ভবের প্রয়োজনীয় শর্ত, কিন্তু কখনোই যথেষ্ট নয়। ইতিপূর্বে, সিন্ধু সভ্যতা গড়ে ওঠার জন্য রাজনৈতিক ক্ষেত্রে একটি পুনর্নির্মাণ প্রয়োজনীয় ছিল; সম্ভবত এর মধ্যে সামাজিক গঠন কাঠামোর একটি বিশেষ রূপ এবং বিশেষ ধরণের একটি বিশ্বাস এবং রীতি রেওয়াজ ছিল। এর পরবর্তীকালে এইসব সংস্কৃতির মধ্যে যদি 'উপরিকাঠামো'

ভিন্ন হয়ে থাকে- তাহলে যেমন শাসক এবং প্রধানেরা যদি একটি ক্ষুদ্র গোষ্ঠীতে সীমাবদ্ধ হয়ে পড়ে- তাহলে কৃষকদের থেকে গ্রাস-করা স্বল্প উদ্বৃত্ত কোনমতেই এমন ভাবে কাজে লাগানো যাবে না যাতে নাগরিক শিল্প ও বাণিজ্য উৎসাহিত হতে পারে।

ইরফান হাবিব লিখেছেন দুর্ভাগ্যক্রমে, প্রত্নতত্ত্ব আমাদের প্রধানত পার্থিব জীবনের কথাই বলে। এসব তথ্য থেকে রাষ্ট্র ও সমাজ বিষয়ক কোন চিত্র অঙ্কন করা সম্ভব হয় না। তবে রাষ্ট্র এবং শাসক যে ছিল সে বিষয়ে সন্দেহের কোনো অবকাশ নেই। রাজস্থানের বালাথাল (খ্রিষ্টপূর্ব ৩০০০-২০০০) প্রায় ৫০০ বর্গমিটার এলাকা জুড়ে বিস্তৃত একটি দুর্গ অঞ্চলের জন্য গর্ব অনুভব করতে পারে; চারপাশের কাদামাটির প্রাচীরটির প্রস্থ ছিল প্রায় ৫ মিটার। কিন্তু সাধারণভাবে বলতে গেলে স্তম্ভ বিশিষ্ট কোন ভবন কাঠামো বাস্তবিকই অনুপস্থিত। কাজেই রাষ্ট্রগুলো সম্ভবত ক্ষুদ্রকার ছিল। স্থানীয়ভাবে বা উপঅঞ্চলে সীমাবদ্ধ হয়ে অল্পমাত্রায় বাণিজ্যসহ পরস্পর এর থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে টিকে ছিল। সমাজের বিষয়ে আমাদের তথ্যাদি সম্ভবত খুবই সামান্য। তবে সাম্য ছিল না; নানা আকারের ও গঠন কাঠামো বাড়িগুলি এবং কুঁড়ে পদমর্যাদার বিভিন্ন স্তর প্রকাশ করে। কিন্তু সমাজে কত নির্দিষ্টভাবে নানান শ্রেণী গড়ে উঠেছিল সে বিষয়ে আমরা কিছুই জানি না। ধর্মীয় বিশ্বাসও সম্ভবত নানান অঞ্চলে নানান রকম ছিল। কাজেই বিভিন্ন সংস্কৃতির কাদা মাটির মূর্তি এবং সমাধিস্থ করার রীতি আমাদের যা বলে তা থেকে কোন যৌগিক চিত্র রচনা করার প্রচেষ্টা মোটেই বাস্তব সম্মত হবে না বলে মনে হয়।

এই কালপর্বের শুরুতেই যদি সিন্ধু সভ্যতার পতন হয়ে থাকে, তবে এর অবসানকালে আরেকটি পরিবর্তন দেখা গেল, সেটিও অতীব গুরুত্বপূর্ণ ইন্দো-আর্য ভাষার আবির্ভাব। এই পরিবর্তনের অনুভাস দেখা দিল পশ্চিমী সীমান্ত রেখায়, নতুন তিনটি গৃহপালিত পশু ব্যবহারের সূত্রপাতে। বাকট্রীয় উট সম্ভবত আগেই পোষ মেনে ছিল, কিন্তু বর্তমানে পিরাকে ঐ পশুর উপস্থিতির প্রচুর চিহ্ন দেখা গেল, এর মধ্যে আবার গাধার সন্ধানও মিলল। খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ নাগাদ সোয়াট থেকে গৃহপালিত অশ্বের প্রমাণ পাওয়া গেল। এই সব গৃহপালিত পশুর জন্য কেবল যে মাল পরিবহন সহজ হয়ে গেল তাই নয়, সেই সঙ্গে ঘোড়ার আবার যথেষ্ট সামরিক গুরুত্ব ছিল। অশ্ব একটি দ্রুতগতিসম্পন্ন পশু; রথ টানতে পারতো; বহন করতে পারতো সওয়ারীকে; আর সেই সওয়ারীটি নিশ্চয়ই এখন কুঠারের সঙ্গে হাতল লাগানোর কলাকৌশল জেনে গেছে। পূর্ব প্রান্ত থেকে সামরিক শক্তি সম্পন্ন কোন জনগোষ্ঠীর সিন্ধু অববাহিকা আগমনের ফলে এমন পরিস্থিতি উদ্ভব হতে পারে। ঘোড়ার-ব্যবহারে-বিশেষত গোষ্ঠী যৌক্তিক বিচারেই ইন্দো-আর্য ভাষা ভাষী হবে। যতদূর সম্ভব মনে হয়, এরা ছিল উচ্চ মেসোপটেমিয়ার ইন্দো-আর্য ভাষাভাষী মিতান্নি জনগোষ্ঠী।

১৭.৮ উপসংহার

পরবর্তী হরপ্পা সংস্কৃতির যে চিত্র আমরা পেলাম তার ভিত্তিতে এই সিদ্ধান্তে আসাটা যুক্তিযুক্ত যে, শেষ পর্যায়ে হরপ্পার সভ্যতার নগর জীবন যথেষ্টই পাল্টে যায়। মহেঞ্জোদারোতে এবং অন্যত্র একেবারে শেষ পর্যায়ে বাড়িঘরের খারাপ, কিছুটা দরিদ্র ও ঘিঞ্জি অবস্থার কথা প্রায় সকল খননকারীই উল্লেখ করেছেন। কিন্তু এর পাশাপাশি আবার ছোট ছোট কেন্দ্রের সংখ্যা ও বেড়ে যায়। গুজরাটে তো এই পর্যায়ে বেট দ্বারকা, রোজডি ইত্যাদির মতো নগরেও দেখা মেলে। তবে এই পর্যায়ের একটি তাৎপর্যপূর্ণ বৈশিষ্ট্য

হলো দোয়াবের দিকে ঝুঁকে পড়া আর গুজরাট থেকে দক্ষিণ-পূর্ব রাজস্থান, মালোয়া অধিত্যকা এবং দক্ষিণাত্যের দিকে এই সংস্কৃতির প্রবাহমানতা। বস্তুত এই পর্বে সমৃদ্ধ নগরজীবনের পরিবর্তে 'বি-নাগরিকরণের' চিত্রই সর্বত্র লক্ষ্য করা যায়, কিন্তু জনজীবনের সম্পূর্ণ অবলুপ্তি কখনোই ঘটেনি। হরপ্পা সভ্যতার এই পরিবর্তনে যে কারণটি হরপ্পা সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ তা হল ঘগগর-সরস্বতী প্রবাহ অর্থাৎ প্রাচীন স্বরস্বতীর ব্যাপক শুকিয়ে আসা। একথা ঠিক যে, হরপ্পা সভ্যতা একদিনে তার বিস্তৃতির সমগ্র অঞ্চলে ছড়ায়নি, চোলিস্তানে শুরু হয়ে তা বিভিন্ন পর্যায়ের ভিতর দিয়েই বালুচিস্তান থেকে দোয়াব আর জম্মু থেকে তাপ্তি মোহনা পর্যন্ত ছড়িয়েছে। কিন্তু তা হলেও বলতে হয় যে, এই সভ্যতার প্রভাব ক্রমশ হ্রাস পেয়েছিল এবং শেষ পর্যন্ত প্রাকৃতিক কারণে অর্থাৎ নদীভিত্তিক সভ্যতার উৎস যে জল প্রবাহ তা শুকিয়ে আশায় সভ্যতার রাষ্ট্রব্যবস্থা শেষ পর্যন্ত টাল সামলাতে পারেনি এবং যখন তা পারেনি, তখন তার নাগরিক জীবন থাকারও কোন প্রশ্ন ওঠেনা। কিন্তু এখানে লক্ষণীয় যে এই ব্যাখ্যাতে সভ্যতার অবলুপ্তি নেই, তার পরিবর্তন আছে, 'বি-নাগরিকীকরণ' আছে। বি-নাগরিকীকরণ হলেই কিন্তু কোনো জনজীবনপ্রবাহ নিঃশেষ হয়ে যায় না, প্রবাহটি শুধু মোড় পাল্টায়। হরপ্পা সংস্কৃতির ক্ষেত্রেও একথা সত্য। পরবর্তী পর্বে এই সংস্কৃতির ধারায় হরপ্পীয় ঐতিহ্য অটুট ছিল। নগর-উত্তর হরপ্পীয় সংস্কৃতির বস্তুগত জীবনের আলোচনাতেও বিষয়টি আরো স্পষ্ট হয়ে ওঠে।

১৭.৯ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. নাগরিক পর্যায়ের পতনের পরেও হরপ্পীয় সংস্কৃতির ধারা অটুট ছিল'— তুমি কি এই মত সমর্থন করো?

২. নগর পরবর্তী পর্বে হরপ্পা সংস্কৃতির বস্তুগত জীবন কেমন ছিল?

৩. টীকা লেখোঃ ঝুকর সংস্কৃতি।

৪. টীকা লেখোঃ সিমেট্রি-'H' সংস্কৃতি।

১৭.১০ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

রণবীর চক্রবর্তী, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব(প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।

রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, আনন্দ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৬।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৯।

ইরফান হাবিব, সিন্ধু সভ্যতা, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০৪।

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, প্রথম খণ্ড, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ), প্রথম খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭

শিরিন রত্নাগর, হরপ্পা সভ্যতার সন্ধানে, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০৩।

Upinder Singh– A History of Ancient and Early Medieval India– Pearson– 2009.

R.S. Sharma– India's Ancient Past– OUP– New Delhi– 2005.

Raymond Allchin and Bridget Allchin– The Rise of Civilization in India and Pakistan– CUP– 1982.

D D Kosambi– An Introduction to the Study of Indian History– Popular Prakashan– Bombay– 1956.

Romila Thapar– Early India- From The Origins to Circa A.D. 1300– London– 2002.

পর্যায় : ৫

সংস্কৃতির রূপান্তর

(Cultures in transition)

একক : ১৮ ◘ উত্তর ভারত, ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব — ৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব (North India– Circa 1500 BCE—300 BC)

গঠন

১৮.০ উদ্দেশ্য

১৮.১ সূচনা

১৮.২ খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-৬০০ অব্দের উত্তর ভারত

১৮.২.১ বৈদিক সাহিত্য সম্ভার

১৮.২.২ আর্য সমস্যা"—বিতর্ক

১৮.২.৩ আর্যদের আদি বাসস্থান

১৮.২.৪ আর্যদের অভিপ্রয়াণ

১৮.২.৪.১ ভারতের আর্যদের বসতি স্থাপন ও বসতি বিস্তার

১৮.২.৫ রাজনৈতিক পরিস্থিতি

১৮.২.৬ আর্থ-সামাজিক জীবন

১৮.২.৬.১ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

১৮.২.৬.২ সামাজিক জীবন

১৮.২.৭ ধর্মীয় জীবন

১৮.৩ খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০-৩০০ অব্দের উত্তর ভারত

১৮.৩.১ রাজনৈতিক পরিস্থিতি

১৮.৩.২ মগধের আগ্রাসী নীতি

১৮.৩.৩ আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন—দ্বিতীয় নগরায়ণ

১৮.৩.৪ সামাজিক অভিঘাত

১৮.৩.৫ সাংস্কৃতিক জীবন

১৮.৩.৫.১ প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

১৮.৩.৫.২ আজীবিক ধর্মমত

১৮.৩.৫.৩ জৈন ধর্ম : বর্ধমান মহাবীর

১৮.৩.৫.৪ জৈন ধর্মের মূলতত্ত্ব

১৮.৩.৫.৫ জৈনধর্মের বিস্তার

১৮.৩.৫.৬ জৈনধর্মের অবদান

১৮.৩.৫.৭ গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম

১৮.৩.৫.৮ বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি

১৮.৩.৫.৯ বৌদ্ধ মঠ সংগঠন

১৮.৩.৫.১০ বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন

১৮.৩.৫.১১ বৌদ্ধধর্মের প্রসারের কারণ

১৮.৩.৫.১২ ভারতে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্তির কারণ

১৮.৪ উপসংহার

১৮.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১৮.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

১৮.০ উদ্দেশ্য

- এই এককের উদ্দেশ্য হল ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্ব থেকে ৩০০ খ্রীষ্টপূর্ব পর্যন্ত উত্তর ভারতের ইতিহাস পর্যালোচনা করা।
- এই আলোচনা দুটি কালপর্বে করা হবে-
  - ➢ ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ — ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ
  - ➢ ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ — ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ
- ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ — ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দঃ এই অংশে শিক্ষার্থীরা শিখতে পারবেন ভারতে আর্য সভ্যতা ও সংস্কৃতির বিকাশ এবং এই সময়কার রাজনৈতিক, সামাজিক, অর্থনৈতিক ও ধর্মীয় জীবন।
- ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ — ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দঃ এই অংশে শিক্ষার্থীরা অনুধাবন করবেন উত্তর ভারতের রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও রাজনৈতিক পরিস্থিতি। এই আলোচনায় বিশেষ ভাবে জোর দেওয়া হবে মগধের উত্থান, দ্বিতীয় নগরায়ণ প্রক্রিয়া এবং প্রতিবাদী ধর্মমতসমূহের বিকাশ ও বিবর্তন।

১৮.১ সূচনা

খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-৩০০ অব্দ ভারতের ইতিহাসের এই সুদীর্ঘকালব্যাপী পর্ব বিবিধ পরিবর্তনের সাক্ষী। উত্তর ভারতের প্রেক্ষিতে বিচার করলে এই দীর্ঘসময়কাল জুড়ে রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক ও ধর্মীয়

জীবনে বিচিত্র ঘটনা ও পরিবর্তনের নজির লক্ষ্য করা যায়। ভারতের ইতিহাস যে আদপেই অনড়, নিশ্চল জীবনের প্রতিচ্ছবি তুলে ধরে না আলোচ্য কালপর্বের ইতিহাসের পাতায় পাতায় তার প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে। সুদীর্ঘকাল ব্যাপী এই কালপর্বের ইতিহাসের বিশ্লেষণ দুটি ভাগে ভাগ করে করা যেতে পারে- ১.খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-৬০০ অব্দ যা সাধারণভাবে বৈদিক যুগ নামে পরিচিত এবং ২.খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০-৩০০ অব্দ, যে কালপর্ব সমগ্র উত্তর ভারত জুড়ে রাজনৈতিক ক্ষেত্রে মহাজনপদের উদ্ভব, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে নগরায়ণের পুনরাগমন ও ধর্মীয় জগতে ব্রাহ্মণ্য ঐতিহ্য বিরোধী প্রতিবাদী ধর্মান্দোলনের সাক্ষী।

১৮.২ খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-৬০০ অব্দের উত্তর ভারত

খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০ থেকে ৬০০ পর্যন্ত সময়কাল আদিপর্বের ভারত ইতিহাসে বৈদিক যুগ নামে সুপরিচিত। এই পর্বের ইতিহাস রচনার প্রধান উপাদান বৈদিক সাহিত্য। একটু খুঁটিয়ে বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যায় মূলত সিন্ধু নদী ব্যবস্থা ও গাঙ্গেয় উপত্যকার বিস্তীর্ণ অংশই এই অভিজ্ঞতার সাক্ষী ছিল। তাই এই পর্বের উত্তর ভারতের ইতিহাস বৈদিক যুগেরই সমার্থক বলা যায়। যে ইতিহাস রচনার প্রধান উপাদানই হল বৈদিক সাহিত্য। আবার এই বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে প্রধানতম ঋকবেদের রচনাকাল সম্ভবত আনুমানিক ১৫০০-১০০০ খ্রীঃ পূঃ । এর ভিত্তিতেই এর কালপর্ব ঋকবৈদিক যুগ নামে পরিচিত। অন্যদিকে ঋকবেদ ব্যতীত অপরাপর বেদসমূহ- সাম, যজু ও অথর্ব এবং অন্যান্য বৈদিক সাহিত্য এর রচনাকাল আনুমানিক ১০০০-৬০০ খ্রীঃ পূর্বাব্দ। এই সময়কাল পরবর্তী বৈদিকযুগ নামে ঐতিহাসিক মহলে পরিচিত। যাই হোক সর্বপ্রথম উপাদানের আলোচনার মধ্য দিয়েই এই অধ্যায়ের আলোচনা শুরু করা যায়।

১৮.২.১ বৈদিক সাহিত্য সম্ভার

ভারতের অতীত অনুধাবনের প্রচেষ্টায় বৈদিক সাহিত্যের গুরুত্ব অপরিসীম। চরিত্রে মূলত ধর্মীয় এই বিপুল সাহিত্য উপমহাদেশের প্রাচীনতম সাহিত্যকীর্তি। সংস্কৃত 'বিদ' ধাতু থেকে বেদ'শব্দটি উদ্ভূত হয়েছে। বিদ ধাতুর অর্থ জানা, তাই বেদের অর্থ হল জ্ঞান। বেদের এই জ্ঞান পঞ্চইন্দ্রিয়ের মধ্যে সীমাবদ্ধ নয়, তা অনাদি, অনন্ত, অতীন্দ্রিয়। বেদ হল হিন্দুদের প্রাচীনতম শাস্ত্র-গ্রন্থ অর্থাৎ ঈশ্বরের বাণী যা প্রত্যক্ষ বা অনুমানের দ্বারা অনধিগম্য। ঈশ্বরের সৃষ্ট বেদের বাণী প্রাচীন ঋষিরা মনে ধরে রাখতেন এবং বংশ পরম্পরায় এই জ্ঞান মুখে মুখে উচ্চারিত হয়েছে এবং স্মরণে রাখা হয়েছে। এই জন্য বেদের আর একনাম 'শ্রুতি'। বেদকে অপৌরুষেও বা ঈশ্বরের সৃষ্টি বলে আখ্যা দেওয়া হলেও আসলে প্রাচীন ঋষিরাই বেদের রচনাকার ছিলেন। বেদ রচনার কাজে যুক্ত মুনি-ঋষিরা হলেন গৃৎসমদ, বিশ্বামিত্র, বামদেব, অত্রি, ভরদ্বাজ, বশিষ্ঠ, কণ্ব, শৌনক, যম, ভৃন্ড, অঙ্গিরা, অথর্ব প্রমুখ। পরবর্তীকালে লিপি বর্ণমালার উদ্ভাবন হলে শ্রুতিবাহিত বেদ সংকলিত হয়। ধর্মপ্রাণ হিন্দুরা বেদকে হিন্দু ধর্মের আকর গ্রন্থ বলে মনে করেন। মনু বেদকে ধর্মের মূল বলে আখ্যা দিয়েছেন। যাজ্ঞবল্ক্যও বেদকে ধর্মের উৎস বলে মেনেছেন।

বেদের সংখ্যা চার- এই চতুর্বেদ হল ঋক, সাম, যজুঃ ও অথর্ব। বেদকে আবার সংহিতাও বলা হয়। অর্থাৎ ঋক বেদ,- ঋক সংহিতা, সাম বেদ,- সাম সংহিতা নামেও পরিচিত। চারটি বেদের মধ্যে প্রাচীনতম বেদ হল ঋগ্বেদ। ম্যাক্সমুলার ঋকবেদের রচনাকাল ১২০০-৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ধার্য করেছেন। ঋকবেদের প্রাচীনতম

স্তোত্রগুলি ১২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত হয়েছিল এবং একদম শেষের দিকের স্তোত্রগুলি ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে রচিত হয়। ম্যাক্সমুলার উল্লিখিত ঋকবেদের সময় কালকে অনেক পণ্ডিত অগ্রাহ্য করেন। বর্তমানে বিভিন্ন সাক্ষ্য-প্রমাণের ভিত্তিতে ঋকবেদে রচনাকাল ১৫০০-১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ধার্য করা হয়। সামবেদ, যজুঃবেদ ও অথর্ববেদ অনেক পরে রচিত হয়েছিল।

বৈদিক সাহিত্য বেদের চারটি ভাগ- সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে গঠিত। সংহিতা ও ব্রাহ্মণ নিয়ে বেদের কর্মকান্ড এবং আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে বেদের জ্ঞানকাণ্ড গঠিত। ঋগ্বেদ সংহিতা ১০৫০০ ঋক বা স্তোত্রের সংকলন। কয়েকটি ঋকনিয়ে এক একটি সূক্ত, আবার কয়েকটি সূক্ত নিয়ে এক-একটি মণ্ডল গঠিত। ঋকবেদে এরকম দশটি মণ্ডল ও ১০২৮টি সূক্ত আছে। সামবেদ হল সাম বা গীতিমন্ত্রের সংকলন। সামবেদের স্তোত্রগুলি যজ্ঞের সময় গানের মতো সুর করে গাওয়া হত। এর নাম সাম গান। যজুর্বেদ হল আর্যদের যজ্ঞ বিষয়ক মন্ত্রের সংকলন। প্রায় দু''হাজার মন্ত্র যজুর্বেদ সংহিতায় রয়েছে। বাকি মন্ত্রগুলি যজুর্বেদের নিজস্ব। যজুর্বেদের আবার দুটি ভাগ- শুক্ল যজুর্বেদ ও কৃষ্ণ যজুর্বেদ। বাজসনেয় সংহিতা- এই একটি মাত্র সংহিতা শুক্ল যজুর্বেদে রয়েছে। অন্যদিকে কৃষ্ণ যজুর্বেদে রয়েছে চারটি সংহিতা। এগুলি হল কাঠক, কপিষ্ঠল-কঠ, মৈত্রায়নী ও তৈত্তিরীয় বা আপস্তম্ব সংহিতা। সবশেষে অথর্ববেদ হল ইন্দ্রজাল বিষয়ক মন্ত্রের সংকলন। অথর্ববেদের প্রাচীন নাম অথর্বাঙ্গিরস। বস্তুত অথর্ব বলতে শুভ তথা হিতকারী ইন্দ্রজাল বোঝায় যা রোগনাশ ও বিষনাশ করে, আবার অঙ্গিরসের অর্থ অশুভ কর্ম, যেমন শত্রুবধ, মারণ, উচাটন, অভিচার ইত্যাদি বোঝায়। অথর্ববেদ এরকম প্রায় ছয় হাজার মন্ত্রের সংকলন। এরকম কয়েকটি মন্ত্র নিয়ে এক-একটি সূক্ত, আবার কয়েকটি সূক্ত নিয়ে এক-একটি কান্ড। অথর্ববেদে এরকম ২০টি কাণ্ড রয়েছে। অথর্ববেদে তন্ত্র-মন্ত্র, ম্যাজিক থাকায় এবং যাজ্ঞিক ক্রিয়াকর্মের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকায় প্রথম তিন বেদের সঙ্গে যুক্ত করা হয়নি।

ব্রাহ্মণ হল গদ্যে রচিত বেদের স্তোত্রের অর্থ ও প্রয়োগের ব্যাখ্যা। বস্তুত ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলো যাগ- যজ্ঞের বিধি, প্রকরণের ও মন্ত্রগুলির প্রয়োগ নিয়ে ব্যাখ্যা তথা নির্দেশিকা। বেদের মন্ত্র গুলো যেহেতু যজ্ঞ বিষয়ক তাই ব্রাহ্মণ গ্রন্থ গুলি যাগ-যজ্ঞ বিবরণ সর্বস্ব হয়ে উঠেছে। ঋক সংহিতার ওপর রচিত দুটি ব্রাহ্মণ গ্রন্থ হল ঐতরেয় ব্রাহ্মণ ও শাঙ্খায়ন বা কৌষীতকী ব্রাহ্মণ। সাম সংহিতার উপর রচিত হয়েছিল জৈমিনীয় ও পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ। কৃষ্ণ যজুঃ সংহিতার উপর রচিত হয়েছিল তৈত্তিরীয় ব্রাহ্মণ এবং শুক্ল যজুঃ সংহিতার উপর রচিত শতপথ ব্রাহ্মণ। অথর্বসংহিতার উপর রচিত একমাত্র ব্রাহ্মণ হল গোপথ ব্রাহ্মণ।

বৈদিক সাহিত্যের দুই গুরুত্বপূর্ণ অঙ্গ হল আরণ্যক ও উপনিষদ। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলোর পরিশিষ্ট রূপে অরণ্যচারী ঋষিরা সৃষ্টি করেছিলেন এক ধরনের সাহিত্য ও দর্শন যা আরণ্যক নামে পরিচিত। অরণ্যের নির্জনতায় ঋষিদের অধিগত বিদ্যা তথা জ্ঞানই হল আরণ্যক। অরণ্যে রচিত হয়েছিল বলেই হয়তো এগুলির নাম আরণ্যক। আরণ্যকের রচিয়তা ঋষিরা যাগ-যজ্ঞে বিশ্বাস করতেন না। তাই অরণ্যবাস করে আত্মার মুক্তির কথা ভাবতেন। এর ফলে উচ্চ দার্শনিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আবার আরণ্যকের পরিশিষ্টরূপে যে গ্রন্থ গুলি রচিত হয়েছিল তা উপনিষদ নামে পরিচিত। উপনিষদ পদটি উপ ও নি —পূর্বক সদধাতু থেকে নিষ্পন্ন যার অর্থ উপবেশন। গুরুর কাছে বসে শিষ্যকে এই জ্ঞান লাভ করতে হত বলে উপনিষদকে গুরুমুখী বিদ্যা বলা হয়। উপনিষদের সংখ্যা অনেক হলেও ১৪ টি উপনিষদ ছিল প্রধান। এগুলি চারটি বেদের সঙ্গে যুক্ত। ঋগবেদের সঙ্গে যুক্ত ঐতরেয় ও কৌষীতকী উপনিষদ, শুক্ল যজুর্বেদের সঙ্গে বৃহদারণ্যক ও ঈশ, কৃষ্ণ যজুর্বেদের সঙ্গে তৈত্তিরীয়, কঠ বা কাঠক, মৈত্রায়ণীয়, মহানারায়ণীয় ও শ্বেতাশ্বতর, সাম বেদের সঙ্গে ছান্দোগ্য

ও কেন এবং অর্থববেদের সঙ্গে যুক্ত মণ্ডুক, প্রশ্ন ও মাণ্ডুক্য উপনিষদ। উপনিষদে আর্য ঋষিদের উচ্চ দার্শনিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আত্মা ও ব্রহ্ম বা জীবাত্মা ও পরমাত্মাকে কেন্দ্র করেই উপনিষদের দার্শনিক চিন্তা আবর্তিত হয়েছে। উপনিষদে বলা হয়েছে ব্রহ্ম বা পরমাত্মাই একমাত্র সত্য, বিশ্বব্রহ্মাণ্ডের সকল কিছুর মধ্যেই তার সত্তার প্রকাশ। আত্মা পরমাত্মারই অংশ, জীবাত্মার মধ্যেই পরমাত্মার বাস। সংক্ষেপে বলা যায় এই জগৎ ব্রহ্মেরই প্রকাশ। আত্মা তাই অবিনশ্বর, যা মৃত্যু পরও বিদ্যমান। বৃহদারণ্যক উপনিষদে আমরা প্রথম জন্মান্তরবাদের কথা জানতে পারি। উপনিষদে কর্মফল তত্ত্ব প্রতিফলিত হয়েছে অর্থাৎ মানুষের কর্ম অনুযায়ী ইহজন্মে ও পরজন্মে সুখ-দুঃখ ভোগ করতে হয়। মৃত্যুর পরও মানুষ কর্ম অনুযায়ী পরজন্মে তার ফল ভোগ করে। আত্মার যেহেতু বিনাশ নেই তাই মৃত্যুর পরে আত্মা পুনরায় নতুন দেহে জন্মগ্রহণ করে বলে উপনিষদে বলা হয়েছে। আসক্তি ও অজ্ঞতার বন্ধন ছিন্ন হলে জীবাত্মা পরমাত্মায় বিলীন হয়, তখন মানুষের আর পুনর্জন্ম হয় না। জন্ম-মৃত্যুর চক্র ও কর্মফলের তাড়না থেকে মুক্ত হবার জন্যই ধ্যান, সন্ন্যাস, পরিশুদ্ধ নীতিবোধের কথা উপনিষদে বলা হয়েছে।

সংহিতা, ব্রাহ্মণ, আরণ্যক ও উপনিষদ নিয়ে গঠিত বেদের সঠিক পাঠ এবং যাগ-যজ্ঞের সুষ্ঠু ও যথাযথভাবে নিয়ম পালনের জন্য যে গ্রন্থ রচিত হয় তা বেদাঙ্গ নামে পরিচিত। বেদাঙ্গ সূত্র সাহিত্য নামেও পরিচিত। বেদাঙ্গের ছটি ভাগ হল শিক্ষা, কল্প, ব্যাকরণ, নিরুক্ত, ছন্দ ও জ্যোতিষ। শিক্ষায় রয়েছে বৈদিক মন্ত্রের সঠিক তথা বিশুদ্ধ উচ্চারণ বিষয়ক নির্দেশাবলী। কল্প হল আর্যদের সমাজ পরিচালনার নিয়ম এবং যাগ-যজ্ঞের প্রণালী বা পদ্ধতির সংকলন। কল্প বেদাঙ্গের এক গুরুত্বপূর্ণ অংশ। কারণ এতে আর্যদের গার্হস্থ্য জীবন, সমাজ ও ধর্মীয় জীবন যাপন সংক্রান্ত নানা অনুশাসন রয়েছে। কল্প সূত্রের চারটি ভাগ রয়েছে। এগুলি হল শ্রৌত্য, গৃহ্য, শুল্ব ও ধর্ম। শ্রৌত্যসূত্রে বৈদিক যাগ-যজ্ঞের কথা বলা হয়েছে। গৃহ্যসূত্রে গৃহীর জীবন যাপন তথা আচরনীয় সংস্কারের কথা বলা আছে। শুল্বসূত্রে রয়েছে যজ্ঞবেদির পরিমাপ সংক্রান্ত বিবিধ তথ্য। এর মাধ্যমে আর্যদের জ্যামিতিক জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া যায়। আর ধর্মসূত্রে রয়েছে সমাজ ও রাষ্ট্র সংক্রান্ত অনুশাসন। ব্যাকরণের মাধ্যমে পদের শুদ্ধাশুদ্ধি জ্ঞান ও ভাষার শব্দ প্রয়োগ বিষয়ে জানা যায়। পাণিনির অষ্টধ্যায়ী ব্যাকরণ গ্রন্থ এক শ্রেষ্ঠ নিদর্শন। নিরুক্ত হল পদের অর্থবোধ বিষয়ক জ্ঞান। এর থেকে বৈদিক ভাষাতত্ত্বের বিষয় জানা যায়। যাস্ক রচিত নিরুক্তই এ বিষয়ের একমাত্র গ্রন্থ। ছন্দে রয়েছে ছন্দ-বিষয়ক জ্ঞান যাতে বেদের স্তোত্রগুলি সঠিক ছন্দে উচ্চারিত হয়। জ্যোতিষ হল গ্রহ-নক্ষত্র বিষয়ক জ্ঞান যাতে যজ্ঞের দিন, ক্ষণ সঠিকভাবে নির্ধারণ করা যায়।

ভারতীয় অতীত অনুসন্ধানের প্রচেষ্টায় বৈদিক সাহিত্যের তাৎপর্য নিয়ে কোথাও কোন দ্বিমত নেই। কিন্তু বৈদিক ঐতিহ্যকেই ভারতীয় সংস্কৃতির প্রধান বা একমাত্র চালিকাশক্তি মনে করা ঠিক নয়। কারণ এই ধরণের দৃষ্টিভঙ্গী কার্যত স্বীকৃতি দেয় যে ভারতীয় সমাজ ও সংস্কৃতিতে পরিবর্তন প্রায় নেই, তা অনড়, অটল, স্থাণু। ভারতীয় ইতিহাসের এই জাতীয় চিত্রায়ণ উনিশ শতকে ঔপনিবেশিক ইতিহাসচর্চায় যথেষ্ট প্রাধান্য পেয়েছিল। কিন্তু এই মত এখন অনেকটাই ভ্রান্ত বলে প্রমাণিত। পুনরুজ্জীবনবাদী, আবেগতাড়িত এবং গর্বোদ্ধত মানসিকতাসহ বৈদিক ঐতিহ্যের মূল্যায়ন প্রকৃতপক্ষে বিশ্লেষণধর্মী ইতিহাসচর্চার পরিপন্থী। এই বিষয়ে আমাদের সচেতন থাকা দরকার।

১৮.২.২ "আর্য সমস্যা"—বিতর্ক

ঋগ্বেদ শুধুমাত্র প্রাচীনতম ভারতীয় সাহিত্য ও বৈদিক সাহিত্য সম্ভারের প্রাচীনতম অংশ তাই-ই নয়, তা সমগ্র ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষারও সম্ভবত প্রাচীনতম সাহিত্যকীর্তি। ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার আদিপর্ব, সম্ভাব্য উৎসস্থান এবং ভৌগোলিক প্রসার বুঝতে গেলেও ঋগ্বেদের তাৎপর্য অপরিসীম। বিষয়টি স্পষ্টতই তুলনামূলক ভাষাতত্ত্বের এক্তিয়ারভুক্ত। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, ভাষাতাত্ত্বিকরা বৈদিক সংস্কৃত, গ্রিক, লাতিন, গথিক, আইরিশ, তোখারীয় প্রভৃতি ভাষার আদি জননীরূপে আদি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার রূপ ও কাঠামো পুনর্গঠন করেছেন। এই আদি ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার উৎস কোথায়, কবে এবং তার প্রাথমিক ব্যবহারকারী কারা—এই প্রশ্নগুলিকে ঘিরেই গড়ে উঠেছে তথাকথিত 'আর্য সমস্যা' বিষয়ক আলোচনা।

'আর্য' শব্দটির ব্যঞ্জনা ও প্রয়োগ নিয়ে পণ্ডিতমহলে মতানৈক্য লক্ষ করা যায়। 'আর্য' শব্দটির ব্যুৎপত্তিগত অর্থ হলো পূজ্য, শ্রেষ্ঠ, সৎকুলজাত, সুসভ্য। তাই ভারতের উচ্চশ্রেণির অধিবাসীগণ এমনকি জাতীয়তাবাদী নেতাদের একাংশ নিজেদের আর্যজাতি সম্ভূত বলে শ্লাঘা বোধ করেন। শুধু ভারতীয়রা নন সুদূর অতীতে পারস্যের সম্রাট প্রথম দারায়ুস (ড্যরায়াস) আনুমানিক ৪৮৬ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে তার সমাধি ফলকে নিজেকে একজন আর্য বংশোদ্ভূত পারসিক' বলে উল্লেখ করেছেন। কিন্তু প্রকৃত অর্থে আর্য বলতে কোন জাতি বা মানবগোষ্ঠীকে বোঝায় না, বোঝায় এক ভাষাগোষ্ঠীকে যারা এই ভাষায় কথা বলেন। এই ভাষা গোষ্ঠী হল ইন্দো ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠী। এই ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত ভাষাগুলি হল গ্রীক, ল্যাটিন, গথিক, জার্মান, সংস্কৃত কেলটিক এবং পারসিক।

১৫৮৩ খ্রিস্টাব্দে ফিলিপো সসেটি নামে ফ্লোরেন্সের একজন বণিক বাণিজ্য উপলক্ষে ভারতে আসেন। গোয়ায় অবস্থানকালে তিনি সংস্কৃত ভাষা অধ্যয়ন করেন। অধ্যয়নকালে তিনি প্রথম উপলব্ধি করেন, ল্যাটিন ও সংস্কৃত ভাষার মধ্যে সাদৃশ্য রয়েছে। এরপর ১৭৮৬ খ্রীঃ স্যার উইলিয়ামস জোন্স তাঁর এশিয়াটিক সোসাইটি বক্তৃতামালায় সংস্কৃত, পারসিক, গথিক, ল্যাটিন, গ্রীক, জার্মান ও কেলটিক এই সাতটি ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার মধ্যে গভীর যোগসূত্রের কথা ব্যক্ত করেন। তিনি বলেন, এই ভাষাগুলি একটি আদি ভাষা থেকে উৎপন্ন হয়েছে, অর্থাৎ এই ভাষাগুলো উৎস এক। এরপর ১৮৭৪ সালে জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলার "আর্যদের বাসস্থান" শীর্ষক প্রবন্ধে দৃঢ়তার সঙ্গে বলেন আর্য বলতে ভাষা বোঝায়, জাতি নয়। তিনি বলেনঃ "Aryan in scientific language, is utterly inapplicable to race. It means language and nothing but language"। পরবর্তী কালে গবেষক ও পণ্ডিতরাও ভাষা পদের ব্যবহার, গঠন, বিন্যাস ও ধ্বনি পরীক্ষা করে এই একই মত পোষণ করেছে। তাঁদের অনুমান আর্যদের ব্যবহৃত মূল ভাষাটি বহুদিন আগেই বিলুপ্ত হয়েছে। পণ্ডিতবর্গ মূল আর্য ভাষাটিকে আদি আর্য, আদি ইন্দো-ইউরোপীয়, আদি ইন্দো-জার্মান ইত্যাদি নামে অভিহিত করেছেন। এই মূল ভাষায় কথা বলা মানুষরাই আদি আর্য। বৈদিক আর্য, ইরানীয় আর্য ও ইউরোপীয় আর্যরা তাদেরই উত্তরসূরী।

১৮.২.৩ আর্যদের আদি বাসস্থান

আর্যদের আদি বাসস্থান কোথায় ছিল তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে যথেষ্ট বিতর্ক রয়েছে। একদল পণ্ডিত মনে করেন আর্যরা বাইরে থেকে আসেনি, ভারতেরই আধিবাসী। এই মতে বিশ্বাস করেন ডি. এ. সি. দাস, পণ্ডিত

গঙ্গানাথ ঝা, ডি. ডি. এস. ত্রিবেদী, এল, ডি, কাল্লা, এ.ডি. পুসলকর, পারগিটার প্রমুখ পণ্ডিতরা। ঋকবেদে উল্লিখিত সপ্তসিন্ধু অঞ্চল, মুলতানের দেবকী নদী অঞ্চল অথবা গঙ্গা যমুনা নদী সঙ্গমস্থলে অবস্থিত ব্রহ্মার্ষিদেশকে তাঁরা আর্যদের আদি বাসভূমি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ভারতকে আর্যদের আদি বাসস্থান হিসেবে চিহ্নিত করার স্বপক্ষে তারা বেশকিছু যুক্তি দেখিয়েছেন। আর্যদের প্রাচীনতম গ্রন্থ ঋকবেদে সপ্তসিন্ধুকেই 'দেবকৃত যোনি' বা দেবনির্মিত দেশ' বলে বন্দনা করেছেন। আর্যরা প্রথম দিকে সপ্তসিন্ধু বা সিন্ধু অববাহিকা অঞ্চলে বাস করতেন, অন্য কোন স্থানের নাম উল্লেখ করেনি। সপ্তসিন্ধু অঞ্চলেই আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল এমন ধারণাই বেদে ধ্বনিত হয়েছে। আর্যদের আদি নিবাস ভারতে, এই মতের সমর্থনে পণ্ডিতরা বলেন যারা দেশ ত্যাগ করে অন্য দেশে চলে যান তারা দীর্ঘদিন তাদের ছেড়ে আসা জন্মভূমি কথা সযত্নে লালন করেন। আদি দেশের কথা গৌরবের সাথে স্মরণ করাই মানুষের সহজাত ধর্ম। তাই আর্যরা অন্য কোন দেশ থেকে এদেশে এলে সেকথা তাদের সাহিত্য ধ্বনিত হতো। কিন্তু বৈদিক সাহিত্যে সপ্তসিন্ধু ছাড়া অন্য কোন দেশের নাম পাওয়া যায়নি, কোনো অভিপ্রয়াণের স্মৃতিচারণাও এখানে নেই। আর্য সাহিত্য বলতে আমরা শুধু বৈদিক সাহিত্যকেই বুঝি। তারা বাইরে থেকে এলে বিদেশেই বেদের মত সাহিত্য রচিত হতো। কিন্তু বেদের অনুরূপ কোন সাহিত্য বিদেশে কোথাও পাওয়া যায়নি। ভারতবর্ষই আর্যদের আদি বাসভূমি। তাই আর্য মনীষার চূড়ান্ত প্রকাশ ঘটেছে এদেশ। ভারত থেকে বেরিয়ে যাওয়া আর্যগোষ্ঠী সাংস্কৃতিক মানদণ্ডে পিছিয়ে ছিল, তাই বেদের মত সাহিত্য রচনা করতে পারেনি। ভারতে আর্যদের আদি বাসস্থান নিয়ে পারগিটার বলেছেন উত্তর-পশ্চিম থেকে ভারতে আর্যদের অভিপ্রয়াণের কোন প্রমাণ নেই। বরং উত্তর-পশ্চিম দিক দিয়ে ভারত থেকে আর্যদের বহির্গমন এর প্রমাণ ঋকবেদের নদীস্তুতিতে পাওয়া যায়। সেখানে নদ-নদী গুলির নাম পূর্ব দিক থেকে শুরু করে উত্তর-পশ্চিমে শেষ হয়েছে। নদী গুলির মধ্যে প্রথমে পূর্ব দিকের নদী গঙ্গা, পরে যমুনা এবং সবশেষে উত্তর-পশ্চিম এর নদী সরস্বতী দিয়ে শেষ হয়েছে। বৈদিক আর্যরা বিদেশ থেকে ভারতে এসেছে এর সপেক্ষ কোন প্রমাণ নেই। ভারতের বিভিন্ন ভাষায় সংস্কৃত শব্দের অনুপ্রবেশ ঘটেছে, কিন্তু ইউরোপের ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগুলির ক্ষেত্রে তা হয়নি। আর্যরা বাইরে থেকে এলে তা ঘটতো না। যে প্রাক বৈদিক ভাষা ভারতে আমাদের ভাষা ছিল, আর্যরা ভারত থেকে বাইরে যাবার আগে এখানে আর্য-অনার্য সংযোগে অন্যান্য ভাষার সৃষ্টি হয়েছিল। তাই ভারতের অন্যান্য ভাষায় সংস্কৃতের প্রভাব লক্ষ করা যায়। আর্যদের জীবনে যাগযজ্ঞের প্রাধান্য ছিল এবং এই উপলক্ষে এবং অন্যান্য উৎসবে তারা সোমরস পান করতেন। ঋগ্বেদে সোমলতা (যার থেকে সোমরস তৈরি হয়) হিমালয় এর মূজবান পাহাড়ের জন্মাত বলে উল্লেখ ররেছে। এর থেকে বোঝা যায় আর্যরা বহু আগে থেকেই এই অঞ্চলে বসবাস করত। আর্যদের আদি বাসভূমি ভারতে নয় বলে যারা বিরোধিতা করেন তারা এই যুক্তি দেখান ঋকবেদে বাঘের উল্লেখ নেই, চালের কথা বলা নেই, অতএব তারা পরে ভারতে এসেছেন। তারা আরো যুক্তি দেখান বেদে হাতিকে মৃগহস্তিন আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অর্থাৎ হাতি সম্পর্কে তাদের ধারণা স্পষ্ট নয়। ঋগ্বেদে চাল ও বাঘ না উল্লেখিত থাকায় কিছু প্রমাণিত হয় না। ঋকবেদে তো লবণের কোথাও বলা নেই। কিন্তু তা থেকে কি এই সিদ্ধান্তে আসা যায় যেন তারা লবণহীন বিস্বাদ খাদ্য গ্রহণ করতেন? আর 'মৃগহস্তিন' শব্দটি সম্পর্কে ভারতীয় ঐতিহাসিকদের বক্তব্য হল এটা আর্যদের কাব্যিক মনের প্রকাশ। আর্যরা যে অঞ্চলে প্রথম বসবাস করতেন সেই পাঞ্জাবে হাতি মোটেই অপরিচিত ছিল না। সিন্ধু অববাহিকায় প্রাপ্ত সিলমোহর থেকে জানা যায় ঐ অঞ্চলের মানুষ হাতি ও বাঘের সঙ্গে পরিচিত ছিল।

ভারতবর্ষ আর্যদের আদি বাসভূমি, এই মত বেশিরভাগ পণ্ডিতই মেনে নেননি। তাঁদের বক্তব্যের সপক্ষে তারা জোরালো যুক্তি পেশ করেছেন। আর্যদের আদি বাসস্থান যে ভারতবর্ষে ছিল তার সপক্ষে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক

প্রমাণ আজও পাওয়া যায়নি। অথচ বোঘজকোই ও তেল-এল আর্মানা নামে দুটি শিলালিপি এশিয়া মাইনরে ও মিশরে আবিষ্কৃত হয়েছে। অনুমান ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এই লিপিতে হিটাইট রাজারা বৈদিক দেবতা ইন্দ্র, বরুণ প্রমুখ দেবতার নাম উল্লেখ করেছেন। তেল-এল আর্মানা লিপিতে প্রাচীন সিরিয়া রাজাদের নাম আর্যদের সঙ্গে সাদৃশ্য বহন করে। তাই অনুমান করা হয় যে আর্যরা বাইরে থেকেই ভারতে এসেছিল। তাছাড়া ভারতবর্ষই যদি আর্যদের আদি বাসভূমি হতো তাহলে তাদের বহির্গমনের পূর্বে সমগ্র দেশকে আর্য সংস্কৃতিভুক্ত করার চেষ্টা করত। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় সমগ্র দক্ষিণ ভারত দীর্ঘদিন আর্যসংস্কৃতির বাইরে ছিল এবং সেখানকার অনার্য দ্রাবিড় ভাষা বহুকাল ধরে প্রচলিত রয়েছে। ভৌগোলিক দিক থেকেও দেখা যায় ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা গোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত বেশীরভাগ ভাষা ইউরোপে অবস্থিত। বস্তুত ১০ টি আর্য ভাষাগোষ্ঠীর মধ্যে ৭টিরই অবস্থান ইউরোপে। এগুলি হল গ্রীক, ল্যাটিন, কেলটিক, টিউটনিক, বাল্টিক, স্লাভনিক ও আলবানিয়া। সমগ্র এশিয়ায় মোট তিনটি ভাষাগোষ্ঠীর রয়েছে। এগুলো হল সংস্কৃত, পারসিক ও আর্মেনিয়ান। বেশিরভাগ আর্য ভাষা গোষ্ঠীর এই ঘন সন্নিবেশ ইউরোপে থাকায় আর্যদের আদি বাসস্থান ইউরোপে হওয়ার সম্ভাবনা বেশি। মূল আর্যভাষার সবচেয়ে কাছের এবং অপেক্ষাকৃত বিশুদ্ধ ভাষাটি হল লিথুয়ানিয়ান। তাই অনুমান করা হয় আর্যদের আদি বাসভূমি লিথুয়ানিয়ার নিকটবর্তী কোন স্থানে হবে। সংস্কৃত ভাষায় যে তালব্য বর্ণর (ন, ং, ৎ ইত্যাদি) প্রাধান্য লক্ষ্য করা যায় তা অন্য কোন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় নেই। ভারতে বিদেশ থেকে আসা আর্যদের ভাষার উপর স্থানীয় দ্রাবিড় ভাষার প্রভাব এর ফলে সংস্কৃতি এই ধ্বনিবিশিষ্ট অর্জন স্থানীয় অস্ট্রিক বা দ্রাবিড় ভাষার প্রভাবের ফলে সংস্কৃত এই ধ্বনিবৈশিষ্ট্য অর্জন করেছিল। আর্যরা ভারত থেকে বিদেশ ছড়িয়ে পড়লে অন্যান্য আর্যভাষায়ও এই ধ্বনিবৈশিষ্ট্য লক্ষ্য করা যেত। তাছাড়া হরপ্পা সংস্কৃতির ভাষা যদি সংস্কৃত প্রমাণিত হতো তাহলে ভারতকে আর্যদের আদি বাসভূমি হিসাবে মেনে নেওয়া যেত। কিন্তু হরপ্পিয়দের ভাষা সংস্কৃতের সঙ্গে কোনও সাদৃশ্য বহন করে না। এর থেকে বোঝা যায় ভারত আর্যদের আদি বাসভূমি নয়, তারা বাইরে থেকেই ভারতে আসে। আর্যদের জীবনে ঘোড়ার গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। প্রথম থেকেই তারা ঘোড়াকে পোষ মানাতে শিখেছিল। কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশে ২০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পূর্বে ঘোড়ার অস্তিত্বের প্রমাণ মেলেনি। অথচ কৃষ্ণসাগরীয় ও দক্ষিণ উরালে ৬০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ঘোড়ার ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। ইউরোপকে যারা আর্যদের আদি বাসভূমি মনে করেন তারা বলেন ঋগ্বেদ অনেক পরবর্তীকালে সংকলন। এই সংকলন থেকে বৈদিক আর্যদের সম্বন্ধে জানা গেলেও আর্যদের পূর্বপুরুষ তথা আদি আর্যদের সম্পর্কে কিছু জানা যায় না।

আবার ইউরোপের ঠিক কোথায় আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল তা নিয়েও পণ্ডিতদের মধ্যে মতানৈক্য রয়েছে। কেউ বলেন সেই অঞ্চলটি অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরী-বোহেমিয়া অঞ্চল, আবার কারোর মতে সেটা উরাল পর্বত এর দক্ষিণ কিরঘিজ স্তেপি অঞ্চল। আবার অনেকে মনে করেন পশ্চিমে পোল্যান্ড থেকে পূর্ব এশিয়া পর্যন্ত বিস্তৃত অঞ্চলেই আর্যদের আদি বাসস্থান ছিল। মার্কিন প্রত্নতাত্ত্বিক মারিয়া গিয়ামবুটাস দক্ষিণ ইউক্রেনকেই আর্যদের আদি বাসভূমি হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। ব্রান্ডেন্সটাইন, ও স্রডার, পি. জাইলস এ. এল. ব্যাশাম, ডি. ডি. কোশাম্বী, বিভিন্ন ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা বিশ্লেষণ করে আদি আর্যদের ও তাদের বাসস্থানের কিছু বৈশিষ্ট্যের কথা বলেছেন। তাঁদের মতে আদি আর্যদের ভাষায় সমুদ্র ও ঐ জাতীয় কোন শব্দ ছিল না। তারা কোন উপকূল অঞ্চলের বাসিন্দা ছিলেন না। তারা যেসব গাছপালা ও পশু পাখির নাম উল্লেখ করেছেন তা নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলের। আর্যরা ওক, বীচ, উইলো, দেবদারু প্রভৃতি গাছের এবং ষাঁড়, গরু, ভেড়া, কুকুর, শুকর, হরিণ, হাস, ঈগল, নেকড়ে, ভাল্লুক প্রভৃতি পশুপাখির সঙ্গে পরিচিত ছিল। অর্ধ যাযাবর আর্যরা তখন সবেমাত্র তাদের

যাযাবরের জীবন ত্যাগ করে কৃষি কাজ শুরু করেছিল। তাই তাদের জীবন-জীবিকার উপযোগী নাতিশীতোষ্ণ অঞ্চলে বসতি স্থাপন করেছিল, যেখানে কৃষিকাজের জন্য উর্বর জমি এবং ঘোড়া ও গবাদি পশুর জন্য চারণভূমি রয়েছে। তাদের নাতিশীতোষ্ণ জলবায়ুতে ওকে, বীচ, উইলো প্রভৃতি গাছ এবং গরু, ঘোড়া, ভেড়া, চড়ানোর উপযোগী ছিল। জাইলসের মতে আর্যদের বসবাসের উপযোগী অঞ্চল অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীতেই রয়েছে। অবশ্য জাইলসের মত অনেকেই গ্রহণ করেননি প্রধানত দুটি কারণে। প্রথমত জাইলসের মতের সমর্থনে কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি। দ্বিতীয়তঃ আর্যদের মতো এক বৃহৎ মানবগোষ্ঠী অষ্ট্রিয়া-হাঙ্গেরীর মত সংকীর্ণ অঞ্চলে বসবাস করত এরকম ধারণা অসংগত বলে মনে হয়।

মার্কিন মহিলা প্রত্নতত্ত্ববিদ মারিয়া গিয়ামবুটাসের মতে দক্ষিণ ইউক্রেনই ছিল আর্যদের আদি বাসভূমি। তাঁর মতে ৪৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইউক্রেনে এমন এক মানব গোষ্ঠী বাস করত যারা ঘোড়াকে বশে এনেছিল। এই মানুবগোষ্ঠী চাকাওয়ালা গাড়ি ব্যবহার করত। তারা কৃষিকাজ ও পশুপালন করত এবং তামা ব্রোঞ্জের জিনিসপত্র ব্যবহার করত। এই জনগোষ্ঠীকেই তিনি আদি আর্য বলে চিহ্নিত করেছেন, যারা ক্রমশ পূর্ব দিকে ছড়িয়ে পড়ে। এরা ২০০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ ভল্গা নদী পর্যন্ত অগ্রসর হয়।

মারিয়া গিয়ামবুটাসের এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। আমরা জানি ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকেই আর্যরা বসবাস করছে এবং তখন তাদের পশুচারণই প্রধান জীবিকা ছিল, কৃষির ব্যাপক বিস্তার হয়নি। তাহলে প্রশ্ন থেকে যায় যে সাড়ে তিন হাজার বছরে আর্যদের আর্থ-সামাজিক জীবনে কোন পরিবর্তন আসেনি? এটা কি সম্ভব?

আর্যদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে জার্মান পণ্ডিত ব্রান্ডেন্সটাইনের মত যথেষ্ট প্রণিধানযোগ্য। তিনি ব্যবহারিক শব্দার্থ বিদ্যার সাহায্য তাঁর জোরালো বক্তব্য পেশ করেন। তাঁর মতে উরাল পর্বতের দক্ষিণ পাদদেশে অবস্থিত বিস্তীর্ণ কিরঘিজ স্তেপ বা তৃণজমিই হল আর্যদের আদি বাসস্থান। তাঁর মতে আর্যরা প্রথম দিকে যেসব শব্দ ব্যবহার করতেন তাতে তাঁদের পাহাড়ের পাদদেশে অবস্থিত তৃণভূমির বাসিন্দা মনে হয়। ওই অঞ্চলে হরিণ, শিয়াল, বন্য শুয়োর, ভাল্লুক ইত্যাদি প্রাণীর অস্তিত্ব ছিল। ব্রান্ডেনস্টাইন মনে করেন ঐ অঞ্চল মধ্য এশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশে কিরঘিজ স্তেপ ছাড়া অন্য কোন স্থান নয়। পরবর্তীকালে ইন্দো-ইউরোপীয় শব্দাবলীতে সম্পূর্ণ ভিন্ন ধরণে জমি, গাছপালা এবং জন্তুদের সন্ধান পাওয়া যায়। সেখানে শুষ্ক তৃণভূমি পরিবর্তে জলাভূমি, গাছপালা ইত্যাদি পাওয়া যায়। এর থেকে মনে হয় কিরঘিজ স্তেপ এর পর আর্যরা কারপেথিয়ান পর্বতের পূর্ব দিকের অঞ্চলে বসবাস শুরু করেছিল। ব্রান্ডেনস্টাইন মনে করেন, পরবর্তীকালে আর্যদের আরেকটি গোষ্ঠী দেশ ত্যাগ করে পূর্ব দিকে চলে যান এবং তাঁরা পারস্য (ইরান) ও ভারতে এসে পৌঁছান। অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় মনে করেন ইউরেশিয়ার কোন তৃণভূমি ছিল ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষাগোষ্ঠীর আদি বাসস্থান। কারণ ঘোড়া ও গবাদি পশুগুলির জীবনধারণের জন্য চারণ ভূমির কাছাকাছি থাকা আবশ্যক ছিল।

ব্রান্ডেনস্টাইনের উপরোক্ত বক্তব্য অনেকের কাছে গ্রহণযোগ্য মনে হয়নি। অধ্যাপক এ. এল. ব্যাশামের মতে পশ্চিম পোল্যান্ড থেকে পূর্বে মধ্য এশিয়া পর্যন্ত বিস্তীর্ণ তৃণভূমি অঞ্চলই আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল। একসময় গর্ডন চাইল্ড মনে করতেন উত্তর ইউরোপ ছিল আর্যদের আদি বাসস্থান। পরে তিনি তার মত পরিবর্তন করে দক্ষিণের রাশিয়াকে আর্যদের আদি বাসস্থান হিসেবে চিহ্নিত করেন। রামশরণ শর্মার মতে আর্যদের আদি বাসভূমি ছিল ককেশাস পর্বতমালার দক্ষিণে। বর্তমানে স্থানগুলি জর্জিয়া, আর্মেনিয়া ও আজারবাইজান অঞ্চল। অধ্যাপক শর্মা বলেন যে আনুমানিক সপ্তম-ষষ্ঠ সহস্রাব্দে আর্যরা ককেসাস পর্বতমালার দক্ষিণ দিকে বসবাস করত। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম সহস্রাব্দের মাঝামাঝি সময়ে আর্যদের একটি শাখা পূর্বদিকে অতিক্রম করে।

আর্যদের এই পূর্বদিকের শাখাই ভারতের বুকে ঢেউ এর মত আছড়ে পড়ে। অধ্যাপক শর্মার এই বক্তব্যের সপক্ষে তিনি যুক্তি প্রদর্শন করেননি। তাছাড়া ককেসাস পর্বতমালার দক্ষিণে এখনো পর্যন্ত কোন প্রত্নবস্তুর সন্ধান পাওয়া যায়নি যার থেকে প্রমাণিত হয় আর্যরা খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম-ষষ্ঠ সহস্রাব্দে ওই অঞ্চলে বসবাস করতেন।

উপরোক্ত আলোচনা থেকে আর্যদের আদি বাসস্থান সম্পর্কে নানা অভিমত জানা যায়। তবে আদি আর্যরা যে ভারতের অধিবাসী নন এই মতের সপক্ষেই জোরালো যুক্তি রয়েছে। তবে ভারতের বাইরে ঠিক কোন অঞ্চল থেকে তারা এসেছে তার সপক্ষে অকাট্য প্রমাণ নেই। কিন্তু অধিকাংশ ঐতিহাসিক ও পণ্ডিত মনে করেন তারা মধ্য এশিয়ার উরাল পর্বতের পাদদেশের কিরঘিজ স্তেপি বা তৃণভূমি থেকে ভারতে প্রবেশ করেছিল। যদিও এই ব্যাপারে চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত গ্রহণের সময় এখনো আসেনি। রোমিলা থাপার এ প্রসঙ্গে একটি জরুরি বিষয় উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে, জাতীয়তাবাদী গৌরব প্রতিষ্ঠার তাগিদে বিভিন্ন এলাকাকে ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষার উৎসস্থান হিসাবে শনাক্ত করেছেন বিভিন্ন বিশেষজ্ঞ। আর্য' তথা ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা ব্যবহারকারীদের আদি বাসস্থান নির্ধারনের এই প্রয়াসকে তাই প্রধানত উনিশ শতকীয় মানসিকতা থেকে সঞ্জাত বলাই যায়।

১৮.২.৪ আর্যদের অভিপ্রয়াণ

আর্যরা দীর্ঘকাল আদি বাসভূমিতে বসবাসের পর কেন তারা দেশ ছাড়ল এ প্রশ্ন সকলের মনে জাগে। কোন পথ দিয়েই বা তারা ভারতে এসে পৌঁছলেন? সম্ভবত জনসংখ্যা বৃদ্ধি, জলবায়ুর পরিবর্তনজনিত জমির শুষ্কতা, পর্যাপ্ত চারণভূমির অভাব ইত্যাদি আদি বাসভূমি ত্যাগের কারণ হতে পারে। তাদের একটি দল ইয়োরোপীয় দেশগুলির দিকে, আর বাকি অংশ পূর্বদিকে অভিপ্রয়াণ করেছিল। তাদের এই অভিপ্রয়াণ একদিনে ঘটেনি, দীর্ঘকাল ধরে চলেছিল। আর্যদের যে শাখাটি ভারতের দিকে অগ্রসর হয় তারা দানিয়ুব নদীর তীর ধরে প্রথমে ওয়ালাসিয়ার সমভূমি এবং পরে আরও দক্ষিণে দারদানেলেস ও বসফরাস প্রণালী অতিক্রম করে এশিয়া মাইনরে এসে উপস্থিত হয়। তারপর তারা এশিয়া মাইনরের মালভূমির ভিতর দিয়ে কৃষ্ণসাগরের দক্ষিণ তীর ধরে পূর্বদিকে অগ্রসর হয়। এইভাবে তারা ইউফ্রেটিস ও ট্রাইগ্রিস নদীর উজানে এসে উপস্থিত হয়। এই দুই নদীর মধ্যবর্তী উপত্যকায় শক্তিশালী রাজ্য থাকায় আর্যগোষ্ঠী সেখানে প্রবেশ করেনি। তারা দক্ষিণের পথ ছেড়ে তাবরিজ-তেহরানের পথ ধরে প্রবেশ করেছিল। সেখান থেকে আর্যদের একটি শাখা হিন্দুকুশ পর্বত অতিক্রম করে কাবুল উপত্যকার ভিতর দিয়ে ভারতের উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও উত্তরে পাঞ্জাবে এসে পৌঁছায়। দীর্ঘদিন ধরে আর্যরা দলে দলে ভারতে প্রবেশ করে এবং ক্রমশ সমগ্র ভারতে আধিপত্য বিস্তার করে।

১৮.২.৪.১ ভারতের আর্যদের বসতি স্থাপন ও বসতি বিস্তার

আর্যদের রচিত ধর্মীয় সাহিত্য ঋগ্বেদ ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে তাদের ভারতে বসতি স্থাপন ও বিস্তারের উল্লেখ রয়েছে। অনেকের মতে ঋগ্বেদের শেষের দিকের স্তোত্রগুলি গৌতম বুদ্ধের জন্মের ৫০০ পূর্বে রচিত হয়েছিল। সেক্ষেত্রে গৌতম বুদ্ধের জন্ম ৫৬৬ খ্রিষ্টপূর্বাব্দে এবং আরও ৫০০ বছর আগে অর্থাৎ ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পূর্বে রচিত হয়েছিল ধরা যেতে পারে। বস্তুত ১৫০০ খ্রিষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়কালকে পণ্ডিতরা ঋগবৈদিক যুগ হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই সময়ের প্রায় সমস্ত তথ্যই ঋকবেদ

নির্ভর। এর সঙ্গে যুক্ত হয়েছে অল্প কিছু প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন, যেমন সোয়াট অববাহিকায় প্রাপ্ত গান্ধার সংস্কৃতির নিদর্শন। তবে বৈদিক সাহিত্যে আর্যদের বসতিস্থাপন ও বিস্তারের ধারাবাহিক বিবরণ নেই, রয়েছে বিক্ষিপ্তভাবে। এই বিক্ষিপ্ত তথ্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক প্রমাণের সাহায্যে আমরা তাদের পরিচিত ভৌগোলিক স্থানগুলি সম্পর্কে ধারণা তৈরি করতে পারি। ঋগ্বেদে ভারতীয় উপমহাদেশের কয়েকটি পর্বত ও নদ-নদীর নাম পাওয়া যায় যার থেকে আমরা তাদের প্রথম দিকের বসতি স্থাপন সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। ঋকবেদে হিমবান (হিমবৎ) বা হিমালয় পর্বত এবং কাশ্মীর এর অন্যতম শৃঙ্গ মুজবন্ত বা মুজবানের উল্লেখ রয়েছে। লক্ষণীয় যে ঋকবেদে বিন্ধ্য পর্বতের ও নর্মদা নদীর কোনও উল্লেখ নেই। এর থেকে মনে হয় ঋকবেদের যুগে আর্যরা দক্ষিণে বিন্ধ্য পর্বতের দিকে অগ্রসর হয়নি। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে যে ৩৯টি নদীর নাম পাওয়া যায় তার মধ্যে ২৫টি নদীর নাম ঋগবেদে উল্লিখিত হয়েছে। ভারতীয় সংস্কৃতির ধারক ও বাহক গঙ্গা নদীর উল্লেখ একেবারে বেশি নেই। তাই মনে হয় ঋকবৈদিক আর্যদের কাছে গঙ্গা নদীর তেমন গুরুত্ব ছিল না।

আর্যরা প্রথম দিকে আফগানিস্তানের কাবুল উপত্যকায় ও কাশ্মীরে বসতি স্থাপন করেছিল। কারণ ঋকবেদে আফগানিস্তানের কয়েকটি স্থান ও নদ-নদীর নাম এবং সপ্তসিন্ধুর উল্লেখ রয়েছে। এগুলি হল কুভা বা কাবুল, সুবাস্তু বা সোয়াট, ক্রুমু (কুরম), গোমতি বা গোমাল। এছাড়া সপ্তসিন্ধু বা পাঞ্জাবের পাঁচটি নদী যথা শতদ্রু, ইরাবতী, চন্দ্রভাগা, বিপাশা, ঝিলাম এবং সিন্ধু ও সরস্বতী বোঝায়। ঋকবেদে উল্লেখিত সপ্তসিন্ধু আফগানিস্তানের সীমান্ত থেকে পাঞ্জাব পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। ঋকবেদে উল্লেখিত 'সপ্তসিন্ধুবঃ' বলতে যেমন একটি অঞ্চল বোঝায়, তেমনি সাতটি বিশেষ নদীও বোঝায়। জার্মান পণ্ডিত ম্যাক্সমুলারের মতে সিন্ধু ও তার পাঁচটি শাখানদী নিয়েই সপ্তসিন্ধু। এই মতানুসারে সপ্তসিন্ধুর ভৌগোলিক পরিসীমায় উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পূর্ব ও পশ্চিম পাঞ্জাব, সিন্ধু, হরিয়ানা এবং উত্তরপ্রদেশের পশ্চিম সীমান্ত অন্তর্ভুক্ত রয়েছে। আবার কেউ মনে করেন ঋগবেদের সাতটি নদীর মধ্যে সরস্বতী নয়, কুভা বা কাবুল অন্তর্ভুক্ত। যদি তাই হয় তাহলে সপ্তসিন্ধু পশ্চিম দিকে কাবুল উপত্যকা পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল বলেই মনে হয়। ঋকবেদে সরস্বতী নদীকে 'নদীতমা' আখ্যা দেওয়া হয়েছে। বর্তমানে এই নদীকে পণ্ডিতরা হরিয়ানা ও রাজস্থানের ঘগ্গর-হাকরা খাল হিসাবে চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু ঋকবেদের বর্ণনায় একে এভেস্তিয় নদী হরখাবতী বা দক্ষিণ আফগানিস্তানের হেলমন্দ নদী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। এই নদীর প্রকৃত পরিচয় নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতভেদ রয়েছে। অনেকের মতে সরস্বতীই হল সিন্ধুনদ, আবার অনেকে মনে করেন সরস্বতী হল এখনকার সরশুতি, যা ভাতনেয়ার মরুভূমিতে শুকিয়ে গেছে। আর্যদের কাছে সিন্ধুনদ হল শ্রেষ্ঠ নদী, তাই এই নদীর নাম বারেবারে উল্লেখিত হয়।

ঋগ্বেদ থেকেই আমরা ভারতের আর্যদের কথা জানতে পারি। এই গ্রন্থে 'আর্য' কথাটি ৩৬ বার উল্লিখিত হয়েছে। আর্য বলতে এখানে এক সাংস্কৃতিক গোষ্ঠীকে বোঝানো হয়েছে যারা ইন্দো-আর্য ভাষায় কথা বলে। বস্তুত ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষায় রচিত প্রাচীনতম গ্রন্থ হল ঋকবেদ। এই গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলেও এর মধ্যে অনেক মুণ্ডা ও দ্রাবিড় শব্দ রয়েছে। সম্ভবত এই শব্দগুলি হরপ্পীয়দের ভাষার মাধ্যমে ঋকবেদে ঢুকেছে। ঋকবেদ হল বিভিন্ন ঋষি ও কবিদের অগ্নি, ইন্দ্র, মিত্র, বরুণ ও অন্যান্য দেবতাদের উদ্দেশ্যে রচিত প্রার্থনা স্তোত্রের সংকলন। এটি দশটি মণ্ডল নিয়ে গঠিত, যার মধ্যে দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মন্ডল এর আদি অংশ। ঋকবেদের প্রথম ও দশম মন্ডল সম্ভবত পরে সংযোজিত হয়েছে বলে অধ্যাপক রামশরণ শর্মা মনে করেন। ঋকবেদের অনেক কিছুই ইরানীয় (পারসিক) ভাষায় রচিত প্রাচীনতম গ্রন্থ আবেস্তার সঙ্গে মিল রয়েছে। দুটি

গ্রন্থেই কয়েকজন দেবতা সম্পর্কে একই শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে এবং এমনকি সামাজিক শ্রেণির ক্ষেত্রেও এই মিল দেখা যায়।

ইন্দো ইউরোপীয় ভাষার প্রাচীনতম নিদর্শন অবশ্য কোনও সাহিত্য নয়, রয়েছে ইরাকে প্রাপ্ত ২২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের এক লিপিতে। পরবর্তীকালে এই ধরণের নমুনা আনাতোলিয়া (তুরস্ক)-য় হিট্টাইটদের লেখতেও পাওয়া যায়। এই লেখগুলি ১৯০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ থেকে ১৭০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত সময়কালের। আর্য ভাষার নমুনা ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে গ্রীসের মিসিনীয় লেখগুলিতে পাওয়া যায়। ১৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ইরাকের কাস্সাইট লেখগুলিতে এবং খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্দশ শতকের সিরিয়ার মিতান্নি লেখতে আর্য নামের উল্লেখ পাওয়া যায়। কিন্তু ভারতে আর্যভাষার কোন প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন পাওয়া যায়নি।

তরঙ্গের অভিঘাতের মতো বারে বারে ভারতে আর্যদের অভিপ্রয়াণ ঘটে। আর্য অভিপ্রয়াণের প্রথম ঢেউ আনুমানিক ১৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে আছড়ে পড়ে। ঋক বৈদিক যুগের আর্যরাই এর প্রতিনিধিত্ব করেন। তারা ভারতে এসে ভারতের দেশীয় অধিবাসীদের সঙ্গে সংঘাতে লিপ্ত হয়। ভারতের এই স্থানীয় অধিবাসীদের তারা 'দাস', 'দস্যু' আখ্যা দেন। প্রাচীন ইরানীয় সাহিত্যেও দাস-দের উল্লেখ থাকায় মনে হয় তারা প্রাক্ আর্যগোষ্ঠী ছিলেন। ঋগ্বেদে ভরত গোষ্ঠীর প্রধান দিবোদাস কর্তৃক সম্বরের পরাজয়ের কথা বলা হয়েছে। এক্ষেত্রে দাস কথাটি দিবোদাসের নামের মধ্যেও রয়েছে। সম্ভবত ঋকবেদের 'দস্যু'রাই ভারতের আদিম অধিবাসী এবং একজন আর্যগোষ্ঠীর প্রধান তাদের পরাজিত করলে তাকে ত্রাস দস্যু আখ্যা দেওয়া হত। রামশরণ শর্মার মতে, আর্যরা দাসদের প্রতি নরম মনোভাব পোষণ করেন, কিন্তু দস্যুদের প্রতি প্রবল শত্রুভাবাপন্ন ছিলেন। ঋকবেদে তাই বারে বারে 'দস্যু' হত্যা কথাটি ব্যবহৃত হয়েছে। দস্যুরাই সম্ভবত লিঙ্গ পূজা করতেন এবং পশু পালনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন না। যাইহোক আর্য-অনার্য সংগ্রামে জয়লাভ করলেও আর্য ভাষায় দ্রাবিড় তালব্য বর্ণ যথা- 'ন', 'ৎ', 'ং' ঢুকে যায় বলে মনে হয়। এই পর্যায়ে আর্যরা আফগানিস্তান, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ, পাঞ্জাব, সিন্ধুর কিয়দংশে এবং পূর্বদিকে সরযু নদী পর্যন্ত আধিপত্য বিস্তার করে।

পরবর্তীকালে অর্থাৎ পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্যরা ভারতের আরও অভ্যন্তরের প্রবেশ করে। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে পূর্বাঞ্চলের উল্লেখ আরও বেশি করে পাওয়া যায়। আর্যদের অগ্রগতি এবং তাদের সংস্কৃতি অববাহিকা থেকে মধ্যেদেশে অর্থাৎ গঙ্গা-যমুনা উপত্যকায় সম্প্রসারিত হয়। এই পর্বে আর্যরা সরযু নদী অতিক্রম করে আরও পূর্বদিকে অগ্রসর হয়েছিল। তাই পরবর্তী বৈদিক যুগের সাহিত্য কোশল। কাশী, মগধ, বিদেহ ও অঙ্গর উল্লেখ পাওয়া যায়। আর্যদের নিরন্তর পূর্বদিকে সম্প্রসারণ এর অন্যতম কারণ তাদের জনসংখ্যা বৃদ্ধি এবং সেই অনুপাতে গোচারণ ভূমি, উর্বর কৃষিক্ষেত্রের অভাব। ডি. ডি. কোশাম্বীর মতে পরুষ্নি বা ইরাবতী নদীর জল বন্টন নিয়ে আর্য গোষ্ঠীগুলোর মধ্যে বিবাদ দেখা দিয়েছিল। ঋকবেদে উল্লেখিত দশ রাজার যুদ্ধ এই বিবাদের আভাস পাওয়া যায়। বস্তুত আর্যগোষ্ঠীগুলির জনসংখ্যা বৃদ্ধি পেলে পাঞ্জাবে বর্ধিত জনসংখ্যার স্থান সঙ্কুলানের সমস্যা দেখা দেয়, তাই গঙ্গা-যমুনা বিস্তীর্ণ উর্বর উপত্যকার আর্যরা বসতি বিস্তার করে। শতপথ ব্রাহ্মণে আর্যদের পূর্বদিকে বসতি বিস্তারের প্রমাণ রয়েছে। খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৮০০ অব্দের মধ্যে আর্যদের পূর্বদিকে বিস্তার সম্পন্ন হয়েছে বলে অনুমান করা হয়। এই পর্বে তারা পশুপালনের উপর নির্ভরতা ছেড়ে কৃষি, প্রস্তর, ধাতুশিল্প ও অন্যান্য জীবিকায় দক্ষতা অর্জন করে।

১৮.২.৫ রাজনৈতিক পরিস্থিতি

ঋকবৈদিক সাহিত্যের- (বিশেষত ঋকবেদ-) মতো প্রধানত ধর্মীয় সাহিত্য থেকে রাজনৈতিক জীবনের কতটুকু জানা যায়? তা কি আদৌ সম্ভব? একথা অনস্বীকার্য যে রাজনৈতিক জীবন সংক্রান্ত তথ্য বৈদিক সাহিত্যে মুষ্টিমেয় তবে মনে রাখতে হবে বহু ক্ষেত্রে বিশেষত ঋকবেদে দেবতার কাছে প্রার্থনা জানানো হয়েছে যুদ্ধে জয়লাভের বাসনায়, যুদ্ধক্ষেত্র থেকে সম্পদ লুণ্ঠনের আকাঙ্ক্ষায়। আবার পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এমন কিছু যাগযজ্ঞ সম্পর্কিত নির্দেশাবলী আছে যা কেবলমাত্র শাসকদের পক্ষেই প্রযোজ্য। বৈদিক সাহিত্যে জনপ্রতিনিধিত্বমূলক কয়েকটি প্রতিষ্ঠানের পরিচয়ও পাওয়া যায়। যেখানে রাজনৈতিক ক্রিয়া-কলাপ আলোচিত হত। আর এই জাতীয় সাক্ষ্যপ্রমাণের দ্বারা রাজনৈতিক পরিস্থিতির অন্তত আভাস দেওয়া সম্ভব। তবে বৈদিক সাহিত্যের মধ্যে রাজনৈতিক ঘটনাবলির বিবরণ নিতান্ত অল্প, তবে একটি বিরল ব্যতিক্রম হলো সুদাসের বিরুদ্ধে সম্মিলিত দশ প্রতিপক্ষের যুদ্ধ, যা ঋকবেদে 'দাসরাজ্ঞ' নামে বর্ণিত।

ঋকবেদে যে জন, গণ, বিশ প্রতিশব্দ বহুবার ব্যবহৃত হয়েছে তা সামগ্রিকভাবে একটি জনগোষ্ঠীকে বোঝাই শব্দটির অর্থ নিছক গ্রামীণ বসতি নয় এক ক্ষুদ্র জনসমষ্টির সমার্থক। রামশরণ শর্মা যে মূল্যবান গবেষণা করেছিলেন তাতে মনে হয় পরস্পরের সঙ্গে সম্পর্কবিহীন কয়েকটি পরিবার নিয়ে সম্ভবত গড়ে উঠত একটি ক্ষুদ্র জনগোষ্ঠী যা গ্রাম নামে অভিহিত। নৃতাত্ত্বিক পরিভাষায় যাকে বলা হয় 'ব্যান্ড' বলা হয়। আর গ্রামের চেয়ে বৃহত্তর জনগোষ্ঠী বোঝাতে জন, গণ, বিশ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহার করা হয়। তাই রামশরণ শর্মা ঋকবেদের আমলে ট্রাইব বা ক্ল্যান জাতীয় কৌম গোষ্ঠীর সক্রিয় উপস্থিতি দেখিয়েছেন। আবার মাইকেল হ্বিৎজেল একশোটি কৌমের সন্ধান পেয়েছিলেন। যার মধ্যে অগ্রণী ছিল পঞ্চজনা বা পঞ্চ কৃষ্টি অর্থাৎ পাঁচটি কৌমের সমাহারে গঠিত একটি গোষ্ঠী। এই পাঁচটি কৌম হল যদু, পুরু, তুর্বস, অনু, দ্রুহ্য। যদিও একাধিক যুদ্ধে সাফল্যের জন্য ঋকবেদে ভরত নামক কৌমটিকে বিশেষ মান্যতা দেওয়া হয়েছে। যুদ্ধের বর্ণনা, যুদ্ধজয়ের অভিলাষের সঙ্গে ঋগ্বেদে এই ভাবে জড়িয়ে আছে যুদ্ধক্ষেত্র থেকে লুণ্ঠনের আকাঙ্ক্ষা। যুদ্ধজয়ের পর সবচেয়ে প্রার্থিত লুণ্ঠন যোগ্য সম্পদ ছিল গবাদি পশু ও অশ্ব। ঋগ্বেদে বর্ণিত গবিষ্টি-র আক্ষরিক অর্থ হল গবাদি পশু লাভের ইচ্ছা। যে সমাজে গবাদি পশু প্রধান পশু সামাজিক ধনসম্বল, সেই সমাজে গবাদি সম্পদ লুণ্ঠনের আকাঙ্ক্ষা নিতান্ত স্বাভাবিক। আর্যবর্ণ ও দাস বা দস্যুবর্ণের মধ্যে লড়াইয়ের বিবরণও ঋগ্বেদে পাওয়া যায়। যুদ্ধের মাধ্যমে প্রতিপক্ষকে দমিয়ে ক্ষমতা বিস্তারের পার্থিব আকাঙ্ক্ষা ঋকবেদে দেখতে পাওয়া যায়।

ঋকবেদে "রাজা" শব্দের বহু উল্লেখ ও প্রয়োগ দেখতে পাওয়া যায়। এই "রাজা" বলতে কি ও কাকে বোঝানো হয়েছে? বৈদিক সাহিত্য নিয়ে বেশিরভাগ আলোচনায় "রাজা" শব্দটিকে সোজাসুজি রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রব্যবস্থার ওপরে অবস্থিত রাজশাসক হিসেবে তুলে ধরা হয়েছে। কিন্তু এই ব্যবস্থায় যে লক্ষণগুলি থাকা অবশ্যই প্রয়োজনীয় যেমন একটি নির্দিষ্ট ভূখন্ড, শাসনাধীন প্রজা বৃন্দ, প্রশাসক গোষ্ঠী, নিয়মিত সেনাবাহিনী, রাজস্ব ব্যবস্থা প্রভৃতি। কিন্তু সেগুলির দর্শন কি সহজেই পাওয়া যায় ঋকবেদে? যিনি রাজা তার অভিধা গুলি ছিল বিশপতি অর্থাৎ বিশ বা কৌমের প্রধান বা দলপতি। কিন্তু আমরা সচরাচর রাজা কে যেসব উপাধিতে ভূষিত হতে দেখি যেমন নরপতি (মানুষের প্রভু),ভূপতি(পৃথিবী বা জমিরপ্রভু), মহীপতি (পৃথিবীর অধিশ্বর) এর একটিও ঋকবেদে ব্যবহৃত হয়নি। ঋকবেদে রাজা গোপতি' — আক্ষরিক অর্থে গবাদি সম্পদের প্রভু উপাধিতে চিহ্নিত। যে সমাজে স্থায়ী কৃষিকর্ম সুপ্রতিষ্ঠিত ছিল না, সেখানে গবাদি সম্পদই ছিল প্রধান ধনসম্বল, যেখানে নির্দিষ্ট ভূখণ্ডের উপর রাজনৈতিক কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা সম্ভাবনা ছিল খুবই কম। জন বা বিশ জাতীয়

কৌমটির প্রধান হিসেবে রাজা কার্যত দলপতির ভূমিকায় অবতীর্ণ হতেন। যে কৌম গোষ্ঠীর নেতৃত্ব রাজা দিতেন সেই কৌমের সদস্যবৃন্দ দলপতির সঙ্গে জ্ঞাতি সম্পর্ক দ্বারা চিহ্নিত। কিন্তু বিশ" কখনো ঋগ্বৈদিক রাজার অধীনস্থ প্রজা ছিল না। রাজা শব্দটির ব্যুৎপত্তি রঞ্জ'ধাতু থেকে অর্থাৎ যার আক্ষরিক অর্থ হলো যিনি নেতৃত্ব দেন, যিনি অতি উজ্জ্বল এবং যিনি (মানুষকে)আনন্দে রাখেন। নৃতাত্ত্বিক গবেষণায় জানা গেছে কৌমের দলপতি যুদ্ধের সময় তার গোষ্ঠীকে নেতৃত্ব দিতেন, তিনি সম্পদ লুণ্ঠনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করতেন এবং লুণ্ঠিত সম্পদ সদস্যবৃন্দের মধ্যে বিতরণ করতেন। জন, গণ, বিশ জাতীয় কৌমের প্রধান হিসেবে ঋকবেদে রাজাকে বিচার করাই তাই যুক্তিসম্মত। রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থার লক্ষণ, তার সামাজিক, অর্থনৈতিক উপাদান ঋকবেদে দেখতে পাওয়া যায় না। ঋকবেদে বিদথ' নামক প্রতিষ্ঠানের উল্লেখ রয়েছে। রামশরণ শর্মা বিদথ বিষয়ে যে অনুসন্ধান করেছিলেন তার থেকে স্পষ্ট বোঝা যায় যে বিদথে উপস্থিত থাকতেন রাজা ও বিশ এর সদস্যবৃন্দ। বিদথে যুদ্ধসহ বিভিন্ন রাজনৈতিক বিষয় যেমন আলোচিত হতো তেমনি তা ছিল সামাজিক ক্রিয়াকলাপের স্থান এমনকি বিনোদন ও বিশ্রাম এর জন্যও বিদথ ব্যবহৃত হতো, আবার বিদথেই আহৃত লুণ্ঠিত সম্পদ বিতরণ করা হতো। অতএব বিদথ একাধারে ছিল রাজনৈতিক সামাজিক ও আর্থিক সাংস্কৃতিক ক্রিয়া-কলাপের স্থান। এর থেকে জনগোষ্ঠীর সমাবেশ ও অধিবেশনের স্থান হিসেবে বিদথের ভূমিকা স্পষ্ট দেখতে পাওয়া যায়। যেহেতু জনগণের সদস্য সকলেই উপস্থিত থাকতেন তাই মনে করা হয় ঋকবেদে রাজা দলপতির বেশি কিছু ছিলেন না।

যুদ্ধবিগ্রহের প্রসঙ্গ ঋকবেদে কিছু কম নেই। কিন্তু যে রাজনৈতিক ঘটনা সবকিছুকে ছাপিয়ে গিয়েছিল তা হলো সুদাসের সঙ্গে দশ রাজার (দলপতির) যুদ্ধ, যা ঘটেছিল পরুষনী বা রাভী নদীর তীরে। পরবর্তীকালে বিম্বিসার যেমন হর্যঙ্কবংশীয় রাজা বলে বর্ণিত, বা অশোক যেমন মৌর্য রাজবংশ সম্ভূত, এমন কোনও রাজবংশগত পরিচিতি সুদাসের ক্ষেত্রে ঋকবেদে পাওয়া যায় না। তবে তিনি তৃৎসু ভরতদের(অর্থাৎ তৃৎসু ভরত বা ভরত গোষ্ঠী / কৌমের প্রধান) রাজা সুদাস নামে বর্ণিত। সুদাস অসামান্য বীরত্বের পরিচয় দিয়ে দশটি কৌমের সম্মিলিত প্রতিরোধকে পর্যুদস্ত করেছিলেন। এই দশটি কৌম হল যদু, তুর্বস, অনু, পুরু, দ্রুহ্য, অলীন, ভলান, পখত, শিব এবং বিশানিন। হ্বিৎজেলের পাণ্ডিত্যপূর্ণ বিশ্লেষণে বোঝা যায় যে ঋগ্বেদ এর মূল অংশে (দ্বিতীয় থেকে সপ্তম মণ্ডল) ভরত কৌম এর রাজনৈতিক ক্ষমতা বৃদ্ধির আভাস মেলে। সুদাসের পিতা দিবোদাস সম্ভবত উত্তর-পশ্চিম প্রান্তীয় অঞ্চল থেকে উপমহাদেশের মূল ভূখণ্ডে আগমনে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন। দিবোদাস এর পিতার নাম পিজবন, যে কারণে সুদাসের অভিধা পৈজবন। সুদাসের পরবর্তী ভরত গোষ্ঠীর দুই নেতা ছিলেন দেবশ্রবস ও দেববাত। ভরতের সঙ্গে পুরুগোষ্ঠীর একদা সৌহার্দ্য থাকলেও পরে বৈরী সম্পর্ক দেখা দিয়েছিল। দিবোদাস ও সুদাসের প্রতি প্রশংসা বর্ধিত হয়েছে ঋকবৈদিক সূক্তে। এইরূপ কয়েকটি সূক্তে দিবোদাস ও সুদাসের বীরত্ব ও দানশীলতার স্তুতি করেছেন বিশ্বামিত্র, যিনি প্রথমে ভরতগোষ্ঠির সমর্থনে থাকলেও পরে প্রতিপক্ষ গোষ্ঠীর সঙ্গে যুক্ত হয়ে পড়লে বিশ্বামিত্রকে অপসারিত করে সুদাস বশিষ্ঠ কে পুরোহিত হিসেবে নিযুক্ত করেছিলেন। তিনি ছিলেন ঋগবেদের সপ্তম মণ্ডলের অন্যতম রূপকার। তিনিও একইভাবে ভরত গোষ্ঠীর সুদাস ও দিবোদাসের শৌর্য ও দানশীলতার মহিমা কীর্তন করেছেন। সপ্তম মণ্ডলে ঘটনা পরম্পরার মাধ্যমে যেভাবে ভরত গোষ্ঠীর সিন্ধু নদী অতিক্রম করে পাঞ্জাবের সমভূমিতে যুদ্ধ জয়ের বিবরণ দেওয়া হয়েছে, পুরু সহ দশটি প্রতিপক্ষের বিরুদ্ধে চূড়ান্ত আঘাত হেনেছিল সুদাস নদীবক্ষে একটি বাঁধ জাতীয় জলাধার কে বিদীর্ণ করে। কোশাম্বির বিচারে নদীর জলের উপরে রাজনৈতিক কর্তৃত্ব স্থাপন এর

অন্যতম প্রথম নজীর এই যুদ্ধে দেখা গিয়েছিল। উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল দাশরাজ্ঞের বিশ্লেষণ করে ঋকবেদের যুগে অতীত চেতনার সম্যক পরিচয় দিয়েছিলেন। মহাভারতের কুরুক্ষেত্র যুদ্ধ এর বিবরণের এক আদিকল্পকে বোধ হয় ঋকবেদের দাশরাজ্ঞ সম্পর্কিত বর্ণনায় খুঁজে পাওয়া যায়। রোমিলা থাপারের মতে পরবর্তীকালে যে ধারা ইতিহাস পুরাণ বলে পরিচিত, তার ও মূল বোধ হয় দাশরাজ্ঞের যুদ্ধে নিহিত।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যেও রাজনৈতিক ঘটনার বিবরণ বিরল। কিন্তু রাজনৈতিক অবস্থা-ব্যবস্থা যে ক্রমশ বদলাচ্ছিল তার সাক্ষ্য পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থগুলিতেও পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেবাসুরের সংগ্রামের প্রসঙ্গ আছে। যেখানে প্রথমদিকে দেবতারা অসুরদের হাতে পরাস্ত হলেও পরবর্তীকালে দেবতারা বীরশ্রেষ্ঠ ইন্দ্র এর নেতৃত্বে জয় লাভ করেন। এই কাহিনীর পার্থিব প্রেক্ষিতে বেণীপ্রসাদ অভিমত দিয়েছিলেন যে একেবারে প্রথম দিকে রাজার প্রয়োজন হয়েছিল যুদ্ধে নেতৃত্ব দেওয়ার উদ্দেশ্যে। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে শাসকের ক্ষমতা ঋগ্বেদের আমলের তুলনায় বেশি ছিল। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে ক্ষমতার কম-বেশির মাপকাঠিতে শাসকের প্রকারভেদ করা হয়েছিল। যেমন রাজার চেয়ে সম্রাট ও একরাটের ক্ষমতা বেশি ছিল। এখানে সম্রাট বা একরাট শব্দগুলিকে অবশ্য প্রচলিত অর্থে বিশাল ভূখণ্ডের একচ্ছত্র অধিপতি বোঝাতে ব্যবহার করা হয়নি। তিনি রাজার তুলনায় বেশি প্রতাপশালী এই পরিচয় ঐতরেয় ব্রাহ্মণে দেওয়া হয়েছে। উপেন্দ্রনাথ ঘোষাল পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে রাজ্য (প্রশাসন), রাষ্ট্র এবং ক্ষেত্র শব্দ তিনটির নিয়মিত ব্যবহারে তিনি বলেছিলেন এগুলি প্রায় সমার্থক শব্দ হিসাবে প্রযুক্ত হয়েছিল। শাসকের ক্ষমতা বৃদ্ধির ইঙ্গিত এখানে পাওয়া যায়। শাসকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির জন্যই পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অশ্বমেধ, বাজপেয়, রাজসূয় যজ্ঞাদির এবং পুনরাভিষেক ও ঐন্দ্রাভিষেক জাতীয় অভিষেক অনুষ্ঠানের বিস্তারিত বিবরণ দেওয়া আছে। অতি জটিল সময় সাপেক্ষ আচার-অনুষ্ঠান ও ক্রিয়া-কলাপ সমন্বিত এই বৈদিক যজ্ঞ পুরোহিতরা সম্পাদন করতেন তাদের যজমান শাসকদের জন্য। এইসব অনুষ্ঠানে শাসকের অভিধাগুলি সরাসরি তার প্রতাপ বৃদ্ধির প্রমাণ দেয়। বৈদিক যজ্ঞগুলি শাসক যথাবিধি সম্পন্ন করলে তিনি ইন্দ্র, বরুণ, অগ্নি এবং সোম দেবতাতে পরিণত হতেন। অথর্ব বেদে পরীক্ষিৎ কে অর্ধদেবতার মর্যাদা দেওয়া হয়েছিল।

উপরোক্ত বক্তব্যগুলি শাসকের ক্ষমতা বৃদ্ধির পরিচয় দেয়। শাসকের বংশপরিচয় ঋগবেদের তুলনায় পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে আরও বড় করে দেওয়া হয়েছিল। দলপতির ক্ষমতা লাভের চেয়ে পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বংশানুক্রমিক ভিত্তিতে শাসক সিংহাসনে বসেছিলেন। রাজসূয়, বাজপেয়, অশ্বমেধ যজ্ঞ কালে শাসক ব্রাহ্মণ পুরোহিত দের ও অন্যান্য শাসকদের ভূমিপ্রদান করতেন। তবে তখন শাসন ক্ষমতা বৃদ্ধি পেলেও পরবর্তী বৈদিক গ্রন্থের তখনও পর্যন্ত তিনি রাষ্ট্রের সর্বময় কর্তৃত্বের অধিকারী হননি।

শাসকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির সঙ্গে প্রশাসনিক জটিলতার প্রসঙ্গটিও এসে যায়। শাসকের সহায়ক এমন ব্যক্তির সংখ্যা ঋকবেদের তুলনায় পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বেশি। এঁরা রত্নিন' অর্থাৎ রাজার কাছে রত্নের মতোই মূল্যবান। শাসককে তার ভূখণ্ড প্রদান করেন বলে তাঁরা প্রশংসিত। তাঁরাই যেন শাসকীয় ক্ষমতার আধার। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলেন সেনানী, ভাগদুঘ এবং অক্ষবাপ।

শাসকের ক্ষমতা যে পরবর্তী বৈদিক আমলে নিরঙ্কুশ হয়ে উঠেছিল, তার জন্য সভা ও সমিতি নামক দুইটি জনপ্রতিনিধি মূলক প্রতিষ্ঠানের ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। অথর্ববেদে সভা ও সমিতি কে প্রজাপতির দুই কন্যা বলে বর্ণনা করা হয়েছে। অতএব দুটি পৃথক প্রতিষ্ঠান অস্তিত্ব নিয়ে সংশয় নেই কিন্তু দুই প্রতিষ্ঠানের বৈশিষ্ট্য

কি তা নির্ধারণ করা কঠিন ছিল। কাশীপ্রসাদ জয়সওয়ালের মতে সভা ও সমিতি যথাক্রমে— উচ্চকক্ষ ও নিম্নকক্ষ অর্থাৎ তিনি আধুনিক সংসদীয় গণতন্ত্রের দুই কক্ষবিশিষ্ট জনপ্রতিনিধিত্বের সম্ভাবনা দেখেছেন। তবে এই মত গ্রহণযোগ্য নয়। সভাতে সম্পন্ন ব্যক্তিরা যোগ দিতেন এবং বিনোদন ও নিয়মিতভাবে পাশা খেলা হতো। সমিতিতে সম্ভবত সকলেই যোগ দিতেন। দলপতি শাসকের উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত আছে সমিতিতে আলোচিত হত যুদ্ধ, বিশ বা কৌম সংক্রান্ত নানা বিষয় এমনকি নির্বাচিত প্রশাসককে ফিরিয়ে নিয়ে আসার মত গুরুত্বপূর্ণ রাজনৈতিক বিষয় সমিতির অনুমোদন বিশেষ জরুরী ছিল। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে দলপতির ক্ষমতা ঊর্ধমুখী হলেও তিনি তখনও রাজনৈতিক ব্যবস্থার কেন্দ্রীয় উপাদানে পরিণত হন নি।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের রত্নিন সহ দলপতির বেশ কয়েক প্রকার সহযোগী প্রশাসককে দেখা যায়। সেনানীর কাজ ছিল অনিয়মিত যোদ্ধা বাহিনী গড়ে তোলা। এর জন্য যে ধরণের ধনসম্বল প্রয়োজন হতো তা সম্ভবত শাসক কৃষি-অর্থনীতি জাতীয় সম্পদ থেকে সংগ্রহ করতেন। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের অন্যতম অভিধা বলিহৃত অর্থাত যিনি বলি আহরণ করেন। বলি বাধ্যতামূলক হলেও তা ছিল অনিয়মিত, এই কারণেই রোমিলা থাপার বলিকে শাসকের জন্য প্রদত্ত অনিয়মিত কিন্তু বাধ্যতামূলক সম্পদ হস্তান্তর হিসেবে চিহ্নিত করেছেন। এই সম্পদ সংগ্রহের পদ্ধতিতে উপযুক্ত পরিমাণ উদ্বৃত্ত ধারণ করা সম্ভব ছিল না যার দ্বারা সেনাবাহিনীর ভরণপোষণ করতে পারা যায়। পরবর্তী বৈদিকসাহিত্যে শাসক যেহেতু অনিয়মিত বলি আহরণ করতে অক্ষম সেই কারণে শক্তিশালী সেনাবাহিনী রাখা ছিল আয়ত্তাতীত। আবার সেনাবাহিনী নির্ভর দমনের ব্যবস্থা না থাকায় রাজস্ব আহরণের জন্য অপরিহার্য চাপ সৃষ্টির কোন উপায় ছিল না। এই সমস্যার কারণে শাসকীয় প্রতাপের বৃদ্ধি ঘটলেও, পরবর্তীকালে রাষ্ট্র কাঠামোর উদ্ভব হয়নি। রামশরণ শর্মার মতে এটি হল 'পূর্ণাঙ্গ রাষ্ট্রব্যবস্থার প্রাক্কালের অবস্থা'। রাষ্ট্রপ্রতিম রাজনৈতিক পরিস্থিতি থাকলেও তখনো রাজতন্ত্র বিকশিত হয়নি। দলপতি বা প্রধানকে কেন্দ্র করে রাজনৈতিক ব্যবস্থা বলবৎ ছিল। এই জাতীয় দলপতি কেন্দ্রিক কয়েকটি গোষ্ঠী পরবর্তীকালে উত্তর ভারতে রাজনৈতিক পরিচিতি পেয়েছিল যেমন কেকয়, মদ্র, কোশল এবং পাঞ্চাল গোষ্ঠী। করু ও পাঞ্চাল এই দুইটি গোষ্ঠী সংযোজিত হওয়ার কারণে অন্যান্য গোষ্ঠীর তুলনায় কুরু-পাঞ্চালের ক্ষমতা ও শক্তি অধিকতর হয়ে ওঠেছিল।

১৮.২.৬ আর্থ-সামাজিক জীবন

বৈদিক সাহিত্য সম্ভার মূলত ধর্মীয় গ্রন্থ হলেও ঋগ্বেদের বহু প্রার্থনাই একান্ত পার্থিব উদ্দেশ্যে উচ্চারিত। অনেকগুলি ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ পারিবারিক ও সামাজিক জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিল। আবার পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ যখন ক্রমে জটিল হয়ে উঠছিল, তখন সামাজিক স্তরভেদের ধারণাও স্পষ্ট আকার নিতে থাকে। একথা ঠিক যে, আর্থ-সামাজিক অবস্থার আলোচনা বৈদিক সাহিত্যের মুখ্য বিষয়বস্তু নয়, তথাপি নানা প্রসঙ্গে তাদের উল্লেখ বৈদিক সাহিত্য সম্ভারে স্থান পেয়েছে। যার বিশ্লেষণ করলেই বোঝা যাবে খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-৬০০ অব্দের মধ্যবর্তী কালপর্বের ভারতীয় বিশেষত উত্তর ভারতের সমাজ ও অর্থনীতি একেবারেই নিশ্চল ছিল না।

১৮.২.৬.১ অর্থনৈতিক পরিস্থিতি

খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-১০০০ অব্দে তথা ঋকবৈদিক যুগে পশুচারণভিত্তিক আর্থ-সামাজিক জীবনের ধারা ভারতীয় উপমহাদেশের উত্তর ও উত্তর-পশ্চিম দিকে বিরাজ করলেও, ওই পাঁচশো বছর কালসীমাতেই তার রূপান্তর ঘটছিল পশুচারণ থেকে স্থায়ী কৃষিভিত্তিক আর্থ-সামাজিক জীবনের দিকে। অবশ্য ঋগ্বেদের বিভিন্ন সূক্তে এই ক্রমবর্ধমান রূপান্তরের দেখা মিললেও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যেই (খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০-৬০০ অব্দে) তার পূর্ণাঙ্গ রূপ ফুটে ওঠে, ঋকবৈদিক যুগ থেকে পরবর্তী বৈদিক যুগের আর্থ-সামাজিক জীবনের এই ক্রমিক রূপান্তরের চিত্র নিঃসন্দেহে নিশ্চল বৈদিক আর্থ-সামাজিক জীবনের চিত্রকে নস্যাৎ করে, এবং গতিশীল ও প্রাণবন্ত আর্থ-সামাজিক জীবনের চিত্রকেই ফুটিয়ে তোলে।

ঋকবৈদিক যুগের অন্তিম পর্ব থেকেই পশুচারণভিত্তিক সমাজে কৃষি অর্থনীতির গুরুত্ব অনুভূত হতে থাকে, কিন্তু এই রূপান্তরের সম্ভাবনা ও লক্ষণগুলি ক্রমে পরিণতি পায় পরবর্তী বৈদিক যুগে এবং তাই স্বভাবতই পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যেই এই রূপান্তরের সাক্ষ্য বিধৃত। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের অন্তর্গত সাম, যজুঃ ও অথর্ব বেদ, ব্রাহ্মণগুলি এবং আরণ্যক সমূহ থেকেই এই রূপান্তরের মূল চিত্র ধরা পড়ে তবে এর পাশাপাশি সমকালীন বেশ কিছু পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্যও এক্ষেত্রে বিশেষভাবে সাহায্য করে।

ঋকবৈদিক যুগের মানুষরা মূলত সিন্ধু ও তার (পূর্ব ও পশ্চিমের) উপনদীগুলির উপত্যকায় বাস করত, কিন্তু পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের কালসীমায় অর্থাৎ খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০-৬০০ অব্দে ঋগ্বেদের অপেক্ষাকৃত ক্ষুদ্র ভৌগোলিক গণ্ডী প্রসারিত হতে থাকে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে পরবর্তী বৈদিক যুগের পাঁচটি প্রধান এলাকার উল্লেখ পাওয়া যায়। এগুলি হলউত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব, পশ্চিম ও মধ্যাঞ্চল। ঋকবৈদিক যুগের অগ্রগণ্য বসতি অঞ্চল সপ্তসিন্ধবের তুলনায় পরবর্তী বৈদিক বসতি গাঙ্গেয় উপত্যকার অভিমুখে প্রসারিত হয়। ড. রণবীর চক্রবর্তীর মতে, সিন্ধু নদের অববাহিকা থেকে গাঙ্গেয় উপত্যকার উত্তরাংশে এবং ক্রমে গাঙ্গেয় উপত্যকার মধ্য ভাগের সঙ্গে নিয়মিত পরিচয় কেবলমাত্র পরবর্তী বৈদিক আমলের ভৌগোলিক জ্ঞানকেই প্রসারিত করে না, অর্থনৈতিক জীবনেও তার গুরুত্ব গভীরভাবে অনুভূত হতে থাকে। সিন্ধু অববাহিকার তুলনায় গাঙ্গেয় উপত্যকার অধিক বৃষ্টিপাত, আর্দ্র জলবায়ু, প্রচুর নদনদী, উর্বর পলিমাটি কৃষির পক্ষে এক অনুকূল পটভূমি রচনা করে দেয়। ফলে ঋকবেদের অন্তিম পর্বে পশুচারণ থেকে স্থায়ী কৃষিজীবী সমাজে রূপান্তরের যে প্রবণতা লক্ষ করা যায়, তা পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের আমলেই বাস্তবায়িত হতে থাকে।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের অন্যতম গ্রন্থ অথর্ববেদ অনুসারে কৃষিকর্ম প্রবর্তন করায় কৃতিত্ব পৃথু বৈন্যের। অথর্ববেদে উল্লিখিত পৃথু বৈন্যের এই কাহিনীটির ঐতিহাসিকতা সন্দেহাতীত না হলেও, এর তাৎপর্য এই যে, ব্রাহ্মণ্য ধারণা অনুযায়ী পৃথু বৈন্য এক অতি আদিম পুরুষ, তিনি যখন কৃষিকর্মের প্রবর্তক তখন অথর্ব বেদে এমন একটি ধারণা তুলে ধরার চেষ্টা হয়েছে যে, বৈদিক সমাজ যেন প্রথম থেকেই কৃষিজীবী। পৃথু বৈন্যের কাহিনীতে আরো বলা হয়েছে যে আমরা কৃষিজীবী এবং 'ব্রাত্য'-জনরা (সামাজিক দিক থেকে পতিত) বৈদিক ধর্মের বিরোধী ও কৃষিকর্মে যুক্ত থাকে না। ড. রণবীর চক্রবর্তীর মতে 'আর্য' কথাটি এখানে ভদ্র ব্যক্তি অর্থে ব্যবহৃত এবং ভদ্রজনের পক্ষে শ্রেয় জীবিকা যে কৃষিকর্ম এমন দৃষ্টিভঙ্গিও এখানে প্রকট। অন্যদিকে কৃষিজীবী নয় এমন সম্প্রদায়ভুক্ত মানুষদের একাধারে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম বিরোধী ও ভদ্র সমাজে অপাঙক্তেয় বলে চিহ্নিত করার প্রবণতা স্পষ্ট। অথর্ববেদে পাওয়া আর্থ-সামাজিক অবস্থা ঋগ্বেদের বর্ণনা থেকে অনেকাংশেই যে পৃথক তা

সহজেই বোধগম্য এবং এই ভিত্তিতে এ-কথা অনুমান করাই সঙ্গত যে, পশুচারণে অভ্যস্ত আদি বৈদিক যুগের মানুষ কৃষি অর্থনীতিজাত স্বাচ্ছন্দ্য ও সুরক্ষার প্রতি ক্রমেই আকৃষ্ট হতে থাকে এবং যে যে গোষ্ঠী স্থায়ী কৃষিজীবী সমাজের নিশ্চিন্তি ও নিরাপত্তার দ্বারা আকৃষ্ট হয়নি তারা তাদের প্রাক্তন বৃত্তি পশুচারণকেই আঁকড়ে ধরে থাকে। ফলে, সংখ্যাগরিষ্ঠ কৃষিজীবী জনগোষ্ঠীর চোখে পশুচারণকারীরা ক্রমে হেয় হতে থাকে এবং কালক্রমে তারা ব্রাত্য স্তরে উপনীত হয়।

ঋকবেদের তুলনায় পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে উল্লিখিত ফসলের বিপুল সংখ্যাধিক্য ও বৈচিত্র্যও পরবর্তী বৈদিক যুগে কৃষিনির্ভর সামাজিক জীবনের গুরুত্বপূর্ণ অস্তিত্বকেই প্রমাণ করে। ঋকবেদের পশুচারণকারী মানুষরা যবের কথা জানলেও, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে তা অন্যতম প্রধান খাদ্যশস্য হিসাবে পরিগণিত। 'গোধূম' বা গমের সম্বন্ধেও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সম্যক ধারণা ছিল। তবে কৃষি অর্থনীতিতে সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য ঘটনা হল ধান বা 'ব্রীহি' উৎপাদনের সূচনা। ঋগ্বেদে 'ব্রীহি' শব্দটি যে কোন শস্যকে বোঝায়। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে 'ব্রীহি' কথাটি নিশ্চিতভাবেই ধানকে বোঝায়। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে যে 'ব্রীহি' ও 'গোধূম'-কে যে পৃথক ফসল হিসাবে বিচার করা হয়েছে তাও পরবর্তী বৈদিক সমাজে কৃষি অর্থনীতির বিকাশের পরিচায়ক। ড় রামশরণ শর্মা 'ব্রীহি'-র অন্যতম প্রতিশব্দ 'ষষ্ঠী'-র প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেছেন যে, যে ধরণে ধান ষাট দিনে পাকত তাকে ষষ্ঠী বলা হত। হস্তিনাপুরের ধূসর চিত্রিত মৃৎপাত্রের স্তর থেকে পরবর্তী বৈদিক যুগের ধান চাষের প্রমাণ হিসাবে ধানের অবশেষ পাওয়া গেছে। এটিও সমকালীন যুগের কৃষির বিকাশের প্রতিই ইঙ্গিত দেয়।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে ফসলের বৈচিত্র্যের পাশাপাশি রয়েছে বিভিন্ন ফসলের জন্য প্রয়োজনীয় ঋতুগুলির বৈচিত্র্য সম্বন্ধে সচেতনতারও ইঙ্গিত। তৈত্তিরীয় সংহিতায় বলা হয়েছে যবের বীজ বপন হয় শীতে, ফসল পাকে গ্রীষ্মে, ধানের বীজ বপন হয় গ্রীষ্মে, ফসল কাটা হয় শীতে। হলকর্ষণ, বীজ বপন, ফসল কাটা এবং পাকা ফসলের ঝাড়াই বাছাইকৃষিকর্মের এই চারটি পর্যায় শতপথ ব্রাহ্মণেও উল্লেখিত। সারের ব্যবহারও যে শুরু হয়েছিল তা জানা যায়। দু-প্রকার সার'সকৃত' বা গোময় ও 'করীষ' বা শুষ্ক গোময়এর উল্লেখ থেকে। ঋকবেদে যেখানে লাঙলের কথা কদাচিৎ, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সেখানে লাঙলের উল্লেখ অনেক বেশি। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের বর্ণনা অনুযায়ী আদর্শ লাঙলের হাতল হবে মসৃণ আর তার ফলা হবে সুতীক্ষ্ণ ('পবীরবৎ')। কৃষিক্ষেত্রে 'কীনাশ' বা কৃষক হালের সঙ্গে বৃষগুলি বেঁধে নিয়ে হল চালনা করছে ও হাতে ধরা দণ্ড দিয়ে বৃষগুলির চলাচল নিয়ন্ত্রণ করছেপরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এই জাতীয় বর্ণনা প্রচুর পরিমাণে আছে। অথর্ববেদ, বাজসনেয়ী সংহিতা, মৈত্রায়নী সংহিতা, কাঠক সংহিতা, শতপথ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় সংহিতায় লাঙল চালাবার জন্য ছয়, আট, বারো এমনকী চব্বিশটি বলদের প্রয়োজনের কথাও উল্লেখ করা হয়েছে। পশুচারণভিত্তিক সমাজকে অতিক্রম করে পরবর্তী বৈদিক সমাজে কৃষিকর্ম যে ওতপ্রোতভাবে মিশে গিয়েছে উপরোক্ত দৃষ্টান্তগুলি তারই সাক্ষ্য তুলে ধরে। তবে যথেষ্ট উন্নতি হওয়া সত্ত্বেও কয়েকটি সমস্যা সম্ভবত কৃষিকর্মে ব্যাঘাত সৃষ্টি করত, যার অন্যতম ছিল কৃষিক্ষেত্রে পোকামাকড় ও ইঁদুরের উপদ্রব। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যগত বর্ণনায় পাওয়া যায় যে, পোকামাকড়ের প্রাদুর্ভাবে ছোটো চারাগাছের কোমল শিকড়গুলি নষ্ট হত আর ইঁদুরের দৌরাত্মে নষ্ট হত সদ্য উপ্ত বীজ। অথর্ববেদে অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টি থেকে বাঁচার জন্য অনেকগুলি জাদুমন্ত্র স্থান পেয়েছে। ড. রণবীর চক্রবর্তীর মতে, সেচব্যবস্থা খুব উন্নত না হওয়ার জন্য বৃষ্টির জল ধরে রেখে তা প্রয়োজনের সময় সেচের কাজে লাগাবার কোনো উত্তম প্রক্রিয়া

ও কৌশল জানা ছিল না বলেই সে যুগে জাদুবিদ্যা ও সংশ্লিষ্ট মন্ত্রই ছিল অনাবৃষ্টি ও অতিবৃষ্টির অভিশাপকে দূরে সরিয়ে রাখার জন্য অগতির গতি।

পরবর্তী বৈদিক যুগে গাঙ্গেয় উপত্যকায় কৃষি অর্থনীতির ভিত্তি প্রতিষ্ঠায় প্রাকৃতিক পরিবেশের অবদান অনস্বীকার্য হলেও, কৃষিপ্রধান বসতি প্রতিষ্ঠার অন্যতম প্রাথমিক শর্ত বোধহয় ছিল ওই অঞ্চলের অরণ্য পরিষ্কার করা। শতপথ ব্রাহ্মণে উল্লেখিত 'বিদেঘ মাঠবের' কাহিনীটির কথা এ প্রসঙ্গে বিশেষভাবে উল্লেখ্য। পবিত্র অগ্নি হাতে কুরুক্ষেত্র অঞ্চল থেকে উত্তর বিহার পর্যন্ত বিদেঘ মাঠবের যাত্রার কাহিনীটিতে সম্ভবত আগুনের সাহায্যে বন পুড়িয়ে বসতি বিস্তারের ব্যঞ্জনা নিহিত রয়েছে। আবার বন পোড়ানোর পাশাপাশি জঙ্গল পরিষ্কার করে কৃষিকাজ চালাবার আরেকটি পদ্ধতিও সে যুগে অজানা ছিল না। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে যে 'শ্যামায়স বা 'কৃষ্ণায়স্'-এর উল্লেখ রয়েছে তা অবশ্যই লোহার সমার্থক। যার দ্বারা বলা যায় বন কেটে কৃষিক্ষেত্র প্রস্তুতিতে লৌহ প্রযুক্তিরও সম্ভবত ব্যবহার করা হয়েছিল। উত্তরপ্রদেশের দুই প্রত্নক্ষেত্র অত্রাঞ্জিখেড়া ও নোহ-তে প্রাপ্ত কুড়াল, কুঠার, বর্শা ও তীরের ফলা লোহার ব্যবহারেরই ইঙ্গিত দেয়।

পশুচারণ থেকে স্থায়ী কৃষিজীবী সমাজের পত্তন ঘটায় কারিগরী দক্ষতার বিকাশও ত্বরান্বিত হয়। লোহার ব্যবহার ও চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্রের নির্মাণশিল্পের বিকাশ যেমন তার সাক্ষ্য বহন করছে তেমনি যজুর্বেদের বাজসনেয়ী সংহিতায় উল্লিখিত প্রায় ১৮ প্রকার কারিগরি ও পেশাদারি বৃত্তির উল্লেখ স্থায়ী ও নিরাপদ এক সমাজের ব্যাপক কারিগরি বৃত্তির অগ্রগতি স্পষ্ট নজির তুলে ধরেছে। স্থায়ী কৃষিভিত্তিক সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্যেও ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে। পশুচারণ ভিত্তিক ঋকবৈদিক যুগের তুলনায় তাই পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের অন্যতম গ্রন্থ যজুর্বেদে 'বাণিজ' কথাটি ব্যবহার করা হয়েছে, যেখানে বাণিজ কথাটি বণিকের পুত্র হিসাবেই ব্যবহৃত। এর দ্বারা স্পষ্টতই বোঝা যাচ্ছে যে বণিকের বৃত্তিটি সম্ভবত বংশানুক্রমিক হবার দিকেই ঝুঁকছিল। স্থায়ী ও নিরাপদ কৃষিভিত্তিক সমাজে ব্যবসা-বাণিজ্যের গুরুত্ব যে বৃদ্ধি পাবে তা সমকালীন সাহিত্যে সুস্পষ্ট।

ঋকবৈদিক যুগের পশুচারণভিত্তিক অর্থনীতি থেকে পরবর্তী বৈদিক যুগে স্থায়ী কৃষিভিত্তিক সমাজে রূপান্তরের যে চিত্রটি বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ের ক্রমবর্ধমান সাহিত্যসূত্র থেকে আমরা দেখতে পেলাম সমকালীন আর্থ-সামাজিক জীবনের ইতিহাসে তার গুরুত্ব ছিল নিঃসন্দেহে অপরিসীম। এই রূপান্তরের ফলে সমকালীন বস্তুগত সংস্কৃতির ক্ষেত্রে যেমন প্রভূত উন্নতি দেখা দেয়, তেমনি আর্থ-সামাজিক জটিলতাও বাড়তে থাকে। পশুচারণভিত্তিক কৌম গোষ্ঠী শাসিত সমাজে মোটামুটি আর্থ-সামাজিক সমতার নীতি প্রতিষ্ঠিত হলেও, কৃষিভিত্তিক সমাজে সমানাধিকারের ধারণা সাধারণত জনপ্রিয় হয় না এবং আর্থ-সামাজিক বৈষম্য প্রকট হয়ে ওঠে। ঋকবৈদিক সাহিত্যের তুলনায় পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বর্ণব্যবস্থার ব্যাপক কঠোরতা বৃদ্ধি সে সত্যই তুলে ধরে। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সামগ্রিকভাবে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়কে সামাজিক অগ্রাধিকার দেওয়া হতে থাকে এবং বৈশ্য ও শূদের অবস্থার ক্রমিক অবনতি ঘটতে থাকে। পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকেই কার্যত কায়িক শ্রম দ্বারা ধনোৎপাদনে নিযুক্ত সামাজিক গোষ্ঠীগুলির প্রতি তাচ্ছিল্য বাড়তে থাকে, অন্যদিকে উদ্বৃত্ত ধনের দ্বারা জীবন নির্বাহকারী ক্ষত্রিয় ও ব্রাহ্মণ বর্ণের আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক ক্ষমতা ব্যাপক আকার ধারণ করে। তবে এ-কথাও সত্য যে স্থায়ী কৃষিভিত্তিক সমাজের প্রতিষ্ঠা গাঙ্গেয় উপত্যকায় কৃষির প্রতিষ্ঠা হওয়ার পর থেকে ভারত ইতিহাসে আর কখনোই তার স্থান গৌণ হয়ে যায়নি। স্থায়ী কৃষিপ্রধান সমাজে জীবিকার নিরাপত্তা ও নিশ্চিতি ক্রমে পেশাদারি ও কারিগরি বৃত্তির উদ্ভব ঘটাতে সহায়ক হয়। তবে অর্থনৈতিক বৈষম্যের বৃদ্ধি

ঘটায় সামাজিক তারতম্য ও রাষ্ট্রশক্তির বিকাশের সুযোগও পাশাপাশি চলতে থাকে। আলোচ্য পর্বের সামাজিক জীবনের আলোচনায় এই চিত্র আরো স্পষ্টরূপে ধরা পড়ে।

১৮.২.৬.২ সামাজিক জীবন

অর্থনৈতিক জীবনের মতোই আলোচ্যপর্বের সামাজিক জীবন অনুধাবনেরও প্রাথমিক উৎস বৈদিক সাহিত্য সম্ভার। বৈদিক সাহিত্যে সমাজজীবনের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে সমাজের প্রাথমিক ভিত্তি ছিল পরিবার (কুল)। এই পরিবার ছিল পিতৃতান্ত্রিক। অর্থাৎ, পারিবারিক জীবন চালানোর চাবিকাঠি ছিল পরিবারের প্রধানতম পুরুষ সদস্যের হাতে। বৈদিক পরিবার প্রথা পিতৃমুখীও বটে। অর্থাৎ সেই সমাজে বংশগত পরিচয় ও সম্পত্তির অধিকার পিতা থেকে সন্তানের ওপর বর্তাতো। সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত পরিবার চরিত্রের দিক থেকে ছিল একান্নবর্তী পরিবার। অন্তত তিনপুরুষ যে বৃহদায়তন একান্নবর্তী পরিবারে একত্রে বাস করতেন, তার বহু প্রমাণ বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায়। বৈদিক একান্নবর্তী পরিবারের শীর্ষে থাকতেন পিতা। অন্যান্য সদস্যদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন পরবর্তী প্রজন্মের সন্তান সন্ততিরা এবং তৃতীয় প্রজন্মের অন্তর্গত পৌত্র-পৌত্রীর পারিবারিক জীবনে এক বিশেষ দিক ছিল অতিথেয়তা। এক কথায় শিশুর কল-কাকলিতে মুখর প্রাণবন্ত পরিবারের জীবনের ছবি, বৈদিক সাহিত্যে ফুটে ওঠে। ঋকবৈদিক এবং পরবর্তী বৈদিক উভয় যুগে মোটামুটি এই ধারা অক্ষুণ ছিল।

সনাতন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার প্রধানতম বৈশিষ্ট্য অর্থাৎ চতুর্বর্ণ প্রথা, তার প্রথম উল্লেখ ঋকবেদে পাওয়া যায়। ঋকবেদের পুরুষসূক্তে চারবর্ণের উৎপত্তি প্রসঙ্গে বলা হয়েছে যে, আদিপুরুষের মুখ থেকে ব্রাহ্মণ, বাহুদ্বয় থেকে রাজন্য, উরুযুগল থেকে বৈশ্য, দুই পা থেকে জন্ম নেয় শূদ্র। এর ভিত্তিতে আপাতভাবে মনে হওয়া স্বাভাবিক যে, ঋকবৈদিক সমাজে চতুর্বর্ণ প্রথা সুপ্রতিষ্ঠিত হয়ে গিয়েছিল। সেখানে ব্রাহ্মণের কর্ম পৌরহিত্য, ক্ষত্রিয়ের কর্ম শাসন ও যুদ্ধ ও বৈশ্যের বৃত্তি কৃষি ও বানিজ্যাদি এবং শূদ্র উচ্চতর বর্ণের শুশ্রূষায় নিযুক্ত। বর্ণ সমাজের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট নির্দিষ্ট পেশাভিত্তিক সামাজিক বিভাজনের এই অস্তিত্বকে অনেক পণ্ডিত মেনে নিয়েছেন। তাঁরা ব্রাহ্মণ শব্দটিকে ব্রহ্মণ -এর পুত্র ব্যাখ্যা করে সিদ্ধান্ত নিয়েছেন যে, বর্ণব্যবস্থা সুলভ জন্ম দ্বারা সামাজিক ও পেশাগত পরিবার ঋকবেদের যুগ থেকেই প্রচলিত ছিল। কিন্তু ডঃ রণবীর চক্রবর্তী মনে করেন, এই মত সন্দেহপূর্ণ। তাঁর মতে, বর্ণ ব্যবস্থার বিশিষ্ট লক্ষণ গুলি হল- ১) জন্ম দ্বারা নির্ধারিত, ২) পুরুষতান্ত্রিক বৃত্তিধারণের আবশ্যিকতা এবং বৃত্তির পরিবর্তনের নিষিদ্ধতা, ৩) শুধুমাত্র স্ব-বর্ণ বিবাহের (অন্তর্বিবাহ) সিদ্ধান্ত ৪) বর্ণান্তরে খাদ্য ও পানীয় গ্রহণ সংক্রান্ত কঠোর বিধিনিষেধের প্রয়োগ ও ৫) উচ্চ-নীচ মর্যাদার প্রকট প্রকাশ। এই লক্ষণগুলি ঋকবেদে বিশেষ দেখা যায় না। তাছাড়াও ঋকবেদে পুরুষসূক্ত ছিল দশম মণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত, যার রচনাকাল ঋকবেদের পরবর্তী। তাই এই সাক্ষ্য দিয়ে ঋকবৈদিক যুগের পরিস্থিতি অনুধাবন করা অনুচিত। ডঃ চক্রবর্তী আরও মনে করেন যে, পুরুষসূক্ত বাদে ঋকবেদে অন্যত্রও চতুর্বর্ণের উল্লেখ অত্যন্ত বিরল। ঋকবেদে প্রকৃতপক্ষে চারটি নয়, দুটি- 'আর্য বর্ণ' ও 'দাস/দস্যু' বর্ণ এই দুই বর্ণের নিয়মিত উল্লেখ পাওয়া যায়; স্পষ্টতই চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার মতো স্তরীভূত সমাজ ব্যবস্থার পরিচয় দেয় না। এছাড়াও বংশানুক্রমিক নির্দিষ্ট বৃত্তির অনুসরণের নিয়মও যে ঋকবৈদিক সমাজে বিশেষ কঠোর ছিলনা, তারও ইঙ্গিত পাওয়া যায়। ঋকবেদের একটি পরিচিত সূক্তে, যেখানে বলা হয়েছে যে, 'এক ব্যক্তি যিনি কবি, তার পিতা ছিল চিকিৎসক (ভিষ্ক) ও মাতা শস্যচূর্ণ করার কাজে নিযুক্ত (উপল প্রক্ষিণী)।

ঋকবৈদিক যুগে সামাজিক সংগঠনের ক্ষেত্রে বর্ণের চেয়ে অনেকবেশি ব্যবহৃত ও পরিচিত ছিল 'জন', 'গণ', 'বিশ' শব্দগুলি। ঋকবেদে ব্যবহৃত এই শব্দগুলি কৌম সংগঠনের আভাস দেয়। কৌমের জীবন অপেক্ষাকৃত সরলতর ও বর্ণব্যবস্থার মতো কঠোর ভেদাভেদ এক্ষেত্রে অনুপস্থিত ছিল। ডঃ রামশরণ শর্মা ঋকবেদে উল্লিখিত ভাজ' ধাতু নিষ্পন্ন শব্দের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করেছেন। 'ভাজ' থেকে একসঙ্গে 'ভক্ত' (খাদ্য বা অন্ন) এবং 'ভাগ' এই শব্দটিরও উৎপত্তি হয়েছে। ডঃ শর্মার মতে, পশুচারণ ভিত্তিক ঋকবৈদিক কৌম সমাজে খাদ্য সম্ভার কৌম সদস্যদের মধ্যেই সম্ভবত বণ্টিত হত। যেহেতু সেই সমাজে কৃষির পূর্ণাঙ্গ পত্তন ঘটে নি, তাই সেই সমাজ ছিল সামাজিক ধনসম্পদ বন্টনের ক্ষেত্রে অপেক্ষাকৃত কম বৈষম্যমূলক। এই কারণেই, বর্ণ সমাজের জটিলতাও সেই সমাজে অনুপস্থিত ছিল। তবে একথা মনে করা ঠিক নয় যে, ঋকবৈদিক সমাজ ছিল পূর্ণ সাম্যভিত্তিক সরলতর সমাজ। সুবিরা জয়সওয়াল ঋকবেদের সমাজেও সামাজিক ব্যবধান যে ছিল, তার প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন আমাদের, তবে এই ভেদাভেদ বর্ণভেদ দ্বারা চিহ্নিত নয়। ঋকবেদে মেঘবন্ বা সম্পন্ন ব্যক্তির উল্লেখ যেমন পাওয়া যায়, তেমনি দরিদ্রতর ব্যক্তিও বিদ্যমান ছিলেন। ডঃ রোমিলা থাপার এর বিচারে, ঋকবেদের সমাজের রক্ত সম্পর্ক বহির্ভূত ব্যক্তির কাছ থেকে শ্রম আদায় প্রচলিত ছিল না। ঋকবেদের বৃহৎ যৌথ পরিবার ব্যবস্থায় বয়স্ক প্রজন্ম নির্ভর করতেন তার পরবর্তী প্রজন্মের শ্রমদানের ওপর। এটি তাঁর মতে, 'লিনিয়েজ প্রথার' (Lineage system) ফল। তবে এ. এল. ব্যাশামের মত, মার্কসীয় ঐতিহাসিকদের কেউ কেউ ঋকবেদে শ্রেণিসুলভ বিভাজনের উপস্থিতির পক্ষে রায় দিয়েছেন। কিন্তু সব মিলিয়ে একথা অবশ্যই বলা যায় যে, 'বর্ণ ব্যবস্থার বিকাশ' ঋকবৈদিক সমাজে আদৌ ঘটেনি।

ঋকবৈদিক সমাজের তুলনা পরবর্তী বৈদিক যুগের সমাজব্যবস্থায় অনেক গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। ঋকবেদের তুলনায় পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে সামাজিক জটিলতার ছবিও আরও প্রকট হয়ে ওঠে। পশুচারণ ভিত্তিক সমাজ থেকে স্থায়ী কৃষিজীবী সমাজের প্রকাশের সঙ্গেই এই সামাজিক জটিলতা বৃদ্ধির প্রক্রিয়াটি অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে যুক্ত ছিল বলে ডঃ রণবীর চক্রবর্তী মনে করেন, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে 'বর্ণ' শব্দটি আর গাত্রবর্ণ অর্থে ব্যবহৃত হয়নি, তা চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার সমার্থক হয়ে দাঁড়ায়। সামাজিক ভেদরেখা পরবর্তী বৈদিক যুগে অনেক স্পষ্ট আকার নেয়। এই যুগের সমাজে ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্যের বর্ণগত মর্যাদা পূর্বের পূর্বের তুলনায় বহুলাংশে বৃদ্ধি পায় এবং এই তিন বর্ণ 'দ্বিজ' বলে অভিহিত হয়। অর্থাৎ তাদের উপনয়নের অধিকার স্বীকৃত হয়। যে অধিকার থেকে শূদ্ররা ছিল বঞ্চিত। শূদ্রদের একমাত্র বৃত্তি ছিল উচ্চতর তিন বর্ণের শুশ্রূষা করা। পরবর্তী বৈদিক আমলে জটিল আচার-অনুষ্ঠান নির্ভর যাগযজ্ঞের ব্যাপকতা যেমন দেখা দিয়েছিল, তার সাথে তাল মিলিয়েই যাগযজ্ঞের পুরোহিত তথা ব্রাহ্মণদের ক্ষমতা উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেতে থাকে। ব্রাহ্মণদের ঠিক পরেই স্থান ছিল ক্ষত্রিয়দের, এরা ঋকবেদে 'রাজন্য' বলে পরিচিত হলেও, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অসীম ক্ষমতাধর শাসকগোষ্ঠী রূপে 'ক্ষত্রিয়' বলে বর্ণিত। এক্ষেত্রে বিশেষভাবে লক্ষণীয় যে, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উভয়ই সামাজিক উৎকর্ষতার দাবিদার। ফলে, দুই গোষ্ঠীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাসও পাওয়া যায়। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে, ব্রাহ্মণ বর্গকে ক্ষত্রিয়ের দৃষ্টিভঙ্গি থেকে সোমপায়ী, অপরের দ্বারা ভক্ষ এবং অপরের দ্বারা নির্ভরশীল বলে বর্ণনা করা হয়েছে। কিন্তু রামশরণ শর্মা পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য থেকে এমন কিছু নজির তুলে ধরেছেন যেখান থেকে বোঝা যায়, শাসক চাইলে এক ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে সরিয়ে পছন্দসই অন্য ব্রাহ্মণ পুরোহিতকে নিয়োগ করতে পারতেন। তবে দুই উচ্চতম বর্ণের মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতার আভাস যেমন মেলে, তেমনি উভয়ের মধ্যে সহযোগিতার দিকটিও বিশেষভাবে লক্ষণীয়। কারণ পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এমন উচ্চারণও আছে যে, ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় পরস্পরের ওপর নির্ভরশীল ও একে অপরের পরিপূরক।

পরবর্তী বৈদিক সমাজে ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয়ের মর্যাদা ও প্রতাপ যখন ক্রমবর্ধমান। তখন নিম্নতর বৈশ্য ও শূদ্রের সামগ্রিক অবস্থার ক্রমাবনতি ঘটতে থাকে। বৈশ্যরা দ্বিজ গোষ্ঠীর অন্যতম হলেও তাদের সম্পর্কে হেয় মনোভাব প্রকট হয়ে ওঠে। ঐতরেয় ব্রাহ্মণে বৈশ্য বলিকৃৎ' (শাসকের জন্য বলি উৎপাদনকারী), যথাকামোথপ্য' (যাকে যথেচ্ছ উৎখাত করা যায়), 'যথকামোপ্রেষ্য' (যাকে যথেচ্ছ অত্যাচার করা যায়) এই তিনটি অভিধায় চিহ্নিত। তবে বর্ণ ব্যবস্থার কঠোরতায় পরবর্তী বৈদিক যুগে সবচেয়ে বেশি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছিল শূদ্ররা। ঐতিরেয় ব্রাহ্মণ অনুযায়ী, শূদ্রকে যথেচ্ছ উৎখাত করাত যেতই এবং তাকে যথেচ্ছ হত্যা করা যায় (যথাকামবধ্য)। স্পষ্টতই, বৈশ্য ও শূদ্রের মধ্যে ভেদরেখা এই যুগে ক্রমশ অস্পষ্ট হয়ে আসতে থাকে। সামাজিক হীনতার দিক থেকে এই দুই বর্ণ কার্যত এক বন্ধনীভুক্ত হয়ে পড়ে। রামশরণ শর্মার মতে, বৈশ্য চতুর্বর্ণের মধ্যে একমাত্র ধনোৎপাদক গোষ্ঠী, ফলে তাকে বলিকৃতের পর্যায়ে অবনমিত রাখলে, সমাজের ধনসম্বলের ওপর নিয়ন্ত্রণ রাখা উচ্চতর দুই বর্ণের পক্ষে সহজ ছিল। অন্যদিকে শূদ্রের কাছ থেকে আদায় করা হত শ্রম, ফলে তার অবস্থান পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে হীনতম রূপে দেখান হয়েছে। আর ব্রাহ্মণ ও ক্ষত্রিয় উৎপাদন প্রক্রিয়ার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত না থেকেও বলি ও শ্রম আদায় নিশ্চিত করে, বিশেষ সুযোগ-সুবিধা ভোগ করত। এই কারণেই নিম্নতর দুই বর্ণের ওপর আধিপত্য কায়েম রাখতে ও সামাজিক প্রক্রিয়ার যুগ্ম আধিপত্য অটুট রাখতে ক্রমেই প্রতিদ্বন্দ্বিতার পরিবর্তে সামাজিক সমঝোতার পথে পা বাড়িয়েছিল।

সমাজজীবনের বর্ণনায় বর্ণ ব্যবস্থার বিকাশের সঙ্গেই মিলিয়ে দেখতে হবে বিবাহ সংক্রান্ত বিধি নিষেধ। যা ঋকবেদের তুলনায় পরবর্তী বৈদিক যুগে নিঃসন্দেহে জটিল আকার ধারণ করেছিল। স্ববর্ণে কিন্তু গোত্রান্তরে বিবাহের আদর্শ পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকে প্রকট হতে থাকে। স্ববর্ণ বিবাহই এই যুগে আদর্শ হলেও তার ব্যতিক্রম ঘটত। এই ব্যতিক্রমকে স্বীকৃতি দেবার জন্যই, অসবর্ণ বিবাহের দুই প্রকারভেদ- অনুলোম (উচ্চবর্ণের পুরুষ ও নিম্নবর্ণের কন্যার বিবাহ) ও প্রতিলোম (নিম্নবর্ণের পুরুষ ও উচ্চবর্ণের কন্যার বিবাহ) এই দুই প্রকার বিবাহকে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছিল। তবে নিঃসন্দেহে, অনুলোম বিবাহ যেমন বৈদিক সাহিত্যে অনুমোদন পেয়েছে, প্রতিলোমের ক্ষেত্রে তা দেখা যায় না। বলা বাহুল্য, এই অনুলোম ও প্রতিলোম বিবাহের ধারণা যে শুধু বর্ণভেদের তত্ত্বকেই আশ্রয় করে দেখা দিল, তাই নয় এই তত্ত্ব পুরোপুরি উচ্চতর বর্ণভুক্ত পুরুষের সুবিধা ও স্বার্থরক্ষার্থে তৈরি হয়েছিল।

বর্ণব্যবস্থা ও বিবাহ পদ্ধতির সঙ্গে সমাজ জীবনে নারীর অবস্থানের বিষয়টি অঙ্গাঅঙ্গি ভাবে যুক্ত এবং এক্ষেত্রে ঋকবৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক যুগে এক ব্যাপক রূপান্তর লক্ষ্য করা যায়। পিতৃতান্ত্রিক সমাজ ব্যবস্থায় নারীর সামগ্রিক অবস্থান পুরুষদের তুলনায় যে গৌন, সমগ্র বৈদিক সাহিত্যেই তার প্রমাণ মেলে। ঋকবেদে বারংবার কন্যা সন্তানের তুলনায় উচ্চারিত হয়েছে পুত্র সন্তান লাভের কামনা। তবে কন্যা সন্তান গ্রহণ করলে, ঋকবৈদিক যুগে তার অবহেলা হত না। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে খোলাখুলি বলা হয়েছে, কন্যা কষ্টের কারণ। ঋকবেদে নারী গার্হস্থ্য কর্মে অংশ নিলেও তার জীবন গৃহস্থলীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল না। অপলা, ঘোষা, বিশ্ববারা প্রমুখ নারীরা 'ব্রহ্মবাদিনী' রূপে ঋকবেদের অনেকগুলি সূক্তের রচিয়তা। ঋকবেদে নারীরা সভা, সমিতির অধিবেশনে যাচ্ছেন এমন বর্ণনাও পাওয়া যায়। বিশ্ববালা, শশীয়সী প্রমুখ নারীরা যুদ্ধেও অংশ নিতেন, সুকুমারী ভট্টাচার্যের ব্যাখ্যা অনুযায়ী, ঋকবেদে উল্লিখিত জরৎকুমারী বা বৃদ্ধাকুমারী নারীরা সম্ভবত অবিবাহিত হিসেবেও সমগ্র জীবন অতিবাহিত করতে পারতেন। কিন্তু পরবর্তীকালে বিবাহ নারীদের পক্ষে প্রায় বাধ্যতামূলক হয়ে দাঁড়ায়। ঋকবেদ অনুযায়ী, প্রাপ্তবয়স্ক নববধূ নারী বিবাহের সময়ে ইচ্ছামত পতিও নির্বাচন করতে

পারতেন। ঋকবেদে 'সমন' নামক খেলা জাতীয় যে অনুষ্ঠানের বিবরণ আছে, সেখানে উপযুক্ত জীবনসঙ্গী নির্বাচন করতে প্রাপ্তবয়স্ক নারী ও পুরুষ সমবেত হতেন। ঋকবেদে একমাত্র বলা হয়েছে বিবাহের পর নববধূ যখন পতিকুলে শ্বশুর বাড়ি যাবেন, তখন তিনি যেন সেখানে সম্রাজ্ঞীর মতো সম্মান ও মর্যাদা লাভ করেন। ঋকবেদে স্বামীর সাথে স্ত্রী যজ্ঞেও অংশ নিতেন, সতীপ্রথাও এযুগে প্রচলিত ছিল না। এমনকি অপুত্রক বিধবা নারী পুত্র সন্তান জন্ম না হওয়া পর্যন্ত দেবরের সঙ্গে সহবাস করতে পারতেন। যা 'নিয়োগ প্রথা' নামে অভিহিত। পুত্র সন্তান উৎপাদনই ছিল এই সামাজিক রীতির উদ্দেশ্য।

সামাজিক রীতি নীতির কঠোরতা বৃদ্ধির সাথে সাথে পরবর্তী বৈদিক যুগে নারীর মর্যাদাও ব্যাপক হ্রাস পায়। কন্যা সন্তানের জন্ম শুধু কষ্টের কারণই নয়, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে মেয়েদের শিক্ষা সম্বন্ধেও অনীহা লক্ষ্য করা যায়। এর পাশাপাশি নারীর অপ্রাপ্তবয়স্ক অবস্থাতেও বিবাহ সম্পাদনের ওপর পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের জোর দেওয়া হয়েছে। নারীর মর্যাদার অবক্ষয়ের এটি অন্যতম পদক্ষেপ। ঋকবৈদিক যুগের সম্পূর্ণ বিপরীতে পরবর্তী বৈদিক যুগে স্বামীর প্রতি আনুগত্য প্রদর্শন ও অনুবর্তন করাই স্ত্রীর আদর্শ হয়ে ওঠে। বৈদিক শিক্ষার পাশাপাশি যজ্ঞ সম্পাদনের অধিকারও তিনি হারান। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য স্পষ্ট বলা হয়েছে, স্বামীর জৈবিক কামনা বাসনা চরিতার্থ করার জন্য নারী সদা প্রস্তুত থাকবে। পুরুষের বহুবিবাহের প্রবণতা বৃদ্ধি ও সপত্নীদের উপস্থিতি পরবর্তী বৈদিক যুগের নারীদের মর্যাদা অবনয়নের জ্বলন্ত উদাহরণ। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্য বলা হয়েছে যে, সূর্যদর্শন করে, প্রেত যেমন ছুটে পালায়, পুত্রবধূ তেমনই শ্বশুরকে দেখে পলায়ন করেন। ঋকবেদে যে পুত্রবধূ পতিকূলে সম্রাজ্ঞীর মর্যাদা পেতেন, তিনি পরবর্তীকালে প্রেতের সমকক্ষ বলে চিহ্নিত। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে মাতা হিসাবে নারীর প্রতি সম্মান জনক উক্তি থাকলেও তার আসল তাৎপর্য ছিল, সন্তান উৎপাদক, বিশেষত পুত্র সন্তানের জন্মদাত্রীরূপে। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে নির্দেশ দেওয়া হয়েছে, যে নারী কেবলমাত্র কন্যার জন্ম দেন, তিনি দশ বছরের মধ্যে পরিত্যাজ্য, যিনি কেবল মৃৎবৎসার জন্ম দেন, তিনি দ্বাদশ বৎসরের মধ্যে পরিত্যাজ্য, কিন্তু যিনি স্বামীর কথার প্রত্যুত্তর দেন, তিনি তৎক্ষণাৎ পরিত্যাজ্য। পরবর্তী বৈদিক যুগে নারী ক্রমশ ভোগ্যবস্তুতে পরিণত হয় এবং তার ওপর পিতৃতান্ত্রিক সমাজের আধিপত্য ব্যাপক আকার ধারণ করে। অন্তত সদাশিব অলটেকর প্রাচীন ভারতের নারীর উচ্চ মর্যাদা এবং দিল্লিতে তুর্কীশাসনের অভিঘাতে নারীর মর্যাদার অবক্ষয়ের যে চিত্র অঙ্কন করেছিলেন, তা উপরোক্ত আলোচনার দ্বারা কার্যত ভ্রান্ত বলে মনে হয়। বস্তুত, পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকেই সমাজ জীবনে নারীদের মর্যাদা যে দ্রুত হ্রাস পেয়েছিল, সুকুমারী ভট্টাচার্য, কুমকুম রায়, উমা চক্রবর্তী প্রমুখের গবেষণা সে বিষয়ে আমাদের সচেতন করে।

১৮.২.৭ ধর্মীয় জীবন

বৈদিক সাহিত্য প্রধানত ধর্ম বিষয়ক গ্রন্থসম্ভার। তাই ধর্মীয় ধ্যানধারণা ও ক্রিয়াকলাপ অনুধাবন করার জন্য বৈদিক সাহিত্য সম্ভারের গুরুত্ব অনুস্বীকার্য। এর পাশাপাশি পণ্ডিতদের ধারণা যে বৈদিক যুগের ধর্মীয় জীবনের মধ্যেই পরবর্তীকালের ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শিকড় প্রোথিত। তবে এই কথাও অনস্বীকার্য যে, রাজনীতি, সমাজ ও অর্থনীতির মতোই বৈদিক যুগে ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপ ও ধ্যানধারণাও ছিল পরিবর্তনশীল। ঋকবৈদিক যুগ থেকে পরবর্তী বৈদিক যুগে এই পরিবর্তনের চিহ্ন ছিল সুস্পষ্ট।

বৈদিক সমাজ যেহেতু ছিল পিতৃতান্ত্রিক, তাই ঋকবেদে উল্লিখিত দেবদেবীর মধ্যে দেবতার তুলনায় দেবীরা সংখ্যায় ছিলেন কম। যাস্ক তাঁর 'নিরুক্ত'তে ঋকবেদের দেবদেবীদের তিন ভাগে ভাগ করেছেন—

১) 'দ্যুলোক' বা স্বর্গের দেবদেবী,- মিত্র, পুষা, বিষ্ণু, ঊষা, আদিত্যগণ প্রমুখ।

২) 'অন্তরীক্ষ' বা আকাশের দেবতা- ইন্দ্র, রুদ্র, বায়ু, মরুদগণ প্রমুখ।

৩) 'ভূলোক' বা পৃথিবীর দেবতা- অগ্নি, পৃথিবী, সোম।

ঋকবৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত তিনলোকের দেবতাদের ক্ষেত্রেই প্রাকৃতিক পটভূমি লক্ষ্য করা যায়। যেমন- দ্যৌঃ অর্থাৎ আকাশ। সুতরাং তার প্রাকৃতিক পটভূমি তর্কাতীত। দ্যৌ এর প্রণয়িনী হলেন পৃথিবী এবং তাদের যুগ্ম রূপ হল দ্যাবাপৃথিবী, যার মধ্যে সমগ্র জগতের পিতা মাতার ধারণা স্থান পেয়েছে। ঋকবেদে উল্লিখিত 'মিত্র' সৌরদেবতারদের মধ্যে সর্বাগ্রগণ্য। কেবলমাত্র একটি সূক্ত বাদ দিলে ঋকবেদের সর্বত্রই মিত্র, বরুণের সাথে যুক্ত থাকেন (মিত্রাবরুণ) এবং তিনি বরুণের চক্ষুরূপে চিহ্নিত। এ ছাড়া অপর দুই সৌরদেবতা হলেন 'সূর্য' স্বয়ং এবং সবিতৃ। প্রভাতের দেবীরূপে ঋকবেদে উপাসিত হয়েছেন 'ঊষা'। অসামান্য কান্তিময়ী এই দেবী চিরযৌবনা, তিনি পূর্ব দিকে উদিতা হন, তিনি একাধারে সূর্যের মাতা ও প্রণয়িনী। প্রণয়িনী যেমন প্রেমিকের সামনে নিজ আবরণ উন্মোচন করেন, ঋকবেদে অনুযায়ী ঊষাও তেমনি নিজেকে উদ্ভাসিত করেন। ঋকবেদের কুড়িটি সূক্তে ঊষার প্রতি নিবেদন এই দেবীর গুরুত্বের পরিচয় বহন করেন। ঋকবেদে 'বিষ্ণু' আদিত্যরূপে কল্পিত। তবে ঋকবৈদিক যুগে তিনি গৌণদেবতা হিসেবে পরিগণিত, যদিও পরবর্তীকালে তাঁর গুরুত্ব ব্যাপক বৃদ্ধি পায়।

বৈদিক যুগে ধর্মীয় জীবনে অন্তরীক্ষের দেবতাদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা পেয়েছেন 'বরুণ' ও 'ইন্দ্র'। ঋকবেদে বরুণ 'ধৃতব্রত', অভিধায় চিহ্নিত, কারণ, তিনি সকল কিছুকে ধরে রাখেন। তিনি ঋত বা যাবতীয় প্রাকৃতিক নৈসর্গিক নিয়মের রক্ষক। কোনো স্থনই তাঁর নজরের বাইরে থাকে না। অন্যায়কারীকে তিনি তাঁর পাশ দিয়ে বন্ধন করে থাকেন। আবার ঋতুসমূহের নিয়ামক হিসেবেও তিনি বর্ষণেরও দেবতা, তাই জলের অধীশ্বর হিসাবেও তিনি চিহ্নিত। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে, আদি বৈদিক ধর্মে সম্ভবত মুখ্য দেবতা ছিলেন 'বরুণ', যদিও ইন্দ্রের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব বরুণের অগ্রগণ্য মর্যাদাকে কিছুটা হ্রাস করেছিল।

ঋকবেদে সর্বাগ্রগণ্য দেবতা নিঃসন্দেহে ছিলেন 'ইন্দ্র'। যার প্রমাণ ঋকবেদে তার উদ্দেশ্যেই সর্বাধিক সংখ্যক সূক্ত রচিত হয়। ঋকবেদে বলা হয়েছে তিনি দেবতাদের প্রধান। কারণ, তিনি অসামান্য বীর হিসেবে দেবতাদের দলপতি তুল্য, তিনি রথারোহী যোদ্ধা রূপে শত্রুদের অশ্বনির্মিত পুর ধ্বংস করেন। তাঁর আয়ুধ বজ্র। দুইটি শক্তিশালী অশ্ব তাঁর সুবর্ণময় রথকে বহন করে। এমন রূপকল্পনাও ঋকবেদে উপস্থিত। তাঁর অপর পরিচয় তিনি বৃত্র সংহারক। বৃত্র কথাটি মেঘের দ্যোতক। সেই অর্থে ইন্দ্রের মধ্যে জল, আকাশ, মেঘ এবং বজ্র বিদ্যুতের অধিষ্ঠাতা দেবতার সমাহার দেখা যায়। ইন্দ্রের অপর অভিধা 'সোমপা', কারণ তিনি প্রভূত পরিমাণে সোমরস পান করতেন।

ঋকবেদে ভূলোক বা পৃথিবীর দেবতাদের মধ্যে বিশেষ মর্যাদা লাভ করেন 'অগ্নি'। তিনি একাধারে দেবতাদের পুরোহিত এবং যজ্ঞে প্রদত্ত আহুতি তিনি দেবতাদের হয়ে গ্রহণ করেন(আসলে ভক্ষণ করেন)। তাঁর খাদ্য ও পানীয়রূপে যথাক্রমে চিহ্নিত হয়েছে কাঠ, ঘৃত ও সোমরস। প্রতি গৃহে তিনি পূতাগ্নি হিসাবেও নিত্য বিরাজমান, তাই তাঁর অপর অভিধা গৃহপতি। আবার তিনি সর্বোহত বলে জাতবেদা নামেও আখ্যাত। পার্থিব দেবতাদের মধ্যে

সোমের কথা বিশ্বাস উল্লেখ্য, কারণ সমগ্র নবম মন্ডলটি (ঋকবেদে) তাঁর উদ্দেশ্যে রচিত। ঋকবেদে যা সোম, আবেস্তাতে তাই হওম' বলে আখ্যাত। ঋকবেদে সোমের স্তুতি করা হয়েছে অমৃততুল্য, মৃতসঞ্জীবনী এক পানীয়রূপে।

ঋকবৈদিক ধর্মীয় জীবনে যজ্ঞানুষ্ঠান একেবারে অপরিচিত ছিল না। তবে অবশ্যই পরবর্তী বৈদিক যুগের মতোই জটিল ও আচারসর্বস্ব রূপ নেয়নি। ঋকবেদে দেবদেবীর উদ্দেশ্যে যে স্তুতি করা হত, তার অন্যতম উদ্দেশ্য ছিল, অতীত দেবদেবীর সহায়তা লাভের স্মৃতিকে জাগ্রত করা এবং তারই ভিত্তিতে ঋষিরা আশা রাখতেন যে, দেবতাদের কৃপা আবারও সাহায্য প্রার্থীদের ওপর বর্ষিত হবে।

ঋকবেদে গভীর দার্শনিক চিন্তার পরিচয় পাওয়া যায়, মৃত্যুর পর কি ঘটে, সেই প্রশ্নও ঋকবৈদিক ঋষিদের আলোড়িত করেছিল। একটি মতানুযায়ী, মৃত্যুর পর দেহ পঞ্চভূতে বিলীন হয়ে যায়। কিন্তু অন্য মতে মৃত্যুর পর মানুষের গতি হয় যমলোকে। মৃত্যুর পর সূর্যলোকেও মানুষ যেতে পারে। অর্থাৎ মৃত্যুপরবর্তী অবস্থার স্বরুপ নিয়ে ঋকবৈদিক যুগে কোন নিশ্চিত ধারণা গড়ে ওঠেনি। বিশ্বসৃষ্টির প্রসঙ্গটিও ঋকবেদে স্থান পেয়েছে। যদিও তা নিয়ে সংশয় তখনও কাটেনি।

ঋকবৈদিক যুগের তুলনায় পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত ধর্মীয় জীবনে নানা পরিবর্তন ঘটে। যার মধ্যে প্রধান ছিল যজ্ঞনির্ভর ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব। ব্রাহ্মণ গ্রন্থগুলিতে যজ্ঞকে সর্বোচ্চ মহাজাগতিক শক্তিরূপে তুলে ধরে বলা হয় যে, যাবতীয় সৃষ্টি যজ্ঞক্রিয়ার উৎসারিত ফল। অসংখ্য আচার-অনুষ্ঠান ও নিখুঁত মন্ত্র উচ্চারণ পরবর্তী বৈদিক যুগের যজ্ঞ ক্রিয়ার সাথে অবিচ্ছেদ্যভাবে যুক্ত হয়ে গিয়েছিল। পরবর্তী বৈদিকযুগে শাসকীয় ক্ষমতা ও প্রতাপবৃদ্ধির অভিলাষে অনুষ্ঠিত অশ্বমেধ, বাজপেয় প্রভৃতি দীর্ঘ ও জটিল যজ্ঞানুষ্ঠান গুলি অনুষ্ঠিত হত। সেখানে পশুবলি ছিল অপরিহার্য। নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য এই মহাযজ্ঞের সঙ্গে আদিম জাদুবিশ্বাসের ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক লক্ষ্য করেছেন। এই যাদুবিশ্বাসের মূলে রয়েছেন প্রাকৃতিক ঘটনার নিখুঁত অনুকরণ ও স্পর্শ ভিত্তিক আচার অনুষ্ঠানের দ্বারা প্রকৃতিকে মানুষের ইচ্ছানুবর্তি করার বাসনা। এরই সাথে বৈদিক যাগযজ্ঞগুলিতে বহু ক্ষেত্রে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য উর্বরতা ও প্রজননের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট যৌনাচারের উপস্থিতি লক্ষ করেছেন। ব্রাহ্মণ গ্রন্থসমূহে প্রায়ই যজ্ঞবেদীকে যোনি ও যজ্ঞগুলির উৎপাদনকে যৌনক্রিয়ার সাথে তুলনা করা হয়েছে।

ঋকবেদের তুলনায় পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে দেবতাদের মধ্যে রুদ্র 'শিবের' গুরুত্ব সম্ভবত বৃদ্ধি পেয়েছিল। শতপথ ব্রাহ্মণে রুদ্র ও অগ্নিকে অভিন্ন বলা হয়েছে। পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে রুদ্র নানা স্থানে নানা নামে পরিচিত হয়েছে। যেমন- পূর্বদিকে 'পর্ব', বাহ্লীক দেশে তার নাম 'ভব', আবার তিনি 'পশুপতি' নামেও ভূষিত। এর থেকে বোঝা যায় যে, বৈদিক 'রুদ্র' ধীরে ধীরে পরবর্তী বৈদিক যুগে 'শিবে' রূপান্তরিত হন। যদিও লিঙ্গ উপাসনার কোন উল্লেখ পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে পাওয়া যায় না।

পরবর্তী বৈদিক যুগে শিবের মতোই 'বিষ্ণুর' মর্যাদাও ক্রমবর্ধমান। শতপথ ব্রাহ্মণে, বিষ্ণুর তিনটি স্থান হিসেবে পৃথিবী, বায়ুমণ্ডল ও আকাশের কথা বলা হয়েছে। বিষ্ণু ও যজ্ঞ অভিন্ন বলেও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে অভিহিত। শতপথ ব্রাহ্মণ, পঞ্চবিংশ ব্রাহ্মণ ও তৈত্তিরীয় আরণ্যক মিলিয়ে পড়লে মনে হয়, যজ্ঞের চরম ফল লাভ করার প্রতিযোগিতায় জয়ী হওয়ার দরুন 'বিষ্ণু' শ্রেষ্ঠ দেবতার মর্যাদা পেয়েছিলেন। তবে যে দেবতা পরবর্তী বৈদিক আমলের পূর্বে অজানা ছিলেন তিনি হলেন 'প্রজাপতি'। অথর্ব বেদে তিনি বিশ্বচরাচরের সৃষ্টিকর্তা ও রক্ষক ফলে বিশেষভাবে সম্মানিত। প্রজাপতি যজ্ঞের প্রতীক হিসাবেও উল্লিখিত।

পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের অন্যতম অঙ্গ আরণ্যক ও উপনিষদে যাগযজ্ঞের উল্লেখ থাকলেও এই দুই সাহিত্যেই যজ্ঞনির্ভর ধর্মীয় ক্রিয়াকলাপের বিকল্প ধ্যান-ধারণার পরিচয় পাওয়া যায়। আরণ্যক শব্দটি থেকে বোঝা যায় যে, এই সাহিত্য অরণ্যচারী ঋষিদের চিন্তার ফসল, যে ঋষিরা কৃষিজীবী স্থায়ী সমাজের অন্তর্গত নন এবং তারা যজ্ঞের শ্রেষ্ঠত্ব সম্পর্কেও সন্দিহান। রোমিলা থাপার-এর মতে, 'এই সংসার ত্যাগী অরণ্যবাসী চিন্তাবিদদের চিন্তাধারাতে এক বিকল্প সংস্কৃতির সন্ধান পাওয়া যায়।' জটিল ও আচার সর্বস্ব যাগযজ্ঞ নয়, মুক্তির প্রকৃত উপায় যে ধ্যাননির্ভর, উপলব্ধি ও জ্ঞান, এই বিকল্প ধারণাও উপনিষদে পাওয়া যায়। গভীর দার্শনিক জিজ্ঞাসা উপনিষদ সাহিত্যের প্রধানতম লক্ষণ এবং সেই কারণে এই সাহিত্য জগতে বিশেষ সমাদৃত। উপনিষদের প্রধান প্রতিপাদ্য ব্রহ্মতত্ত্ব। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৈদিক ঐতিহ্যবিরোধী যে নতুন ও দার্শনিক চিন্তাধারা উত্তর-পূর্ব ভারতকে আলোড়িত করেছিল, তার সঙ্গে উপনিষদিক তত্ত্বের মিল খুঁজে পাওয়া যায়।

ঋকবৈদিক ও পরবর্তী বৈদিক যুগের ধর্মীয় ধ্যানধারণার তুলনামূলক আলোচনার পরিশেষে বলতে পারি যে, আর্থসামাজিক জীবনের মতোই ধর্মীয় ক্ষেত্রেও বৈদিক যুগ পরিবর্তনের সাক্ষী। এই পরিবর্তনের প্রধান সাক্ষ্য গ্রহণ করছে ঋকবেদের তুলনায় পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে বর্ণিত জটিল আচার সম্পাদনের বিশদ নির্দেশাবলী। অবশ্য নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্যের মতে, পরিবর্তনের এই ধারাটি ছিল অতি সরল কারণ, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যের মত, ঋকবেদেও যজ্ঞ সম্পাদন কেন্দ্রীয় গুরুত্ব পেয়েছিল। তবে একথা বিশেষ উল্লেখযোগ্য যে, ঋকবেদে প্রজননের সঙ্গে আচার-অনুষ্ঠান অনুপস্থিত। কিন্তু পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে এই জাতীয় আচারের অবশ্যই দেখা মেলে। তাছাড়া সমগ্র বৈদিক সাহিত্যে কোথাও মূর্তিপূজার পরিচয় মেলেনি এবং এদিক থেকে আবার বৈদিক যুগের ধর্মীয় ধ্যানধারণার সাথে হরপ্পা সভ্যতার ধর্মীয় জীবনের পার্থক্য ছিল সুস্পষ্ট।

১৮.৩ খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০-৩০০ অব্দের উত্তর ভারত

ভারত ইতিহাসে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ, এই সময়কাল বহুবিধ গুরুত্বপূর্ণ পরিবর্তনের সাক্ষী। আনুমানিক ৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ বৈদিক সাহিত্য সম্ভারের শেষতম পর্বের উপনিষদগুলি সম্ভবত রচিত হয়ে গিয়েছিল। আবার খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের অন্তিম পাদে দেখা দিল প্রবল প্রতাপশালী মৌর্য সাম্রাজ্য। এই দুই পর্বের মধ্যবর্তী পর্যায়ে মূলতঃ উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে দেখা দিল নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আশ্রিত একাধিক রাজনৈতিক শক্তির উন্মেষ, যার অভিঘাত ছিল সুদূরপ্রসারী। আবার একই সময়ে উত্তর ভারতের নানা অঞ্চলে গড়ে উঠল নগর। সাংস্কৃতিক জীবনেও নতুন ধর্মীয় ধ্যান-ধারণার উদ্ভবের মধ্যে দিয়ে ধরা দিল পরিবর্তনের ছায়া। এই সামগ্রিক পরিবর্তনের ভিত্তিভূমি রূপেই তাই আলোচ্য সময়কালের উত্তর ভারতের ইতিহাস ভারত ইতিহাসে স্বতন্ত্রতার দাবিদার।

১৮.৩.১ রাজনৈতিক পরিস্থিতি

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ-পঞ্চম শতকে বুদ্ধের সমকালীন সময়ে উত্তর ভারতের ১৬ টি রাজনৈতিক শক্তির উল্লেখ পাওয়া যায় অঙ্গুত্তরনিকায় নামক বৌদ্ধ গ্রন্থে। যা ষোড়শ মহাজনপদ নামে পরিচিত। জনপদ শব্দটির আক্ষরিক অর্থ জন বা কৌম যেখানে তার পা রেখেছে। অর্থাৎ একটি জনগোষ্ঠীর নির্দিষ্ট এলাকা। অতএব জনপদের

সুচিহ্নিত ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য রয়েছে। তবে যে কোন এলাকাই জনপদ নয় অর্থাৎ জনবসতির পক্ষে অনুকূল অঞ্চল হল জনপদ। প্রাচীন ভারতীয় রাজনীতি বিষয়ক তথ্য অনুযায়ী জনপদ রাষ্ট্রের অন্যতম প্রধান উপাদান। অতএব জনপদ বলতে কোনোও রাজশক্তির শাসনাধীন জনবসতি সম্পন্ন এলাকাই বোঝাই। জনপদ কেবলমাত্র একটি ভৌগোলিক সংজ্ঞা নয় তার একটি রাজনৈতিক মাত্রা ও আছে। আর মহাজনপদ কথাটি নিঃসন্দেহে বৃহত্তর ভূখণ্ড ও ঐ ভূখণ্ডের ওপর ক্ষমতাধর অধিকতর প্রতাপশালী রাজনৈতিক শক্তিকে বোঝায়। অঙ্গুত্তর নিকায় অনুসারে আলোচ্য পর্বের ষোড়শ মহাজনপদ ও তাদের বর্তমান অবস্থান হল-

১. কাশী — রাজধানী বারাণসী বর্তমান উত্তরপ্রদেশের বারাণসী সন্নিহিত এলাকা।

২. কোশল —উত্তর প্রদেশে লক্ষ্ণৌ, গোণ্ডা, ফৈজাবাদ,বেহারাইচ এলাকা রাজধানী শ্রাবস্তী (এখনকার সহেট-মহেট)।

৩.অঙ্গ —বিহারের পূর্বাংশ রাজধানী চম্পা, বর্তমান ভাগলপুরের নিকটে অবস্থিত।

৪. মগধ—দঃ বিহারে অবস্থিত রাজধানী রাজগৃহ- গিরিব্রজ, এখনকার রাজগির।

৫. বৃজি —উত্তর বিহারের অবস্থিত ও প্রায় নেপালের তরাই অঞ্চল অব্ধি প্রসারিত , রাজধানী বৈশালী যার অবস্থান বর্তমান মজাফফরপুরের কাছে।

৬. মল্ল —রাজধানী, পাবাপুরী।

৭. চেদি- রাজধানী সুক্তিমতি, বর্তমান মধ্যপ্রদেশের জবলপুর ও সন্নিহিত এলাকা নিয়ে মহাজনপদের ভূখণ্ড

৮. বৎস— রাজধানী কৌশাম্বী ,এলাহাবাদ ও সংলগ্ন এলাকা জুড়ে এই মহাজনপদের এলাকা ছিল।

৯. মৎস্য —রাজধানী বৈরাট যা মহাভারতে উল্লিখিত। রাজস্থানের পূর্বাংশে অবস্থিত।

১০. শূরসেন- রাজধানী মথুরা, যমুনা নদীর উপর অবস্থিত সুপরিচিত মথুরা নগরী সঙ্গে অভিন্ন।

১১. কুরু— বর্তমান দিল্লি ও সন্নিহিত এলাকা, রাজধানী হস্তিনাপুর।

১২. পাঞ্চাল- রাজধানী কাম্পিল্য, বর্তমান রোহিলাখণ্ড এলাকা।

১৩. অশ্মক- রাজধানী গোবর্ধন, বর্তমান নান্দের মহারাষ্ট্র, এটি দাক্ষিণাত্যের অন্তর্গত একমাত্র মহাজনপদ, অবস্থান গোদাবরী উপত্যকায়।

১৪. অবন্তী—বর্তমান মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমাংশে অবস্থিত দুটি রাজধানী উজ্জয়নী ও মাহিষ্মতী।

১৫. গান্ধার- উপমহাদেশের উত্তর-পশ্চিম প্রান্তে অবস্থিত বর্তমানে পাকিস্তানের পেশোয়ার, রাওয়ালপিন্ডি অঞ্চল সিন্ধু নদের পূর্ব-পশ্চিম এর অন্তর্গত , রাজধানী প্রাচীনকালের বিখ্যাত তক্ষশীলা।

১৬. কম্বোজ- বর্তমান পাকিস্তানের হাজেরা জেলায় অবস্থিত।

উপরোক্ত মহাজনপদগুলির প্রায় সবই উত্তর ভারতে অবস্থিত শুধুমাত্র অশ্মক মহাজনপদ ছাড়া। মহাজনপদ গুলির অধিকাংশই রাজতান্ত্রিক। বৃজি ও মল্ল ছিল গণরাজ্য। কোশল, বৎস ,অবন্তী ,মগধ এবং বৃজি ছিল

সবচেয়ে শক্তিশালী ও ক্ষমতাধর মহাজনপদ। গাঙ্গেয় উপত্যকায় বিশেষত মধ্যগঙ্গা উপত্যকাতেই মহাজনপদ গুলির আবির্ভাব উত্থানের কারণ হিসেবে হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী লিখেছেন যে, বৃহদায়তন গাঙ্গেয় উপত্যকা ছিল এক বিস্তীর্ণ সমতলভূমি। কোনো প্রাকৃতিক বাধা এই অঞ্চলে কার্যত ছিল না। রাজনৈতিক ক্ষমতার বিস্তার ও একীকরণের জন্য ছিল একটি আদর্শ এলাকা। নদীবাহিত পলিমাটি ও যথেষ্ট বৃষ্টিপাতের দরুণ গাঙ্গেয় উপত্যকা স্বাভাবিকভাবেই কৃষি সমৃদ্ধ, বনজ সম্পদ সুপ্রচুর এবং নদীপথে যাতায়াত করাও কঠিন ছিল না।এই কারণেই মগধ ক্রমে শক্তিশালী হয়ে উঠেছিল। তবে এই উপাদান গুলি ছাড়াও ছিল যথেষ্ট সংখ্যক রণহস্তী, ব্রাহ্মণ্য গোঁড়ামি থেকে মুক্ত হওয়ায় মগধের উথান সম্ভবপর করে তুলেছিল। ডি ডি কোশাম্বী, রামশরণ শর্মা রোমিলা থাপার প্রমুখ ঐতিহাসিকরা মনে করেন যে বর্তমান বিহার ঝাড়খন্ড রাজ্যে আকরিক লোহার ব্যবহার শুরু হয়েছিল খ্রীষ্টপূর্ব ৭০০নাগাদ। মধ্যগঙ্গা উপত্যকায় অবস্থিত মহাজনপদ বিশষত মগধ লোহার উত্তরোত্তর ব্যবহারে সুবিধা ভোগ করেছিল। তাই মধ্যগঙ্গা উপত্যকায় বেশিরভাগ শক্তিশালী মহাজনপদ গুলির উপস্থিতি ছিল। হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী দেখিয়েছেন যে উত্তর ভারতে যেসব এলাকা বিশেষত হিমালয়ের পাদদেশে অবস্থিত অঞ্চল ও অপেক্ষাকৃত দুর্গম এলাকা প্রাকৃতিক কারণ দুরধিগম্য, সেখানে এমন রাজনৈতিক শক্তি গড়ে উঠেছিল যেগুলি নিজ নিজ স্বাতন্ত্র্য রক্ষায় ও প্রতিস্পর্ধায় বৃহৎ মহাজনপদের ক্ষমতা বিস্তার প্রতিরোধ করতে ছিল বদ্ধপরিকর। দ্বিতীয় ক্ষেত্রে একটি প্রক্রিয়া কাজ করেছিল রায়চৌধুরি যাকে চিহ্নিত করেছেন স্থানীয় স্বাতন্ত্র্য রক্ষার অভিলাষ হিসেবে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে মৌর্য সাম্রাজ্য প্রতিষ্ঠার আগে পর্যন্ত উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাস এই দুই বিপরীতধর্মী প্রতিক্রিয়ার নিরন্তর টানাপোড়েনের ফলে অত্যন্ত বর্ণময় ও তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

১৮.৩.২ মগধের আগ্রাসী নীতি

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর ভারতে কোন রাজনৈতিক ঐক্য ছিল না। আর্যাবর্তে অবস্থিত বিভিন্ন মহাজনপদ গুলি এসময় পারস্পরিক বিবাদে লিপ্ত ছিল। ক্রমেই মহাজনপদ গুলির মধ্যে কোশল, অবন্তী, বৎস ও মগধ তাতে উল্লেখযোগ্য হয়ে ওঠে এবং উত্তর ভারতে রাজনৈতিক প্রাধান্য স্থাপনের প্রশ্ন তাদের মধ্যে দীর্ঘস্থায়ী সংঘর্ষের সূচনা হয়। শেষ পর্যন্ত অপর তিন প্রতিদ্বন্দ্বী জনপদকে ধ্বংস করে সমগ্র উত্তর ভারতে মগধের একছত্র আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়, ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরী মগধের এই উত্থানের প্রশংসা করে লিখেছেন যে ইংল্যান্ডের ইতিহাসে 'ওয়েসেক্স' এবং জার্মানির ইতিহাসে 'প্রাশিয়া' যে ভূমিকা গ্রহণ করেছিল, প্রাচীন ভারতের রাজনৈতিক ইতিহাসে মগধও ঠিক অনুরূপ গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। মগধের এই ক্রমিক উত্থানের পশ্চাতে একাধিক কারণ গুরুত্বপূর্ণ হলেও মগধের রাজাদের আগ্রাসী নীতির ভূমিকা নিঃসন্দেহে সর্বাধিক গুরুত্বপূর্ণ ছিল এবং তাদের এই আগ্রাসী প্রচেষ্টার ফলশ্রুতি রূপেই মগধের নেতৃত্বে উত্তর ভারতের রাজনৈতিক ঐক্য সাধনের প্রক্রিয়া সম্পন্ন হয়েছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে রাজনৈতিক পরিবর্তন রূপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে মগধ মহাজনপদের রাজনৈতিক উত্থানে, পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যও মগধ সম্পর্কে হেয় মনোভাবই লক্ষ্য করা যায়। এমনকি একটি জাতকের কাহিনী থেকে জানা যায় যে, রাজগৃহ-গিরিব্রজ অঙ্গের অন্তর্গত ছিল, অর্থাৎ প্রাথমিকভাবে মগধ একটি গৌণ শক্তি হিসেবেই টিকে ছিল, কিন্তু আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ৫৪৫/৫৪৪ থেকে বিম্বিসারের রাজত্বকালের সূচনার সাথে সাথে মগধের চিত্র দ্রুত বদলাতে থাকে। রাজনীতিবিদ ও কূটনীতিবিদ বিম্বিসার এর মূল লক্ষ্য ছিল মগদের

শক্তি বৃদ্ধি। তাতে তিনি তবে তিনি শুরুতেই প্রতিবেশী শক্তিগুলির বিরুদ্ধে জঙ্গি নীতি নেন নি। কোশল, বৃজি, মদ্র শাসকদের সাথে তিনি বৈবাহিক মিত্রতার নীতি অবলম্বন করেন। ডঃ রায়চৌধুরীর মতে, বিম্বিসার অনেকটা অস্ট্রিয়ার হ্যাম্পসবার্গ ও বুরবোঁ দের মত বিভিন্ন রাজ পরিবারের সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে। বৃজির সাথে বৈবাহিক সম্পর্ক স্থাপন করে তিনি মগদের অব্যবহিত দূরে উঃ অবস্থিত প্রতিবেশীর সাথে সংঘাতের আশঙ্কা রোধ করেন। কোশল রাজকন্যা কোশল দেবীকে বিবাহ করে তিনি কাশী গ্রাম যৌতুক হিসাবে লাভ করেন। এরফলে এই প্রথম মগদের এলাকার বাইরে মগধের প্রশাসনিক কৃর্তত্ব প্রসারিত হয়। ডঃ রায়চৌধুরী বলেছেন যে বিম্বিসারের এই বৈবাহিক নীতির ফলে তিনি প্রবল সামরিক শক্তি সম্পন্ন রাজন্যবর্গকে যে শান্ত রাখতে সফল হলেন তাই নয়, পশ্চিম ও উত্তরে মগধের সাম্রাজ্য বিস্তারের ক্ষেত্রেও এই পদক্ষেপ তাকে সাহায্য করেছিল। এরপর বিম্বিসার পূর্ব দিকের প্রতিবেশী রাজ্য অঙ্গ মহাজনপদের বিরুদ্ধে সফল সামরিক অভিযান করেন ও মগধের অন্তর্ভুক্ত হয়। সামরিক অভিযানের দ্বারা এই প্রথম মগদের ভৌগোলিক বিস্তৃতি ঘটে এবং কোশল, অবন্তী প্রভৃতি আগ্রাসী শক্তির মতই একটি ক্ষমতাধর মহাজনপদ রূপে আত্মপ্রকাশ করে। বৌদ্ধ সূত্র অনুযায়ী বিম্বিসার কেবল যুদ্ধ জয়ের কৃতিত্ব পাওয়ার অধিকারী নয়, সুদক্ষ প্রশাসক রূপেও তিনি মগধের শক্তি বৃদ্ধি করেন।

মগধরাজ বিম্বিসারের আমলে মগধের শক্তি যে দৃঢ় ভিত্তির ওপর প্রতিষ্ঠিত হয় তা পরবর্তী শাসক অজাতশত্রুর কাছে বিশেষ অনুকূল হয়ে ওঠে। বিম্বিসারের পুত্র রূপে অজাতশত্রু মগধের সিংহাসনে বসলেও বৌদ্ধ শাস্ত্র মতে তিনি ছিলেন পিতৃহত্যাকারী। তাই তাঁর হাতে বিম্বিসারের মৃত্যু হলে তাঁর শোকে কোশল দেবীও মৃত্যু মুখে পতিত হন। এর ফলে কোশল রাজ প্রসেনজিৎ ক্ষুব্ধ হয়ে কাশী গ্রাম মগধের থেকে কেড়ে নেয়। এর ফলে মগধ-কোশল সরাসরি সংঘাত অবশ্যম্ভাবী হয়ে পড়ে। অজাতশত্রু ও প্রসেনজিতের মধ্যে দীর্ঘ লড়াই চলেছিল। তবে শেষ পর্যন্ত বৈবাহিক মৈত্রী সংগঠিত হয় এবং কাশীগ্রাম মগধের অধিকারেই থেকে যায়। এর কিছুকাল পর প্রসেনজিতের পুত্রের বিদ্রোহ ও প্রসেনজিতের অকাল মৃত্যুতে যোগ্য উত্তরাধিকারীর অভাবে কোশল দুর্বল হয়ে পড়ে এবং অজাতশত্রু কোশল দখল করে নেয়।

মগধরাজ অজাতশত্রুর আগ্রাসন নীতির অন্যতম দিক ছিল বৃজি মহাজন পদের সাথে সংঘাত। তবে এর কারণ নিয়ে নানা মতামত প্রচলিত, তবে যে কারণেই যুদ্ধ লেগে থাকুক না কেন অজাতশত্রু দীর্ঘ ১৪ বছর যুদ্ধ করার পর বৃজি মহাজনপদকে বশে এনেছিলেন। 'নিরয়াবলিয়া সুক্ত' নামক জৈন গ্রন্থে বলা হয়েছে অজাতশত্রুর হাতে ৯টি লিচ্ছবি, ৯টি মল্ল, এবং কাশী-কোশলের ১৮ টি গণরাজ্য এই যুদ্ধে পরাজিত হয়েছিল। ডঃ রণবীর চক্রবর্তীর মতে এর তাৎপর্য ছিল অপরিসীম, কারণ প্রকৃতপক্ষে এটি ছিল ক্রমবর্ধমান রাজতান্ত্রিক শক্তির বিরুদ্ধে অরাজতান্ত্রিক গণরাজ্যগুলির সম্মিলিত প্রতিরোধ গড়ে তোলার এক বিশিষ্ট নজির, তাছাড়া আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ দিক হল, কোশল ও বৃজি উভয়েই মগধের বিরুদ্ধে এই যুদ্ধে নেমেছিল। অর্থাৎ এই যুদ্ধে কোশল ও বৃজি মহাজনপদ দুটি তাদের প্রতিদ্বন্দ্বী মগধকে পর্যদুস্ত করতে চেয়েছিল। তাছাড়া অজাতশত্রুর সিংহাসনে বসার আগে মগধের ক্ষমতা প্রধানত গঙ্গার দক্ষিণস্থ এলাকাতেই সীমিত ছিল। অজাতশত্রু স্বাভাবিকভাবেই তাই গঙ্গার উত্তর তীরস্থ ভূখণ্ডে মগধের ক্ষমতা বৃদ্ধিতে বদ্ধ পরিকর ছিলেন। এভাবে রাজনৈতিক ভূগোল ও প্রতিস্পর্ধা শক্তিগুলির ক্ষমতার লিপ্সা সম্ভবত মগধ-কোশল ও মগধ-বৃজি প্রতিদ্বন্দ্বিতার ক্ষেত্র প্রস্তুত করে দিয়েছিল। তবে যাই হোক অজাতশত্রু কূটনীতি ও ভেদাভেদের যৌথ প্রয়োগ ঘটিয়ে এবং 'মহাশিলাকণ্টগ' ও 'রথমুষল' নামক দুটি অভিনব অস্ত্রের প্রয়োগ ঘটিয়ে শেষ পর্যন্ত সামরিক বিজয় লাভে সফল হন। এভাবে

গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সময় কোশল ও বৃজির ন্যায় মহাজনপদের কার্যক্ষমতা বিলুপ্ত করে দিয়ে মগধ গাঙ্গেয় উপত্যকায় পূর্বাংশে এক অপ্রতিহত শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করে। এই সময় মধ্যপ্রদেশের পশ্চিমের অবন্তী ছিল মগদের একমাত্র প্রতিদ্বন্দ্বী। 'মজঝিমনিকায়' থেকে জানা যায় অজাতশত্রু অবন্তীর আক্রমণের আশঙ্কায় তার রাজধানীকে সুরক্ষিত করেছিলেন। তবে অবন্তী-মগধ সংঘাত অজাতশত্রু ও প্রদ্যোত এর আমলে শেষ পর্যন্ত ঘটেনি।

অজাতশত্রুর উত্তরসূরিদের আমলেও মগধের আগ্রাসী নীতি অব্যাহত ছিল। তবে অজাতশত্রুর পুত্র 'উদায়িন' এর প্রধান কৃতিত্ব ছিল মগধের রাজধানীকে রাজগৃহ থেকে পাটলিপুত্রে স্থানান্তরিত করা। পরবর্তীকালে যার রাজনৈতিক গুরুত্ব সংশয়াতীত বলেই মনে হয়েছিল।

হর্যঙ্ক বংশীয় শাসকদের পর মগদের ক্ষমতা দখল করেন শিশুনাগ ও তাঁর শৈশুনাগ বংশ। শিশুনাগের রাজত্বকালেই শেষ পর্যন্ত মগদের হাতে অবন্তীর পরাজয় ঘটে। মগধের ক্ষমতা সম্প্রসারণের ইতিহাসে যা ছিল এক গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। এর ফলেই ২৬ টি মহাজনপদের মধ্যে মগধই প্রধান শক্তি হিসেবে দেখা দেয়। শিশুনাগ বংশীয় অন্যান্য শাসকদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কালাশোক, কাকবর্ণ, নন্দী বর্ধন প্রমুখ। ডঃ হেমচন্দ্র রায়চৌধুরীর মতে আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব ৪১৩ অব্দে শিশুনাগ বংশ প্রতিষ্ঠিত হয় এবং খ্রিষ্টপূর্বাব্দ ৩৪৫ অব্দে তাঁদের শাসনের অবসান ঘটে।

শৈশুনাগ বংশকে ক্ষমতাচ্যুত করে মগধ তথা উত্তর ভারতে প্রবল শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করে নন্দ রাজবংশ। এই রাজবংশের প্রতিষ্ঠাতা মহাপদ্ম নন্দের কৃতিত্বে গৌরব আরও বৃদ্ধি পায়। পুরাণে তিনি একরাট বলে প্রসিদ্ধ এবং তার হাতে পরাজয় ঘটে পাঞ্চাল, ইক্ষবাকু, কাশী, কলিঙ্গ, অশ্মক, কুরু, মোথিল, সূরসেন, প্রভৃতি শক্তির। এই তালিকাটির সত্যাসত্য যাচাই করা অসম্ভব হলেও নন্দ বংশের শাসন যে কলিঙ্গ পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল খারবেলের হাতিগুম্ফা প্রশস্তি থেকে জানা যায়। আলেকজান্ডারের ভারত অভিযানের বিবরণেও নন্দ রাজাদের বিরাট সৈন্য ও প্রভাবের ব্যাখ্যার উল্লেখ আছে। সামগ্রিক বিচারে তাই বলা যায় উত্তর ভারতের বৃহৎ অংশে ও উড়িষ্যার একাংশে মগধের ক্ষমতা বিস্তারের কৃতিত্ব নন্দ রাজাদের প্রাপ্য। পরবর্তীকালে এই নন্দ বংশের শেষ শাসক ধননন্দকে পরাস্ত করে চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য, মৌর্য সাম্রাজ্যের প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে মগধে সাম্রাজ্যবাদী আকাঙ্ক্ষা ও কৃতিত্বকে আরও বিস্তৃত রূপ দেন।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে মগধ মহজনপদ হিসেবে ছিল কার্যত নগণ্য এক শক্তি। কিন্তু মগধ রাজাদের আগ্রাসী নীতির সামনে প্রয়োগ ও ভূখণ্ড বিস্তার উত্তর ভারতে মগধের নেতৃত্বে রাজনৈতিক একীকরণের পথ প্রশস্ত করেছিল এবং খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকের শেষ দিকে মগধ উত্তর ভারতের সবথেকে পরাক্রান্ত শক্তি রূপে আত্মপ্রকাশ করেছিল।

১৮.৩.৩ আর্থ-সামাজিক পরিবর্তন—দ্বিতীয় নগরায়ণ

আলোচ্যপর্বে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশে মহাজনপদগুলির আবির্ভাব ও ক্ষমতাবৃদ্ধি শুধুমাত্র রাজনৈতিক ইতিহাসের চিত্তাকর্ষক বিষয় নয়, অর্থনৈতিক ইতিহাসেও তার এক বিশেষ মাত্রা রয়েছে। জনপদগুলি পারিভাষিক অর্থে কৃষিসমৃদ্ধ গ্রামীণ অঞ্চলকেও বোঝায়। সুতরাং কৃষি অর্থনীতির গুরুত্ব আলোচ্যপর্বে নিশ্চিতরূপেই বৃদ্ধি পেয়েছিল। একইসাথে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠেছিল বিভিন্ন কারিগরি শিল্প। যার মধ্যে অন্যতম ছিল মৃৎপাত্র বা

কৌলাল। আবার লৌহ উপকরণ নির্মাণ ও ব্যবহারের ক্ষেত্রেও আলোচ্যপর্বে চমকপ্রদ বিকাশ পরিলক্ষিত হয়। শ্রেষ্ঠীর মত ধনী বণিকের উদ্ভব বাণিজ্যিক অগ্রগতিরও সাক্ষ্য তুলে ধরে। বিনিময়ের মাধ্যম রূপে ধাতব মুদ্রার উপস্থিতিও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তবে নিঃসন্দেহে আর্থ-রাজনৈতিক এই পরিবর্তনের অন্যতম অভিঘাত রূপে দেখা দিল উত্তর ভারতে নগরায়ণ। প্রাচীন ভারতে নগরায়ণের প্রথম পর্ব দেখা দিয়েছিল হরপ্পা সভ্যতায় (খ্রীঃ পূঃ২৩০০-১৭৫০)। হরপ্পা সভ্যতার শহরগুলি অবলুপ্ত হওয়ার পর ভারত উপমহাদেশে এই প্রথম আবার নগরজীবনের পূর্ণ আবির্ভাব ঘটে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের এই নগরায়ণ ভারতের ইতিহাসে 'দ্বিতীয় নগরায়ণ' (Second urbanization) নামে পরিচিত।

মানব সমাজে স্থায়ী বসতির দুটি মূল প্রকারভেদ হল গ্রাম ও নগর। গ্রাম ও নগরের সংজ্ঞা নিয়ে ঐতিহাসিক, সমাজতাত্ত্বিক ও ভৌগোলিকদের মধ্যে মতবিরোধ থাকলেও অর্থনৈতিক প্রেক্ষিতে গ্রাম ও নগরের স্বতন্ত্রতা সংশয়াতীত। গ্রামগুলি কৃষি অর্থনীতির ওপর নির্ভরশীল এবং গ্রামের অধিকাংশ মানুষ সরাসরি খাদ্যোৎপাদক। অন্যদিকে শহরে চাষ-আবাদ হয় না এবং শহরের বাসিন্দারা সাধারণত বিভিন্ন কারিগরি শিল্প, পেশাদারী বৃত্তি, ব্যবসা-বাণিজ্য ও প্রশাসনিক কাজে যুক্ত থেকে জীবন চালায়। তাই নগর জীবনের সঙ্গে চাষ-আবাদের সরাসরি সম্পর্ক না থাকলেও খাদ্য ও শস্যের সরবরাহ নিশ্চিত ও নিয়মিত না হলে শিল্প ও বাণিজ্য এর কেন্দ্র হিসেবে শহরের পক্ষে টিকে থাকা মুশকিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় কৃষির ব্যাপক বিকাশ ও শিল্প এবং ব্যবসায় যুগপৎ অগ্রগতি নগরায়ণের পক্ষে এক অনুকূল পটভূমির জন্ম দেয়। যার ফলশ্রুতিতেই দ্বিতীয় নগরায়ণের সূচনা হয়।

ডঃ রামশরণ শর্মা তার 'Perspectives in the Social and Economic History of Early India' গ্রন্থে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের দ্বিতীয় নগরায়ণের সাথে হরপ্পা সভ্যতার নগরায়ণ-এর তুলনামূলক আলোচনার ভিত্তিতে মধ্য গাঙ্গেয় উপত্যকার নগরায়ণের কিছু স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্য তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে, দ্বিতীয় পর্বে গাঙ্গেয় উপত্যকার এই নগরায়ণের একটি মুখ্য বৈশিষ্ট্য ছিল তাঁর ভৌগোলিক স্বতন্ত্রতা। সিন্ধু উপত্যকা-সহ হরপ্পা অঞ্চল ছিল ভৌগোলিক দিক থেকে শুষ্ক মরুভূমি জাতীয় অঞ্চল। যেখানে বর্ষণ কম হওয়ায় ঘন অরণ্য বিশেষ ছিল না। কিন্তু মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকা ছিল প্রচুর বর্ষণ সিক্ত, পলিমাটি সিক্ত এবং ঘন অরণ্য অঞ্চল। এই ভৌগোলিক পরিবেশগত পার্থক্যর জন্যই মধ্যগাঙ্গেয় সমভূমিতে লৌহনির্মিত হাতিয়ার ছাড়া বসতিস্থাপন ছিল ডঃ শর্মার মতে এক প্রকার অসম্ভব। তাই মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় লৌহ যুগের সূচনার পরেই নগরায়ণের আবির্ভাব ঘটে।

ডঃ শর্মার মতে, ধাতব মুদ্রার ব্যবহার ও মুদ্রা অর্থনীতির প্রসারও দ্বিতীয় নগরায়ণের আরেকটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য। মুদ্রা অর্থনীতির প্রসার ঘটার ফলে খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতক থেকেই বাণিজ্য, কৃষি ও শিল্প জাত পণ্যে উৎপাদন ও ব্যবসার ব্যাপক অগ্রগতি ঘটে। মুদ্রা অর্থনীতির এই প্রচলন হরপ্পা সভ্যতায় ছিল অনুপস্থিত।

হরপ্পীয় ও গাঙ্গেয় নগর এর মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ পার্থক্য হলো এই যে- গাঙ্গেয় উপত্যকার নগরায়ণের স্থায়িত্বের মেয়াদ ছিল হরপ্পীয় নগরের থেকে অনেক বেশি। হরপ্পীয় নগরায়ণের স্থায়িত্ব ছিল মাত্র ৬০০ বছর। কিন্তু মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে যে নগরায়ণের সূচনা হয়, তা পরবর্তীতে সম্পূর্ণ বিনষ্ট হয়ে যায় নি। ডঃ শর্মার মতে, উদ্ভব থেকে শুরু করে ৩০০ খ্রীঃ পূঃ পর্যন্ত এর প্রগতি ছিল অবাধ। পরবর্তীকালে অধিকাংশ নগরের পতন হলেও আকারে বা পুনরুজ্জীবিত ভাবেও এই নগরায়ণের ধারা অব্যাহত ছিল।

ডঃ শর্মা আরও দেখিয়েছেন যে, গাঙ্গেয় উপত্যকায় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে আর একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য ছিল যে প্রথম প্রথম এই নগরায়ণের বস্তুগত জীবনের মান উন্নত ছিল না। মধ্যগাঙ্গার তীরে কৌশাম্বী বা বারানসী, বৈশালী, রাজগৃহ, চম্পার মতো নগরের উদ্ভব হলেও সেখানে খড়ের ছাউনি দেওয়া মাটির বাড়ি প্রথম প্রথম তৈরি হত। কাঠের বাড়িও নির্মিত হত। যদিও পরবর্তীকালে খ্রীষ্টপূর্ব ২০০ অব্দের পর থেকে এই নগরগুলি বস্তুগত মান ক্রমশ বাড়তে থাকে। উত্তরের উজ্জ্বল কৃষ্ণবর্ণ মৃৎমাত্র (NBPW) ও ছাপযুক্ত রৌপ্যমুদ্রার আবিষ্কার থেকে বোঝা যায়, ধীরে ধীরে এই নগরগুলির বস্তুগত মান বাড়তে থাকে।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে যে নগরগুলি গড়ে উঠেছিল, বৌদ্ধ সাহিত্যে তাদের বিশেষ বর্ণনা আছে। অঙ্গুত্তরনিকায় নগর, নিগম প্রভৃতি শব্দের উল্লেখ পাওয়া যায়। আবার 'দীর্ঘনিকায়' আছে নগরক, মহানগর ও রাজধানী। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে পাণিনি গ্রাম ও নগরের পার্থক্য বিষয়ে সচেতন ছিলেন। তিনি বলেছিলেন যে, নগরগুলি প্রাচ্য (পূর্ব) দিকেই বেশি। পাঞ্জাবের বাসিন্দা পাণিনি পূর্বদিকের নগর বলতে সম্ভবত মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকার নগর গুলোকে বোঝাতে চেয়েছেন। 'পালি সাহিত্যে' ও 'মহাপরিনির্বাণ সূত্রে' বলা হয়েছে, বুদ্ধের সময় উত্তর ভারতে ৬০ টির মত নগর ছিল। এদের মধ্যে চম্পা, রাজগৃহ, শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, বারানসী ও কুশী নগর এই ৬টি খুবি গুরুত্বপূর্ণ। এর মধ্যে কুশী নগর বাদে বাকি নগরগুলির প্রত্যেকটি মহাজনপদের রাজধানী হিসেবে যথেষ্ট খ্যাতির অধিকারী ছিল। বুদ্ধের সময় পাটলিপুত্র পুরোপুরি নগর হয়ে ওঠেনি, কিন্তু কিছুদিনের মধ্যেই বুদ্ধের ভবিষ্যদ্বাণীকে সত্যি করে পাটলিপুত্র ভারতের প্রধানতম নগররূপে আত্মপ্রকাশ করে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে নগরের আকৃতি ও প্রকৃতির কথা বৌদ্ধ সাহিত্য ও প্রত্নতাত্ত্বিক নিদর্শন থেকেও জানা যায়, যার ভিত্তিতে বোঝা যায় যে, কৌশাম্বী, রাজঘাট, রাজগৃহ, এরান, উজ্জয়িনী প্রভৃতি স্থানে কাদা মাটি, কাদা মাটির ইট বা পাথর দিয়ে নগর প্রকার তৈরি হয়েছিল। সম্ভবত প্রতিরক্ষার জন্যই এই ধরনের প্রকার তৈরি হয়েছিল। শহরের কর্মমুখর রাস্তাঘাট দিয়ে বণিক, কারিগর ও পথচারীদের অবিরাম আনাগোনা করত।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় দ্বিতীয় নগরায়ণের যে চিত্র আমরা পেলাম, তা মূলত উত্তর ভারতেই সীমাবদ্ধ ছিল। বিন্ধ্য পর্বতের দক্ষিণে বিস্তীর্ণ অঞ্চলে লোহার ব্যবহার জানা থাকলেও সেখানে নগরায়ণ ছিল অনুপস্থিত। উত্তর ও দক্ষিণ ভারতের বস্তুগত সংস্কৃতির তুলনামূলক আলোচনা থেকেই এই পার্থক্য বোঝা যায় যে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে উত্তর ভারতের অর্থনৈতিক ও সামাজিক জীবন অনেক অগ্রসর ও জটিলতর রূপ নিয়েছিল। বিশেষত্ব কৃষি অর্থনীতির ব্যাপকতা ও নগরায়ণের যে বিস্তার উত্তর ভারতে তথা মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় পরিলক্ষিত হয়, দক্ষিণ ভারতে তা ছিল অনুপস্থিত। দক্ষিণ ভারতের তুলনায় মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় নগরায়ণের এই প্রাণকেন্দ্র রূপে আত্মপ্রকাশ এর মূল কারণ নিয়ে ঐতিহাসিক মহলে মতবিরোধ বিদ্যমান। আর বলাই বাহুল্য, এই প্রশ্নের সন্তোষজনক সমাধানের মধ্যেই নিহিত রয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় দ্বিতীয় নগরায়ণের মূল স্বরূপ।

নগর গড়ে ওঠার জন্য গ্রামাঞ্চলের প্রয়োজন মিটিয়ে শহরাঞ্চলের খাদ্য সরবরাহ করার জন্য উদ্বৃত্ত উৎপাদন করা অপরিহার্য। গর্ডন চাইল্ড এর মতে, উদ্বৃত্ত উৎপাদন তখনই সম্ভব হয়, যখন কৃষির প্রয়োজনীয় উপকরণের উন্নতি ঘটিয়ে কৃষিতে কলাকৌশল ও প্রযুক্তিগত অগ্রগতি ঘটে। উন্নত তর উপকরণের সাহায্যে উদ্বৃত্ত শস্য উৎপাদন করে শহরের বাসিন্দাদের প্রয়োজন মেটানো সম্ভব হয়। এই উদ্বৃত্ত সংগ্রহের ও নগরবাসীর মধ্যে বণ্টনের জন্য আবার প্রয়োজন হয় একটি শক্তিশালী ও সক্রিয় প্রশাসন যন্ত্রের। যে প্রশাসন যন্ত্রের রাজনৈতিক কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করা দুরুহ। গর্ডন চাইল্ড কে অনুসরণ করেই ডি ডি কোশাম্বী ও রামশরণ শর্মা মনে

করেন, মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় লোহার ক্রমবর্ধমান ব্যবহার, বিশেষত্ব লাঙলের ফলায় লোহার ব্যবহার কৃষি উদ্বৃত্ত উৎপাদনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয়। তাঁরা মনে করেন, বিহারের আকরিক খনির ওপর নিয়ন্ত্রণ আসায় খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় ধাতুর ব্যাপক ব্যবহার বৃদ্ধি পায়। প্রযুক্তিগত এই উন্নতি ও কলাকৌশল কৃষি উদবৃত্ত উৎপাদনকে সুনিশ্চিত করে। ড. কোশাম্বী ও ড. শর্মা নগরের উদ্ভবের পেছনে ব্যবসা-বাণিজ্য, কারিগরি শিল্পের বিকাশ ও রাজতন্ত্রের ক্ষমতা বৃদ্ধির ভূমিকাকে অগ্রাহ্য করেননি, কিন্তু তাঁরা মনে করেন, দ্বিতীয় নগরায়ণের ক্ষেত্রে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল- 'লৌহ উপকরণ'। বিশেষত, লোহার ফলা ও লাঙ্গল-এর ব্যাপক ব্যবহার দ্বারা যথেষ্ট উদ্বৃত্ত উৎপাদন করার ক্ষমতা।

পক্ষান্তরে, পুরাতাত্ত্বিক অমলানন্দ ঘোষ মনে করেন যে, খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ ও পঞ্চম শতকে কৃষিকাজের লোহার ফলা ওয়ালা লাঙলের ব্যাপক ব্যবহারের প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য-প্রমাণ নেই। তাই তাঁর ধারণায়, মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকার ঘন অরণ্য ধ্বংস করতে তামার কুড়াল, কুঠার ইত্যাদি হাতিয়ার এবং বন পুড়িয়ে সাফ করার সাবেক পদ্ধতি যথেষ্ট ছিল। তাই তাঁর বিশ্বাস, তাম্র হাতিয়ার দিয়েই মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় উদ্বৃত্ত ফসল ফলানো সম্ভব ছিল। অমলানন্দ ঘোষ উদ্বৃত্ত উৎপাদনের ক্ষেত্রে প্রযুক্তিগত উন্নতি থেকে অনেক বেশি গুরুত্ব দিয়েছেন রাষ্ট্র সংগঠন ও কেন্দ্রীভূত রাজনৈতিক কর্তৃত্বের বিষয়টিকে।

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকেই মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকায় রাজনৈতিক পালাবদল ঘটতে থাকে। যার অন্যতম প্রমাণ হল মহাজনপদগুলির উদ্ভব এবং কৌম গোষ্ঠী শাসিত রাজনৈতিক সংগঠন গুলির গুরুত্ব ও ক্ষমতা হ্রাস। রাজনীতিক ব্যবস্থার এই অপ্রতিহত গতি স্থায়ী সামরিক বাহিনী সজ্জিত মগধ মহাজনপদের উত্থানের মধ্যে দিয়ে স্পষ্ট হয়ে ওঠে। রাজনৈতিক ক্ষমতার এই ক্রমিক বৃদ্ধি ও স্থায়ী সৈন্যবাহিনীর ভরণপোষণের জন্য উদবৃত্ত শস্য উৎপাদন এবং উদবৃত্ত রাজস্ব শাসকগোষ্ঠী কর্তৃক আহরণের তাগিদ দেখা দেয়। এই পটভূমিতে নগরায়ণের ভিত্তি ও উদ্ভব সহজতর হয়ে ওঠে।

পরিশেষে, ডঃ রণবীর চক্রবর্তীর সাথে একমত হয়ে বলতে পারি যে, রাজক্ষমতা বৃদ্ধি ও রাজস্ব আদায়ের মাধ্যমে উদ্বৃত্ত সম্পদ আহরনের ক্ষমতা— এই দুইয়ের মধ্যে নিশ্চিত যোগসূত্র বিরাজ করে। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে কেবলমাত্র মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকাতেই উদ্বৃত্ত আহরণ করার মত প্রয়োজনীয় রাজনৈতিক কাঠামো ও প্রশাসনিক ব্যবস্থার অস্তিত্ব ছিল। তাই এই অঞ্চলেই দ্বিতীয় পর্যায়ের নগরায়ণ ঘটে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতের লোহার ব্যবহার ও প্রযুক্তিগত দক্ষতা সত্ত্বেও সেখানে উদবৃত্ত কৃষি উৎপাদন ঘটেনি, তাই নগরায়ণও হয়নি। আবার একই সাথে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে চতুর্থ শতক অবধি দক্ষিণ ভারতে সংগঠিত রাষ্ট্রশক্তির পরিবর্তে কৌমগোষ্ঠী শাসিত শাসনব্যবস্থা প্রচলিত ছিল। ফলে উদ্বৃত্ত আহরণের তাগিদের পরিবর্তে সেখানে সমানাধিকারের ধারণাই প্রতিষ্ঠিত ছিল। ফলে, নগরায়ণের মতো জটিলতর এক আর্থ-সামাজিক অবস্থার উদ্ভব হওয়ার পক্ষে অনুকূল পরিবেশ ও ক্ষেত্র বিন্ধ্যপর্বতমালার দক্ষিণে ছিল না, এর বিপরীত অবস্থার জন্য মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকাই ছিল দ্বিতীয় নগরায়ণের প্রাণকেন্দ্র।

১৮.৩.৪ সামাজিক অভিঘাত

নগরায়ণ শুধুমাত্র কয়েকটি বা অনেকগুলি নগরের নামের আলোচনা মাত্র নয়, যে জটিল আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক উপাদানের সমাহারে নগরের মত বৃহদায়তন মানববসতি গড়ে ওঠে তার গুরুত্বও অপরিসীম।

নগরায়ণের উদ্ভব ও বিকাশ ঘটলে সমাজ অপেক্ষাকৃত সরলতর অবস্থা থেকে জটিল রূপ ধারণ করে। খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০-৩০০ অব্দের উত্তর ভারতের সামাজিক পরিস্থিতির আলোচনায় তা স্পষ্টরূপে ফুটে ওঠে।

বস্তুত পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকেই বর্ণব্যবস্থার কঠোরতা বৃদ্ধির মাধ্যমে সনাতন সমাজব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার যে প্রয়াস শুরু হয়েছিল আলোচ্যপর্বে তাকে দৃঢ়ভিত্তি দিতেই রচিত হল সূত্র সাহিত্য। শ্রৌতসূত্র, গৃহ্যসূত্র ও ধর্মসূত্র— তিন প্রকার সূত্র সাহিত্যের মাধ্যমেই ধর্মীয়, গার্হস্থ্য ও রাজনৈতিক জীবন আরো জটিল রূপ নিল। পাশাপাশি বর্ণব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার হাতিয়ার রূপে বিবাহ সংক্রান্ত বিধিনিষেধও কঠোরতা আরোপিত হল। রণবীর চক্রবর্তী যথার্থই লিখেছেন, বর্ণসংকর তত্ত্ব ও জাতি বা মিশ্র জাতির উদ্ভবের তত্ত্ব সূত্র সাহিত্যেই প্রথম দেখা যায়। নিঃসন্দেহে এটি ক্রমবর্ধমান সামাজিক জটিলতা ও কঠোরতার সাক্ষ্যই তুলে ধরে।

আলোচ্যপর্বের পালি সাহিত্য কিছুটা ভিন্ন সামাজিক পরিস্থিতির নজির তুলে ধরে। পালি সাহিত্যের বিবরণ থেকে জানা যায়, বুদ্ধ চতুর্বর্ণ ব্যবস্থার প্রতি আস্থাশীল ছিলেন না। বৌদ্ধ সংঘে তাই বর্ণের তারতম্য থাকতো না। যার ফলে সনাতন ভারতীয় সমাজব্যবস্থার দুই প্রধান স্তম্ভ— বর্ণ ও আশ্রম ব্যবস্থা আলোচ্য সময়কালে ক্রমশ তার গুরুত্ব হারাতে থাকে। তবে সংঘের অভ্যন্তরে পালি সাহিত্যে সামাজিক তারতম্য স্বীকৃত না হলেও, সংঘের বাইরে বৃহত্তর সমাজ যে ভেদাভেদ শূন্য নয়, সেই বাস্তববোধ অবশ্যই তুলে ধরেছিল। তবে এই তারতম্যের মূল বর্ণ-জাতি ব্যবস্থা দ্বারা চিহ্নিত হয় নি, হয়েছে পারিবারিক মর্যাদা, পেশা ও বৃত্তির নিরিখে। এই ভিন্ন সামাজিক-সাংস্কৃতিক প্রেক্ষিতেই পালি সাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ স্থান অধিকার করে নেয় গহপতি' নামক নতুন একটি গোষ্ঠী। যা নিঃসন্দেহে পরিবর্তিত সামাজিক পরিস্থিতিরই দৃষ্টান্ত তুলে ধরে।

১৮.৩.৫ সাংস্কৃতিক জীবন

পরবর্তী বৈদিক আমল থেকে উত্তর ভারতের সাংস্কৃতিক জীবনে বিশেষ স্থান নিয়েছিল বহুবিধ যাগযজ্ঞ, আচার-অনুষ্ঠান। দৈনন্দিন ও সামাজিক জীবনের প্রায় এমন কোনও দিক ছিল না যা জটিল যাগযজ্ঞ ও অনুষ্ঠানের আওতায় আসে নি। কিন্তু খ্রীষ্টপূর্ব ৬০০-৩০০ অব্দে সাংস্কৃতিক জীবনে বৈদিক যাগযজ্ঞকেন্দ্রিক ধর্মানুষ্ঠানের যৌক্তিকতা নিয়ে নানা প্রশ্ন উঠতে শুরু করেছিল। এক্ষেত্রে বৌদ্ধ ও জৈন ধর্মের খ্যাতি সুবিদিত। কিন্তু শুধু এই দুই ধর্মই নয়, চার্বাক, লোকায়ত, আজীবিক গোষ্ঠীর চিন্তাধারাতেও উঠে এসেছিল প্রতিবাদী কণ্ঠস্বর। আলোচ্য পর্বের সাংস্কৃতিক জীবনের মুখ্য উপজীব্যই তাই প্রতিবাদী ধর্মান্দোলনের উদ্ভব।

১৮.৩.৫.১ প্রতিবাদী ধর্ম আন্দোলনের প্রেক্ষাপট

খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক ভারত তথা পৃথিবীর ইতিহাসে ধর্মীয় এবং সংস্কারধর্মী আন্দোলনের এক অবিস্মরণীয় অধ্যায়। এই সময় চিনে কনফুলিয়াস, পারস্যে জরাথুস্ট, গ্রিসে পারমেনিডেস ও এমপোডোকিলস, ব্যাবিলনে হেরাক্লিটাস, ভারতে মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের মতো চিন্তাবিদ ও সংস্কারকদের আবির্ভাব ঘটে যাঁরা পৃথিবীর জটিল জীবনধারা থেকে আত্মার মুক্তির বিষয়ে উদ্যোগী হয়েছিলেন এবং সঠিক পথের দিশা দেখিয়েছিলেন। উপরোক্ত ধর্মপ্রবর্তক বা সংস্কারকদের মধ্যে গৌতম বুদ্ধ ছিলেন অদ্বিতীয়। বহির্বিশ্বে তাঁর ধর্ম যে ব্যাপক ও গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল, কনফুসিয়াস অথবা জরাথুস্টের ধর্মও তা করেনি। ঐতিহাসিক ব্যাশাম তাই বুদ্ধকে ভারতের শ্রেষ্ঠ সন্তান আখ্যা দিয়েছেন। আর দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী বুদ্ধকে বিদেশিদের কাছে

ভারতের শ্রেষ্ঠ দান বলে উল্লেখ করেছেন। বৌদ্ধধর্ম ভারতে স্তিমিত হয়ে এলেও শ্রীলঙ্কা, থাইলান্ড, জাপান, মোঙ্গোলিয়া, কোরিয়া, ইন্দোচিন প্রভৃতি দেশে বিপুল জনপ্রিয়তার সাথে আজও বিদ্যমান।

খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম ও ষষ্ঠ শতাব্দীতে অর্থাৎ বৈদিকোত্তর যুগে ভারতে ধর্মীয় চিন্তার জগতে যে প্রবল আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছিল তাঁর আগে থেকেই এর পটভূমি রচিত হয়েছিল। এই সময় ভারত পশুচারণভিত্তিক জীবন অতিক্রম করে কৃষিভিত্তিক সমাজজীবনে পদার্পণ করেছিল। কৃষি উৎপাদন বৃদ্ধির সাথে সাথে শুরু হয় বাণিজ্যের বিকাশ, শুরু হয় দ্বিতীয় নগরায়ণ। আর বৈদিক সংস্কৃতি গাঙ্গেয় দোয়াব অঞ্চল থেকে সম্প্রসারিত হয় পূর্ব ভারতে। কিন্তু এখানে বৈদিক সভ্যতা আগের তেজ হারিয়ে অনার্য সংস্কৃতির সঙ্গে মিশে জন্ম দেয় মিশ্র সংস্কৃতির। এখানেই ক্ষত্রিয়দের নেতৃত্বে বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল।

আরণ্যক, উপনিষদের সময়কাল থেকেই আচার-সর্বস্ব বৈদিক যাগ-যজ্ঞের উপযোগিতা সম্পর্কে মানুষের মনে প্রশ্ন ওঠে। এই সময় বৈদিক যাগ-যজ্ঞ সম্পর্কে দুই ধরণের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়। নতুন চিন্তার অগ্রদূত অরণ্যচারী সন্ন্যাসীদের একদল মনে করেন যাগ-যজ্ঞের বিশেষ উপযোগিতা নেই, ভক্তি সাধনায় ঈশরলাভ সম্ভব। তাঁরা বৈদিক ও অবৈদিক দেবদেবীর অস্তিত্ব স্বীকার করলেও যাগযজ্ঞের উপর গুরুত্ব আরোপ করেননি। এই সংস্কারপন্থীরা তাঁদের উপাস্য দেবতা অনুযায়ী শৈব ও ভাগবত এই দুই ধর্মীয় সম্প্রদায়ে বিভক্ত ছিলেন। কিন্তু বৈদিক ধর্মের বিরুদ্ধে প্রকৃত প্রতিবাদ ধ্বনিত হয় পূর্ব ভারতের ক্ষত্রিয় সম্প্রদায়ের মধ্যে। এদের অনেকেই গণরাজ্যের শাসক বংশের সন্তান ছিলেন। প্রতিবাদী এই ধর্মগুলির মধ্যে জৈনধর্ম, আজীবিক ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মই ছিল প্রধান। এই ধর্মগুলি বেদের প্রামাণ্যতাকে অস্বীকার করেছিল। তবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ শুধুমাত্র জৈন ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যেই শোনা যায়নি, ধর্মীয় ক্ষেত্রে নতুন চিন্তার সাক্ষ্য রেখেছিল চার্বাক, লোকায়ত এবং আজীবিক গোষ্ঠীর মতো বেশ কিছু গোষ্ঠী। জৈন গ্রন্থমালা থেকে জানা যায় মহাবীরের সমসাময়িক প্রায় ৩৬৩টি দার্শনিক মতবাদের অস্তিত্ব ছিল। এর থেকে বোঝা যায় ধর্মীয় তথা দার্শনিক চিন্তার ক্ষেত্রে ভারত ছিল এক বৈচিত্রময় দেশ। ঐতিহাসিক ওল্ডেনবার্গ যথার্থই বলেছেন যে, বুদ্ধের আবির্ভাবের কয়েকশো বছর আগেই ভারতীয় চিন্তাজগতে এমন অগ্রগতি সাধিত হয়েছিল যা বৌদ্ধধর্মের ক্ষেত্র প্রস্তুত করেছিল। তবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের নানাবিধ ত্রুটি ও সীমাবদ্ধতাও প্রতিবাদী আন্দোলনের পটভূমি রচনা করেছিল।

বৈদিক ধর্মের ব্যয়বহুল যাগযজ্ঞ, আচারসর্বস্বতা এবং বর্ণভিত্তিক বিভাজন মানুষের মধ্যে শুধু অসাম্য সৃষ্টি করেনি ক্ষোভও সৃষ্টি করেছিল। পরিব্রাজক শ্রমণ, অরণ্যচারী ঋষি-সন্ন্যাসীরা জটিল যাগযজ্ঞের উপযোগিতা নিয়ে আগেই প্রশ্ন তুলেছিলেন। গাঙ্গেয় উপত্যকায় সর্বত্র অতীন্দ্রিয়বাদী ঋষি ও সন্ন্যাসীরা প্রচার করেন যে যজ্ঞ নয়, শুদ্ধ জীবন, সংযম, মানসিক শৃঙ্খলা ও তপশ্চার্যার মাধ্যমেই আত্মার মুক্তিলাভ সম্ভব। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্যধর্মের বর্ণ-কঠোরতা, আচারসর্বস্বতা ও সামাজিক বৈষম্যের বিরুদ্ধে অস্ফুট প্রতিবাদ ধ্বনিত হতে থাকে। পরবর্তী বৈদিক যুগে আর্য সমাজ ব্রহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য এবং শূদ্র এই চারটি বর্ণে বিভাজিত ছিল। আর্যদের এই বর্ণভিত্তিক সামাজিক বিভাজন ছিল জন্মগত, কর্মভিত্তিক নয়। প্রতিটি বর্ণের জন্য কর্মও নির্দিষ্ট ছিল। চার বর্ণে বিভাজিত সমাজে সবার উপরে ছিল ব্রাহ্মণের স্থান যাদের পেশা ছিল যজমানি ও অধ্যাপনা। যেহেতু ব্রাহ্মণের পুত্রই ব্রাহ্মণ হতেন তাই বংশপরম্পরায় তাঁরা এই সুবিধা ভোগ করতেন। সর্বোচ্চ সামাজিক মর্যাদা ছাড়াও তাঁরা বেশ কিছু বিশেষ সুবিধা আদায় করেছিল যেমন - দান গ্রহণ করা, কর প্রদান না করা এবং শাস্তি থেকে অব্যাহতি পাওয়া ইত্যাদি। পরবর্তী বৈদিক যুগের সাহিত্যে ব্রাহ্মণদের এই ধরণের বিশেষাধিকার ভোগের উল্লেখ আছে। সমাজের দ্বিতীয় স্থানে অবস্থিত ক্ষত্রিয়দের পেশা ছিল যুদ্ধ ও শাসন করা এবং কৃষকশ্রেণীর কাছ থেকে

সংগৃহিত করের উপর জীবন নির্বাহ করা। বৈশ্য শ্রেণি নিযুক্ত ছিল চাষবাস, পশুপালন এবং বাণিজ্যিক ক্রিয়াকলাপে। বৈশ্যরাই ছিল সমাজের প্রধান কর প্রদানকারী। সমাজের সবার নীচে অবস্থান যাদের সেই শূদ্রদের কাজ হল উপরোক্ত তিন শ্রেণীর সেবা করা। নারীদের সঙ্গে শূদ্ররাও বেদ-পাঠ থেকে বঞ্চিত ছিল। তারা দাস হিসেবে গৃহস্থের ঘরে, কৃষিক্ষেত্রে কাজ করত এবং কারিগরি হস্তশিল্পেও ভাড়াটে শ্রমিক হিসেবে কাজ করত। পরবর্তী বৈদিক যুগের সমাজে ছিল চূড়ান্ত বৈষম্য, কারণ এই সমাজে যত উঁচুতে যার অবস্থান, বিশেষাধিকার তার তত বেশি এবং যার অবস্থান যত নীচে দোষী হিসেবে তার তত বেশি শাস্তি প্রাপ্য। এর ফলে, বর্ণ-বিভাজিত সমাজে সামাজিক অস্থিরতা ও ক্ষোভের সূচনা হয়। রামশরণ শর্মা বলেছেন যে, বৈশ্য ও শূদ্ররা এই সামাজিক অসাম্যের বিরুদ্ধে কীভাবে প্রতিক্রিয়া ব্যক্ত করেছেন তা জানার উপায় নেই, কিন্তু শাসক শ্রেণি হিসেবে ক্ষত্রিয়রা ব্রাহ্মণ শ্রেণির আচার-ভিত্তিক আধিপত্যের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং জন্ম-ভিত্তিক বর্ণব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদী আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন। এইভাবে গোসাল, মহাবীর এবং গৌতম বুদ্ধ ব্রাহ্মণদের কর্তৃত্ব অগ্রাহ্য করে নতুন ধর্মের জন্ম দেন। তবে প্রতিবাদী ধর্মসমূহের উত্থানের আরও কারণ আছে।

রামশরণ শর্মার মতে এই নতুন ধর্মগুলির উত্থানের প্রকৃত কারণ নিহিত আছে উত্তর-পূর্ব ভারতে নতুন কৃষি অর্থনীতি বিকাশের মধ্যে। পূর্ব-উত্তর প্রদেশ এবং উত্তর ও দক্ষিণ বিহার সহ সমগ্র উত্তর-পূর্ব ভারত কৃষি বিকাশের এক আদর্শ ক্ষেত্র। এই অঞ্চলে ১০০ সেন্টিমিটার বৃষ্টিপাত, তার সঙ্গে আর্দ্র আবহাওয়া উন্নত কৃষির অনুকূল পরিবেমশ রচনা করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকের শেষে মধ্য গাঙ্গেয় সমভূমিতে দ্রুত বসতি গড়ে উঠেছিল। কারণ এই সময় লোহার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। ৬০০-৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে এখানে অনেক লোহার কুঠারের সন্ধান পাওয়া গেছে। লোহার কুঠার ও কৃষি সরঞ্জামের সাহায্যে বন-জঙ্গল সাফ করে বসতি গড়ে তোলা সম্ভব হয়েছিল। লাঙলের ফলা-ভিত্তিক কৃষি অর্থনীতির জন্য প্রয়োজন ছিল বলদ ব্যবহারের যা পশুপালন ছাড়া সম্ভবপর ছিল না। কিন্তু যজ্ঞভিত্তিক বৈদিক যজ্ঞে বিপুল সংখ্যক গবাদি পশু হত্যা করা হলে দ্রুত গো-সম্পদ কমে আসে। এ ছাড়া দক্ষিণ ও পূর্ব সীমান্তের অবৈদিক উপজাতি গোষ্ঠী খাদ্যের জন্য পশুহত্যা করলে গো-সম্পদ আরও কমে আসে। এই অবস্থায় নতুন কৃষি অর্থনীতিকে স্থিরতা দিতে পশু বলি বন্ধ করা অনিবার্য হয়ে পড়ে।

কৃষির বিকাশের সাথে সাথে গাঙ্গেয় সমভূমিতে ব্যবসাবাণিজ্যের প্রসার হয়। ৫০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ উত্তর-পূর্ব ভারতে রাজগৃহ, চম্পা, বারাণসী, বৈশালী ও শ্রাবস্তীর মতো বড়ো বড়ো শহরেরও উত্থান ঘটে। বর্ধমান মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধের স্মৃতি এই শহরগুলির সাথে ওতপ্রোতভাবে জড়িত। ব্যাপক কৃষি উৎপাদন ও বাণিজ্যের বিকাশের ফলেই খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের মধ্যভাগে গাঙ্গেয় সমভূমিতে নগরায়ণের সূচনা হয়। বৌদ্ধধর্মের উদ্ভবের অর্থনৈতিক পটভূমি আলোচনা প্রসঙ্গে কে টি সরাও বলেছেন যে, এই সময়ের এই নগরায়ণ লৌহ প্রযুক্তির বর্ধিত প্রয়োগের ফলেই সম্ভব হয়েছিল। তিনি বৌদ্ধ ধর্মের আবির্ভাবকে লৌহ সরঞ্জামের প্রভূত ব্যবহারের ফল হিসেবেই দেখেছেন। পণ্ডিত-গবেষকদের মধ্যে দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী-ই প্রথম বুদ্ধের সময়কালে লোহার ব্যবহারের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। গাঙ্গেয় উপত্যকায় আর্থ-সামাজিক জীবনে পরিবর্তন প্রসঙ্গে অধ্যাপিকা রোমিলা থাপার মন্তব্য করেন ঃ ''The changing features of social and economic life such as the growth of towns, expansion of artisan class and the rapid development of trade and commerce were closely linked with changes in another sphere that of religion and philosophical speculation.'' অর্থাৎ নগরের বিকাশ, কারিগর শ্রেণির প্রসার এবং

শিল্প-বাণিজ্যের দ্রুত প্রসারের মতো আর্থ-সামাজিক পরিবর্তনকারী শক্তিগুলি ধর্মীয় ও দার্শনিক চিন্তার জগতেও পরিবর্তনের সূচনা করেছিল। জৈমিনী উপনিষদ, ব্রাহ্মণ, পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী এবং খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতক থেকে তৃতীয় শতকের মধ্যবর্তী কালে রচিত ধর্মসূত্রগুলিতে এই রূপান্তরের সাক্ষ্য রয়েছে। গাঙ্গেয় উপত্যকায় নগরায়ণ ও ব্যবসা বাণিজ্যের বিকাশের বহুবিধ কারণ ছিল। মগধের রাজগৃহের মতো কিছু শহর রাজনৈতিক ও প্রশাসনিক কেন্দ্র হিসেবে গড়ে উঠেছিল। আবার কিছু শহর রাজধানী ও বাণিজ্যকেন্দ্র হিসেবেও বিকশিত হয়েছিল যেমন শ্রাবস্তী, কৌশাম্বী, বারাণসী, উজ্জয়িনী ইত্যাদি। আবার কপিলানস্তু, বৈশালী ও কুশীনগর গণরাজ্য কেন্দ্র হিসেবেও গড়ে উঠেছিল। কৃষি উৎপাদন, বাণীজ্যকেন্দ্র ও বাণিজ্যের বিকাশের সাথে ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন ধনী গহপতি ও শ্রেষ্ঠীরা যাদের অবদান অবিস্মরণীয়। এদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন মগধের অন্তর্গত ভদ্দিয় শহরের ধনী গহপতি মেন্ডক এবং শ্রাবস্তীর ব্যাংক-মালিক অনাথপিন্ডক। তাঁরা চেয়েছিলেন এমন এক ধর্ম যাতে ভেদাভেদ নেই এবং তাঁদের বাণিজ্য-কর্মের সহায়ক যা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে সম্ভব হবে না। তামা, রূপার মতো ধাতুর সহজ-প্রাপ্যতা বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে মুদ্রার ব্যবহারকে সম্ভব করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব পঞ্চম শতকে প্রথম অঙ্ক-চিহ্নিত মুদ্রা (Punch- marked coins) প্রথমেই উত্তর প্রদেশ ও বিহারে ছড়িয়ে পড়ে। এর ফলে ব্যবসায়িক আদান-প্রদান সহজ হয়। এ ছাড়া সুনির্দিষ্ট বাণিজ্য পথ অন্তর্বাণিজ্য ও বহির্বাণিজ্য বিকাশের পথ প্রশস্ত করেছিল। ব্যবসাবাণিজ্য এবং জৈন ধর্ম ও বৌদ্ধ কধর্ম ছিল একে অপরের পরিপূরক। নতুন এই ধর্মে সমুদ্র পারাপার সংক্রান্ত কোনো বিধিনিষেধ ছিল না এবং অর্থবিনিয়োগ করে সুদ নেওয়াতেও কোন বাধা ছিল না, যা ব্রাহ্মণ্য ধর্মে ছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মশাস্ত্রে সুদ নেওয়া কুসিদজীবীদের নিন্দা করা হয়।

জৈনধর্মে ও বৌদ্ধধর্মে অহিংসার কথা বলা হয়, ফলে পশুবলি নিষিদ্ধ হয় যা কৃষি, অর্থনীতি বিকাশে সহায়তা করে। দুই ধর্মই অহিংসা ও শান্তির কথা প্রচার করলে বিভিন্ন রাজ্যের মধ্যে যুদ্ধের উন্মাদনা কমে। এই শান্তি ও স্থিতাবস্থা বাণিজ্যিক বিকাশের পথকে প্রশস্ত করেছিল। এর ফলে বৈশ্য শ্রেণির হাতে প্রচুর ধনাগম হয়। কিন্তু ধন থাকলেও ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সামাজিক বিভাজনে তাঁদের মর্যাদা ছিল না। বৌদ্ধধর্মের মতো নতুন ধর্মে তারা সামাজিক সম্মান পায়। ধনপতি শ্রেষ্ঠীদের উদার দানে বৌদ্ধ মহাসংঘ সমৃদ্ধ হয়। বস্তুত বৌদ্ধধর্ম ও জৈনধর্মের বিপুল জনপ্রিয়তা ও প্রসারের একটি বড়ো কারণ হল গহপতি ও শ্রেষ্ঠীদের সক্রিয় সহযোগিতা ও উদার দান। তাছাড়া ক্ষত্রিয় রাজন্য শ্রেণী আচার-সর্বস্ব পুরোহিত প্রধান ব্যয়বহুল যজ্ঞের প্রতি তাঁদের বিরূপতা পোষণ করেন। তাঁরা সামাজিক সাম্যে বিশ্বাসী বৌদ্ধ ধর্মের মতো নতুন ধর্মমত সাদরে গ্রহণ করেন। গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্মমতে বেদের প্রামাণ্যতাকেই শুধু অস্বীকার করেননি, তিনি জাতিভেদ প্রথারও বিরোধী ছিলেন এবং নারী জাতি সম্পর্কে প্রগতিশীল দৃষ্টিভঙ্গী গ্রহণ করেছিলেন। ব্রাহ্মণ্যধর্মে জন্ম-ভিত্তিক বর্ণবিভাজন যে সামাজিক বৈষম্য ও অশান্তির জন্ম দিয়েছিল সে সম্পর্কেও তিনি অবহিত ছিলেন। এ ছাড়া ধন-বৈষম্যের প্রতিকারস্বরূপ তিনি সকলকে উৎপাদনে অনুপ্রাণিত করেছিলেন। দীঘ নিকায়তে বলা হয়েছে যে, যে ব্যক্তি সম্পদ সৃষ্টু করতে পারে না সে দরিদ্র হয়। তাই তিনি তাঁর ধর্মে কর্মকেই শ্রেষ্ঠত্ব দান করেন। ভেদাভেদ-হীন সমাজ গঠনের লক্ষ্যে তিনি কর্মের দ্বারাই আই আদর্শ প্রচার করেন যে, কর্মই হবে মানুষের আসল পরিচয়, জন্ম নয়। অধ্যাপক ব্রতীন্দ্রনাথ মুখার্জী দেখিয়েছেন কীভাবে গৌতম বুদ্ধ সমাজজীবনের সর্বস্তরে পরিব্যত হতাশা ও ব্যর্থতা থেকে সাধারন মানুষকে উদ্ধার করে তারদের সকলের কাছে গ্রহণযোগ্য একটি জীবন পদ্ধতির নির্দেশ দিয়েছিলেন। এ ছাড়া তিনি মানুষের মনের কথা বুঝতে পেরেছিলেন - - তিনি বুঝেছিলেন দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষায় রচিত জটিল ও যাগযজ্ঞের প্রধান ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সাধারন মানুষের কাছে দুজ্ঞেয় ও

রহস্যময়। তাই তিনি তাঁর ধর্ম প্রচার করেন পালি-প্রাকৃত ভাষায়। সহজ, সাবলীল এই ভাষা ছিল সকলের বোধগম্য, সাধারন মানুষের হৃদয়ের ভাষা। তাই তাঁর ধর্মমত আপামর জনগণের কাছে সাদরে গৃহীত হয়েছিল।

ব্রাহ্মণ্য ধর্ম-বিরোধী আন্দোলন দানা বাঁধে উত্তর-পূর্ব ভারতের গণরাজ্যগুলিতে। একথা অনস্বীকার্য যে রাজশক্তির প্রতিষ্ঠা, স্থায়িত্ব প্রদান ও বিস্তারের জন্য শাস্ত্রীয় বিধির প্রয়োজন হয়েছিল। তাই রাজ্যাভিষেক, অশ্বমেধ যজ্ঞ, রাজসূয় যজ্ঞ, বাজপেয় যজ্ঞ ইত্যাদি সম্পাদনের জন্য পুরোহিতের প্রয়োজন হয়। এইভাবে ক্রমে ক্রমে পুরোহিতের প্রাধান্য প্রতিষ্ঠিত হয়। অন্যদিকে প্রভাবশালী ক্ষত্রিয়রা বিশেষত রাজন্য শ্রেণি সমাজের উচ্চাসনে অধিষ্ঠিত হাতে আগ্রহী হয়ে উঠলে ব্রাহ্মণ শ্রেণীর সঙ্গে তাঁদের বিরোধ বাঁধে। বিপুল যজ্ঞ সম্পাদন করতে ক্ষত্রিয় রাজাদের প্রচুর ব্যয় করতে হত যা তাঁর এতদিন রাজা ও রাষ্ট্রের মঙ্গল কামনার কথা ভেবে করে এসেছিলেন। পাঞ্জাব ও মধ্য দেশে বা উত্তর প্রদেশে যেখানে আর্য সংস্কৃতির দাপট ছিল সেখানে এই শাস্ত্রীয় রীতি অটুট ছিল। রাজশক্তিও এর বিরুদ্ধাচারণ করেনি। কিন্তু পূর্ব ভারতের আর্য সভ্যতা হীনবল হয়ে পড়লে শক্তিশালী রাজারা ব্রাহ্মণদের এই একাধিপত্য নাশ করতে উদ্যত হয়। পরিবর্তে ধর্ম, দর্শন ও চিন্তার জগতে যে পরিবর্তন এসেছিল তাকে স্বাগত জানায়। রোমিলা থাপার মনে করেন খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে হিমালয়ের পাদদেশে ও পাঞ্জাবের উত্তর ও পশ্চিম অংশে গণরাজ্যগুলির উত্থান খুব সম্ভবত বৈদিক ধর্মের গোঁড়ামির প্রতিক্রিয়াস্বরূপ হয়েছিল। তাঁর মতে গণরাজ্যগুলি ব্যক্তিস্বাতন্ত্র্য ও স্বাধীন মত প্রকাশের ব্যাপারে বেশি উদার ছিল। এই প্রেক্ষাপটেই প্রতিবাদী ধর্মসমূহের আবির্ভাব ঘটেছিল।

১৮.৩.৫.২ আজীবিক ধর্মমত

ব্রাহ্মণ্য-বিরোধী প্রতিবাদী ধর্মসমূহের মধ্যে আজীবিক সম্প্রদায় অন্যতম। বৌদ্ধধর্ম ও জৈন ধর্মের পাশাপাশি এই ধর্মমত যথেষ্ঠ জনপ্রিয়তা লাভ করেছিল। বৌদ্ধ গ্রন্থ 'অঙ্গুত্তর নিকায়', 'মহানিদ্দেস' ও 'চুল্লনিদ্দেস' থেকে আমরা জানতে পারি যে খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বেশ কিছু ধর্মীয় সম্প্রদায় ও উপাসনা পদ্ধতি সক্রিয় ছিল। এগুলির মধ্যে আজীবিক, নির্গন্থ, জটিলক, পরিব্রাজক, অবিরুদ্ধক, মুন্ডশ্রাবক, মাগণ্ডিক ত্রৈদণ্ডিক, গৌত্মক, দেবধার্মিক অন্যতম। প্রাচীন ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে আজীবিকরা যে বেশ জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল তা অশোকের শিলালিপিতে ও মিলিন্দ পঞহো গ্রন্থে তাঁদের উল্লেখ থেকে বোঝা যায়। আজীবিক ধর্মীয় সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা কে তা নিয়েও পণ্ডিতিদের মধ্যে মতানৈক্য লক্ষ করা যায়। একদলের মতে মংখলিপুত্ত গোসাল আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রতিষ্ঠাতা। আবার অনেকের মতে নন্দবৎস এই সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেন। প্রতিষ্ঠাতা হোন বা না হোন গোসাল যে আজীবিক সম্প্রদায়ের প্রাণপুরুষ ছিলেন একথা অনস্বীকার্য।

প্রতিবাদী ধর্মীয় সম্প্রদায় হিসেবে আজীবিকদের নামে জৈন ও বৌদ্ধদের সঙ্গে একসাথে উচ্চারিত হয়। বস্তুত এই তিনটি ধর্মীয় মত পরবর্তী বৈদিক যুগের রাষ্ট্রীয় এবং আর্থ-সামাজিক জীবনে ঘটে যাওয়া ব্যাপক পরিবর্তনের সূত্র ধরেই আত্মপ্রকাশ করে। মহাবীর ও গৌতম বুদ্ধ কৌম সমাজের মানুষ হিসেবে লক্ষ করেন নগরায়ণ এবং সংগঠিত বণিক শ্রেণীর উদ্ভব জনজীবনকে কি গভীরভাবে প্রভাবিত করেছিল। প্রখর দূরদৃষ্টি দিয়ে রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক পরিবর্তনের কল্যাণকর দিকগুলি উপলব্ধি করেন এবং সেগুলিকে উপেক্ষা না করে তাদের ধর্মীয় মতাদর্শ স্থান দেন। কিন্তু আজীবিকরা এই বিপুল সামাজিক, অর্থনোইতিক ও রাজনৈতিক পরিবর্তনের তাৎপর্য উপলব্ধি করতে না পেরে পুরনো জীবন ধারা আকড়ে ধরে থাকেন। এর ফলে পরিবর্তনশীল সমাজের

সঙ্গে তাঁদের জীবনাদর্শের সংঘাত ক্রমশ বাড়তে থাকে; তাঁরা হতাশ হয়ে নিয়তিবাদকেই তাঁদের জীবনের আদর্শ করে নেন।

মংখলিপুত্ত গোশাল বর্ধমান মহাবীরের সমসাময়িক ছিলেন। তাঁর পিতা ছিলেন একজন মংখ অর্থাৎ চারণকবি ও চিত্রকর। গোশালও তাঁর পিতার বৃত্তি গ্রহণ করেছিলেন। প্রথম জীবনে গোশাল মহাবীরের শিষ্য ছিলেন। মতভেদের কারণে তিনি মহাবীরকে ছেড়ে আজীবিক সম্প্রদায় গঠন করেন। আজীবিকরা নাস্তিক্যবাদী ছিলেন। তাঁদের মতবাদকে এক কথায় নিয়তিবাদ বা অদৃষ্টবাদ আখ্যা দেওয়া যায়। এই মতবাদের মূল কথা হল — এই পৃথিবীর সবকিছু এমনকি সামান্যতম বস্তুও নিয়তির দ্বারা পূর্বনির্দিষ্ট। আজীবিকদের বিশ্বাস মানুষ তার কাজের জন্য দায়ী নয়, সবকিছুই নিয়তির দ্বারা নির্দিষ্ট। মানুষ তাই খুবই অসহায়। মানুষ তার নিজের শক্তি বা কর্ম দিয়ে দুঃখের অবসান ঘটাতে পারে না। মানুষের কর্মের দ্বারা দুঃখের হ্রাস-বৃদ্ধি হয় না। কঠোর তপস্যা, ব্রতপালন কিংবা ব্রহ্মচর্য পালনের দ্বারা দুঃখের নাষয় না। দুঃখের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে হলে পণ্ডিত-মুর্খ প্রত্যেক মানুষকে ৮৪ লক্ষ বার জন্ম গ্রহণ করতে হবে। এই জীবনচক্র অতিক্রম করার পর অবশেষে মানুষের জীবনে দুঃখের অবসান ঘটবে। আজীবিকদের কোনও ধর্ম গ্রন্থ পাওয়া না যাওয়ায় তাঁদের মতাদর্শ সম্পর্কে জানতে হলে আমাদের বৌদ্ধ ও জৈন সাহিত্যের উপর নির্ভর করতে হয়। বৌদ্ধ মজঝিম নিকায়ে গোশালকে অহৈতুকতা (কারণকে অস্বীকার) ও অক্রিয়াবাদী আখ্যা দেওয়া হয়েছে। অঙ্গুত্তর নিকায়ে বলা হয়েছে যে গোশালের মতবাদ কর্ম, ক্রিয়া এবং বীজের ফলকে স্বীকার করা হয়নি।

আজীবিকরা অক্রিয়াবাদী হলেও দৈনন্দিন জীবনে তারা কঠোরপন্থী ছিলেন। নগ্নদেহী আজীবিক সন্ন্যাসীরা ভিক্ষাপাত্র না নিয়ে দু-হাত পেতে ভিক্ষান্ন গ্রহণ করতেন। আজীবিক শ্রমণদের দীক্ষা গ্রহণের প্রক্রিয়া ছিল খুবই কষ্টকর। এর জন্য তাঁদের নিজের হাতে চুল উপড়ে ফেলতে হত এবং তপ্ত ধাতুপিন্ডকে ধারণ করতে হত। ব্রহ্মচর্য আদর্শের প্রতি তাদের কোনোও শ্রদ্ধা না থাকলেও অনেক সময় তারা উপবাসের মধ্য দিয়ে স্বেচ্ছায় মৃত্যু বরণ করতেন। নিয়তিবাদী বলে আজীবিক ধর্ম বৌদ্ধ ধর্ম ও জৈন ধর্মের মতো জনপ্রিয় হতে পারেনি। প্রতিবাদী ধর্ম সম্প্রদায় হিসেবে তাঁরা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রামাণ্যতাকে অগ্রাহ্য করেছিল ঠিকই, কিন্তু তার পরিবর্তে মানুষের মুক্তির জন্য কোনো বিকল্প পথের তাঁরা সন্ধান দিতে পারেনি। তাই বৌদ্ধ ও জৈনধর্মের মতো আজীবিক ধর্মমত ততটা জনপ্রিয় হয়ে উঠতে পারেনি।

১৮.৩.৫.৩ জৈন ধর্ম : বর্ধমান মহাবীর

আজীবিক ধর্মের তুলনায় জৈন ধর্ম অনেক বেশী জনপ্রিয় হয়ে উঠেছিল এবং ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তা ছড়িয়ে পড়েছিল। জৈন ঐতিহ্য অনুসারে চব্বিশ জন তীর্থংকর এই ধর্মের প্রসার ঘটান। প্রথম জৈন তীর্থংকর ছিলেন ঋষভ বা আদিনাথ এবং সর্বশেষ অর্থাৎ চব্বিশতম তীর্থংকর ছিলেন মহাবীর। মহাবীরকে শেষতম তীর্থংকর ধরলে জৈনধর্মের সূচনাকাল হবে খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দীতে। প্রথম পনেরোজন তীর্থংকরের বেশিরভাগেরই জন্ম পূর্ব উত্তর প্রদেশ অথবা বিহারে। কিন্তু তাঁদের ঐতিহাসিকতা নিয়ে সন্দেহ আছে। তবে জৈনধর্মের গুণগত পরিবর্তন আসে শেষ দুজন তীর্থংকর পার্শনাথ ও মহাবীরের হাতে। বস্তুত জৈন ধর্মের আদি গুরুত্বপূর্ণ তত্ত্ব ও শিক্ষা আমরা পার্শনাথের কাছ থেকে পাই। পঞ্চদশ শতকের রচনা ভবদেবসূরীর পার্শনাথ চরিত্র গ্রন্থ থেকে আমরা পার্শনাথের জীবনী সম্পর্কে জানতে পারি। মহাবীরের জন্মের প্রায় আড়াইশো বছর আগে পার্শনাথের আবির্ভাব ঘটে। বারাণসীর এক রাজপরিবারে পার্শনাথের জন্ম হয়েছিল। তাঁর পিতার নাম ছিল অশ্বসেন এবং

মায়ের নাম বামা। অযোধ্যার রাজকন্যা প্রভাবতীর সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তিরিশ বছর বয়সে তিনি সংসার ত্যাগ করে তপশ্চর্যার ব্রত নেন। তাঁর তপশ্চর্যার ৮৪তম দিনে তিনি কেবল জ্ঞান লাভ করেন; তারপর দীর্ঘ ৭০ বছর ধরে ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। বহু মানুষ তাঁর ধর্মমত গ্রহণ করেছিল। একশো বছর বয়সে ঝাড়খন্ডের হাজারিবাগ জেলার পরেশনাথ পাহারে তিনি দেহত্যাগ করেন। পার্শনাথের আধ্যাত্মিক জীবনের যোগ্য উত্তরসুরি হলেন বর্ধমান মহাবীর যাঁকে আমরা জৈনধর্মে প্রকৃত প্রতিষ্ঠাতা রূপে গণ্য করতে পারি।

জৈন ঐতিহ্য অনুসারে ৫৬৯ খ্রিস্ট পূর্বাব্দে বৈশালীর কুন্ডগ্রামে বর্ধমান মহাবীর-এর জন্ম হয়। পিতা সিদ্ধার্থ জাতৃক নামের ক্ষত্রিয় গোষ্ঠীর প্রধান ছিলেন এবন্নগ তাঁর মাতা ছিলেন লিচ্ছবী-রাজ চেতকের বোন ত্রিশলা। এই লিচ্ছবী-রাজ চেতকের কন্যাকেই বিবাহ করেন মগধ রাজ বিম্বিসার। এইভাবে মহাবীর মগধ রাজবংশের সাথে আত্মীয়তার বন্ধনে আবদ্ধ ছিলেন। রাজ পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কিত হওয়ার কারণে আভিজাত সমাজে ধর্ম প্রচারে তাঁর সুবিধে হয়েছিল। পরিণত বয়সে যশোদা নামের এক মহিলার সঙ্গে তাঁর বিবাহ হয়। তাঁদেরকন্যা সন্তান হয়, নাম অনজ্জা। মহাবীর ৩০ বছর বয়সে সংসার ত্যাগ করেন এবং সন্ন্যাসীর জীবন শুরু করেন। সংসার ত্যাগের ১৩ মাস পরে এক শীতে তিনি তাঁর পরিধেয় বস্ত্রখানিও বিসর্জন দেন। এইভাবে শুরু হয় তাঁর দিগম্বর পরিব্রাজকের জীবন। দীর্ঘ ১২ বছর কঠোর কৃচ্ছসাধনের পর ঋজুপালিকা নদীর তীরে জুম্ভিক গ্রামে এক শালগাছের নীচে কেবল জ্ঞান লাভ করেন অর্থাৎ তিনি সত্যজ্ঞান লাভ করেন। তখন তাঁর নাম হয় "কেবলিন" বা সর্বজ্ঞ, "জিন" বা বিজেতা এবং মহাবীর।

কেবলিন হবার পর অর্থাৎ সত্য জ্ঞান লাভ করার পর মহাবীর দীর্ঘ তিরিশ বছর গাঙ্গেয় সমভূমির বিভিন্ন রাজ্যে তাঁর ধর্মমত প্রচার করেন। ধর্মপ্রচারের সূত্রেই তিনি কোশল, মগধ, মিথিলা, চম্পা প্রভৃতি রাজ্যে পরিভ্রমণ করে ধনী-দরিদ্র, রাজা-প্রজা সকলের মদজ্যেই ধর্মপ্রচার করেন। বৌদ্ধ ধর্মাবলম্বী বহু রাজা-মহারাজা জৈনধর্মেরও পৃষ্ঠপোষণা করেন। ৪৬৮ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে ৭২ নবছর বয়ুসে রাজগিরের কাছে পাবাপুরীতে তিনি দেহত্যাগ করেন।

১৮.৩.৫.৪ জৈন ধর্মের মূলতত্ত্ব

মহাবীর ও তাঁর পূর্ববর্তী ২৩জন তীর্থংকর মিলে যে ধর্মমত প্রচার করেন তা নিয়েই জৈন ধর্মের মূল তত্ত্ব গড়ে উঠেছিল। মহাবীরের পূর্ববর্তী তীর্থংকর পার্শনাথ প্রচারিত জৈন ধর্মের চারটি নীতি চতুর্যাম নামে খ্যাত। বস্তুত জৈনদের অবশ্য পালনীয় জীবনচর্চা-প্রণালী চতুর্যাম নামে খ্যাত। এগুলি হল — ১)অহিংসা, ২) অনৃত বা মিথ্যা কথা না বলা; ৩) অস্তেয় বা অন্যের জিনিস অপহরণ না করা, ৪)অপরিগ্রহ বা ব্যক্তিগত সম্পত্তির অধিকারী না হওয়া। মহাবীর উপরোক্ত চারটি অবশ্য পালনীয় কর্তব্যের সঙ্গে ব্রহ্মচর্য ব্রতকে পঞ্চম পালনীয় কর্তব্য হিসেবে যুক্ত করেন। জৈন ধর্মের প্রচার ও বিস্তার বর্ধমান মহাবীরের মাধ্যমেই হয়েছিল। পার্শনাথের ধর্মমতকে সংস্কার করে তিনি তা জনপ্রিয় করে তোলেন। তাই মহাবীর এই ধর্মের প্রতিষ্ঠাতা না হলেও কার্যত তিনি-ই ছিলেন এই ধর্মের প্রবক্তা। জৈনধর্মে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে অহিংসার উপর অর্থাৎ কোনও জীবিত প্রাণীর ক্ষতি না করা। মহাবীরের পূর্বসুরি পার্শনাথ তাঁর অনুগামীদের দেহের উপরের ও নিম্নভাগে শ্বেতবস্ত্রের আবরণের কথা বলেন। তাঁরা শ্বেতাম্বর নামে পুরিচিত। কিন্তু মহাবীর কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের পথ বেছে নিয়েছিলেন। তাই তিনি তাঁর অনুগামীদের বস্ত্রত্যাগ করার কথা বলেন। মহাবীরের জৈন অনুগামীরাই দিগম্বর নামে পরিচিত হয়।

জীব বা আত্মার মুক্তিই ছিল জৈনধর্মের সার কথা। আত্মা হল চৈতন্যময়, সে অনন্ত জ্ঞান, অনন্ত শক্তি, অনন্ত আনন্দ ও জীবনদর্শনের মাধার। আত্মার অনন্ত বিকাশে প্রধান বাধা হল কর্ম। কারণ কর্মের মাধ্যমে আকাঙ্ক্ষা জন্মায়, আসক্তি আসে। আকাঙ্ক্ষা পূরনের জন্য আত্মা দেহ ধারণ করে। এই দেহ হল জড় বস্তু যা অসংখ্য পরমাণুর সমাহার মাত্র। মানুষের জীবনে কর্মের কোনও শেষ নেই, সংসারেরও শেষ নেই। কর্মের এই আসক্তি থেকেই মানুষ এক জন্ম থেকে আরেক জন্ম লাভ করে। সংসারের এই বন্ধন থেকে মুক্তি পাওয়া খুবই কঠিন, কিন্তু অসম্ভব নয়। ত্রিরত্নের অর্থাৎ সম্যক দর্শন, সম্যক জ্ঞান ও সম্যক চরিত্রের সার্থক অনুশীলন ও সাধনায় সিদ্ধিলাভ সম্ভব।

জৈনধর্মে ঈশ্বরের অস্তিত্ব স্বীকৃত কিন্তু তাঁকে জিন-এর থেকে নীচে স্থান দেওয়া হয়েছে বলে রামশরণ শর্মা মনে করেন। রোমিলা থাপারের মতে আদি জৈন ধর্মমতে ঈশ্বরের অস্তিত্ব প্রধান বিষয় ছিল না। এই ধর্মমতে এই বিশ্বব্রহ্মাণ্ড শাশ্বত নিয়মে চলে এবং সৃষ্টি সংক্রান্ত তরঙ্গের প্রগতি ও পতনের ধারার মাধ্যমে তা নিয়ত বহমান। আত্মার শুদ্ধিই জীবের লক্ষ্য, কারণ শুদ্ধ আত্মারই জড় দেহ থেকে মুক্তি লাভ করে স্বর্গবাস হয়। জৈন ধর্মে বৌদ্ধ ধর্মের মতো জাতিভেদ প্রথাকে নিন্দা করা হয়নি। মহাবীরের মতে একজন মানুষের উঁচু বা নীচু বর্ণে জন্ম তার পূর্বজন্মের পাপ-পূণ্যের ফল। মহাবীর একজন চন্ডালের মধ্যেও মানবিক মূল্যবোধের সন্ধান পেয়েছেন। তাঁর মতে শুদ্ধ ও সদগুণের জীবন যাপন করে একজন নিম্ন জাতির মানুষ মোক্ষ লাভ করতে পারেন। জৈনধর্মের তাই প্রধাণত লক্ষ্য ছিল পার্থিব বন্ধন থেকে মানুষের মুক্তি। এই মুক্তি বা মোক্ষ লাভের জন্য কোনও নিয়ম-আচার পালনের প্রয়োজন এই। সৎ- জ্ঞান, সৎ বিশ্বাস এবংগ সৎ কর্ম দ্বারাই তা পাওয়া সম্ভব।

১৮.৩.৫.৫ জৈনধর্মের বিস্তার

জৈনধর্মের প্রচার ও প্রসারের জন্য মহাবীর নারী-পুরুষ উভয়ের জন্য মঠ বা সংঘ গঠন করেন। মহাবীর তাঁর ধর্মমত সাধারণ মানুষের ভাষা প্রাকৃতে প্রচার করেন। জানা যায় তাঁর অনুগামীর সংখ্যা ছিল ১৪ হাজার। সংখ্যার বিচারে তারা খুব বেশি ছিলেন না। এর বড়ো কারণ জৈনধর্ম প্রচলিত ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে বিস্তর প্রভেদ রচনা করেনি, অনেক আপোস করেই চলেছিল। তাই সমাজের অবহেলিত, বঞ্চিত ও শোষিত নিপীড়িত সাধারণ মানুষ এই ধর্মের প্রতি বিশেষ আকৃষ্ট হননি। এসব সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও জৈনধর্ম কালক্রমে দক্ষিণ ও পশ্চিম ভারতে বিস্তার লাভ করে যেখানে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম দুর্বল ছিল। পরবর্তীকালে এক ঐতিহ্য থেকে জানা যায় মৌর্য সম্রাট চন্দ্রগুপ্ত মৌর্যের কারণেই কর্নাটকে জৈনধর্মে বিস্তার লাভ করে। আমরা জানি চন্দ্রগুপ্ত মৌর্য ধর্ম গ্রহণ করেছিলেন এবং তাঁর শেষ জীবনে সিংহাসন ত্যাগ করে একজন জৈন সন্ন্যাসীর জীবন অতিবাহিত করেন এবং তিনি মহীশূরের শ্রাবণবেলগোলায় দেহত্যাগ করেন। অন্য কোনও সূত্রে কর্ণাটকে জৈনধর্ম বিস্তারের এই ঐতিহ্য সমর্থিত হয়নি। দ্বিতীয় কারণ হিসেবে বলা যায় যে, মহাবীরের মৃত্যুর ২০০ বছর পর মগধে মারাত্মক দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছিল। এই দুর্ভিক্ষ দীর্ঘ ১২ বছর স্থায়ী হয়েছিল। তাই আত্মরক্ষার জন্য বহু জৈন অনুগামী ভদ্রবাহর নেতৃত্বে দক্ষিণে চলে যান, বাকিরা স্থলভদ্রের নেতৃত্বে মগধে থেকে যান। অভিপ্রয়াণকারী জৈনরাই দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্ম প্রচার করেন। দুর্ভিক্ষশেষে এই জৈনরা মগধে ফিরে এলে স্থানীয় জৈনদের সাথে তাদের মতভেদ তৈরী হয়। দক্ষিণের অভিপ্রয়াণকারী জৈনরা জানায় যে, দুর্ভিক্ষের দিনেও তারা কঠোরভাবে ধর্মীয় বিধি পালন করেছে, কিন্তু মগধের জৈনরা সেই ধর্মীয় বিধি লঙ্ঘন করে শিথিল জীবন যাপন করেছে।

জৈন অনুগামীদের মধ্যে এই মতবিরোধ দূর করার জন্য এবং জৈন ধর্মের মূল তত্ত্বের সংকলনের জন্য পাটলিপুত্রে এক সম্মেলন আহ্বান করা হয়। কিন্তু দক্ষিণের জৈনরা এই সম্মেলন বয়কট করে এবং এই সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত গ্রহণে অস্বীকৃত হয়। এরপর থেকেই দক্ষিণের জৈনরা দিগম্বর এবং মগধের জৈনরা শ্বেতাম্বর নামে পরিচিত হয়। তবে প্রত্নতাত্ত্বিক সাক্ষ্য অনুযায়ী দক্ষিণ ভারতে জৈনধর্মের বিস্তার খ্রীষ্টীয় তৃতীয় শতকের আগে হয়নি।

উড়িষ্যায় জৈনধর্ম বিস্তার লাভ করেছিল খ্রীষ্টপূর্ব চতুর্থ শতকে। খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম শতকে এই ধর্ম কলিঙ্গরাজ খারবেলের পৃষ্ঠপোষকতা লাভ করেছিল। খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় ও প্রথম শতকে জৈন ধর্ম তামিলনাড়ুর জেলাগুলিতে বিস্তার লাভ করে। পরবর্তী কয়েক শতকে জৈন ধর্ম মালব, গুজরাট এবং রাজস্থানে বিস্তার লাভ করে। বর্তমানে ব্যবসাবাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত বিপুল সংখ্যক জৈন এইসব রাজ্যে বসবাস করেন। জৈন ধর্ম মূলত ব্যবসায়ী শ্রেণীকে আকৃষ্ট করেছিল, কারণ জৈন ধর্মে অহিংস আচরণ কঠোরভাবে পালনীয় ছিল। কৃষিকাজ করতে গেলে ভূমি কর্ষণের সময় অজ্ঞাতসারে বা অলক্ষ্যে ক্ষুদ্রাতিক্ষুদ্র প্রাণী ও কীটপতঙ্গের প্রাণ বিনাশের সম্ভাবনা থাকে যা অহিংসার বিরোধী। সেই তুলনায় বাণিজ্যিক কাজে তা কম। তাই বাণিজ্যকেই জৈনরা শ্রেয় বৃত্তি হিসেবে গ্রহণ করে। যদিও জৈন ধর্ম বৌদ্ধ ধর্মের মতো রাজা তথা রাষ্ট্রের সমর্থন পায়নি এবং বৌদ্ধ ধর্মের মতো দ্রুত ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে বিস্তার লাভ করে নি, তবুও এই ধর্ম যেখানে বিস্তার লাভ করেছিল সেখানে আজও টিকে আছে। কিন্তু বৌদ্ধধর্ম এক সময় প্রবল প্রতাপে বিরাজ করলেও বর্তমানে ভারতীয় উপমহাদেশে বিলুপ্ত-প্রায়। এর কারণ জৈনধর্ম বৌদ্ধধর্মের মতো ব্রাহ্মণ্যধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করেনি, বরং স্বাতন্ত্র্য বজায় রেখে ব্রাহ্মণ্যধর্মের অনেক কিছু গ্রহণ করে নিজেদের শক্তিবৃদ্ধি করেছে। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের সঙ্গে আপসের পথেই তাদের সাফল্য এসেছে।

১৮.৩.৫.৬ জৈনধর্মের অবদান

প্রতিবাদী ধর্ম হিসেবে জৈন ধর্মের আবির্ভাবের পর আড়াই হাজার বছর অতিক্রান্ত হলেও সেই ধর্ম এতটুকু ম্লান হয়নি। ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে আজও বিরাজমান। এর থেকে এই ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি ও সারবত্তা বোঝা যায়। বস্তুত জৈনধর্মই প্রথম বৈদিক ধর্মের আচারসর্বস্বতা এবং বর্ণপ্রথার কুফল হ্রাস করতে উদ্যোগী হয়। বৌদ্ধ ধর্মের মতো জৈন ধর্মেও বাণিজ্যকে উৎসাহিত করা হয়। জৈন ধর্মে ব্যক্তিগত সম্পত্তি সম্পর্কে নিষেধাজ্ঞা আছে ঠিকই, কিন্তু বলা হয় এই নিষেধাজ্ঞা শুধুমাত্র ভূসম্পত্তি সম্পর্কে প্রযোজ্য, বাণিজ্য সম্পর্কে নয়। বরঞ্চ জৈনধর্মে বাণিজ্যিক গুণাবলী, সততা ও মিতব্যায়িতাকে উৎসাহ দেওয়া হয়েছে। তাই ব্যবসাবাণিজ্য প্রসারে জৈনরা এগিয়ে আসে। আদি পর্বের জৈনরা ব্রাহ্মণ-পৃষ্ঠপোষিত সংস্কৃত ভাষাকে পরিত্যাগ করেন। তাঁদের ধর্মপ্রচারের জন্য তাঁরা সাধারণ মানুষের ভাষা প্রাকৃতকে বেছে নেন। জৈন ধর্মগুলি লেখা হয় অর্ধ-মাগধী ভাষায়। খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে এই ধর্মগ্রন্থগুলি গুজরাটের বিখ্যাত শিক্ষাকেন্দ্র বলভীতে সংকলিত হয়। ধর্মমত প্রচারের কাজে প্রাকৃত ভাষা গৃহীত হলে জৈন ভাষা ও সাহিত্য সমৃদ্ধ হয়। বস্তুত প্রাকৃত ভাষা থেকে বহু আধুনিক ভাষার সৃষ্টি ও বিকাশ ঘটে — যেমন সৌরসেনি থেকে মারাঠি ভাষার বিকাশ হয়েছিল। জৈনরা আদি জৈন রচনাগুলি অপভ্রংশে রচনা করেছিলেন এবং তাঁরা এর প্রথম ব্যাকরণ রচনা করেন। মহাকাব্য, পুরাণ, উপন্যাস এবং নাটক নিয়ে গড়ে উঠেছিল জৈন সাহিত্য। পুরাণ ও চরিত সাহিত্যের সিংহভাগ অপভ্রংশে রচিত হয়েছিল। জৈন রচনার এক বড় অংশ এখনও পান্ডুলিপিতে রয়েছে, প্রকাশিত হয়নি। গুজরাট ও

রাজস্থানের মন্দিরে তথা দেবস্থানে এই রচনাগুলি পাওয়া গেছে। জৈন বিহারগুলিতে প্রাচীন পুঁথি সংরক্ষণ করা হত। আদি-মধ্যযুগে জৈনরাও সংস্কৃতের বহুল প্রয়োগ শুরু করে এবং অনেক গ্রন্থ সংস্কৃত ভাষায় রচিত হয়। বস্তুত সংস্কৃত সাহিত্যের অন্যতম বড় কবি ন্যায়চন্দ্র জৈন সন্ন্যাসী ছিলেন। কালিদাসের বিখ্যাত টীকাকার মল্লিকনাথ একজন জৈন ছিলেন। কন্নড় ভাষার বিকাশেও জৈনদের অবদান ছিল। এই ভাষায় তাঁরা প্রচুর লেখালেখি করেন।

প্রথমদিকে বৌদ্ধ কিংবা জৈনরা মূর্তি পূজা করতেন না। পরবর্তীকালে জৈনরা মহাবীর এবং বাকি ২৩ জন তীর্থংকরের পূজা শুরু করেন। এই মূর্তি পূজার উদ্দেশ্যেই জৈনরা বিহার, উত্তরপ্রদেশ, কর্ণাটক, গুজরাট, রাজস্থান এবং মধ্যপ্রদেশে বিশাল প্রস্তরমূর্তি নির্মাণ করেন। প্রাচীনতম জিন বা তীর্থংকরদের মূর্তিগুলির মধ্যে একটি পাওয়া গেছে বিহারের লোহানিপুরে যা পাটনা সংগ্রহশালায় রক্ষিত আছে। এই ভগ্নমূর্তিটি মৌর্য যুগের। কুষাণ যুগের বহু মূর্তি মথুরায় পাওয়া গেছে। লক্ষ্ণৌ সংগ্রহশালায় একটি সরস্বতী মূর্তি রখিত আছে, জৈন প্রতিমালক্ষণশাস্ত্রের বিচারে যেটি খুবই মূল্যবান। সরস্বতী মূর্তি ছাড়াও অম্বিকা, পদ্মাবতী প্রভৃতি জৈন দেবদেবীর মূর্তি ভারতের বিভিন্ন স্থানে পাওয়া গেছে। জৈন অম্বিকা মূর্তির একটি পাওয়া গেছে চব্বিশ পরগনা জেলার নলগোর থেকে, আরেকটি পাওয়া গেছে মানভূমের আলয়ারা থেকে। অষ্টম থেকে একাদশ শতকের মধ্যে তৈরি অসংখ্য জিনমূর্তি রাজস্থান, মধ্যভারত, কাথিয়াবাড়, দক্ষিণ ভারত এবং বাংলা, বিহার ও উড়িষ্যা থেকে পাওয়া গেছে। পূর্ব ভারতের বেশিরভাগ মূর্তিই দশম থেকে দ্বাদশ শতকের মধ্যে নির্মিত। প্রাচীন ভারতে জৈন শিল্প স্থাপত্য ও ভাস্কর্য বৌদ্ধদের মতো সমৃদ্ধ না হলেও মধ্য যুগের শিল্প স্থাপত্যে জৈনদের অবদান অনস্বীকার্য। বৌদ্ধদের তুলনায় কম হলেও জৈন গুহামন্দিরগুলি শিল্পোৎকর্ষের দিক থেকে অনন্য।

১৮.৩.৫.৭ গৌতম বুদ্ধ ও বৌদ্ধধর্ম

বৌদ্ধ ধর্মের প্রাণপুরুষ গৌতম বুদ্ধের জীবন ও তাঁর ধর্মমত নিয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে বৌদ্ধশাস্ত্র মহাবস্তু, 'সুত্তনিপাত' থেকে তাঁর জন্ম সম্পর্কে কিছু কথা জানা যায়। সিংহলী ইতিবৃত্ত 'মহাবংশ' ও দীপবংশ-ও এ বিষয়ে আলোকপাত করে। এ ছাড়া পরবর্তীকালের রচনা 'বুদ্ধচরিত' ও 'ললিতবিস্তার' থেকেও কিছু তথ্য পাওয়া যায়। বুদ্ধের জন্মস্থান কপিলাবস্তুর লুম্বিনী বনে মৌর্যসম্রাট অশোক ২৫০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে যে স্তম্ভলিপি প্রোথিত করেন, যা নিঃসন্দেহে তাঁর জন্মস্থান বিষয়ে এক প্রামাণ্য উপাদান। গৌতম বুদ্ধ বর্ধমান মহাবীরের প্রায় সমসাময়িক ছিলেন। এক ঐতিহ্য অনুসারে তিনি ৫৬৭ খ্রীষ্টপূর্বাব্দে নেপালের কপিলাবস্তুর এক সম্ভ্রান্ত ক্ষত্রিয় শাক্য বংশে জন্মগ্রহণ করেন। কপিলাবস্তু উত্তরপ্রদেশের বস্তি জেলার পিপড়াওয়া গ্রাম বলে চিহ্নিত। এটি নেপালের পাহাড়ের পাদদেশের খুব কাছেই অবস্থিত। শাক্য কুলপতি শুদ্ধোধন ছিলেন তাঁর পিতা। তাঁর মায়ের নাম মায়াদেবী বা মহামায়া। তিনি কোলিয়া গোষ্ঠীভুক্ত ছিলেন। প্রথম জীবনে বুদ্ধদেব গৌতম ও সিদ্ধার্থ নামে পরিচিত ছিলেন। গৌতম গোত্রজাত বলে তিনি গৌতম এবং তাঁর জন্মের পর সকলের আশা পূর্ণ হয়েছিল বলে তিনি সিদ্ধার্থ। শাক্যকুলে জন্ম হওয়ায় তিনি শাক্যসিংহ নামেও পরিচিত। বোধিজ্ঞান লাভের জন্য তিনি বুদ্ধ এবং সত্য উপলব্ধি করার জন্য তিনি তথাগত নামেও খ্যাত।

গৌতম বুদ্ধের জন্ম নিয়ে অশ্বঘোষের 'বুদ্ধচরিতে' সুন্দর বর্ণনা আছে। তাঁর মা মায়াদেবী ছিলেন শুদ্ধোধনের প্রধান মহিষী। সূর্যের আলোর ছটা যেমন সকল অন্ধকার বিদীর্ণ করে তিনি তেমনি সকল মায়া(শঠতা) মুক্ত হয়ে সকল রানির মাঝে ভাস্বর। সকল প্রজার কাছে তিনি মাতা, তাদের হিতসাধনই তাঁর ব্রত। সকল

শ্রদ্ধাভাজনের কাছে তিনি একনিষ্ঠ, উৎসর্গীকৃত। তাঁর প্রভুর পরিবারে তিনি সম্বৃদ্ধির দেবীর মতো ভাস্বর — বিশ্বের সকল দেবীর মধ্যে তিনি-ই শ্রেষ্ঠা। এই মায়াদেবীর গর্ভে স্বর্গ থেকে ত্রিভুবন আলো করে বোধিসত্ত্বদের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ জ্যোতিষ্ক প্রবেশ করেন যেমন নাগরাজ নন্দার গুহায় প্রবেশ করেন। তারপর তা হিমালয়ের মতো শুভ্র এক বিশালাকায় হস্তীর রূপ নেয়। ষড়দন্তে সজ্জিত সুগন্ধি ধারায় সুবাসিত মুখমণ্ডলের এই গজ রাজরানির গর্ভে প্রবেশ করে, এই বিশ্বের সকল অশুভ শক্তি নাশ করার জন্য। মায়াদেবী তাঁকে গর্ভে ধারণ করেছিলেন যেমন মেঘরাশি তড়িৎ-শিখাকে ধারণ করে। তারপর পুষ্যা নক্ষত্রের এক পুণ্যলগ্নে শুদ্ধ রানির কোন বেদনা ও অসুস্থতা ছাড়াই এক পুত্র সন্তান জন্ম নেয় বিশ্বের কল্যাণে। প্রভাতে মেঘ বিদীর্ণ করে যেমন সূর্যের উদয় হয় তেমনই মাতৃগর্ভ থেকে তাঁর জন্ম হয়েছিল; তাঁর আলোকশিখায় তমশা নাশ করে বিশ্বকে স্বর্ণের মতো উজ্জ্বল করার জন্য। যখনই তাঁর জন্ম হয় সহস্রাক্ষি তৃপ্ত ইন্দ্র তাঁকে সহৃদয়ভাবে তুলে দেন, তিনি যেন এক স্বর্ণস্তম্ভ। স্বর্গ থেকে প্রবাহিত দুই শুদ্ধ স্রোতস্বিনীর ধারা, আর মন্দার পুষ্পের স্তুপ তাঁর মস্তকে ঝরে পড়ে। অশ্বঘোষের বুদ্ধচরিত থেকে জানা যায় যে তিনি পূর্ণজ্ঞানী। গৌতম জন্মের পরেই বলেছিলেন এটাই তাঁর শেষ জন্ম।

গৌতম বুদ্ধের জন্মের সাত দিন পরেই তাঁর মা মারা যান। এই সময় তাঁর বিমাতা তথা মাসি মহাপ্রজাপতি গৌতমী তাঁকে পুত্রস্নেহে লালন-পালন করেন। রাজ পরিবারের ঐশ্বর্য ও ভোগ-বিলাসের মধ্যে বড়ো হলেও ছেলেবেলা থেকেই গৌতমের মনে বৈরাগ্য জন্মে। তাঁর সম্পর্কে দৈবজ্ঞরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছিলেন যে, তিনি রাজচক্রবর্তী হবেন অথবা সংসারত্যাগী মহাজ্ঞানী সাধক হবেন। এই কারণেই তাঁর পিতা শুদ্ধোধন তাঁর বিষয়ে উদ্বিগ্ন ছিলেন। তাই শুদ্ধোধন তাঁকে বিলাসব্যাসনের মধ্যে রেখে সংসারী করে তুলতে চেয়েছিলেন। সংসারের দিকে আকর্ষণ বৃদ্ধি করার জন্য শুদ্ধোধন তাঁর সঙ্গে যশোধরা (মতান্তরে গোপা) নামে এক শাক্য (মতান্তরে কোলিয়) কন্যার বিবাহ দেন। রাহুল নামে তাঁদের এক পুত্র সন্তান জন্মায়। কিন্তু সংসারের এই বিষয়-আসয়, বিত্ত-বৈভব কিছুই তাঁকে শান্তি দিতে পারেনি। তাঁর সম্পর্কে দৈবজ্ঞদের ভবিষ্যদ্বাণী বাস্তবায়িত হবার জন্য যেন তিনি এই সময় একের পর এক চারটি দৃশ্য দেখেন। প্রথমে তিনি দেখেন এক জরাগ্রস্ত বৃদ্ধকে, তারপর এক ব্যাধিগ্রস্ত লোককে, তারপর একটি মৃতদেহকে এবং সর্বশেষে হলুদ পোশাক পরিহিত এক সৌম্যকান্তি সন্ন্যাসীকে। এসব দেখে ভিক্ষু পরিব্রাজকের জীবনই তিনি বেছে নেন। কারণ তিনি বুঝেছিলেন যে, মানবজীবনে জড়া ব্যাধি, দুঃখ ও মৃত্যুর হাত থেকে তাঁর নিস্তার নেই। ভোগ-বিলাস ও মায়া মোহের বন্ধন কাটিয়ে তিনি মুক্তির পথ খুঁজছিলেন। ফলে একদিন গভীর রাতে তিনি গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস ব্রত নেন। তখন তাঁর বয়স ২৯ বছর। গৌতমের গৃহত্যাগ করে সন্ন্যাস ব্রত নেওয়ার ঘটনাকে বৌদ্ধধর্মে মহানিষ্ক্রমণ আখ্যা দেওয়া হয়েছে। ললিত বিস্তার ও বুদ্ধচরিত গ্রন্থ থেকে জানা যায় — সকলের অজ্ঞাতে ঘোড়া কন্টকের পিঠে চড়ে সারথি ছন্দকের সাথে তিনি গৃহত্যাগ করেন। পথে কন্টক ও ছন্দককে বিদায় দেন। এরপর মস্তক মুণ্ডন করা কাষায় বস্ত্র পরিধান করে ভিক্ষুকের মত জীবন শুরু করেন। পরিব্রাজকের জীবন শুরু হলে তিনি ঘুরতে ঘুরতে লিচ্ছবি গণরাজ্যের বৈশালীতে আরাড় কালামের আশ্রমে উপস্থিত হন। সেখানে আরাড় কালামের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে যোগ সাধনা করেন। যোগ সাধনায় সিদ্ধিলাভ হবে না বুঝতে পেরে গৌতম আশ্রম ছেড়ে রাজগৃহে এসে উদ্রক রামপুত্রকের কাছে আধ্যাত্মিক জ্ঞান লাভ করেন। এখানেও কাঙ্ক্ষিত ফল না পেয়ে তিনি উরুবিল্ব বা বোধগয়ায় চলে আসেন। উরুবিল্ব বা বোধগয়ায় এসে কঠোর কৃচ্ছসাধনের পথ বেছে নেন। এখানে তার পাঁচজন সঙ্গী জুটে যায়। কঠোর আত্মনিগ্রহ করে দেহ কঙ্কালসার হয়ে জ্ঞান হারালেও কোন ফললাভ না হওয়ায় তিনি এই পথ

ত্যাগ করেন। তিনি বুঝিতে পারেন শারীরিক কষ্টের মাধ্যমে বোধিজ্ঞান লাভ সম্ভব নয়। তাঁর এই সিদ্ধান্তে অসন্তুষ্ট হয়ে তাঁর পাঁচজন সঙ্গী তাঁকে ছেড়ে চলে যান। এরপর একদিন গৃহস্থ কন্যা সুজাতার আনা একবাটি পায়েস খেয়ে তিনি নৈরঞ্জনা নদীর তীরে একটি অশ্বথ গাছের নীচে বসে ধ্যানমগ্ন হন। মনে মনে তিনি দৃঢ় সংকল্প করেনঃ-

ইহাসনে শুষ্যতু মে শরীরং

ত্বগাস্থিমাংসং প্রলয়ঞ্চ যাতু

অপাপ্য বোধিং বহুকল্প দুর্লভাং

নৈবাসনাৎ কায়মতশ্চলিষ্যতে।

অর্থাৎ আমার শরীর শুকিয়ে যাক, ত্বক, অস্থি ও মাংস লোপ পাক, তবু দুর্লভ বোধি লাভ না করে আমি এই আসসন ত্যাগ করব না। অর্থাৎ বোধি জ্ঞান লাভ না করা পর্যন্ত তিনি ধ্যান ভঙ্গ করবেন না। এই অটল সংকল্প নিয়ে ধ্যানমগ্ন অবস্থায় গৌতম ৪৯ দিন অতিবাহিত করেন। সেই সময় তাঁকে অনেক কঠিন পরীক্ষার মধ্য দিয়ে যেতে হয়। অবশেষে আসে সেই মাহেন্দ্রক্ষণ। এক বৈশাখী পূর্ণিমার রাতে গৌতমের সত্যজ্ঞানের উপলব্ধি ঘটে অর্থাৎ তিনি সত্যেজ্র সন্ধান পান। তাঁর অন্তরের অজ্ঞানতা দূর হল, তিনি বোধি জ্ঞান লাভভ করলেন। ৩৫ বছর বয়সে গৌতম বুদ্ধত্ব লাভ করে মানুষকে দুঃখের হাত থেকে মুক্তি দেবার উপায় খুঁজে পান। সত্য-জ্ঞানের অধিকারী গৌতম এই সময় থেকে বুদ্ধ নামে পরিচিত হন

গৌতম বুদ্ধ তাঁর নবলব্ধ জ্ঞান মানুষের মাঝে প্রচার করবেন কিনা তা নিয়ে তাঁর মনে দ্বিধা ছিল। মহাভগ্গে (বৌদ্ধ মঠ জীবনের বিধি বা বিনয়ের একাংশ) আমরা গৌতম বুদ্ধের বুদ্ধত্বলাভের প্রথম কয়েক সপ্তাহের কথা জানতে পারি। বুদ্ধ বলেন তিনি সত্যের (ধম্মের) অধিকারী হয়েছেন যা প্রগাঢ়, যাকে দেখা এবং বোঝা কঠিন, এ এক প্রশান্ত, অতি উত্তম কালজয়ী যুক্তি, অতি সূক্ষ্ম্য এবং কেবলমাত্র জ্ঞানীরাই উপলব্ধ করতে পারেন। তাঁর ধম্ম তথা অভিজ্ঞান সর্বসাধারণের উপযোগী কি না তা নিয়ে তিনি সন্দিহান ছিলেন। তারপর স্বয়ং ব্রহ্মার অন্নুরোধে তিনি এই মহান কাজে ব্রতী হন। ঋষিপত্তনে বা বর্তমান সারনাথে এসে বুদ্ধ তাঁর পাঁচজন প্রাক্তণ সতীর্থদের মধ্যে প্রথম ধর্মমত প্রচার করেন। এরা হলেন বপ্র, ভত্রিয়, অশ্বজিৎ, মহানাম, ও কৌন্ডিন্য। ইতিহাসে এই ঘটনা 'ধর্মচক্র' প্রবর্তন' নামে খ্যাত। বুদ্ধের দীক্ষিত পাঁচজন শিষ্য নিয়েই বৌদ্ধ সংঘের সূচনা হয়। এরপর দীর্ঘ ৪৫ বছর ধরে বুদ্ধ ভারতের নানা স্থানে তাঁর ধর্মপ্রচার করেন। ধর্মপ্রচারের উদ্দেশ্যে তিনি রাজগৃহ, চম্পা, গয়া, বারাণসী, শ্রাবস্তী, কপিলাবস্তু, বৈশালী, কৌশাম্বী, নালন্দা, কজঙ্গল, বেরঞ্জা প্রভৃতি স্থানে যান। সারনাথের পর বারাণসী হয়ে তিনি রাজগৃহে যান। সেখানে তিনি মগধরাজ বিম্বিসার, শারিপুত্ত এবং মৌদগল্লায়নকে বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা দেন। নৃপতি বিম্বিসার গৌতম বুদ্ধকে বিখ্যাত বেনুবন উপহার দেন। এরপর বুদ্ধদেব কপিলাবস্তুতে যান। সেখানে বুদ্ধপত্নী পুত্র রাহুলকে তাঁর সামনে এনে পিতার উত্তরাধিকার প্রার্থনা করেন। বুদ্ধ তাঁর পিতা, পুত্র, পত্নী মাসি, প্রজাপতি গৌতমী এমনকি দেবদত্তকে পর্যন্ত এই ধর্মে দীক্ষিত করেন। কোশল রাজ্যের রাজধানী শ্রাবস্তী গৌতম বুদ্ধের খুব প্রিয় ছিল, তাই ধর্মপ্রচারের কাজে এখানে তিনি দীর্ঘকাল অতিবাহিত করেন। বস্তুত তাঁর ধর্ম প্রচারকের জীবনে ২৫টি বর্ষাবাস বা বর্ষাকাল যাপন করেন। পরিব্রাজক বৌদ্ধ ভিক্ষুকেরা বছরের ৮ মাস ধর্ম প্রচার করেন, আর বর্ষাকালের চার মাস কোন এক শহরের বিহারে বা মঠে অবস্থান করেন। সেই সময় সেখানেই ধর্মপ্রচার করেন যা বর্ষাবাস (বা বসসাবাস) নামে পরিচিত। এ

প্রসঙ্গে স্মরণীয় যে বৌদ্ধধর্মের ভিত্তি মগধ রাজ্যে স্থাপিত হলেও এর পূর্ণবিকাশ ঘটে কোশল রাজ্যে। মগধ-রাজ বিম্বিসারের মতো কোশল রাজ প্রসেনজিৎ গৌতম বুদ্ধের ভক্ত ছিলেন। প্রসেনজিৎ ও তাঁর স্ত্রী মল্লিকা, শ্রাবস্তীর ধনকুবের অনাথপিণ্ডক, শ্রাবস্তীর বিত্তশালী গৃহবধূ বিশাখা বৌদ্ধ ধর্ম ও সঙ্ঘের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। শ্রাবস্তীর ধনবান অনাথপিণ্ডক রাজকুমার জেতার কাছ থেকে বিপুল অর্থের বিনিময়ে জেতবন ক্রয় করে সংঘকে উপহার দেন। এই বিহার জেতবনবিহার নামে খ্যাত। বলা হয় গৌতম বুদ্ধের প্রিয় এই বিহার ক্রয় করার জন্য বিহারের পৃষ্ঠতলের সমপরিমাণ রৌপ্যমুদ্রা ব্যয় করেছিলেন।

রাজগৃহে ধর্মপ্রচারে গিয়ে গৌতম বুদ্ধ অসুস্থ হয়ে পড়লে বিখ্যাত চিকিৎসক জীবক কুমারভৃত্যের চিকিৎসায় আরোগ্যলাভ করেন। পরে জীবক তাঁর শিষ্যত্ব গ্রহণ করেন। শাক্য ও কোলিয়দের মধ্যে বিরোধে তিনি মধ্যস্থতা করেন। পিতার বিশেষ অনুরোধে তিনি কপিলাবস্তুতে যান। তাঁর পিতার মৃত্যুর পর বিমাতা ও মাসি গৌতমীর বিশেষ অনুরোধে তিনি বৌদ্ধ ভিক্ষুণি সংঘের প্রতিষ্ঠা করেন। প্রজাপতি গৌতমী এই সংঘের প্রতিষ্ঠাতা সদস্য ছিলেন। গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্মকে প্রচারকের জীবনের শেষ পর্বে অনেক অনভিপ্রেত ঘটনার সাক্ষী থাকেন। তাঁর জ্ঞাতি ভ্রাতা দেবদত্ত বৌদ্ধ সংঘে বিভেদ রচনার চেষ্টা করে ব্যর্থ হন। মগধরাজ অজাতশত্রু কর্তৃক তাঁর পিতার কারাবাস ও হত্যা তাঁকে ব্যাথিত করেছিল। এরপর অজাতশত্রু কর্তৃক বৃজি রাষ্ট্রসংঘের ধ্বংসসাধন যেমন তিনি অনুমোদন করেননি তেমনি কোশলরাজ বিড়ুড়ভ কর্তৃক শাক্যদের বিনাশ তাঁর হৃদয় ভারাক্রান্ত করেছিল। এত শোকাবহ ঘটনা সত্ত্বেও গৌতম বুদ্ধের ধর্মপ্রচার থেকে থাকেনি। কর্তব্যের টানেই তাঁকে স্থান থেকে স্থানান্তরে পরিভ্রমণ করতে হয়েছে। তিনি বৈশালীতে গেলে সেখানকার বিখ্যাত নগরশোভিনী আম্রপালী তাঁকে আমন্ত্রণ জানান। গৌতম বুদ্ধ তাঁকে ধর্মকথা শোনান। আম্রপালী তাঁর বিরাট আম্রকুঞ্জ সংঘকে দান করেন। এটাই ছিল বুদ্ধের শেষ দানগ্রহণ। আম্রপালী বৌদ্ধধর্মে দীক্ষা নিয়ে ভিক্ষুণিতে রূপান্তরিত হন। আশি বছর বয়সে জীবনের অন্তিম লগ্নে বুদ্ধ প্রিয় শিষ্য আনন্দকে নিয়ে কুশীনগর যাওয়ার পরিকল্পনা করেন। মনোরম শহর বৈশালী থেকে বিদায় নিয়ে তাঁরা পার্শবর্তী পাহাড়ি অঞ্চলে বিশ্রাম নেন। বহু মন্দির ও পবিত্র স্থানে পূর্ণ মনোরম দৃশ্যের দিকে তাকিয়ে বুদ্ধ আনন্দকে বলেন — "বর্ণময় এবং সমৃদ্ধ এই ভারত, মানুষের জীবন বড়ই মনোহর এবং ভালোবাসার মতো।" পথে পাবা নামক স্থানে তিনি কর্মকার চুন্দের আতিথ্য গ্রহণ করেন। এই চুন্দই ছিলেন বুদ্ধের শেষ দীক্ষিত শিষ্য এখানেই তিনি আমাশয় রোগে আক্রান্ত হন। এই অসুস্থ শরীর নিয়েই তিনি কুশীনগর যাত্রা করেন। পথে মৃত্যু আসন্ন বুঝতে পেরে বুদ্ধ প্রিয় শিষ্য আনন্দকে হিরণ্যবর্তী নদীতীরের শাল কাননে দুটি শালবৃক্ষের মাঝখানে একটি কাপড় বিছিয়ে দিতে বলেন। তিনি ক্রন্দনরত আনন্দকে সান্তনা দিয়ে বলেন, "আনন্দ রোদন করো না, হতাশ হয়ো না। মানুষের তার ভালোবাসার সবকিছু থেকে বিদায় নিতে হয়। যার জন্ম হয়, যা কিছু অনিত্য তাকে চলে যেতে না দিলে চলবে কী করে? তুমি ভাবছ আমাদের আর কোনো প্রভু থাকল না, তা কখনই হবে না। ও আনন্দ, যে মতবাদ প্রচার করেছি সেই মতাদর্শই তোমাদের প্রভু। এই মতাদর্শই তোমাদের পথ দেখাবে।" এইগুলি ছিল গৌতম বুদ্ধের শেষ কথা। এরপর তিনি ডান পাশ ফিরে শয়ন করে শেষ নিশ্বাস ত্যাগ করেন। বৌদ্ধধর্মে এই ঘটনা মহাপরিনির্বাণ' নামে খ্যাত। মৃত্যকালে বুদ্ধ সন্ন্যাসী ভিক্ষুদের উদ্দেশ্যে বলেন, "বয়ধম্মা সংখ্যারা, অপপমাদেন সম্পাদেথ' তি" অর্থাৎ যা সৃষ্ট, যা জাত, তা ব্যয়ধর্মের অধীন তা অনিত্য। অর্থাৎ মৃত্যু অনিবার্য। এর জন্য মুক্তির লক্ষ্যে মানুষকে সর্বদা সতর্ক হয়ে কাজ করতে হবে। এটাই গৌতম বুদ্ধের শেষ উপদেশ।

১৮.৩.৫.৮ বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি

বৌদ্ধ ধর্মের তত্ত্ব জানার জন্য আমাদের পালি ভাষায় লিখিত ত্রিপিটকের উপর নির্ভর করতে হয়। তিনটি পিটক বা পেটিকা নিয়ে গঠিত ত্রিপিটক। এগুলি হল সূত্তপিটক, বিনয় পিটক ও অভিধম্ম পিটক। বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মঠ-জীবন সম্পর্কিত নানাবিধ নিয়মকানুন, বিধি-নিষেধ বিনয় পিটকের অঙ্গ। সূত্তপিটক ও অভিধম্ম পিটকে রয়েছে বৌদ্ধ ধর্মের নৈতিক ও আধ্যাত্মিক তথা দার্শনিক তত্ত্বের ব্যাখ্যা। বৌদ্ধ ধর্মের মূল বিষয়বস্তু হল দুঃখবাদ। জগতে সব কিছু অনিত্য, অর্থাৎ অস্থায়ী, অলীক ও আশশ্বত। গৌতম বুদ্ধ দুঃখের উপর বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করায় বলা যায় দুঃখ তত্ত্বই বৌদ্ধধর্মের কেন্দ্রীয় তত্ত্ব। মানুষের আসক্তি,আকাঙ্ক্ষা, তৃষ্ণা অসীম ও অশেষ। মানুষের কামনা, বাসনা, আকাঙ্ক্ষা চরিতার্থ করার জন্যই তাকে জন্ম-মৃত্যুর চক্রে আবর্তিত হতে হয়। তাই বৌদ্ধ ধর্মের মূল লক্ষ্য হল মানুষের জীবনকে দুঃখের হাত থেকে মুক্ত করা। বৌদ্ধ ধর্মে বলা হয় মানুষের কর্মফলের তাড়নায় তার পুনর্জন্ম হয়। গত জন্মের কর্মফল তার এই জীবনে ভোগ করতে হয়। জন্ম হলেই মানুষকে কর্ম করতে হয়, এই কর্ম থেকেই আসে আসক্তি ও মৃত্যু ও তৃষ্ণা এবং তার থেকে আসে দুঃখ। তাই দুঃখ থেকে মুক্তি পেতে হলে মানুষের জন্ম নেওয়াকে রদ করতে হবে। গৌতম বুদ্ধ তাই চতুরার্যসত্যের কথা বলেছেন। এই চারটি আর্যসত্য হল — এ জগতে দুঃখ আছে, দুঃখের কারণ আছে, দুঃখের নিবৃত্তি সম্ভব এবং এই দুঃখ নিবারণের জন্য সঠিক মার্গ বা পথ অনুসরণ করতে হবে। এই প্রসঙ্গে নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য তাঁর ধর্ম ও সংস্কৃতি-প্রাচীন ভারতীয় প্রেক্ষাপট' শীর্ষক গ্রন্থে লিখেছেন, "দুঃখ সম্পর্কে বুদ্ধের যে ধারণা তা চরকসংহিতার কথাই স্মরণ করিয়ে দেয় যা হচ্ছে রোগ আছে, রোগের কারণ আছে, রোগের নিবৃত্তি প্রয়োজন এবং তা সম্ভব। চরকসংহিতা অনেক পরবর্তীকালের রচনা, কিন্তু সেখানে ধরে রাখা ভারতীয় চিকিৎসাবিদ্যার আপ্তবাক্যগুলি দীর্ঘদিনের ঐতিহ্যলব্ধ। এই ঐতিহ্যকে বুদ্ধও আশ্রয় করেছিলেন। চিকিৎসকের নির্মোহ দৃষ্টি নিয়েই তিনি দুঃখকে বিশ্লেষণ করেছেন এবং তার কারণ আবিষ্কারের চেষ্টা করেছেন। দুঃখের উপর বুদ্ধের বিশেষ গুরুত্বপ্রদান এই বিষয়ে ইঙ্গিত করে যে দুঃখ তত্ত্বই বৌদ্ধধর্মের মূল তত্ত্ব এবং আদিতম বৌদ্ধের বিকাশ এই তত্ত্বকে আশ্রয় করেই হয়েছিল।

বৌদ্ধ ধর্ম অর্ধসত্য, প্রতীতে সমুৎপাদ ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ- এই তিন তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত। প্রতীত্যসমুৎপাদ ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ প্রকৃতপক্ষে যথাক্রমে দ্বিতীয় ও চতুর্থ সত্যেরই বিশ্লেষণ। প্রতীত্যসমুৎপাদ হল বুদ্ধ-উল্লিখিত বারোটি কারণ-পরম্পরা। এগুলি হল অবিদ্যা, সংস্কার, বিজ্ঞান, নামরূপ, ষড়ায়তন, স্পর্শ, বেদনা, তৃষ্ণা, উপাদান, ভব, জাতি, জরা-মরণ ইত্যাদি। দুঃখের অন্যতম কারণ অবিদ্যা অর্থাৎ সত্য সম্বন্ধে অজ্ঞানতা এবং সংস্কার বা মানসজাত ধারণাসমূহ। পুনর্জন্ম দুঃখের। সংসারের প্রতি আসক্তি থেকেই মানুষের পুনর্জন্ম হয়। আর এই আসক্তি জন্মায় চোখ, কান, নাক, জিহ্বা, ত্বক ও মন এই ছ'টি ইন্দ্রিয় থেকে। বস্তুত ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর প্রতি তীব্র আসক্তি বা তৃষ্ণা থেকেই মানুষকে বারে বারে জন্মগ্রহণ করে অশেষ দুঃখ-কষ্ট সহ্য করতে হয়।

দুঃখের নিবৃত্তির জন্য গৌতম বুদ্ধ অষ্টাঙ্গিক মার্গের কথা বলেছেন। এই অষ্টাঙ্গিক মার্গ হল — ১)সৎবাক্য; ২) সৎকার্য; ৩) সৎজীবিকা; ৪)সৎচেষ্টা, ৫) সৎচিন্তা; ৬) সৎ-চেতনা; ৭) সৎ-সংকল্প এবং ৮) সম্যক সমাধি। প্রথম তিনটি মার্গ সঠিকভাবে পালন করলে শুদ্ধশীল হওয়া যায়। দ্বিতীয় দুটি মার্গ অনুসরণ করলে আসবে চিন্তার প্রশস্তি এবং দূর হবে কামনা-বাসনা। শেষের দুটি মার্গ অনুসরণ করলে প্রজ্ঞার উদয় হবে যা আমাদের আসাক্তি থেকে মুক্ত করবে এবং অহিংসার পথে চালিত করবে। দামোদর ধর্মানন্দ কোশাম্বী অষ্টাঙ্গিক মার্গের সামাজিক তাৎপর্য ব্যাখ্যা করেন। বুদ্ধ নির্দেশিত পথে সঠিকভাবে পালনের ফলে এই ধর্ম সামাজিক দিক থেকে

প্রাসঙ্গিক হয়ে ওঠে। কোশাম্বী তাঁর ''The Culture and Civilisation of Ancient India in Historical Outline গ্রন্থে লিখেছেন — "Clearly this was the most social of religions, the applications of the various steps are carefully developed and expounded in a long series of discourses as ascribed to the Buddha." বুদ্ধ-নির্দেশিত যে অষ্টাঙ্গিক মার্গের পরিচয় আমরা পাই তার মধ্যে 'মধ্যপন্থা' (মাঝামাঝি পন্থা) জীবনচর্চার প্রতিফলন দেখতে পাই। অতিরিক্ত ভোগ-বিলাস এবং কঠোর কৃচ্ছ্রসাধনের মাঝামাঝি পথ অনুসরণ করাকেই বুদ্ধ 'মঝঝিম পন্থা' বলেছেন। এই মধ্যপন্থার সাথে তিনি অহিংসাকে কায়মনোবাক্যে পালন করতে বলেন।

কোশাম্বীর মতে বৌদ্ধধর্মের সার বা মূল বিষয়বস্তু অষ্টাঙ্গিক মার্গে নিহিত আছে। এই আটটি পদক্ষেপের মধ্যে প্রথমটি হল যথার্থ দৃষ্টি বা সগভীর অন্তর্দৃষ্টি। এই জগৎ দুঃখে ভরা যা মানুষের অনিয়ন্ত্রিত কামনা-বাসনা, লোভ, ধ্বলিপ্সা ও আত্মপ্রসারতা জাত। মানুষের এই কামনা, তৃষ্ণা মেটাবার পথই হল সকলের জন্য শান্তি। অষ্টাঙ্গিক মার্গ হল এই লক্ষ্যে পৌঁছনোর সেই পথ। তাই লক্ষ্যে পৌঁছনোর প্রথম পদক্ষেপ হল সৎদৃষ্টি বা সুগভীর অন্তর্দৃষ্টি। দ্বিতীয় পদক্ষেপ হল যথার্থ লক্ষ্য অর্থাৎ অন্যের স্বার্থ বলি দিয়ে নিজের সম্পত্তি ও ক্ষমতা বৃদ্ধি না করা, ইন্দ্রিয় সুখ বা বিলাসব্যসনে হারিয়ে না যাওয়া। অন্যকে পরিপূর্ণরূপে ভালোবাসা ও অন্যের সুখ বৃদ্ধি করা, একেই যথার্থ পরিকল্পনা বলে। তৃতীয় পদক্ষেপ হল যথার্থ বাক্য। সতবাক্য বলতে বুদ্ধদেব পারস্পরিক বন্ধুত্বের পরিপূরক, প্রিয়, পরিমিত ও সত্য বাক্যকে বুঝ্যেছেন। কারণ মিথ্যে কথা, পরনিন্দা, অপবাদ, গালিগালাজ-পূর্ণ কটুবাক্য, অযথা বাক্যব্যয় করা বা ঐ জাতীয় শব্দের অপব্যবহার সমাজ সংগঠনের ক্ষতি করে। এইসব কটু কথা থেকে বিবাদ, হিংসা এমনকি হত্যাকান্ডও ঘটে। চতুর্থ পদক্ষেপ হল সৎ কার্য বা যথার্থ কর্ম। গৌতম বুদ্ধ মনে করতেন চুরি, হত্যা, ব্যভিচার সমাজে বিপর্যয় ডেকে আনে। তাই মানুষকে এইসব অন্যায় কর্ম থেকে বিরত থাকতে হবে। তাই তিনি মানুষকে সদর্থক কাজ করতে বলেন যাতে মানুষের উপকার হয়। পঞ্চম পদক্ষেপ হল সৎ জীবিকা। বুদ্ধ মনে করেন কোনো মানুষ অন্যের তথা সমাজের ক্ষতি করে জীবিকা অর্জন করবে না। উদাহরণস্বরূপ মদ ও মাংসের ব্যবসাকে তিনি সমাজের পক্ষে ক্ষতিকর বলে মনে করতেন। অভীষ্ট লক্ষ্যে পৌঁছনোর ষষ্ঠ পদক্ষেপ হল মানসিক উৎকর্ষতার বিকাশ। মনে কুচিন্তা প্রবেশ করতে না দেওয়া, মনের মধ্যে থেকে যাওয়া কুচিন্তা বের করে দেওয়া, মনে সক্রিয় সৎচিন্তা সৃষ্টি করা এবং মনের মধ্যে থেকে যাওয়া সৎচিন্তাকে পূর্ণতা দেওয়া মানসিক চর্চা তথা উৎকর্ষতা বৃদ্ধির মঙ্গ। সপ্তম পদক্ষেপ হল সৎ চৈতন্য। বুদ্ধ বলেছেন মানুষকে সর্বদা এই বিষয়ে সচেতন থাকতে হবে যে আমাদের দেহ অনেক অপরিচ্ছন্ন বস্তু দিয়ে গড়া। তাই দেহের সুখ ও বেদনার অনুভূতির নিয়ত পরীক্ষা করতে হবে, কারণ মানুষের দেহ বন্ধনও মনের আসক্তি থেকেও অনেক অশুভ বস্তুর সৃষ্টি হয়। এগুলি দূর করার বিষয়ে তাকে চিন্তা করতে হবে। অর্থাৎ ইন্দ্রিয়ের বন্ধন থেকে মনের মুক্তির কথা সর্বদা চিন্তা করতে হবে। অষ্টাঙ্গিক মার্গের অষ্টম পথ বা পদক্ষেপ সম্যক সমাধি বা যথার্থ ধ্যান হল মনোনিবেশ বা মনঃসংযোগ করার সযত্ন ও সচেতন মানসিক প্রশিক্ষণ। মন বা চিত্তের একাগ্রতাই সম্যক সমাধি, মনের চঞ্চলতা দূরকরার জন্য তাই চাই চিত্তের একাগ্রতা। সংক্ষেপে কোশাম্বী বলেছেন, গ্রিকদের দেহসৌষ্ঠব গঠনে শারীরক্রীড়ার যে স্থান, বৌদ্ধধর্মে অষ্টাঙ্গিক মার্গেরও সেই স্থান।

বৌদ্ধধর্মে চারটি আর্যসত্য ও অষ্টাঙ্গিক মার্গ অনুশীলনের মাধ্যমে জীবের তৃষ্ণা, অবিদ্যা ও অজ্ঞানতার অন্ধকার দূর হয় এবং জীবনের প্রতি প্রবল আসক্তি থেকে চিত্তের মুক্তি হলেই দুঃখের নিবৃত্তি ঘটে, মানুষের

নির্বাণ লাভ হয়। মানুষের আর পুণর্জন্ম হয় না। নির্বাণ-এর আক্ষরিক অর্থ দীপশিখার নিভে যাওয়া অর্থাৎ দীপ যেমন নিভে যায়, তেমনি বাসনা ও আসক্তি বা সংস্কারের বিনাশের দুঃখের অন্ত হয়, পুণর্জন্ম বন্ধ হয়। বৌধ দর্শনে নির্বাণ হল সকল কামনা-বাসনা ও আসক্তি থেকে মুক্তি। বৌদ্ধ শাস্ত্রে নির্বাণের যা ধারণা দেওয়া হয়েছে তাতে নির্বাণ হল অব্যাকৃত, অজর, অমৃত, অশোক, অসংক্লিষ্ট, অনুত্তর (অতুলনীয়), যোগক্ষেম। সব মানুষই নির্বাণ লাভের অধিকারী হলেও, তা সহজলভ্য নয়। বহু সাধনার ফলে মানুষ এই স্তরে উন্নীত হয়। বৌদ্ধ ধর্মে নির্বাণ লাভের জন্য সাধনার চারটি পর্যায়ের কথা বলা হয়েছে। এই চারটি স্তর হল — স্রোতাপন্ন, সকৃদাগামী, অনাগামী ও অর্হৎ। নির্বাণ লাভের সাধনের প্রথম স্তরটি হল স্রোতাপন্ন, অর্থাৎ যিনি নির্বাণ লাভের স্রোতের ভাসমান বা নিমগ্ন রয়েছেন। সকৃদাগামী হলেন সাধন মার্গের এমন উচ্চ প্ররযায়ে অবস্থিত ব্যক্তি যার নির্বাণ লাভের জন্য মাত্র একটি জন্মের প্রয়োজন। সাধনার আরো উচ্চস্তরে অবস্থিত ব্যক্তি যিনি এই জন্মেই নির্বাণ লাভ করবেন, তিনি হলেন অনাগামী। আর যিনি নির্বাণলাভ করেছেন বা বোধিপ্রাপ্ত হয়েছেন তিনি অর্হৎ। এটি সাধনার সর্বোচ্চ বা শেষ পর্যায়।

বৌদ্ধ ধর্মে বৌদ্ধ ভিক্ষু অর্থাৎ সংসারত্যাগী সন্ন্যাসী ও গৃহী ভক্তদের পালনীয় নিয়মকানুন — ভিক্ষুকদের তুলনায় অনেক সরল, যেমন — বৌদ্ধ সন্ন্যাসীদের কৌমার্য ও ব্রহ্মচর্য পালন করতে হত যা গৃহী ভক্তদের ক্ষেত্রে আবশ্যিক হল না। বৌদ্ধ ধর্মে অহিংসা ও সৎজীবনের উপরে জোর দেওয়া হয়েছে। যিনি শুদ্ধ চিত্তে নৈতিকতা মেনে সৎ জীবন যাপন করেন, হিংসা ও পাপ কাজ থেকে বিরত থাকেন, পিতা-মাতা ও গুরুজনদের প্রতি সেবাপরায়ণ এবং দাস-দাসী সকলের প্রতি সদয় থাকেন — তিনি একজন আদর্শ গৃহী। জীবনচর্যার বিষয়ে তিনি মধ্যমপন্থা বা মঝঝিম পন্থার পক্ষপাতী। তিনি চরম কৃচ্ছ্রসাধন ও বিলাস ব্যসনের পক্ষপাতী ছিলেন না। ব্রহ্মচর্য ছাড়াও বৌদ্ধ সন্ন্যাসী বা ভিক্ষুদের জীবন যাপনে অনেক বিধি নিষেধ ছিল। তাদের ধর্মপ্রচার, ভিক্ষাবৃত্তির কাজে নিযুক্ত থাকতে হত এবং মঠ তথা সংঘজীবনের অনুশাসন মেনে চলতে হত।

১৮.৩.৫.৯ বৌদ্ধ মঠ সংগঠন

বৌদ্ধ ধর্মকে সুসংগঠিত ও সংহত রূপ দেওয়ার জন্য গৌতম বুদ্ধ বৌদ্ধ সঙ্ঘ গড়ে তুলেছিলেন। বৌদ্ধ সংঘের গঠন ও পরিচালনায় উপজাতি সভায় বিশেষত গণ রাজ্যগুলির সংগঠনের প্রভাব পরিলক্ষিত হয়। গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশায় বৌদ্ধ মঠের সদস্য অংখ্যা ৫০০ অতিক্রম করে নি। বৌদ্ধ সংঘের নিয়মাবলি বিশেষ করে ভিক্ষুদের পালনীয় বিধি ও কর্তব্য বিনয়পিটকে স্থান পেয়েছে। ভিক্ষুদের চির কৌমার্য পালনের নির্দেশ ছিল। বৌদ্ধ সংঘে প্রবেশ ও বাসের জন্য ভিক্ষুদের নির্দিষ্ট নিয়ম ছিল। বৌদ্ধ সংঘ ত্রিরত্নের একটি রত্ন। বুদ্ধ, ধর্ম ও সংঘ নিয়ে ত্রিরত্ন। সংঘে প্রবেশের জন্য প্রথম পর্যায়ে প্রার্থীকে প্রব্রজ্যা নিতে হত অর্থাৎ সন্ন্যাস অবলম্বন করে পরিভ্রমণ করতে হত। প্রব্রজ্যা গ্রহণের জন্য তাদের ন্যূনতম ১৫ বছর বয়সের হতে হত। বৌদ্ধশাস্ত্রে প্রব্রজিত সন্ন্যাসীকে শ্রমণ বলা হত যাকে 'দশশীল' পালন করতে হত। এগুলি হল ১) প্রাণী হত্যা না করে, ২) অদত্ত দ্রব্য বর্জন করা, ৩) অব্রহ্মচর্য পরিহার করা, ৪) মিথ্যা কথা না বলা, ৫) সুরা, মৈরেয় ও মদ বিসর্জন দেওয়া, ৬) বিকেলে ভোজন না করা, ৭) নাচ গান বাজনা, কৌতুকাদি বর্জন করা, ৮) মালা, সুগন্ধি ও অলঙ্কার পরিহার করা, ৯) সুখকর শয্যা বর্জন করা, ১০) স্বর্ণ, রৌপ্য ও প্রতিগ্রহে নিরাশক্ত হওয়া। এই দশশীলের মধ্যে প্রথম পাঁচটি, যা পঞ্চশীল নামে পরিচিত, বৌদ্ধ উপাসক —উপসিকাদের অবশ্য পালনীয় বিধি ছিল। একজন ভিক্ষুব্রত গ্রহণকারীর ব্যক্তিগত সম্পত্তি বলে কিছু থাকবে না। তাঁর সম্পত্তি বলতে একটি ভিক্ষাপাত্র, তিন

টুকরো কাষায় বস্ত্র, একটি জলপাত্র, একটি তৈলাধার, একটি ক্ষুর, একটি লাঠি ও কাপড় সেলাইয়ের জন্য একটি সূচ, একটি শয্যা ও একজোড়া পাদুকা। লাভজনক কোনও কাজ, এমনকি চাষ বাস থেকেও তাকে বিরত থাকতে হত। দাড়ি, গোঁফ কেটে, মস্তক মুণ্ডন করে তাঁকে চীবর ধারণ করতে হত। প্রব্রজ্যা গ্রহণের পর শ্রমণকে কঠোর নিয়ম পালন করত হত। নিষ্ঠার সঙ্গে শ্রমণজীবন অতিবাহিত করার পর ২০ বছর বয়সে তাকে উচ্চতর দীক্ষা বা উপসম্পদা দান করা হত। এই উপসম্পদা প্রাপ্ত শ্রমণ ভিক্ষু নামে পরিচিত হতেন এবং প্রাতিমোক্ষ বিধি পালন করতেন।

ভিক্ষু হবার পর ভিক্ষু সংঘের উপর অধিকার যেমন বর্তায় তেমনি সংঘের বিধি-নিয়মও তাঁকে পালন করতে হত। বুদ্ধ ভিক্ষুকদের আহার-বিহার, আচার-ব্যবহার, ইত্যাদি নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে বেশ কিছু অনুশাসন প্রবর্তন করেন। প্রয়োজন বিশেষে আবার বেশ কিছু নিয়ম নপরিবর্তন ও নতুন নিয়ম প্রবর্তন করতেন। বিনয়পিটকে ভিক্ষুদের আচরণীয় বিধি ও সংঘের নিয়মকানুনের বিস্তৃত বিবরণ রয়েছে। ভিক্ষু সংঘে প্রতি মাসে দুটি উপসোথ করতে হত। উপসোথ অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হত চতুর্দশী অথবা পঞ্চমী তিথিতে। সেইদিন সঙ্ঘের ভিক্ষুরা সমবেত হয়ে প্রাতিমোক্ষের নিয়মাবলি আবৃত্তি করতেন। ধর্মবিষয়ে আলোচনা ছাড়াও সেদিন ভিক্ষুকদের ত্রুটিবিচ্যুতি নিয়ে আলোচনা হত। দোষ প্রমাণিত হলে শাস্তির বিধান দেওয়া হত। ব্যাভিচার, চুরি, নরহত্যা ও শক্তির অপব্যবহার এই চারটি কুকর্ম গুরুতর অপরাধ বলে গণ্য করা হত। এর মধ্যে যে কোনও একটিতে দোষী সাব্যস্ত হলে ভিক্ষুকে সঙ্ঘ থেকে বহিস্কার করা হত। ভিক্ষু স্বেচ্ছায় যে কোনও সময় সংসারজীবনে ফিরে যেতে পারতেন।

ভিক্ষুর দৈনন্দিন জীবন বড়ো কষ্টের ছিল। তাঁকে গ্রামে গ্রামে ঘুরে ভিক্ষান্ন জোগাড় করতে হত। মানুষের ফেলে দেওয়া বাসি খাবার তাঁর দ্বিরহরের একমাত্র ভোজন ছিল। কোনও ভিক্ষু গৃহস্থের বাড়িতে একটি রাতও কাটাতে পারতেন না। পরে এই নিয়মে পরিবর্তন এনে তাঁদের সর্বোচ্চ তিনটি রাত কাটানোর অনুমতি দেওয়া হয়। সাধারনত ভিক্ষুর নিবাস হত মনুষ্যবসতির দূরে কোনো কাননে, গুহায়, বৃক্ষতলে অথবা শ্মশান-ভূমির কাছে। এখানেই তাঁরা অলৌকিক শক্তির অধিকারী হওয়ার জন্য তপস্যা ও ভয়াবহ আদিম আচার পালন করতেন। বর্ষাকালের তিন অথবা চার মাস ভিক্ষুরা পরিব্রাজকের ভূমিকা পালন না করে কোনও আবাসে বর্ষাযাপন করতেন এবং সেখানে মানুষকে ধর্মের কথা বলতেন। বৌদ্ধরা এই সময়কালকে বর্ষাবাস (পালি বসসাবাস) বলতেন। তা ছাড়া বাকি সময় ভিক্ষুরা পায়ে হেঁটে মানুষের মধ্যে ধর্মপ্রচার করতেন। আদি বৌদ্ধধর্নে বৌদ্ধভিক্ষুদের এই কঠিন জীবনের পরিচয় পাই। গৌতম বুদ্ধ নিজেই একজন দক্ষ খাদ্য সংগ্রাহক ছিলেন, তিনি শুধু মানুষের কাছে থেকে বাসি খাদ্যই গ্রহণ করতেন না, বিপদসংকুল গভীর অরণ্যের মধ্য দিয়ে দূর দূরান্তে পরিভ্রমণ করতেন। অনেক সময় বণিকদের গো-শকটবাহী যানের সঙ্গে যেতেন এবং শিবিরের বাইরে রাত্রি যাপন করতেন। বৌদ্ধ ভিক্ষুকদের শ্রমদানেরমাধ্যমে মুনাফা অর্জন করা কিংবা কৃষিকার্যের উপর নিষেধাজ্ঞা ছিল। শুধু ভিক্ষান্নে জীবন ধারণ করতে হত অথবা কোনোও প্রাণী হত্যা না করে বন থেকে খাদ্য সংগ্রহ করতে হত। সৎভাবে জীবন যাপন করে শুধু সামাজিক কর্তব্য পালনে তাঁদের মনোনিবেশ করতে হত।

বৌদ্ধ সংঘের কাজকর্ম গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে পরিচালিত হত। সংঘের বিষয়ে প্রত্যেক ভিক্ষুর মত প্রকাশের স্বাধীনতা ছিল। কোনও বিষয়ে মতবিরোধ দেখা দিলে সংখ্যাগরিষ্ঠের ভোটে তার নিস্পত্তি হত। কৌশাম্বীতে বৌদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে বিরোধ উপস্থিত হলে স্বয়ং বুদ্ধ তার মধ্যস্থতা করেন। কিন্তু তাতেও বিরোধ না মিটলে বুদ্ধ বিরক্ত হয়ে বিহার পরিত্যাগ করেন।

১৮.৩.৫.১০ বৌদ্ধধর্মের বিবর্তন

গৌতম বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের কিছুদিন পরেই তাঁর শিষ্যরা বুদ্ধের বাণীগুলিকে সংকলন করার জন্য রাজগৃহে এক সম্মেলন আহ্বান করেন। মহাকাশ্যপের সভাপতিত্বে রাজগৃহের সপ্তপর্ণী গুহায় এই সমেলন ডাকা হয়েছিল গৌতম বুদ্ধের বাণীগুলির বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্যে। চুলবগ্গ থেকে জানা যায় কুশীনগরে বুদ্ধের মহাপরিনির্বাণের সময় মহাকাশ্যপ উপস্থিত ছিলেন না তাঁর অনুগামীদের নিয়ে পাবা থেকে কুশীনগর যাবার পথে আজীবিক গোষ্ঠীর এক নগ্ন সাধুর মাধ্যমে তিনি গৌতম বুদ্ধের মৃত্যুসংবাঝ। জানা যায় এই সময় সভদ্দ নামের এক বৌদ্ধ ভিক্ষু বিলাপরত ভিক্ষুদের শোক প্রকাশ করতে নিষেধ করেন, বরং বুদ্ধের এই মৃত্যুর ঘটনাটিকে এইভাবে ভাবতে বলেন যে, এর ফলে তাঁরা বুদ্ধের কড়া অনুশাসন থেকে অব্যাহতি পাবেন।সুভদ্দের এই অনভিপ্রেত অপ্রাসঙ্গিক মতব্য শ্রদ্ধেয় মকাশ্যপকে বুদ্ধের প্রচারিত ধমর্রে বিশুদ্ধতা ও তার ভবিষ্যত নিয়ে উদ্বিগ্ন করে তুলেছিল। বৌদ্ধ ধর্মের উপর কর্তৃক প্রতিষ্ঠা করার জন্য ও পবিত্র ধর্মের প্রতিষ্ঠা দেওয়ার জন্যে তিনি বুদ্ধের পরিচ্ছদ গ্রহণ করেন। বুদ্ধের পরিনির্বাণের পর ভিক্ষুদের আচরণে ও সংঘের শৃঙ্খলায় যে শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল তা দূর করে বৌদ্ধধর্মের বিশুদ্ধতা রক্ষার জন্য বুদ্ধের বাণী যথাযথ সংকলনের প্রয়োজনীয়তা দেখা দিয়েছিল। মহাকাশ্যপের সভাপতিত্বে পরিচালিত রাজগৃহ সম্মেলনে বুদ্ধর প্রিয় শিষ্য আনন্দ সুত্তপিটক ও উপালি বিনয়পিটক সংকলন করেন। এই মহাসম্মেলনে ৫০০ ভিক্ষু যোগ দিয়েছিলেন।

রাজগৃহ মহাসম্মেলনের প্রায় একশো বছর পরে লিচ্ছবী গণরাজ্যের রাজধানী বৈশালীতে দ্বিতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয়। এই মহাসম্মেলনে ৭০০ ভিক্ষু যোগ দেন। মহাস্থবির যশ এই সভা পরিচালনা করেন। এই মহা সমেলনে মগধ, চম্পা, বৃজি প্রভৃতি পূর্ব ভারতীয় ভিক্ষুদের সাথে কৌশাম্বী পাঠেয়, অবন্তী প্রভৃতি পশ্চিম ভারতীয় ভিক্ষুদের প্রবল মতবিরোধ দেখা দেয়। এই সম্মেলনে গৃহীত দশটি নতুন আচার গ্রহণে পশ্চিম ভারতীয় ভিক্ষুরা আপত্তি জানায়। বিরোধ নিষ্পত্তির জন্য প্রতি গোষ্ঠী থেকে ৪ জন করে মোট ৮ জন নিয়ে এক কার্যকরী সমিতি গঠন করা হয়। সমিতির সিদ্ধান্ত ভারতীয় ভিক্ষুদের বিরুদ্ধে যায়। এর ফলে ক্ষুব্ধ ভিক্ষুরা সভা ত্যাগ করেন এবং দিনকয়েক পরেই তাঁরা বৈশালীর উপন্ট্রে মহাবনের কুটাগারশালায় এক সভায় মিলিত হন। এই সভার নাম দেওয়া হয় মহাসঙ্গীতি এবং এখানে অংশগ্রহণকারী ভিক্ষুদের নাম হয় মহাসংঘিক।আর রক্ষণশীল পশ্চিম ভারতীয় ভিক্ষুরা থেরবাদী বা স্থবিরবাদী নামে পরিচিত হন। মহাসংঘিকদের গুরু হন মহাকাশ্যপ, আর স্থবিরবাদীদের গুরু হন মহাকাত্যায়ন।

বৌদ্ধ সংঘের বিরোধ এখানেই থেমে থাকেনি। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে তৃতীয় বৌদ্ধ সঙ্গীতি আহ্বান করা হয়। এই সম্মেলনে থেরবাদীরা প্রাধান্য পায়। তাই বলা যায় থেরবাদী ও মহাসংঘিকাদের মধ্যে বিরোধ প্রাকাশ্যে না আসলেও মতভেদ থেকেই যায়। কুষাণ সম্রাট কণিষ্কের রাজত্বকালে চতুর্থ বৌদ্ধসঙ্গীতি অনুষ্ঠিত হয় কাশ্মীরের কুন্ডল বন বিহারে। সভাপতিত্ব করেন পণ্ডিত বসুমিত্র। এই সম্মেলনে গৃহীত সিদ্ধান্ত অনুযায়ী পণ্ডিত পার্শ বৌদ্ধশাস্ত্রগুলিকে সংস্কৃত ভাষায় সংকলন করেন। এই মহাসম্মেলন থেকেই থেরবাদীরা ও মহাসংঘিকাররা আলাদা হয়ে যান। যারা থেরবাদকে আঁকড়ে ধরে থাকেন তাদের ধর্ম হয় হীনযান। চতুর্থ বৌদ্ধ সঙ্গীতিতে সর্বাস্তিবাদীদের মতভেদ দূর হয়ে যে ধর্মমত গড়ে ওঠে তার নাম হয় মহাযান। এই ধর্মমতে নিজের মুক্তির কথা না ভেবে গোষ্ঠীর মুক্তির কথা বলা হয় এবং বুদ্ধকে দেবতা জ্ঞানে পূজা করা হয়।

১৮.৩.৫.১১ বৌদ্ধধর্মের প্রসারের কারণ

প্রতিবাদী ধর্ম হিসেবে আত্মপ্রকাশের পর এই ধর্ম প্রথম দিকে পূর্বভারতে আবদ্ধ ছিল। কিন্তু পরে ধীরে ধীরে এই ধর্ম ভারতের বিভিন্ন প্রান্তে ছড়িয়ে পড়ে। সম্রাট অশোকের রাজত্বকালে ও তাঁর উদ্যোগে ও পৃষ্ঠোপোষকতায় বৌদ্ধ ধর্ম ভারত ও ভারতের বাইরে সিংহল, ব্রহ্মদেশ সুবর্ণভূমি, শ্যামদেশ, মিশর, ম্যাসিডিনিয়া, সিরিয়া, কাইরিনি প্রভৃতি দেশে বিস্তার লাভ করেছিল।

তাই রাজশক্তির পৃষ্ঠোপোষণা ভারতের অভ্যন্তরে ও বাইরের দেশে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারের একটি বড়ো কারণ। মগধের রাজা বিম্বিসার ও অজাতশত্রু, কোশল-রাজ প্রসেনজিত বৎস-রাজ উদয়ন আদি বৌদ্ধধর্মের উত্থান ও বিস্তারে বড়ো ভূমিকা পালন করেছিল। শাক্য, লিচ্ছবি, মল্ল, ভগ, কোলিয় প্রভৃতি গণরাজ্যের অধিবাসীরা শুধু বোউদ্ধ ধর্ম গ্রহণ করেই ক্ষান্ত হননি এর প্রসারের কাজেও এগিয়ে আসেন। তবে বৌদ্ধধর্ম বিস্তারে সম্রাট অশোকের ভূমিকাই সর্বাধিক।

ভারতে ও ভারতের বাইরে বৌদ্ধ ধর্ম বিস্তারের আরও নানাবিধ কারণ ছিল। প্রতিবাদী ধর্ম হিসেবে বৌদ্ধ ধর্ম সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিল। এই ধর্মই প্রথম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যাগযজ্ঞ ও পশুবলির বিরুদ্ধে মানুষের ক্ষোভকে অনুধাবন করতে পেরেছিল। তাই বৌদ্ধ ধর্মে আচারসর্বস্বতার কোনো স্থান ছিল না। সৎ আচরণ ও সৎ কর্মের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হয়। এই ধর্মে অহিংসার উপর জোর দেওয়া হয় এবং পশুবলি নিষিদ্ধ ঘোষিত করা হয়। এর ফলে কৃষি অর্থনীতির সঙ্গে যুক্ত মানুষজন এই ধর্ম সমর্থন করেছিল। রাজনৈতিক দিক থেকে দেখলে দেখা যাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ব্যয়বহুল যজ্ঞের বিরুদ্ধে এবং পুরোহিত শ্রেণির বিরুদ্ধে ক্ষত্রিয় শ্রেণির প্রতিবাদ ধ্বনিত হয়। এই প্রতিবাদ ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দুর্বল ক্ষেত্র পূর্বভারতে স্পষ্ট রূপ নেয়।

বৌদ্ধধর্ম জাতিভেদ প্রথার বিরোধী ছিল। ফলে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে বৈশ্য ও শূদ্র শ্রেণি যে সামাজিক বৈষম্য ও শোষণের শিকার হয়েছিল তারা বৌদ্ধ ধর্মে সামাজিক সম্মান পায়। ব্যবসা-বাণিজ্যের ক্ষেত্রে বৈশ্য শ্রেণি এযাবৎকাল যে প্রতিবন্ধকতার সমুখীন হয়েছিল বিশেষত সমুদ্র পাড়ি দিয়ে দূরপাল্লার বাণিজ্যে অংশ নেওয়া এবং অর্থ বিনিয়োগ করে সুদ আহরণ করা ইত্যাদি — বৌদ্ধ ধর্মে সেই বাধা ছিল না। বৌদ্ধধর্মে সমুদ্র যাত্রার উপর কোনও নিষেধাজ্ঞা ছিল না। তেজারতি কারবারও নিষিদ্ধ হয়নি। তাই ধনবান শ্রেণি ও গৃহপতি শ্রেণি বোউদ্ধ ধর্মকে শুধু সাদরে গ্রহণ করেনি এই ধর্মের বিকাশে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বস্তুত ধনবান গোষ্ঠী ও গৃহপতিদের উদার দানে বৌদ্ধ বিহার ও সংঘ সমৃদ্ধ হয়েছিল। গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্মে যে মানবিকতার উপর জোর দিয়েছিলেন সেই উদার মানষিকতাই সাধারণ মানুষকে এই ধর্মের প্রতি আকৃষ্ট করেছিল। তিনি মানুষের জন্মের উপর গুরুত্ব দেননি, কর্মের উপর গুরুত্ব দিয়েছিলেন। জন্মকৌলীন্যের পরিবর্তে কর্মগুণকেই সামাজিক পরিচয়ের মাপকাঠি হিসেবে বেছে নিয়েছিলেন। তাঁর ধর্মে ব্রাহ্মণ থেকে শুরু করে অস্পৃশ্য, পতিতা নারী সকলের সমান স্থান ছিল। বৌদ্ধ ধর্মের মঠ সংগঠন ও সংঘ পরিচালনায় গণতান্ত্রিক পদ্ধতি অনুসৃত হত, বিশেষাকিরের কোন স্থান ছিল না। যোগ্যতার ভিত্তিতে গুণ অনূযায়ী যে কোনও ব্যক্তি সংঘের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য হতেন।

বৌদ্ধ ধর্মের বিপুল বিস্তার ও সাফল্যের কারণ খুঁটিয়ে দেখলে দেখা যাবে — এই ধর্ম সমকালীন মানুষের আর্থ-সামাজিক জীবনের চাহিদা মিটিয়েছিল শুধু নয়, মানুষের মনের কথাও বুঝতে পেরেছিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে সকলের বেদপাঠের অধিকার ছিল না, সংস্কৃত ভাষাও তারা বুঝত না, তাই এই ধর্ম সাধারণ মানুষের ধর্ম হয়ে

ওঠেনি। গৌতম বুদ্ধ তাই তাঁর ধর্মকে সকল মানুষের বোধগম্য কর তোলেন। বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের দুর্বোধ্য সংস্কৃত ভাষায় নয় মানুষের কথ্য ভাষা মাগধি প্রাকৃত ভাষায় তাঁর ধর্ম প্রচার করেন। ফলে তাঁর ধর্ম ও বাণী প্রত্যন্ত গ্রামের মানুষের কাছেও বোধগম্য হয়েছিল।

বৌদ্ধধর্মের সাফল্যের একটি বড়ো কারণ নারীসমাজের বিপুল সমর্থন। ব্রাহ্মণ্য ধর্মে নারীসমাজের প্রতি যে সংকীর্ণতা দেখা যায় তা বৌদ্ধধর্মে একদমছিল না, বরঞ্চ এই ধর্মে নারীকে শ্রদ্ধার আসন দেওয়া হয়। নারীসমাজের প্রতি সামাজিক দায়িত্ব পালনের উদ্দেশ্যে ভিক্ষুণি সংঘ গড়ে তোলা হয়েহিল। ব্রাহ্মণ্য ধর্মের ময়ো নারীকে গৃহবন্দী করে রাখা হয়নি, ধর্ম প্রচারেও তাঁদের নিযুক্ত করা হয়। ক্ষেমা, উপ্পলবর্ণা, বিশাখা, সুপ্পিয়া, মল্লিকা বৌদ্ধ নারীসমাজের উজ্জ্বল রত্ন, যারা প্রত্যেকে স্বমহিমায় ভাস্বর। থেরীগাথায় বৌদ্ধ নারীসমাজের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশার কথা তাঁরা নিজেরাই ব্যক্ত করেছেন। নারীসমাজের এই স্বাধীনতা বৌদ্ধধর্মকে জনপ্রিয় করে তুলেছিল। বৌদ্ধধর্মে নগরশোভিনী আম্রপালী, গণিকা বিমলাকেও আশ্রয় দেওয়া হয়েছিল। নারীসমাজের প্রতি এই উদারতা বৌদ্ধধর্ম প্রসারে বড়ো ভূমিকা পালন করেছিল।

১৮.৩.৫.১২ ভারতে বৌদ্ধধর্ম বিলুপ্তির কারণ

যে ভারত একসময় বুদ্ধময় ছিল এবং যে মহামানবের স্মৃতি ভারতের সর্বত্র বিরাজমান সেই জন্মভূমি থেকে বৌদ্ধধর্মের নির্বাসন আমাদের সবাইকে অবাক করে। কিন্তু গভীরভাবে বিশ্লেষণ করলে দেখা যাবে — এই ধর্মের অবক্ষয় কোনও আকস্মিক ঘটনা নয়, এর বহুবিধ কারণ ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ষষ্ঠ শতকে বৌদ্ধধর্মের আবির্ভাব কাল থেকে খ্রিস্টীয় দ্বাদশ শতক পর্যন্ত ভারতে বৌদ্ধধর্ম তার অস্তিত্ব বজায় রেখেছিল। মধ্যবর্তী সময়কাল বিশেষত মৌর্য শাসনকাল পর্যন্ত এই ধর্মের প্রভাব ছিল অপরিসীম, শুঙ্গ যুগে বৌদ্ধধর্মের প্রভাব হ্রাস পায়, কুষাণ যুগে আবার এই ধর্ম স্বমহিমায় বিরাজ করে, গুপ্তযুগে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের পাশাপাশি বৌদ্ধধর্ম টিকে ছিল। হর্ষের রাজত্বকালে ও পাল যুগে ভারতের কিছু প্রদেশে বৌদ্ধধর্ম প্রভাব বিস্তার করেছিল। এরপর এই ধর্মের প্রভাব ক্রমশ কমতে থাকে এবং তুর্কি আক্রমণের পর এই ধর্ম প্রায় নিশ্চিহ্ন হয়ে যায়।

ভারতে বৌদ্ধধর্ম নিশ্চিহ্ন হলেও সিংহল, ব্রহ্মদেশ, শ্যামদেশ, তিব্বত, মোঙ্গলিয়া, চিন, জাপান প্রভৃতি দেশে বৌদ্ধধর্ম আজও বেশ জনপ্রিয়। ভারতে বৌদ্ধধর্মের জনপ্রিয়তা হ্রাসের এবং ক্রমশ অবলুপ্ত হবার অনেক কারণ ছিল।

বৌদ্ধধর্ম অবলুপ্ত হবার কারণ হিসেবে বলা যায় যে বৌদ্ধধর্ম ভারতে বিস্তার লাভ করেছিল রাজশক্তির পৃষ্ঠপোষণায়। বিম্বিসার, অজাতশত্রু, অশোক, কণিষ্ক, হর্ষবর্ধন প্রমুখ শাসক বৌদ্ধধর্ম গ্রহণ করে এই ধর্ম বিস্তারে অগ্রনী ভূমিকা পালন করেন। পরে রাজকীয় পৃষ্ঠপোষনার অভাবে এই ধর্ম তার গতি হারিয়ে ফেলে। তবে শুধু রাজ-অনুগ্রহের অভাবে বৌদ্ধধর্মের পতন শুরু হয়েছিল এই যুক্তি মানা যায় না। ধর্মের অন্তর্নিহিত শক্তি ধর্মকে বাঁচিয়ে রাখে। তা ছাড়া বৌদ্ধধর্ম সমাজের সকল শ্রেনির কাছে প্রাসঙ্গিকতা হারিয়েছিল কিনা তা ভেবে দেখার বিষয়। সময়ের সাথে সাথে বৌদ্ধধর্মে যে ব্যাপক পরিবর্তন আসে তাতে ধর্ম হিসেবে তার গ্রহণযোগ্যতা যে কমেছিল সে বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই।

প্রতিবাদী ধর্ম হিসেবে বৌদ্ধধর্ম ব্রাহ্মণ্য ধর্মের যাগযজ্ঞ, আচারসর্বস্বতা ও পুরোহিততন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র আক্রমণ হেনেছিল। বেদের অভ্রান্ততাকে বুদ্ধ মানেননি, কারণ তিনি মনে করতেন বেদ অপৌরুষেয় নয়। তাঁর

ধর্মে উদার মানবিকতার প্রকাশ ঘটেছিল। কিন্তু তাঁর মৃত্যুর পর সময়ের সাথে সাথে আদি বৌদ্ধ ধর্মে অনেক পরিবর্তন আসে। বিবর্তিত বৌদ্ধ ধর্মে মূর্তিপূজা, তন্ত্র-মন্ত্র সব ঢুকে যায়, যা ব্রাহ্মণ্য ধর্মের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ ছিল। বৌদ্ধরা অনেকগুলি সম্প্রদায়ে বিভক্ত হয়ে গূঢ় সাধনায় রত হয়। তারাকে বোধিসত্ত্বের স্ত্রীরূপে কল্পনা করা হয়। এইভাবে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম ও বৌদ্ধ ধর্মের মধ্যে তেমন পার্থক্য রইল না। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম সংস্কার করে অনেক পরিবর্তন আনা হয়। যাগযজ্ঞের গুরুত্ব কমিয়ে ধর্মকে সরল করার চেষ্টা করা হয়। কৃষি ও বাণিজ্যের স্বার্থে গো-সম্পদ সংরক্ষণের ব্যবস্থা নেওয়া হয়। গৌতম বুদ্ধকে প্রতিপক্ষ না ভেবে বিষ্ণুর নবম অবতার ভাবা হয়। এর ফলে বৌদ্ধধর্ম তার নিজস্বতা হারায় এবং সাধারণ মানুষের কাছে তা ব্রাহ্মণ্য ধর্মেরই একটি শাখারূপে গণ্য হয়।

বৌদ্ধ সংঘে শৃঙ্খলার অভাবে এই ধর্মের পতন ডেকে এনেছিল। গৌতম বুদ্ধ ভিক্ষুদের মধ্যে যে নৈতিকতা ও শৃঙ্খলা এনে তাদের অনাড়ম্বর জীবনে অভ্যস্ত করে তুলেছিলেন, তাঁর মৃত্যুর পরে এই শ্রমণ ও ভিক্ষুরা আরামপ্রিয় ও বিলাসী হয়ে ওঠেন। তাদের নৈতিক অবক্ষয় ও জাগতিক সুখ লাভের স্পৃহা সংঘজীবনের শৃঙ্খলা নষ্ট করে এবং জনমানসে তাদের ভাবমূর্তি বিনষ্ট হয়। মঠের সম্পদ বৃদ্ধির সাথে সাথে শ্রমণদের যেমন ভোগ তেমন লালসা বৃদ্ধি পায়। তেমনি সাধারণ মানুষের সঙ্গে তাঁদের সংযোগ ছিন্ন হয়। সময়ের সাথে সাথে বৌদ্ধ ধর্মে নৈতিকতা ও সৎজীবনের আদর্শের পরবর্তে তন্ত্র-মন্ত্র, গুহ্য সাধনা, রহস্যময়তা বৃদ্ধি পায়। বৌদ্ধধর্ম ব্রজ্রযান, সহযান ইত্যাদি তন্ত্র—সাধনার বিষয়বস্তুতে পরিণত হয়। মূর্তিপূজা থেকে শুরু করে তন্ত্রসাধনাও নানাবিধ গূঢ় আচারসর্বস্ব এই ধর্ম সাধারণ মানুষকে আকৃষ্ট করতে ব্যর্থ হয়। গৌতম বুদ্ধ তাঁর ধর্মকে সাধারণ মানুষের কাছে বোধগম্য করেতোলার জন্য কথ্য প্রাকৃত ভাষায় উপদেশ দিতেন, পরবর্তীকালে সেই বৌদ্ধশাস্ত্র (মহাযান ধর্মের) সংস্কৃত ভাষায় রচিত হলে সাধারণ মানুষের সঙ্গে এই ধর্মের সংযোগ বিচ্ছিন্ন হয়।

গৌতম বুদ্ধের জীবদ্দশায় বৌদ্ধ ধর্ম সমকালীন অন্যান্য ধর্ম ও সম্প্রদায় থেকে এগিয়ে গিয়েছিল তাঁর নিজস্ব ব্যক্তিত্ব, প্রজ্ঞা ও অসাধারণ বাগ্মিতায়।ব্রাহ্মণ্য, জৈন ও আজীবিক প্রভৃতি ধর্মীয় গোষ্ঠীর বড়ো বড়ো পণ্ডিত ও ধর্মীয় নেতাকে তিনি তর্কযুদ্ধে পরাজিত করেন। তর্কযুদ্ধে পরাজিত অনেকেই বৌদ্ধধর্মগ্রহণ করেন। বৌদ্ধ শাস্ত্র থেকে জানা যায়, তিনি অলৌকিক ক্ষমতার অধিকারী ছিলেন। 'মহাবগ্গ' থেকে জানা যায় — বোধগয়ায় ভ্রাতাদের বশবর্তী করার জন্য তিনি তাঁর শেষ অস্ত্র অলৌকিক ক্ষমতার প্রয়োগ করেন। এর ফলে তাঁর কার্যসিদ্ধি হয়। গৌতম বুদ্ধের শিষ্যদের মধ্যে মহাকাশ্যপ, আনন্দ, সারিপুত্ত, উপালি, মহাকাত্যায়ন প্রমুখ তাঁর যোগ্য উত্তরসুরি ছিলেন যাঁরা বৌদ্ধ ধর্মকে যেকোনও সংকথেকে উদ্ধার করতে সক্ষম ছিলেন। কিন্তু তাঁদের পর বৌদ্ধ ধর্মের অবক্ষয় রোধ করবার মতো প্রতিভাসম্পন্ন ব্যক্তিদের অভাব দেখা দেয়। অন্যদিকে ব্রাহ্মণ্য ধর্মে কুমরিল ভট্ট ও শঙ্করাচার্যের মতো সংস্কারদের আবির্ভাব এই ধর্মে জোয়ার এনেছিল। সংস্কারক ও তার্কিক হিসেবে তাঁদের যথেষ্ট খ্যাতি ছিল। তাই বৌদ্ধ মতবাদ খণ্ডন করে বৈদিক ব্রাহ্মণ্য ধর্মের শ্রেষ্ঠত্ব প্রচার করতে তাঁদের কোনো অসুবিধা হয় নি।

ভারতে বৌদ্ধ ধর্মের অবলুপ্তির কারণ হিসেবে হিন্দু রাজাদের ধর্মীয় অসহিষ্ণুতা ও বৌদ্ধ নির্যাতনকেও দায়ী করা হয়। শুঙ্গ বংশীয় শাসক পুষ্যমিত্র শুঙ্গ, হূণরাজ মিহিরকুল এবং গৌড়াধিপতি শশাঙ্কের তীব্র বৌদ্ধ বিদ্বেষ বৌদ্ধ ধর্মের পতনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন বলে অনেকে মনে করেন।প্রাচীন বৌদ্ধ গ্রন্থাদিতে উপরোক্ত শাসকদের বিরুদ্ধে বৌধ নির্যাতনের অনেক বিবরণ পাওয়া যায়। 'দিব্যাবদানে' বর্ণিত কাহিনি থেকে জানা যায় যে পুষ্যমিত্র শুঙ্গ ঘোষনা করেন যে তাঁকে শ্রমণ বা ভিক্ষুর মস্তক এবে দিতে পারবে

তিনি তাকে শত দিনার দিয়ে পুরস্কৃত করবেন। তবে এই বিবরণে অতিশয়োক্তি আছে বলে মনে করা হয়। অন্য কোনো সূত্রে এই বিবরণ সমর্থিত নয়। শুঙ্গ বংশের শাসকেরাই মধ্যপ্রদেশের ভারহুতে বৌদ্ধস্তুপ নির্মাণ করেছিলেন এবং সম্রাট অশোক নির্মিত সাঁচী স্তুপের বেষ্টনী তৈরী করেছিলেন। হিউয়েন-সাঙ-এর বিবরণ থেকে জানা যায় যে, গৌড়াধিপতি শশাঙ্ক শৈব ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রতি সহজাত বিদ্বেষবশত তিনি গয়ার বোধিবৃক্ষ ছেদন করেন। হিউয়েন-সাঙ বলেছেন ১৬০০ স্তুপ ও মঠ ধ্বংস করা হয়েছে এবং হাজার হাজার বৌদ্ধ শ্রমণ-ভিক্ষুককে হত্যা করা হয়েছে। এই বিবরণ অতিরঞ্জিত হলেও একথা অনস্বীকার্য যে এর মধ্যে কিছুটা সত্যতা না থাকলে একথা উল্লেখ করা হত না। এর বিরুদ্ধে বৌদ্ধদের প্রতিক্রিয়া লক্ষ করা যায়, তাদের দেবালয়ের প্রতিকৃতিতে, যেখানে ব্রাহ্মণ্য দেবতাদের বৌদ্ধ দেবতাদের দ্বারা পদদলিত হতে দেখা যায়। হিন্দুদের হাতে বৌদ্ধরা নির্যাতিত হয়েছিল একথা কিছুটা হলেও সত্যি। আদিমধ্য যুগে দক্ষিণ ভারতের শৈব ও বৈষ্ণবরা জৈন ও বৌদ্ধদের তীব্র বিরোধিতা করেছিল। এই ধরণে বিরোধেও বৌদ্ধধর্ম দুর্বল হয়ে পড়েছিল। তবে গৌড়রাজ শশাঙ্ক ঘোর বৌদ্ধবিরোধী একথা কোনও সূত্র থেকে প্রমাণ করা কঠিন। বরং জানা যায় বিশ্ববিখ্যাত বৌদ্ধ শিক্ষা প্রতিষ্ঠান নালন্দা বিশ্ববিদ্যালয় তাঁর মৃত্যুর দীর্ঘকাল পরেও স্বমহিমায় ভাস্বর ছিল। আর শৈব মিহিরকুলের বৌদ্ধ প্রজাহত্যা ও নির্যাতনের প্রভাব খুব গভীর ছিল না।

ভিক্ষুণি সংঘ প্রতিষ্ঠা করে বৌদ্ধ ধর্মের পতনকে ত্বরান্বিত করা হয়েছিল বলে মনে করা হয়। স্বয়ং বুদ্ধ এই ভিক্ষুণি সংঘ প্রতিষ্ঠার করা হয়। মহিলাদের সংঘে যোগদানের পর মঠের শৃঙ্খলায় শৈথিল্য দেখা দিয়েছিল। ভিক্ষু-ভিক্ষুণিদের নৈতিক অবক্ষয় ও উচ্ছৃঙ্খলতা মঠের পরিবেশকে কলুষিত করেছিল। চুল্লবগগ থেকে জানা যায় বুদ্ধ একবার কথাপ্রসঙ্গে তাঁর প্রিয়শিষ্য আনন্দকে বলেছিলেন যে মঠে মহিলারা প্রবেশাধিকার না পেলে সদ্ধর্ম হাজার বছর টিকে থাকত। তা না হলে এ ধর্ম বড় জোর পাঁচশো বছর বেঁচে থাকবে। তবে মহিলাদের সংঘে যোগদানের জন্য বৌদ্ধ ধর্মের পতন হয়েছিল একথা ঠিক নয়। বৌদ্ধ সংঘ পরিচালনা ও সংঘের শৃঙ্খলায় সার্বিক অবনতি এর জন্য দায়ী ছিল।

অনেক পণ্ডিত বৌদ্ধধর্মের ঐকান্তিক দুঃখবাদকে এর পতনের অন্যতম কারণ মনে করেন। বৌদ্ধধর্ম ও দর্শণে দুঃখবাদ প্রকট হয়ে উঠেছে যা মানুষের মনে হতাশা সঞ্চারিত করে। জরা, ব্যাধি, মৃত্যুকে জীবনের স্বাভাবিক ঘটনা হিসেবে না দেখে বৌদ্ধধর্মে দুঃখকে বড় করে দেখা হয়েছে। মানুষের জীবনে সুখ-দুঃখ দুই-ই আছে। মানুষ দুঃখ ভুলে সুখ ও আনন্দ পেতে চায়। তাই ব্রাহ্মণ্য ধর্মে যখন জীবনকে দুঃখময় না বলে একটি সোপান আখ্যা দেয় তখন মানুষ উজ্জীবিত বোধ করে। একেকটি জীবনের সোপান বেয়ে মানুষ আত্মোপলব্ধির পথে এগিয়ে চলে। বৌদ্ধ ধর্মে মানুষের জীবনকে উজ্জীবিত না করে হতাশ করলে এর প্রতি আকর্ষণ কমে যায়।

বৌদ্ধ ধর্মের অন্তর্নিহিত দুর্বলতায় যখন ধুঁকছিল, তখন তুর্কি আক্রমণ এই ধর্মের পতন সুনিশ্চিত করে। এই তুর্কি আক্রমণের ফলে অনেক বৌদ্ধ বিহার ধ্বংস হয়, অনেক বৌদ্ধ ভিক্ষু মৃত্যপথে পতিত হন। দ্বাদশ শতকের শেষ লগ্নে ইক্তিয়ার-উদ্দিন- মহম্মদ বিন বখতিয়ার খলজির নেতৃত্বে তুর্কিরা বঙ্গদেশে প্রবেশ করে। এই আক্রমণে ওদন্তপুরী মহাবিহার ধ্বংস হয় এবং বহু বৌদ্ধ ভিক্ষু নিহত হন। আক্রমণের ফলশ্রুতি স্বরূপ বহু বৌদ্ধ শ্রমণ ও ভিক্ষু নেপাল, তিব্বত প্রভৃতি স্থানে পালিয়ে যান এবং সঙ্গে নিয়ে যান প্রচুর মহামূল্যবান পুঁথি। এইভাবে বৌদ্ধ ধর্ম ও সংস্কৃতির শেষ অবশেষটুকুও বিলুপ্ত হয়।

১৮.৪ উপসংহার

আলোচ্য অধ্যায়ে সহস্রাধিক বছরের উত্তর ভারতের ইতিহাসের চালচিত্র যে তুলে ধরা হল তার গভীর তাৎপর্য সংশয়াতীত। বৈদিক সাহিত্যের দ্বারাই ভারতের সাহিত্যিক ঐতিহ্যের যে সূচনা তা যেমন আমরা দেখতে পেলাম, তেমনই অনুধাবন করলাম যাগযজ্ঞ নির্ভর ধর্মকর্ম প্রতিষ্ঠা কিভাবে আলোচ্য আমলে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অঞ্চলে সুদূরপ্রসারী প্রভাব ফেলেছিল। স্থায়ী লাঙলনির্ভর কৃষিজীবী সমাজের গোড়াপত্তনের মধ্য দিয়েই ভারতীয় সমাজব্যবস্থার কঠোরতা কিভাবে উত্তরোত্তর বাড়ছিল তার দৃষ্টান্তও প্রতিফলিত হয় আলোচ্য কালপর্বেই। কিন্তু ক্রমে ব্রাহ্মণ্য ধর্মের প্রাধান্যকে গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের সম্মুখে পড়তে হয় নানা প্রতিবাদী ধর্মমতের উত্থানের মধ্যে দিয়েই। আবার রাজনৈতিক দিক থেকে আলোচ্য কালপর্বের দ্বিতীয় ভাগে ভারত ইতিহাস প্রথম সাক্ষী থাকলো নির্দিষ্ট ভূখণ্ডে আশ্রিত রাজনৈতিক শক্তির উদ্ভবের, পরবর্তীকালে যা মৌর্য সাম্রাজ্যের সুপ্রতিষ্ঠিত অবয়বে আরো পরিপূর্ণ চেহারায় আত্মপ্রকাশ করে। সর্বোপরি, অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে এই পর্বেই ভারত ইতিহাসে দেখা গেল নগরের পুনরাবির্ভাব। ভেদাভেদ ও তারতম্যে পর্যবসিত সমাজ ও সাংস্কৃতিক জীবনের ক্রমবর্ধমান জটিলতার অনন্য নজির রূপেও আলোচ্য কালপর্ব ভারত ইতিহাসে প্রতিভাত।

১৮.৫ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. টীকা লেখোঃ বৈদিক সাহিত্য।

২. ঋগ্বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত রাজনৈতিক জীবন ও পরবর্তী বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত রাজনৈতিক জীবনের একটি তুলনামূলক আলোচনা করো।

৩. ঋগ্বৈদিক যুগের পশুচারণ থেকে পরবর্তীকালের স্থায়ী কৃষিজীবী সমাজে রূপান্তরের চিত্রটি কীভাবে বৈদিক যুগের শেষ পর্যায়ের ক্রমবর্ধমান সাহিত্যসূত্র থেকে বোঝা যায়?

৪. বৈদিক সাহিত্যে প্রতিফলিত নারীদের সামাজিক অবস্থান সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখো।

৫. ঋগ্বৈদিক আমলের ধর্মীয় জীবন কেমন ছিল? পরবর্তী বৈদিক আমলে তাতে কী কী পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়?

৬. তুমি কি মনে কর যে পরবর্তী বৈদিক আমলের জটিল যাগযজ্ঞের ক্রমবর্ধমান গুরুত্ব শাসকীয় ক্ষমতা বৃদ্ধির দ্যোতক?

৭. টীকা লেখঃ ষোড়শ মহাজনপদ।

৮. দ্বিতীয় নগরায়ণ বলতে কী বোঝ? এর প্রধান বৈশিষ্ট্যগুলি কী ছিল? মধ্যগাঙ্গেয় উপত্যকা এই নগরায়ণের প্রাণকেন্দ্র কেন ছিল?

৯. গহপতি ও শ্রেষ্ঠী কারা?

১০. মগধের সাফল্যলাভকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

১১.মগদের রাজাদের আগ্রাসী নীতি কীভাবে উত্তর ভারতে মগধের নেতৃত্বে রাজনৈতিক একীকরণে সাহায্য করেছিল?

১২. প্রতিবাদী ধর্মান্দোলনের উদ্ভবকে তুমি কীভাবে ব্যাখ্যা করবে?

১৩. আজীবিক কারা?

১৪. বৌদ্ধধর্মের মূলনীতি গুলি কী ছিল? এই ধর্মের অবলুপ্তির কারণগুলি কী কী ছিল?

১৫. জৈন ধর্মের মূল বক্তব্য সম্পর্কে একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখো।

১৮.৬ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

রণবীর চক্রবর্তী, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব(প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।

রণবীর চক্রবর্তী, প্রাচীন ভারতের অর্থনৈতিক ইতিহাসের সন্ধানে, আনন্দ, কলকাতা, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২০১৬।

ইরফান হাবিব ও বিজয় কুমার ঠাকুর, বৈদিক সভ্যতা, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০৫।

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, প্রথম খণ্ড, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ), প্রথম খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

নরেন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য, ধর্ম ও সংস্কৃতি- প্রাচীন ভাতীয় প্রেক্ষাপট, আনন্দ, কলকাতা, ২০১৫।

ড. রতন কুমার বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (আদিপর্ব), প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, কলকাতা, ২০১৯।

সুকুমারী ভট্টাচার্য, প্রাচীন ভারতঃ সমাজ ও সাহিত্য, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৮৫।

Upinder Singh– A History of Ancient and Early Medieval India– Pearson– 2009.

Raymond Allchin and Bridget Allchin– The Rise of Civilization in India and Pakistan– CUP– 1982.

D D Kosambi– An Introduction to the Study of Indian History– Popular Prakashan– Bombay– 1956.

Romila Thapar– Early India- From The Origins to Circa A.D. 1300– London– 2002.

R.S. Sharma– India's Ancient Past– OUP– New Delhi– 2005.

R.S. Sharma– Perspective in the Social and Economic History of Early India– Munshiram Monohorlal– New Delhi– 1983.

Hemchandra Roychowdhury– Political History of Ancient India– OUP– New Delhi– 1996.

একক : ১৯ ◘ মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্য, খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০— খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দ (Central India and Deccan– Circa 1000 BC—Circa 300 BCE)

গঠন

১৯.০ উদ্দেশ্য

১৯.১ সূচনা

১৯.২ লোহার আগমন

১৯.৩ কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্র

১৯.৪ মেগালিথ

১৯.৫ মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের সাংস্কৃতিক রূপান্তর

১৯.৫.১ প্রাক-লৌহ পর্ব

১৯.৫.২ লৌহ পর্ব

১৯.৬ উপসংহার

১৯.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১৯.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

একক ১৯.০ উদ্দেশ্য

- এই এককের উদ্দেশ্য হল মধ্য ভারতের ও দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস আলোচনাঃ কালপর্ব খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে ৩০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ।
- এই এককে মধ্য ও দক্ষিণ ভারতের ঐতিহাসিক বিকাশ বিশ্লেষণ করা হবে দুটি উপাদানের উপর ভিত্তি করেঃ লোহার ব্যবহার এবং কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্রের নির্মাণ।
- মেগালিথ সংস্কৃতির বিকাশ ও প্রাকলৌহ যুগ থেকে লৌহ যুগের বিবর্তনও এই একক থেকে শিক্ষার্থীরা জানতে পারবেন।

১৯.১ সূচনা

খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০—৩০০ অব্দের মধ্যবর্তী কালপর্বে উত্তর ভারতের বিস্তীর্ণ অংশ জুড়ে মানব ইতিহাসের বিভিন্ন দিকের যে চিত্র আমরা পেয়ে থাকি তার একটা বড় অংশের মূল উপাদান সাহিত্যিগত সূত্র। বিশেষত ১৫০০-৬০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের বৈদিক যুগের ইতিহাসের প্রধান আকর বৈদিক সাহিত্য সম্ভার। কিন্তু এই অভিজ্ঞতাকে সর্বভারতীয় মাত্রার সঙ্গে এক করে দেখা মোটেই ঠিক নয়। খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০— খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দের মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের মানবসমাজের ইতিহাস বহুলাংশেই বিধৃত হয়েছে পুরাতাত্ত্বিক সাক্ষ্যে। এই পুরাতাত্ত্বিক সংস্কৃতির অন্যতম প্রধান লক্ষণ তাম্র ও প্রস্তর আয়ুধের যুগপৎ ব্যবহার এবং ক্রমান্বয়ে লৌহযুগে প্রবেশ। এই সংস্কৃতিগুলিতে সাধারণভাবে কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্রের ব্যাপক ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এ প্রসঙ্গে উল্লেখ্য যে, ভারতে লৌহ যুগের আগমনের সময়কাল নিয়ে পণ্ডিতমহলে নানা মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। তাই আলোচ্য কালপর্বের মধ্য ও দাক্ষিণাত্যের জনজীবনের আলোচনায় এই বিতর্কের মাত্রাকেও উপেক্ষা করা কঠিন।

১৯.২ লোহার আগমন

লোহা এমন এক উপাদান, এ ব্রহ্মাণ্ডে যার ভাণ্ডার অপর্যাপ্ত। শুধু পৃথিবীতে নয়, অনেকসময় নক্ষত্রে, সূর্যে এবং উল্কায় লোহা পাওয়া যায়। ওজনের হিসাবে ভূত্বকের পাঁচ শতাংশই লোহা উল্কাপিণ্ডগুলিকে বাদ দিলে প্রকৃতিতে লোহা বিযুক্ত অবস্থায় খুব কমই পাওয়া যায়। অবশ্য পৃথিবীপৃষ্ঠে লোহার আকরিক বিপুল পরিমাণে ছড়ানো আছে। আকরিক থেকে বিচ্ছিন্ন হবার পর ধাতুটি নমনীয় এবং একে হাতুড়ির সাহায্যে পাতলা পাতে পরিণত করা যায়। লোহার গলনাঙ্ক অনেক উচ্চ(১৫৩৫°সে.) এবং সবচেয়ে পরিচিত রূপে এটি ৭০০° সেন্টিগ্রেডের নিম্ন তাপমাত্রায় স্থিতিশীল থাকে। লোহা বিগলনে এত অসুবিধা থাকার জন্যই এর ব্যবহার প্রচলিত হতে এত বিলম্ব হয়েছিল। পৃথিবীর প্রায় বেশিরভাগ অঞ্চলেই তামা ও ব্রোঞ্জ সবার আগে মানুষের কাজে লেগেছে।

মোটামুটিভাবে বিচ্ছিন্ন অবস্থায় লোহার যে রূপটি প্রকৃতিতে সহজলভ্য সেটি একমাত্র উল্কাপিণ্ডের মধ্যেই পাওয়া যায়। ভূপৃষ্ঠের সর্বত্র এই উল্কাপিণ্ড মাটির গভীরে পোঁতা আছে। কাজেই তাকে উত্তপ্ত করে, হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়েই যে, প্রাচীনতম লোহার সামগ্রী তৈরি করা হবে এতে অবাক হওয়ার কিছু নেই। এইসব সামগ্রীতে নিকেলের ভাগ অত্যন্ত বেশি থাকায় সহজেই এদের শনাক্ত করা যায়। এমনকি খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ সালের আগেও ইজিপ্টে এবং ইরাকে লৌহ সামগ্রীর যে প্রাচীনতম খণ্ডাংশ পাওয়া গেছে, সেগুলি সবই উল্কাপিণ্ড থেকে তৈরি।

ধাতু বিগলন শুরু হবার পর, যে সমস্ত সোনা বা তামার আকরিকে লোহার যৌগ-উপাদান অনেক বেশি ছিল সেগুলি থেকে আকস্মিক কোন ঘটনাচক্রে লোহা বিচ্ছিন্ন হয়ে গিয়েছিল। প্রথমোক্ত ধাতুগুলি গলিয়ে আকরিক থেকে বাইরে আনার সময় পড়ে-থাকা লোহা খণ্ডের সঙ্গে এমন কিছু টুকরো ছিল যেগুলি একটু গড়ে পিটে কোন সামগ্রী বানানো যায়। হরপ্পা সভ্যতার আল্লাহডিনো ও লোথালে এবং কাশ্মীর নব্য প্রস্তর যুগের গুফক্রালে বিক্ষিপ্তভাবে পাওয়া এরকম ছোট ছোট লৌহসামগ্রী হয়তো এইরকম পড়ে-থাকা লোহা দিয়ে তৈরি

হয়েছিল। কিন্তু এরকম লোহা এত কম পাওয়া যেত যে দামী ধাতু হিসাবে এর মূল্য অনেক বেশি ছিল। খ্রীষ্টপূর্ব ঊনবিংশ শতাব্দীতে পশ্চিম এশিয়ায় লোহা রূপার চেয়ে চল্লিশগুণ দামী ছিল।

চুল্লীর তাপ যখন লোহার জন্য প্রয়োজনীয় তাপমাত্রায় পৌঁছতে পারলো তখন বিগলনের প্রকৃত সময় উপস্থিত হল। এভাবে তৈরি লোহার খণ্ড অনেকদিন আগেই আবিষ্কৃত হয়েছে মাণ্ডিগাকের চতুর্থ স্তর থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ২৩০০ সময়কালের দুটি বিগলিত লোহার অলংকৃত বোতাম' মিলেছে। তখনও লোহাকে পুরোপুরি গলানো যায় নি। উত্তপ্ত করে হাতুড়ি পিটিয়ে অত্যন্ত শ্রমসাধ্য পদ্ধতিতে একে রূপ দিতে হয়। কিন্তু এত কিছুর পরেও এর কাটা প্রান্তগুলি বেশিদিন টিকতো না। এরকম নরম লোহা' উৎপাদনের খরচ কিংবা কার্যকারিতা কোনদিক থেকেই তামার সাথে পাল্লা দিতে পারতো না।

লোহার সঙ্গে কার্বনের মিল ঘটিয়ে এর উপরিতল ইস্পাত-কঠিন' করার দরকার ছিল। সেটা করতে গেলে হাপরের সাহায্যে আগুনকে এমনভাবে নিয়ন্ত্রণ করতে হবে যাতে চুল্লীর মধ্যে কেবলমাত্র লোহার দণ্ডের উপরিতলেই কার্বণের স্পর্শ লাগে। কাঠকয়লার চুল্লীতে নতুন-কাটা কঠের অনুপ্রবেশে কার্বনায়ন তরান্বিত হতে পারে। আকস্মিকতা এবং দীর্ঘ অভিজ্ঞতার ভিত্তিতেই সম্ভবত মূল আবিষ্কারে পৌঁছনো সম্ভব হয়েছিল। কিন্তু এর কলাকৌশল তখনও পর্যন্ত এত জটিল ছিল যে, বিভিন্ন সংস্কৃতিতে সেভাবে প্রতিটি ব্যক্তি ও কারিগরের পক্ষে আলাদাভাবে এই আবিষ্কারের জ্ঞান অর্জন করা খুব কঠিন ছিল। ইরফান হাবিব তাই মনে করেন, কোনও একটি উৎস থেকেই এই জ্ঞান অন্যত্র ছড়িয়ে পড়েছিল, এমন সম্ভাবনাই জোরালো। বলাবাহুল্য, একবার ইস্পাত-এ পরিণত করা সম্ভব হলেই তৎক্ষণাৎ লোহা শিল্প-ধাতু হয়ে উঠল। লৌহ-সামগ্রীর উৎপাদন কয়েকগুণ বেড়ে গেল। তামা বা ব্রোঞ্জের তুলনায় যখন লৌহ সামগ্রী পরিমাণে অনেক বেশি তৈরি হল , তখনই অর্থনীতিতে লোহার আগমন' তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে উঠলো। লোহার অস্তিত্বের সঙ্গে সাধারণভাবে পরিচিত হওয়া আর হাতিয়ার ও অস্ত্র হিসাবে এটির প্রয়োজনীয় উপাদান হয়ে ওঠা— এই দুইয়ের মাঝে নিঃসন্দেহে সময়ের অনেকখানি ফাঁক ছিল।

মানব সভ্যতার ইতিহাসে লৌহ বিপ্লবের সূচনা কোথায় এবং কবে হয়েছিল তা নিয়ে পণ্ডিত মহলে মতভেদ আছে। বেশিরভাগ গবেষকের ধারণা এশিয়া মাইনরের হিট্টাহিটরাই এই বিপ্লবের সূচনাকারী। কিন্তু জে. এ. চার্লস মনে করেন, খ্রীষ্টপূর্ব প্রথম সহস্রাব্দের প্রথমার্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে স্বতন্ত্রভাবেই লৌহ বিপ্লব দেখা দিয়েছিল। আফ্রিকা মহাদেশের উদাহরণ এ প্রসঙ্গে তিনি দিয়েছেন। চার্লসের স্বতন্ত্র ধারায় বিকাশের তত্ত্বকেই ভারতীয় প্রেক্ষাপটে প্রয়োগ করেছেন কে.টি. এম হেগড়ে। তাঁর মতে কোনও বিদেশী শক্তির প্রভাবে নয়, ভারতে স্বতন্ত্রভাবেই এই বিপ্লবের সূচনা হয়েছিল। এর প্রেক্ষাপটে ছিল তাম্রপ্রযুক্তি ও ব্রোঞ্জের মত সংকর ধাতু নির্মাণ প্রযুক্তির শৈলী এবং এর প্রাণকেন্দ্র ছিল মালব ও বানাসসংস্কৃতি।

বিতর্ক ভারতীয় উপমহাদেশে লৌহযুগের সূচনাকাল নিয়েও। দীর্ঘদিন এই ধারণা বলবৎ ছিল যে, ৮০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ নাগাদ ভারতে প্রথম লোহার ব্যবহার শুরু হয়েছিল। কিন্তু সাম্প্রতিক গবেষণায় এই ধারণা পরিবর্তিত হয়েছে এখন মনে করা হচ্ছে ভারতবর্ষে লোহার প্রচলন শুরু হয় আনুমানিক ১১০০ খ্রীষ্টপূর্ব বা তার কাছাকাছি সময়ে। তবে খেয়াল রাখা দরকার যে, বিশাল এই ভারত উপমহাদেশে লোহার প্রচলন সর্বত্র এক সময়ে হয় নি। এই প্রেক্ষাপটেই গুরুত্বপূর্ণ হয়ে ওঠে কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্র ও মেগালিথের আলোচনা।

১৯.৩ কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্র

ভারতীয় উপমহাদেশে নানান অঞ্চলের বিভিন্ন প্রত্নক্ষেত্রে কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্র (BRW) নানান সাংস্কৃতিস প্রেক্ষাপটে অন্যান্য বিভিন্ন মৃৎপাত্রের সঙ্গে মিশ্রিত অবস্থায় পাওয়া গেছে। ১৯৬০-এর দশকে অত্রঞ্জিখেরায় উৎখননের ফলে প্রথম BRW-র একটি নির্দিষ্ট ও স্বতন্ত্র প্রত্নতাত্বিক স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। এই মৃৎপাত্রটি প্রস্তুত করতে লাল ও কালোএই দুটি রং ব্যবহার হওয়ার জন্য এর নাম কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্র Black and Red Ware। যদিও লাল ও কালো রং দুটি পাত্রের একই গাত্রে লাগানো হয়েছে এরকম নিদর্শন পাওয়া গেছে তবুও সাধারণত কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্রের একটি গাত্রে লাল ও অন্য গাত্রে কালো রং-ই বেশি চোখে পড়ে। বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই মৃৎপাত্রের ভেতরের গাত্রটি কালো ও বহির্গাত্রটি লাল। সম্ভবত এই মৃৎপাত্রের প্রস্তুতকালে একটি বিশেষ উল্টো করে দগ্ধ করার পদ্ধতি প্রয়োগ করা হত বলেই এই মৃৎপাত্রে এইরকম রং দেখা যায়। অনুমান করা হয় যে BRW-র পাত্রগুলিতে কোনো জৈব পদার্থ রেখে পাত্রটি উল্টো করে দগ্ধ করতে থাকলে ক্রমশ জারণ প্রক্রিয়ায় মৃৎপাত্রের বহির্গাত্রটি লালবর্ণ ধারণ করে এবং জৈব পদার্থ থাকার ফলে মৃৎপাত্রের অন্তর্গাত্রটি বিজারণ প্রক্রিয়ায় কৃষ্ণবর্ণে পরিণত হয়। অন্য একটি অনুমান অনুযায়ী মনে করা হয় যে পাত্রগুলির এই বিশিষ্ট দু''বার দগ্ধ করার পদ্ধতির জন্যেও হয়ে থাকতে পারে। প্রথমবার দগ্ধ হলে মৃৎপাত্রগুলি লোহিত বর্ণের হয়ে যায়। অতঃপর পুনরায় দগ্ধ করলে সরাসরি আগুনের প্রভাবে থাকা মৃৎপাত্রের গাত্রটি কৃষ্ণকায় হয়ে যায়।

BRW-র ভৌগোলিক অবস্থান ও প্রত্নতাত্বিক স্তরবিন্যাসের দিকে চোখ রাখলে দেখা যায় যে, দোয়াব অঞ্চল এবং রাজস্থানের নোহ ও যোধপুরের মতো প্রত্নতাত্বিক স্থানগুলির নির্দিষ্ট, স্বতন্ত্র BRW স্তরটি অনেকক্ষেত্রে গৈরিক মৃৎপাত্র (OCP) ও চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্র (PGW) স্তরগুলির মধ্যবর্তী স্তরে অবস্থিত। ভারতীয় উপমহাদেশের অন্যান্য যেসব অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন সংস্কৃতির প্রেক্ষিতে BRW মৃৎপাত্রগুলি লক্ষ করা যায় তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলচিরন্দ বা পিকলিহাল-এর মতো নব্যপ্রস্তরকেন্দ্রগুলি, লোথাল-এর মতো প্রাক-হরপ্পা সংস্কৃতির অঞ্চল, রংপুর বা দেশলপুরের মতো গুজরাটে অবস্থিত হরপ্পীয় প্রত্নক্ষেত্রগুলি, চিরন্দ বা পাণ্ডুরাজার ঢিবির মতো মধ্য ও নিম্ন গাঙ্গেয় উপত্যকার তাম্র-প্রস্তর ক্ষেত্রগুলি, আহর বা গিলুন্দের মতো বানস সংস্কৃতির কেন্দ্রগুলি, ইনামগাঁও-র মতো মহারাষ্ট্রের মালওয়া সংস্কৃতির প্রত্নস্থল, চান্দোলীর মতো জোরওয়ে সংস্কৃতির প্রত্নক্ষেত্রগুলি, অত্রঞ্জিখেরা বা হস্তিনাপুরের মতো লৌহ যুগের চিত্রিত ধূসর মৃৎপাত্রস্থলে এবং ব্রহ্মাগিরির বা নাগার্জুনকোণ্ডার মতো দক্ষিণ ভারতীয় 'মেগালিথিক' সংস্কৃতির স্থানগুলি।

উপিন্দর সিং তাঁর 'A History of Ancient and Early Medieval India' শীর্ষক গ্রন্থে দেখিয়েছেন যে, দোয়াবের অত্রঞ্জিখেরায় যে স্বতন্ত্র BRW-র স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে, সেই একই প্রত্নতাত্বিক স্তরে কোনো প্রস্তর বা ধাতব প্রত্নবস্তুর দেখা না মিললেও বিভিন্ন পাথর বা কাঠের টুকরো, একটি হাড় বা অস্থিনির্মিত চিরুনির অংশ, মূল্যবান পাথরের কিছু খণ্ড এবং তিনটি (কর্নেলিয়ান, শামুক ও তামার তৈরি) পুঁতি বা গুলি উৎখননে পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া নোহ-র মতো রাজস্থানের প্রত্নক্ষেত্রে আকৃতিবহীন লোহা, পোড়ামাটির বা পুঁতির খণ্ড এবং অস্থিনির্মিত 'স্পাইক' (Spike) উদ্ধার করা গেছে। অত্রাঞ্চখেরায় স্বতন্ত্র BRW সংস্কৃতির অবশেষ থেকে জানা যায় যে, OCP সংস্কৃতিতে ধান, বার্লি, মটর ইত্যাদি যেসব শস্য উৎপাদন করা হত তা পরবর্তীকালের BRW-পর্যায়েও প্রচলিত ছিল। কারণ এই প্রত্নক্ষেত্রের BRW স্তরে ধান ও মুগ ডালের মতো শস্যের দানা উদ্ধার করা হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশের বিভিন্ন ভৌগোলিক পরিস্থিতির বিভিন্ন প্রত্নতাত্ত্বিক সংস্কৃতির সাথে সম্পৃক্ত অবস্থায় প্রাপ্ত BRW মৃৎপাত্রগুলির আকৃতি, নকশা বা নির্মাণ পদ্ধতির ভিন্নতা লক্ষ করার মতো। এর থেকে বোঝা যায় যে, কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্র পৃথকভাবে সবসময় কোনো একটি মৃৎপাত্র সংস্কৃতিকে চিহ্নিত করে না বা তা শুধু কোনো একটি বিশেষ কারিগরগোষ্ঠীর দ্বারাও নির্মিত নয় অথবা তা শুধু সমাজের নির্দিষ্ট কয়েকজন ব্যক্তির ব্যবহারের জন্য তৈরি নয়। বিভিন্ন অঞ্চলে ভিন্ন ভিন্ন প্রকৃতির BRW-র অস্তিত্ব থেকে সমাজে সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বা সমাজের একীকরণের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। তবে প্রত্নতত্ত্বের বিচারে স্কুট্ঢ-র এই বৈচিত্র্যময় অস্তিত্ব প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসের আঞ্চলিক বৈশিষ্ট্যের ওপরই গুরুত্ব আরোপ করে।

ইরফান হাবিব ও বিজয়কুমার ঠাকুর বিভিন্ন অঞ্চলের BRW-র কার্বন-১৪ পরীক্ষার ফলাফলের নিরিখে বলতে চেয়েছেন যে, সম্ভবত পূর্ব অঞ্চল থেকে BRW পরবর্তী সময়ে ভারতীয় উপমহাদেশের পশ্চিম দিকে অর্থাৎ মধ্য ও পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ বা পূর্ব রাজস্থানের মতো অঞ্চলে ক্রমশ বিস্তৃতি লাভ করে। তাঁদের অনুমান অনুসারে পরবর্তী বৈদিক যুগের মানুষ, খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের পর গাঙ্গেয় উপত্যকায় পদার্পণ করলে পূর্ব দিকের এই নতুন অধিকৃত অঞ্চলের সংস্কৃতির প্রভাবে BRW-র ব্যবহার ক্রমশ পশ্চিম দিকে প্রসারিত হয়। সামগ্রিকভাবে BRW-র প্রচলন মোটামুটিভাবে প্রাচীন ভারতীয় ইতিহাসে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বাদশ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব নবম শতাব্দী পর্যন্ত ঘটেছিল। ত্রিভুবন রায় মনে করেন যে, BRW সংস্কৃতি সরাসরি PGW সংস্কৃতি এবং উত্তর ভারতের কৃষ্ণচিক্কণ মৃৎপাত্র (NBPW) সংস্কৃতিকে প্রভাবিত করেছিল।

১৯.৪ মেগালিথ

'মেগালিথ' (megalith) কথাটি দুটি গ্রিক শব্দ 'megas' (বড়ো বা বৃহৎ) এবং 'lithos' (বা পাথর) থেকে উদ্ভূত। অর্থাৎ বড়ো আকারের পাথর বা মহাশ্ম-ই হল মেগালিথ। ভারতীয় উপমহাদেশে "মেগালিথিক ব্যারিয়ালস" বা মহাশ্মীর সমাধি সুদূর দক্ষিণ ভারতে, দাক্ষিণাত্য মালভূমি, বিন্ধ্য ও আরাবল্লী পর্বতমালায় এবং উত্তর পশ্চিমে পাওয়া গেছে। কিছু মহাশ্মীয় ক্ষেত্র প্রাক-লৌহ যুগের সাক্ষ্য বহন করে। কিন্তু দক্ষিণ ভারতে মহাশ্মীয় সংস্কৃতি লৌহ যুগের সঙ্গে সম্পর্কিত। দক্ষিণ ভারতে বা উপদ্বীপীয় ভারতে লোহার ব্যবহারের সঙ্গে 'মেগালিথ' বা মহাশ্মীয় সমাধি প্রথা ঘনিষ্ঠভাবে সম্পর্কিত। মেগালিথ বা মহাশ্ম প্রাগৈতিহাসিক কালের বিভিন্ন ধরনের স্মৃতিসৌধ যা বড়ো পাথরের চাঁই দিয়ে তৈরি হত। প্রস্তরনির্মিত এই ধরনের স্মৃতিসৌধ ও সমাধিক্ষেত্র পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে (এশিয়া, ইউরোপ, আফ্রিকা এবং মধ্য ও দক্ষিণ আমেরিকা) পাওয়া গেছে। ভারতীয় উপমহাদেশে এই ধরনের মহাশ্মীয় সমাধিক্ষেত্র দাক্ষিণাত্যের মালভূমির সুদূর দক্ষিণে এবং উত্তর-পশ্চিম ভারতে পাওয়া গেছে। মেগালিথ বানানোর রীতি ভারতের বিভিন্ন উপজাতি গোষ্ঠীর মধ্যে রয়েছে যেমন অসমের খালি এবং ছোটোনাগপুরের মুক্তাদের মধ্যে।

মহাশ্মীয় সংস্কৃতি বা 'megalithic culture' বলতে মহাশ্মের স্থানে বিশেষত সমাধি ক্ষেত্রে এবং বসতি ক্ষেত্রে এবং বসতিস্থলে প্রাপ্ত সাংস্কৃতিক অবশেষকে বোঝায়। এক সময় মহাশ্মীয় সংস্কৃতিকে একটি সমজাতীয় স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যপূর্ণ সংস্কৃতি ভাবা হত। এই মত এখন বর্জিত হয়েছে। এই সাংস্কৃতিক অবশেষের নানাবিধ গুরুত্বপূর্ণ বৈচিত্র্যের কথা মাথায় রেখে পণ্ডিতরা এখন থেকে একে 'megalithic cultures' বলেন অর্থাৎ একবচনার্থে নয় বহুবচনার্থে ব্যবহার করেন। 'megaliths' বা মহাপ্রস্তরগুলির মধ্যে বিভিন্ন সময়ে

বিভিন্ন স্থানে সমাধির ধরন প্রতিফলিত হয়েছে যা বেশ কিছু কাল ধরে চলেছিল। এই সমাধিরীতির উৎস নব্যপ্রস্তর যুগ এবং তাম্র প্রস্তর যুগে রয়েছে। উদাহরণস্বরূপ বলা যায় গর্ত সমাধি বা পিট ব্যারিয়াল এবং বরফ কবরী বা ভস্মাধার সমাধি 'urn burial' দক্ষিণ ভারতের নব্যপ্রস্তর ও তাম্রপ্রস্তর যুগের উচ্চস্তরে জরয়ে (Jorue) পর্যায়ে পাওয়া গেছে। এই সমাধিরীতি ইমানাগাওয়ে পাওয়া গেছে। মহাশ্মীয় কক্ষসমাধি এই সমাধি সংস্কৃতির এক নব পর্যায়।

এ. সুন্দরা তাঁর ''The Early Chamber Tombs of South India" শীর্ষক গ্রন্থে প্রধানত তিন ধরনের মহাশ্মীয় সমাধির কথা বলেছেন। এগুলি হল কক্ষ সমাধি, কক্ষহীন সমাধি এবং সমাধি সম্পর্কিত মহাশ্ম। কক্ষ সমাধি (বিভিন্ন আকৃতি ও আয়তনের)। সাধারণত দুটি বা চারটি দন্ডায়মান প্রস্তরখন্ডের উপর একটা চ্যাপ্টা পাথরবা টুপি পাথর চাপিয়ে তৈরি হত। এক কক্ষবিশিষ্ট সমাধিগুলি মাটির ভিতরে হলে এগুলিকে সিস্ট (cist) বা কন্দর কক্ষ সমাধি বলা হত। এই কক্ষ সমাধি অংশত মাটির ভিতরে থাকলে এগুলিকে (dolmenis cist) বা প্রস্তর টেবিলসদৃশ বন্দর কক্ষ বলা হত। সম্পূর্ণ মাটির উপর খাড়া পাথরের উপর চ্যাপ্টা পাহতর বসিয়ে প্রস্তুত টেবিলসদৃশ সমাধিকে ডলমেন (dolmen) বলা হত। কখ সমাধির মধ্যে কোনটির আবার গর্ত থাকত, সাধারণত দন্ডায়মান যে কোনো একটি পাথরের ভিতর। এই গর্তকে 'পর্ট হোল' (Port Hole) বলা হত। অপরিসর হলেলো কক্ষে পৌঁছনোর জন্য জায়গা থাকত। কখনও কখনও কক্ষগুলি দন্ডায়মান পাথর দিয়ে বিভিন্ন অংশে ভাগ করা হত। এগুলিকে ট্রানসেপ্টস্ (transepts) বলা হত। কখবিশিষ্ট সমাধিগুলির মধ্যে ছিল 'টোপিকাল' বা টুপিসদৃশ প্রস্তর সমাধি এবং কুডাইকাল বা ছাতা সদৃশ প্রস্তর সমাধি। এবং কুডাইকাল বা ছাতাসদৃশ প্রস্তর সমাধি। এই ধরনের দন্ডায়মান পাথরের সমাধিগুলিতে ভস্মাধার সমাধিস্থ করা হত মাটির ভিতরে গর্ত করে এবং তা ঢাকা হত অনুচ্চ, উত্তল, বৃত্তাকার টুপি পাথর দিয়ে। কুদাইকানাল বা ছাতাসদৃশ প্রস্তর সমাধির ক্ষেত্রে ভস্মাধার রাখা হত খাড়া পাথরের ওপর অর্ধগোলাকার টুপিপাথর চাপিয়ে গড়া কক্ষের ভিতরে।

অকক্ষবিশিষ্ট সমাধি ফলকগুলি ছিল তিন ধরনের — গর্ত সমাধি বা 'Pit burials', ভস্মাধার সমাধি বা 'urn burials' এবং ভাস্কর্যমন্ডিত সমাধি বা 'Sacrophagus burials'। গর্ত সমাধির ক্ষেত্রে অন্ত্যেষ্টি-সংক্রান্ত সামগ্রী গর্তে সমাধিস্থ করা হত। এর উপর বড় পাথরের স্তুপ নির্মিত হত। এই পাথরের শিলাস্তুপকে cairn বলা যায়। যদি এই সমাধিকক্ষকে বৃত্তাকার পাথর ও শিলাস্তূপ থেকে তাহলে একে শিলাস্তূপ বৃত্ত বা (Cairn store circle) বলে। যদি কোনও গর্ত সমাধি একটি বৃহৎ দন্ডায়মান পাথর দ্বারা চিহ্নিত হত তাহলে একে 'মেনেহর(মেনহির) বা দণ্ডায়মান শিলাসমাধি বলা হয়। আর সার্কোফোগাস ব্যারিয়েল (Sacrophagus burial) বা ভাস্কর্য শোভিত বা লিপি খচিত পাথরের শবাধার হল পায়া ও ঢাকনা দেওয়া পোড়া মাটির শবাধার যার মধ্যে অন্ত্যেষ্টির সামগ্রী রাখা হত। ভস্মাধার সমাধির ক্ষেত্রে একটি বড়ো পাত্রে অন্ত্যেষ্টির সামগ্রী রাখা হত, যার মুখটি একটি প্রস্তরখণ্ড দিয়ে ঢাকা থাকত। ভস্মাধার সমাধি ও ভাস্কর্য শোভিত সমাধি প্রায়শই মহাশ্মীয় সমাধির মধ্যে গণ্য হয়, যদিও এগুলি মহাশ্মীয় ঐতিহ্যের সঙ্গে সম্পর্কিত হলেও এগুলির বিশেষত্ব ও গুরুত্ব আমাদের কাছে স্পষ্ট নয়।

মহাশ্মীয় সমাধির আকৃতি ও আয়তন যত সহজে বলা সম্ভব, তত সহজে এই নির্মাণের মধ্য দিয়ে তাদের ধর্মবিশ্বাসের ব্যাখ্যা দেওয়া সম্ভব নয়। তবে একথা অনস্বীকার্য যে, এই সমাধি কাঠামোগুলির সেই মানুষগুলির জীবনে ও বিশ্বাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। নব্য প্রাস্তর যুগ ও তাম্র প্রস্তর যুগের সমাধিগুলির সঙ্গে মহাশ্মীয়

সমাধির তুলনা করলে প্রথোমোক্তদের ক্ষেত্রে দেখা যায় বসতি এলাকায় বা বাসস্থানেই সমাধির অস্তিত্ব রয়েছে। কিন্তু মহাশ্মীয় সমাধির ক্ষেত্রে আমরা দেখি বাসস্থান আর সমাধিস্থল জীবন্ত ও মৃতের পৃথক ক্ষেত্রের এই বিষয়টি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কারণ এর মাধ্যমে সামাজিক সংগঠনে পরিবর্তনের ইঙ্গিত পাওয়া যায়। এর মাধ্যমে আমরা সামাজিক উত্তরণের ছবি পাই। দক্ষিণ ভারতে মহাশ্মীয় সমাধিগুলি থেকে পাওয়া লৌহ সামগ্রী লৌহ যুগের সূচনার কথা বলে। সমাধিস্থল থেকে পাওয়া লোহার জিনিসগুলির মধ্যে আছে বর্ষার ফলা, তিরের ফলা, কাস্তে, ত্রিশূল, হাঁসুলি, তরবারি, তেপায়া প্রদীপ ইত্যাদি। এসব ছাড়া সমাধিতে পাওয়া গেছে কালো ও লাল রঙের মৃৎপাত্র, পাথর ও পোড়ামাটির (টেরাকোটার) সামগ্রী। দক্ষিণ ভারতের মহাশ্মীয় সমাধিক্ষেত্রেগুলি হল কর্ণাটকের ব্রহ্মগিরি, জাদিগেনহল্লি, মাস্কি, হনামসাগর, তারদালহালাঙ্গলি, টি, নারসিপুর এবং হাল্লুর; তামিলনাড়ুর সানুর, আদিচানাল্লুর, অমৃতমঙ্গলম, কুন্নাত্তুর, বাসুদেবনাল্লুর, তেনকাশি, কারকাই, করাল কালুগুমালাই, পেরুমলমলাই, পুদুক্কোটাই, তিরুক্কমপুলিয়ার এবং অদুগতুরল কেরালার পুলিমাত্তু, তেঙ্গাক্কল, চেনকোট্টা, মুখুকর, পেরিয়াকানাল, মাচাদ, পাকায়ান্নুর এবং মঙ্গাদু। ১৯৮৫ সালে কর্ণাটকের হাল্লুরে উতখননের পরই প্রথম জানা যায় যে মহাশ্মীয় সংস্কৃতির সাথে লোহার আদি ব্যবহারের সংযোগ রয়েছে। রেডিও কার্বন পদ্ধতিতে জানা যায় যে হাল্লুরে লোহার আবির্ভাব ঘটেছিল ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বে। হস্তনির্মিত বস্তুর সাংকেতিক বৈশিষ্ট্যের উপর ভিত্তি করে মাচাঁদ এবং পাঝায়ান্নুরকে খ্রীষ্টপূর্ব দ্বিতীয় শতক থেকে খ্রিষ্টিয় দ্বিতীয় শতকের মহাশ্মীয় সমাধি ধরা হয়। কেরালার কোল্লাম জেলার মজাদু মহাশ্মের (মেগালিথের) সময়কাল আনুমানিক ১০০০-১০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ পর্যন্ত পরিব্যপ্ত। রেডিয়ো কার্বন পদ্ধতিতে কর্ণাটকের ব্রহ্মগিরি, মাস্কি, হনামসাগর, তারদালহালাঙ্গলি, হাল্লুর প্রভৃতি গুরুত্বপূর্ণ মেগালিথের নিদর্শনগুলির সময়কাল ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দ ধার্য হয়েছে। অন্ধ্রপ্রদেশের কদম্বপুর, নাগার্জুনকোন্ডা, ইয়েলেস্বরম, ব্রাপ্পলি, তাড়পত্রি, মীরাপুরম এবং অমরাবতী মেগালিথের উল্লেখযোগ্য ক্ষেত্র। মহারাষ্ট্রের জনাপানি ও খাপায় মেগালিথের নিদর্শন পাওয়া গেছে।

দক্ষিণ-ভারতের মেগালিথ বা মহাশ্মীয় সমাধিগুলিতে প্রাগৈতিহাসিক যুগ থেকে গ্রামীণ সমাজের উত্তরনের ছবি পাই। এত বিশাল সময় ও স্থান জুড়ে এই সংস্কৃতি বিস্তৃত হওয়ায় এর মধ্যে বৈচিত্র্যময় জীবনধারার প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। তবে তার মধ্যে লৌহযুগের সূচনা এবং কালো ও লাল মৃৎপাত্রের সংস্কৃতি একটি প্রধান বৈশিষ্ট্যরূপে প্রতিভাত হয়। কৃষ্ণ ও লোহিত মৃৎপাত্রের সঙ্গে মেগালিথ বা মহাশ্মের এই সংযোগ আমরা শ্রীলঙ্কাতেও দেখতে পাই। মেগালিথ বা মহাশ্মের কতগুলি ধরনের সাথে কিছু অঞ্চলের নাম জড়িয়ে আছে — কোদাইকাল ও টোপিকালিএর সাথে কেরালা ও কর্ণাটকের নাম এবং 'মেনহির'-এর সাথে কেরালা, অন্ধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটকের নাম জড়িয়ে আছে। প্রথমে মহাশ্মীয় ক্ষেত্রেগুলিকে যাযাবর পশুপালকদের বসতি বলে মনে করা হত, কিন্তু দক্ষিণ ভারতে আদি লৌহ যুগের প্রমাণ মেলায় বোঝা যায় তারা কৃষি, পশু শিকার, পশু পালন, মৎস্য শিকার — এই ধরণের জীবনযাত্রায় অভ্যস্ত ছিল। শুধু তাই নয়, তখনকার মানুষ হস্তশিল্পেও দক্ষ ছিল। কৃষিকাজের মধ্যে তারা বিভিন্ন ধরনের শস্য, মিলেট, বিভিন্ন ধরনের ডাল, রাগি উৎপাদন করত। কর্ণাটকের কুর্গ ও খাপায় ধানের তুষ পাওয়া গেছে এবং হাল্লুরে পাওয়া গেছে পোড়া রাগি, তামিলনাড়ুর বুরাত্তুরে চাল পাওয়া গেছে। শস্য উৎপাদনে এই আঞ্চলিক বৈচিত্র্য লক্ষ করা গেছে। কয়েকটি মহাশ্মীয় ক্ষেত্রে মুঘল ও শস্য পেষাই করার পাথর পাওয়া গেছে — যেমন, কেরালার মাচাদে গ্রানাইটের পেষাই-পাথর পাওয়া গেছে।

কিছু চিত্রকলা ও ক্ষুদ্র প্রস্তর মূর্তি থেকে আমরা সেই স্ময়কার মানুষজনের গ্রাসাচ্ছাদনের ও জীবনযাত্রা সম্পর্কে ধারণা করতে পারি। যেমন কেরালার মায়ায়ূর এবং অট্টালায় শিকারের দৃশ্য। কর্ণাটকের হিরেবেঙ্কলে

আমরা দেখতে পাই শিকারের দৃশ্য, যেখানের রয়েছে ময়ুরী, ময়ুর, হরীণ, কৃষ্ণসার মৃগ এবং নৃত্যরত মানুষের দল। সমাধিগুলিতে প্রাপ্ত বন্য ও পোষা প্রাণীর হাড় থেকে আমরা তাদের পশুশিকার ও পশুপালনের জীবনের ছবি পাই। পালিত পশুর মধ্যে গবাদি পশুই ছিল প্রধান। এই পর্যায়ের মানুষের জীবনযাত্রায় আদি নব্যপ্রস্তর ও তাম্র প্রস্তর যুগের মানুষের জীবনযাত্রার ধারাবাহিকতারই প্রতিফলন লক্ষ করা যায়। তামিলনাড়ুর কিছু মহাশ্মীয় সমাধি ক্ষেত্রে আমরা মাছ ধরার বঁড়শি পেয়েছি। আগেই বলা হয়েছে যে দক্ষিণ ভারতের মহাশ্মীয় সমাধিক্ষেত্রগুলি থেকে আমরা উন্নত বিশেষীকৃত হস্তশীল্পের ঐতিহ্যের প্রমাণ পাই। বিভিন্ন ধরনের মৃৎপাত্র বিশেষত কালো ও লাল রঙের মৃতপাত্রগুলি এই উন্নত হস্তশিল্পের সাক্ষ্য বহন করে। কিছু মৃৎপাত্র ছিল ঢাকনাসহ এবং বিভিন্ন পাখি ও পশুর আকৃতির। এই ধরনের মৃতপাত্রগুলিনিঃসন্দেহে উতসব-অনুষ্ঠানে ব্যভৃত হত। সমাধিস্থ করার সামগ্রীর মধ্যে কর্নেলিয়ন পুঁতি (carnelian beads) এবং অন্যবস্তু দিয়ে গড়া পুঁতিও পাওয়া গেছে। এর সাথে তামা ও ব্রোঞ্জের বাসন-কোসন, বালা এবং কিছু রূপা ও সোনার অলংকারও পাওয়া গেছে। এ ছাড়া লোহার তৈরি আনাবিধ কৃষি সরঞ্জাম তো ছিলই। ধাতু দিয়ে গড়া হস্তশিল্পের জন্য তারা ধাতু গলানোর কৌশল আয়ত্ত করেছিল। কিছু তামা ও ব্রোঞ্জের সামগ্রী স্পষ্টই তারা ছাঁচে বানাত অন্যগুলিকে হাতুড়ি দিয়ে পিটিয়ে বিভিন্ন আকার দেওয়া হত। কিছু মহাশ্মীয় ক্ষেত্র শুধু হস্তশিল্পের কেন্দ্রি ছিল না, হস্তশিল্প উতপাদনের সঙ্গে সেখানে বিনিময়ের সংযোগ গড়ে উঠেছিল। কিছু মহাশ্মীয় ক্ষেত্রে আমরা যে গুহাচিত্র পাই তাতে লড়াইয়ের দৃশ্য ও পশু লুঠ এবং শিকারের দৃশ্য পাই।

মেগালিথ বা মহাশ্মগুলি অবশ্যই সম্প্রদায় বা গোষ্ঠীর দলবদ্ধ প্রয়াসের ফল। এখানেই আমরা তাদের গোষ্ঠীবদ্ধ তথা সামাজিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের ছবি পাই। এই মহাশ্মীয় স্মৃতি সৌধগুলি অবশ্যই সেই যুগের মানুষের অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার ক্ষেত্র ছিল যা তাদের সামাজিক ও অর্থনৈতিক জীবনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। মহাশ্মীয় সম্প্রদায়ের ওপর সাম্প্রতিক কালের জাতিতত্ত্ব বিষয়ক গবেষণায় প্রতিভাত হয় যে এই ধরনের স্মৃতিসৌধগুলি সম্ভবত পার্বন বার্ষিক উৎসব-অনুষ্ঠান, উপহার বিনিময় এবং মৈত্রীর সম্পর্ক গড়ার সঙ্গে সম্পর্কিত ছিল। দক্ষিণ ভারতের এই সমাধিক্ষেত্রগুলিতে লোহার উন্নত কৃষি সরঞ্জাম প্রাপ্তি যেমন হস্তশিল্পের উন্নতির সাক্ষ্য বহন করে তেমনি বেশ কয়েকটি ক্ষেত্র বাণীজ্যিক বিনিময়ের কেন্দ্র হিসাবে আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে আলাদা গুরুত্ব পায়। এইভাবে মহাশ্মীয় ক্ষেত্রগুলি বিভিন্ন অঞ্চলে বিভিন্ন ঐতিহাসিক সন্ধিক্ষণের ও বাস্তবতার প্রতিফলন ঘটিয়ে দক্ষিণ এশিয়ার ইতিহাসে এক বর্ণময় অধ্যায়ের সূচনা করে।

১৯.৫ মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের সাংস্কৃতিক রূপান্তর

খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০—খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দের মধ্যভারতের ও দাক্ষিণাত্যের সাংস্কৃতিক জীবনের পরিবর্তনের ধারাকে অনুধাবন করতে হলে দুটি দিক থেকে বিষয়টিকে দেখতে হবে। একটি হল প্রাক-লৌহ পর্ব বা বলা ভাল তাম্রাশ্মীয় পর্বের সংস্কৃতি ও লৌহ সংস্কৃতি। কারণ আমাদের মনে রাখতে হবে হঠাৎ করে লৌহ সংস্কৃতির আবির্ভাব হয়নি। তাম্র-ব্রোঞ্জ সংস্কৃতি থেকে লৌহ সংস্কৃতির স্তরে পৌঁছনোর মধ্যবর্তী একটি উত্তরণ পর্ব দেখা গিয়েছিল। যে পর্বে তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগীয় বৈশিষ্ট্য ও লৌহ যুগীয় বৈশিষ্ট্য—এই দুইয়ের সহবস্থান দেখা যায়। মধ্যভারতের ক্ষেত্রে এ প্রসঙ্গে তিনটি সংস্কৃতির —কায়থা, আহার ও মালওয়া সংস্কৃতি- কথা ও দাক্ষিণাত্যের ক্ষেত্রে জোরউই সংস্কৃতির কথা উল্লেখ্য।

১৯.৫.১ প্রাক-লৌহ পর্বঃ

বানাস (চম্বলের একটি উপনদী) উপত্যকার মুখে দক্ষিণমধ্য রাজস্থানে অবস্থিত আহার হলো বানাস সংস্কৃতির আদর্শ নমুনা হিসেবে পরিচিতি এক সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র। কার্বন নির্ণয় তারিখে দেখা গেছে যে, এ সভ্যতার সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০ থেকে ১৩০০। (বালাথালের সময়কালের প্রসার খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০০-২০০০ ক্যা)। এই সংস্কৃতির বিশিষ্ট মৃৎশিল্প হলো লালকালো বাণিজ্যপণ্য, এবং তার গায়ে সাদা রেখাঙ্কিত অলঙ্করণ। আহারে কাজের হাতিয়ার নির্মাণের একমাত্র একমাত্র উপাদান হল তামা এবং সেখানে তামা বিগলনের প্রমাণও রয়েছে। নিকটেই রাজপুর দরিপ-র মতো অনেক তামার খনি রয়েছে, কার্বন নির্ণয় পদ্ধতি তাদের সময়কাল এর প্রসারতা হলো খ্রীষ্টপূর্ব ১৫৪৫-১১০০। তবুও মনে হয়, গিলুন্দ ও ছোট্ট একটি পাথরের শিল্প ছিল; অতএব পাথরের হাতিয়ারও অবশ্যই ব্যবহৃত হতো। বালাথলে পাওয়া প্রমাণ থেকে বোঝা যায়, গম, বার্লি, সাধারণ এবং foxtail ভুট্টা (চীনা এবং কৌন), কালো এবং সবুজ ছোলা, শুঁটি এবং তৈলবীজ, এইসব খাদ্যশস্য খ্রীষ্টপূর্ব ১৩০০ সালের পূর্বে, কৃষি কাজের তালিকায় যুক্ত হয়েছে। আবার আহার-এ ধান এবং ভুট্টার (জোয়ার এবং বাজরা) প্রমাণ পাওয়া গেছে ভাঙ্গা মৃৎপাত্রে। কোনোটিই খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০- এর পূর্বে দৃশ্যমান হয়নি। অবশ্য ধানই একমাত্র এর ব্যতিক্রম যেটি আরও পূর্বেকার খাদ্যশস্য। পাথর এবং কাদামাটির ইট, তারই সঙ্গে মাটি এবং তালপাতা, এসবই গৃহ নির্মাণে ব্যবহার হতো।

আরও দক্ষিণে, মালওয়া, (পশ্চিমী মধ্য প্রদেশ) উচ্চ চম্বল উপত্যকায় কায়াথাতে একটি সংস্কৃতি আবিষ্কৃত হয়েছে। কার্বন কাল নির্ণয় পদ্ধতিতে এর সময়কাল নির্ধারিত হয়েছে খ্রীষ্টপূর্ব ২৪০০-২১০০। এর মৃৎশিল্প বেশ আদিম (৮৫ শতাংশ হাতে গড়া) এছাড়া এটি তাম্র প্রস্তর যুগের; অসংখ্য তামার পণ্য সামগ্রী পাওয়া গেছে এখানে। কর্নেলিয়ান এবং অকীক পুঁতি ও স্টিয়াটাইট পুঁতিতে পূর্ণ পাত্র গুলি সম্ভবত স্থানীয় প্রশস্তি নয়, সিন্ধু এলাকা থেকে আমদানি করে আনা। পরবর্তীকালে কায়াথায় একটি 'বানাস দশা' (খ্রীষ্টপূর্ব ২১০০-১৮০০) দেখা গেল যেখানে বানাস মৃৎশিল্প আবির্ভূত হলো; সেই সময়কালের পোড়ামাটির মূর্তি থেকে অনুমান করা যায় যে, ষাঁড়-সংক্রান্ত ধর্মীয় রীতি সেখানে উপস্থিত ছিল।

খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০ সময়কালের পর পশ্চিম মধ্যপ্রদেশের অনেক অঞ্চল এবং মহারাষ্ট্রের বিশাল অংশ জুড়ে বিস্তৃত একটি প্রধান তাম্রপ্রস্তর যুগের সভ্যতার সন্ধান মেলে যেটির নাম দেওয়া হয় মালওয়া সংস্কৃতি। বিশাল এলাকায় বিস্তৃত এর ক্ষেত্রটি মহারাষ্ট্রের ইনামগাও থেকে শুরু হয়ে একটু বেঁকে উত্তর দিকে নর্মদার তীরে নাভদাটোলিকে স্পর্শ করে আরও উত্তরপূর্ব মুখে অগ্রসর হয়ে মধ্যপ্রদেশের এরান এবং ত্রিপুরী পর্যন্ত বিস্তৃত ছিল। মহারাষ্ট্রের সাভালদা সংস্কৃতি যেটি কিছু তামার যন্ত্রপাতি এবং ধীর গতি সম্পন্ন চাকে নির্মিত মৃৎশিল্প সহ নিশ্চিতরূপে একটি নব্যপ্রস্তর যুগের সভ্যতা (খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০-১৪০০), তারই উত্তরসূরী, এই মালওয়া সংস্কৃতি। এতএব মধ্যপ্রদেশে মালওয়া সংস্কৃতির সময়কাল (প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ২০০০-১৪০০) মহারাষ্ট্রের সময়কালের পূর্বেকার (প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ১৮০০-১৪০০)।

মালওয়া সংস্কৃতির এলাকায় উপায় মরসুমের ফসলই উৎপাদিত হতঃ গম, বার্লি, মসূর, ধান (পরবর্তীকালের সংযোজন), রাগি, বিন, ঘাস-শুটি কালো, সবুজ এবং আর তিসি। ইনামগাঁও ছাড়া কোথাও মহারাষ্ট্র চাল উৎপাদিত হতো না আর সেখানেও এই শস্যটি পরবর্তীকালে জোরউই সংস্কৃতির সংযোজন। কার্পাসের কোন চিহ্ন পাওয়া যায়নি। কিন্তু ছিদ্রযুক্ত মাটির থালা বেশ প্রচুর পরিমাণে পাওয়া যায় আর তার সঙ্গে যখন চোখে

পড়ে খেলনা নয় আসল তকলি তখন আমরা অবশ্যই আশা করতে পারি যে, কার্পাস চাষ অবশ্যই হত। বিশিষ্ট মালওয়া মৃৎশিল্প চাকে নির্মিত লালকালো বর্ণের, এর গড়ন এবং নকশায় বিপুল বৈচিত্র্য চোখে পড়ে। চিত্রিত অলঙ্করণের মূলত জ্যামিতিক আকার এবং পশু, কখনো সখনো মনুষ্যমূর্তি। নাভদাটোলিতে আবিষ্কৃত নল লাগানো ডেকচি সম্ভবত এশিয়ার অনুপ্রেরণায় নির্মিত কিন্তু নলাকার পার্শমুখওয়ালা সেরামিকের পাত্র (লোটা) পাওয়া গেছে ইনামগাঁও-এ। এই ধরনের পাত্রের মধ্যে এটি প্রাচীনতম এবং সম্ভবত দেশীয়। এরই সম্ভাব্য আকারের একটি প্রাচীনতম হাতে তৈরি ধূসর রঙের পাত্র দক্ষিণ ভারতের নব্য প্রস্তর সংস্কৃতির একটি অঞ্চল টেক্কালাকোটায় পাওয়া গেছে এমন তথ্য রয়েছে। ইনামগাঁও ও দৈমাবাদের বাড়িগুলি সাধারণত আয়তকার, নিচু কাদামাটির দেওয়ালে নির্মিত এবং মাথার ওপরে মাটির আস্তর-দেওয়া তালপাতার ছাউনি। খননকার্যে আবিষ্কৃত একটি মন্দিরের মত বাড়ির ঢিবিতে অগ্নিকুণ্ড এবং পোড়া শস্যদানা পাওয়া গেছে। কোন মৃতদেহের কলসাকার মৃৎপাত্রে বা গর্তে সমাধিস্থ কয়েকটি মৃতদেহের সঙ্গে স্টিয়াটাইট, চীনামাটি এবং অন্যান্য উপাদানের পুঁতি পাওয়া গেছে।

এবার দাক্ষিণাত্যের দিকে চোখ ফেরানো যাক। মহারাষ্ট্রে মোটামুটি ১৪০০ খ্রীষ্টপূর্ব নাগাদ মালওয়া সংস্কৃতির স্থান অধিকার করে জোরউই সংস্কৃতি। সেটি প্রায় খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ পর্যন্ত বিকশিত হয়, তারপর ক্রমশ ক্ষয় পেতে থাকে। সমগ্র মহারাষ্ট্র জুড়ে এই সংস্কৃতির ২০০টি প্রত্নস্থান আবিষ্কৃত হয়েছে, যদিও বিদর্ভ এবং উপকূলবর্তী অঞ্চলে একটি প্রত্নস্থানও পাওয়া যায়নি। উত্তরের তাপি অববাহিকাতেই বসতির ঘনত্ব সর্বাধি।

জোরউই সংস্কৃতিতে কৃষিকাজ এবং জনসংখ্যার তাৎপর্যময় প্রসার লক্ষ করা যায়। লাঙলের ব্যবহার সম্ভবত এর অন্যতম একটি কারণ। অবশ্য এর কোনো প্রকৃত প্রমাণ মেলেনি। কিন্তু শিলালিপিতে উৎকীর্ণ ষাঁড়ে টানা গাড়ির রেখাচিত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী, কোন কিছু টানার জন্য কুঁজওয়ালা ষাঁড় (জেবু) ব্যবহৃত হত, এ সিদ্ধান্তের বৈধতা স্বীকার করা চলে। প্রধান উৎপাদিত খাদ্যশস্য যব, তবে গমও উৎপন্ন হতো। নতুন আবির্ভাবেই ধান তখন যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ হয়ে উঠেছে। ভুট্টার মধ্যে জোয়ার এবং রাগি এই দুই ধরনের বীজ পাওয়া যায়। এর মধ্যে বাজরাও (হয়ত বা)ছিল। উৎপাদিত দানা শস্যের মধ্যে ছিল কুলখ কলাই, হায়াস্থিন বিন, মসূর, শুটি, ঘাস-শুটি এবং সবজে ছোলা (উর্দ)। কার্পাসের প্রমাণও পাওয়া গেছে। গৃহপালিত পশুদের মধ্যে ষাঁড় এবং ছাগল ভেড়াই প্রধান ছিল এবং খাদ্যের একাংশ থাকত এদের মাংস। জোড়উই যুগে দাক্ষিণাত্যের ইনামগাঁও তে সর্বপ্রথম ঘোড়ার উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়।

লালের ওপর কালো রং চিত্রিত মৃৎশিল্প এই সংস্কৃতির চারিত্রিক বৈশিষ্ট্য। ঘূর্ণমান চাকায় এগুলি তৈরি করা হত এবং এর কিছু নির্দিষ্ট আকার চোখে পড়ে যেমন, রঙিন (গোলাপী রঙের) বয়াম, ছিদ্রযুক্ত বয়াম আর উঁচু গলাওয়ালা গোলাকার পাত্র। তামা বিগলনের মান তখনো পুরোপুরি আদিম আর লোহার চিহ্ন মাত্র নেই। যথেষ্ট সংখ্যায় পাথরে হাতিয়ার ব্যবহার করা হতঃ নেভেসায়একটি 'পাথরের কুঠারের কারখানা' পাওয়া গেছে।

একটি রেশমের (বন্য) সুতো এবং সুতীর আবরণী পাওয়া গেছে নেভাসাতে। এছাড়া চান্দোলিতে পাওয়া গেছে একটি শনের দড়ি। এই সমস্ত সূতো সম্ভবত কাপড় বোনার কাজে লাগতো।

গাড়ি যে তখন ব্যবহৃত হতো তার দৃঢ় প্রমাণ মেলে ইনামগাঁও থেকে পাওয়া একটি বয়ামের ওপর খোদিত ষাঁড়ে টানা গাড়ির চিত্রে। দৈমাবাদের ব্রোঞ্জ সম্পর্কে যা অনুমান করা হয়, সেইমতো এটি যদি সিন্ধু

সভ্যতা সামগ্রী হয়ে থাকে তাহলে দক্ষিণাত্যে গাড়িও সিন্ধু সভ্যতার প্রভাবে এসেছিলে কথা মেনে নিতে হয়। ঘটনাচক্রে, বয়ামের নকশায় কিংবা জোরউই সংস্কৃতির প্রত্নস্থল গুলিতে পাওয়া পোড়া মাটির খেলনা-চাকায় স্পোকের কোন চিহ্ন মিলে না। গাড়ি নিশ্চয়ই স্থানীয় বাণিজ্যের পরিমাণ অনেকখানি বাড়িয়ে দিয়েছিল। তাছাড়া অরভল্লিস থেকে আসত তামা এবং কর্ণাটক থেকে সোনা। কাজেই ক্ষেত্রগুলির কিছু বাণিজ্যিক লেনদেনের সম্ভাবনা থেকেই যায়।

এইসব উন্নতির ফলে কিছু বসতি আকারে ছোট একটা গ্রামের চেয়ে অনেকটাই বড় হয়ে ওঠে। প্রায় তিরিশ হেক্টর এলাকা জুড়ে বিস্তৃত দৈমাবাদের জনসংখ্যা ছিল অন্ততপক্ষে ৬০০০। ভারতবর্ষে, সেই সময়ে আমাদের জানা সবচেয়ে বড় জনবসতি ছিল সেটি। সিন্ধুর শহরগুলির তুলনায় অবশ্য একে তখনো ছোট একটি শহর বলা চলে। তবে প্রকাশ আর ইনামগাও, এদের প্রত্যেকটি পাঁচ হেক্টর ক্ষেত্র জুড়ে বিস্তৃত ছিল।

মানুষজন আয়তাকার বাড়িতে বাস করত। প্রত্যেক বাড়ির চতুর্দিকে ছিল মাটির প্রাচীর। ডালপালায় নির্মিত মূল কাঠামোর ওপর মাটির আস্তর লাগানো হতো। প্রতিটি বারিতেই সংলগ্ন আঙিনা থাকত, যেটি গবাদিপশুর খোঁয়াড় হিসেবে ব্যবহৃত হতো। এছাড়া সেই আঙ্গিনায় পশুর মাংস ঝলসাবার জন্য উন্মুক্ত চুল্লী রাখা হতো।

ইনামগাঁও এর বহু কামরা সম্বলিত কাঠামোটিকে 'প্রধানের বাড়ি' হিসেবে চিহ্নিত করা হয়েছে। এর নিকটস্থ একটি কাদামাটির কাঠামো ছিল 'শস্যাগার'; যেখানে সম্ভবত প্রধানকে দেয় শস্যকর মজুত থাকতো। এই সামান্য কিছু প্রাথমিক সিদ্ধান্ত ছাড়া অনুমানে আর বেশি এগিয়ে যাওয়া কঠিন।

সাধারণত বাড়ির মেঝেতে ছড়ানো অবস্থায় মৃতদেহ সমাধিস্থ করা হতো আর শিশুদের দেহ কবর দেওয়া হতো কলাসাকার শবাধারে। মৃতের পায়ের পাতা গোড়ালি থেকে কেটে নেওয়া হতো। যাতে তারা এই পারিবারিক বাড়ি ছেড়ে অন্যত্র না যায় কিংবা প্রেতাত্মা হয়ে চারিদিকে ঘুরে বেড়ায় সে জন্য কি এমন করা হত? কাদামাটির প্রতিমূর্তি গুলিতে দুজন দেবীর কথা জানা যায়, একজনের মাথা রয়েছে আর অন্যজন মস্তকহীন। বস্তুত পুরুষ মূর্তি একেবারেই অনুপস্থিত।

জোরউই বসতির প্রধান স্থান গুলি ১০০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের পর ধ্বংস হতে শুরু করে। কেবলমাত্র ভিমা উপত্যকায় (ক্যা খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০-৭০০) একটি অধঃপতিত অন্তিম জোরউই সংস্কৃতি কিছুদিন অব্যাহত ছিল। অকস্মাৎ জমি অনুর্বর হয়ে যাওয়ার কারণে এমন ঘটেছিল বলে মনে করা হয়। কিন্তু এই সিদ্ধান্ত মেনে নেওয়া বেশ কঠিন। কেননা সামগ্রিকভাবে সর্বত্রই অনুর্বরতা দেখা দিয়েছিল সে সময়। সেক্ষেত্রে এর ফলে কেবল মহারাষ্ট্রেই যে কেন এমন বিধ্বংসী ফলাফল দেখা গেল অথচ অন্য এলাকায় তেমন কিছুই হলো না, তার কোনো বিশ্বাসযোগ্য কারণ খুঁজে পাওয়া যায় না।

জোরউই সংস্কৃতির ধ্রুপদী যুগে (খ্রীষ্টপূর্ব ১৫০০-১০০০) দীর্ঘ সময় ধরে টিকে থাকা দক্ষিণ ভারতের নব্যপ্রস্তর এলাকার সঙ্গে এই সংস্কৃতির বেশ ঘনিষ্ঠ যোগাযোগ ছিল। দক্ষিণ ভারতের ওই সংস্কৃতির ওপর জোরউই সংস্কৃতির অনেক প্রভাব চোখে পড়ে যেমন, তামার বহুল ব্যবহার, সেই সঙ্গে অনেক তাম্রসামগ্রী জোরউই সামগ্রীর আকারকে মনে করিয়ে দেয়; চাকে ঘোরানো পালিশ না করা চিত্রিত মৃৎশিল্প; শিশুদের কলসাকার শবাধারের মত এমন অনেক রীতি-রেওয়াজ। হালুরে পাওয়া (কর্ণাটক) অশ্বাস্থির সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব ১৩০০ অব্দ। এটি ইনামগাঁও-এর বাড়ির ঘোড়ার কথা স্মরণ করিয়ে দেয়। হালুর এবং তার পার্শবর্তী প্রত্নস্থান

কোমারানাহাল্লিতে, কার্বন এবং তাপোজ্জলন উভয় পদ্ধতিতে নির্মিত তারিখে বোঝা যায় যে, ১০০০ খ্রীষ্টপূর্ব নাগাদ এখানে লোহা এসে পৌঁছেছিল। জোরউই সংস্কৃতির এলাকাগুলোতে সোনা রপ্তানির সম্ভাব্যতা এ প্রসঙ্গে আগেই উল্লেখ করা হয়েছে; স্বর্ণখনির কাজ হত হাত্তিতে, কার্বন তারিখে এর সময়কাল খ্রীষ্টপূর্ব ৯০০-৭৪০ অব্দ। দক্ষিণ ভারতের সংস্কৃতিক অঞ্চলের সবচেয়ে দৃশ্যমান বৈশিষ্ট্য হলো বিশাল বিশাল প্রস্তরখণ্ডের ব্যবহার।

১৯.৫.২ লৌহ পর্ব

মধ্যভারতের তথা মালব অঞ্চল ও তাপ্তি নদী এলাকায় যে লৌহ যুগীয় সংস্কৃতির বিকাশ ঘটেছিল তার আনুমানিক সময়কাল ১০০০ খ্রীষ্ট পূর্বাব্দ বলে মনে করা হয়। এই অঞ্চলের মূল প্রত্নকেন্দ্রের মধ্যে নাগদা, এরান, প্রকাশ প্রভৃতি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। মালব সংস্কৃতিতে তাম্র-ব্রোঞ্জ সংস্কৃতির প্রাগ্রসর পর্বের মধ্যে দিয়ে বিশুদ্ধ লৌহ বিপ্লবে উত্তরণের সুস্পষ্ট চিত্র প্রতিফলিত হয়। এরান প্রত্নকেন্দ্রটি বীণা নদী দ্বারা তিন দিক থেকে বেষ্টিত এবং খাল দ্বারা চতুর্থ দিককে বেষ্টনের নিদর্শন মিলেছে। এখানে মূলত দুটি স্তর আবিষ্কৃত হয়েছে। মালব অঞ্চলের লৌহ সংস্কৃতির সঙ্গে সংযুই অবস্থায় পাওয়া গেছে কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্র। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, মধ্যপ্রদেশের একটা বড় অংশ জুড়ে লৌহ-নির্ভর মেগালিথের দেখা মেলে। যার মধ্যে অন্যতম হল ধানোরা, সোনাভির, করহিভাণ্ডারি, চিরাচোরি, তিমেলওয়াড়া ইত্যাদি।

দাক্ষিণাত্যের প্রাচীনতম লৌহ অবশেষ কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্র সংস্কৃতিপর্বভুক্ত এবং এদের বেশিরভাগই মেগালিথের সাথে সংযুক্ত। তবে এই যুগের সাংস্কৃতিক অবশেষ ও জোরউই সংস্কৃতির সম্পর্ক নিয়ে খানিকটা অস্পষ্টতা রয়েছে। এই পর্বের দাক্ষিণাত্যের অন্যতম কেন্দ্র হল প্রকাশ, নাগদার মতোই যে কেন্দ্রে এক ধরণের সাংস্কৃতিক নিরবচ্ছিন্নতা লক্ষ্য করা যায়। বিভিন্ন মেগালিথ সমাধি ও অন্যান্য বসতির অবশেষ থেকে লোহার বিভিন্ন সামগ্রী পাওয়া গেছে। এখানকার গুরুত্বপূর্ণ কেন্দ্রের মধ্যে -- তাকালঘাট-খাপা, নাইকুণ্ড, মহুরঝারি, বাঘিমোহারি, বরগাঁও, রঞ্জালা, জুনাপানি অন্যতম। এইসব বসতিতে কৃষিভিত্তিক বস্তুগত জীবনের ছবি ধরা পড়ে। নাইকুণ্ডতে মিলেছে লোহা নিশাষণের চুল্লী সহ একটি কর্মশালার ধ্বংসাবশেষ। মহুরঝারি ছিল একটি অন্যতম পুঁতি নির্মাণ কেন্দ্র, মেগালিথ পর্ব থেকে আদি ঐতিহাসিক পর্ব পর্যন্ত এই পুঁতি নির্মাণ কেন্দ্রের সক্রিয় উপস্থিতী নজরে পড়ে। মহুরঝারির বিভিন্ন সমাধিস্থলের অবশেষ যোদ্ধাদের সমাধি সংস্কৃতির দৃষ্টান্তও তুলে ধরে।

১৯.৬ উপসংহার

ভারতীয় উপমহাদেশের ইতিহাসে খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ অব্দের প্রধান তাৎপর্যই হল লৌহ যুগের আগমন। একথা ঠিক যে ভারতবর্ষের সর্বত্র একই সময়ে লৌহ সংস্কৃতির সূচনা হয় নি, তাম্রপ্রস্তর, তাম্র-ব্রোঞ্জ যুগ হয়ে লৌহ সংস্কৃতির যাত্রাপথে এক মধ্যবর্তী স্তর ছিল তাৎপর্যপূর্ণ। যে পর্যায়ে মৃৎপাত্রের বৈশিষ্ট্যগত পরিবর্তনের পাশাপাশি বস্তুগত সামগ্রিক পরিবর্তনেরও প্রতিফলন লক্ষ্য করা যায়। বিশেষত মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের সাংস্কৃতিক বিবর্তনের ছবিতে যা স্পষ্ট রূপে ধরা দেয়। সম্ভবত এখানেই আলোচ্য পর্বের ইতিহাসচর্চার সর্বাধিক তাৎপর্য নিহিত।

১৯.৭ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. টীকা লেখোঃ কৃষ্ণলোহিত মৃৎপাত্র।

২. টীকা লেখোঃ মেগালিথ।

৩. পুরাতত্ত্বের আলোকে খ্রীষ্টপূর্ব ১০০০ থেকে খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ অব্দের মধ্যে মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের সাংস্কৃতিক পরিবর্তনের চিত্র তুলে ধরো।

৪. মধ্যভারত ও দাক্ষিণাত্যের সাংস্কৃতিক জীবনযাত্রায় প্রাক-লৌহ ও লৌহ সংস্কৃতির কোনো রূপ ধারাবাহিকতা লক্ষ্য করা যায় কি?

১৯.৮ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

রণবীর চক্রবর্তী, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব(প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।

দিলীপকুমার চক্রবর্তী, ভারতবর্ষের প্রাগিতিহাস, আনন্দ, কলকাতা, ১৯৯৯।

ইরফান হাবিব, প্রাক-ইতিহাস, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০২।

ইরফান হাবিব, সিন্ধু সভ্যতা, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০৪।

ইরফান হাবিব ও বিজয় কুমার ঠাকুর, বৈদিক সভ্যতা, (ভাষান্তর কাবেরী বসু), এন বি এ, কলকাতা, ২০০৫।

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

অরুণিমা রায়চৌধুরী, প্রাগৈতিহাসিক ভারতবর্ষ- প্রস্তরযুগ থেকে লৌহযুগ, মিত্রম, কলকাতা, ২০০৮।

গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ), প্রথম খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

Upinder Singh– A History of Ancient and Early Medieval India– Pearson– 2009.

R.S. Sharma– India's Ancient Past– OUP– New Delhi– 2005.

Raymond Allchin and Bridget Allchin– The Rise of Civilization in India and Pakistan– CUP– 1982.

একক : ২০ ◘ তামিল অঞ্চল, খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০-৩০০ খ্রীষ্টাব্দ (Tamilakam– circa 300 BCE to CE 300)

গঠন

২০.০ উদ্দেশ্য

২০.১ সূচনা

২০.২ সঙ্গম যুগ

২০.২.১ সঙ্গম সাহিত্যের সময়কাল

২০.২.২ সঙ্গম সাহিত্যের প্রথম পর্যায়

২০.২.৩ সঙ্গম সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায়

২০.২.৪ সঙ্গম সাহিত্যের তৃতীয় পর্যায়

২০.৩ সঙ্গম সাহিত্যে প্রতিফলিত রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক জীবন

২০.৪ অন্যান্য তামিল গ্রন্থ

২০.৫ তামিলকম-ভৌগোলিক বিন্যাস

২০.৬ প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উপাদানে তামিলকম

২০.৭ বস্তুগত সংস্কৃতি

২০.৮ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি

২০.৯ উপসংহার

২০.১০ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

২০.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

২০.০ উদ্দেশ্য

- এই এককের উদ্দেশ্য হল ঐতিহাসিক প্রেক্ষিতে তামিল অঞ্চলের বিকাশ ব্যাখ্যা করা। সময়কালঃ ৩০০ খ্রীষ্ট পূর্ব থেকে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দ।
- প্রথমে অনুধাবন করা হবে সঙ্গম যুগ তথা সঙ্গম সাহিত্য ও তার বিভিন্ন পর্যায়।

- দ্বিতীয়ত, তামিলকমের ভৌগোলিক বিন্যাস ও প্রত্নতাত্ত্বিক এবং সাহিত্যিক উপাদানে তামিলকমের প্রতিফলন এই এককের আলোচ্য বিষয় রূপে বিবেচিত হবে।
- তৃতীয়ত, এই এককে আলোচনা করা হবে তামিলকমের রাজনৈতিক, সামাজিক ও বস্তুগত সংস্কৃতির বিকাশ।

২০.১ সূচনা

'তামিলকম' কথাটির অর্থ হল তামিলদের বাসভূমি। এর ভৌগোলিক ক্ষেত্র ও পরিসীমা প্রসঙ্গে প্রাচীন গ্রন্থে বলা আছে উত্তরে ভেঙ্কটস অর্থাৎ তিরুপতি পাহাড় থেকে দক্ষিণে কুমারু এবং পূর্ব ও পশ্চিমে সাগর। কুমারু বলতে কোমারো অন্তরীপ নয় ওই নামের একটি নদীকে বোঝানো হয়েছে যা ভারত মহাসাগরে বিলীন হয়েছে। প্রাচীন তামিলদের বসতভূমি তামিলকাম বলতে বোঝানো হয়েছে বর্তমান তামিলনাড়ু, কেরালা, পুদুচেরী, লাক্ষাদ্বীপ এবং অনধ্রপ্রদেশ ও কর্ণাটকের দক্ষিণভাগ। প্রাচীন ঐতিহ্য এবং তোলক্কাপ্পিয়ামে উপরোক্ত ভূমিখন্ডকে একটি সাংস্কৃতিক ক্ষেত্র হিসাবে বর্ণনা করা হয়েছে যেখানে তামিল-ই হল সেই অঞ্চলের মানুষের জাতীয় ভাষা ও সংস্কৃতি। প্রাচীন তামিল ভূমি কতগুলি রাজ্যে বিভক্ত ছিল। এর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল চের, রাজ্য, চোল রাজ্য, পাণ্ড্যরাজ্য এবং পল্লব রাজ্য। সঙ্গম যুগে তামিল সংস্কৃতি তামিলকামের বাইরে প্রসারিত হয়েছিল। তাই প্রাচীনকালে শ্রীলঙ্কায় এবং মালদ্বীপেও (গিরভারস) তামিল বসতি বিস্তৃত হয়। আদি পর্বের তামিল ইতিহাস রচনার প্রধান উৎসই হল সঙ্গম সাহিত্য। বস্তুত সঙ্গম সাহিত্যের আলোচনা ব্যতিরেকে তামিলকম-এর ইতিহাস রচনা কার্যত অসম্ভব। সঙ্গম সাহিত্যের সময়কাল দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে সঙ্গম যুগ' নামেও পরিচিত।

২০.২ সঙ্গম যুগ

দক্ষিণ ভারতের ইতিহাসে সঙ্গম যুগ এক গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায়। সমাজ, ভাষা ও সাহিত্য বিকাশের ইতিহাসে এই যুগ এক অবিস্মরণীয় প্রগতির সাক্ষ্য বহন করে। এই সময় শুধু তামিল সাহিত্যেরই অভূতপূর্ব বিকেশ ঘটেনি, সূচনা হয়েছিল আর্য ও স্থানীয় সংস্কৃতির মিলনে এক সমন্বিত সংস্কৃতির। এইভাবে দক্ষিণ ভারতের সাথে উত্তর ভারতের ভাবের সেতুবন্ধ রচিত হয়েছিল। সঙ্গম সাহিত্যের বর্ণাত্মক এবং শিক্ষামূলক তথা নীতিগত বিষয়বস্তুর মধ্য দিয়ে তামিল সমাজের বিবর্তনের এক সুন্দর ছবি ফুটে উঠেছিল।

সঙ্গম সাহিত্য বলতে দক্ষিণ ভারতের আদি তামিল সাহিত্য বোঝায়। এই সাহিত্যে বহু সংখ্যক তামিল কবির মিলিত কবিতা ও গান স্থান পেয়েছে। তামিল গীতিকবিদের এই কবিতা ও গান মুখে মুখে চলে আসছিল, পরে এগুলি সংকলিত হয়। প্রাচীন তামিল কবিদের এই রচনাগুলি পরে কবিপরিষদ আনুষ্ঠানিক স্বীকৃতি দান করে অর্থাৎ এই রচনাগুলি অনুমোদিত হয়। সঙ্গম শব্দটি দ্রাবিড় শব্দভাণ্ডার থেকে এসেছে যা গোষ্ঠী, সমাজ, পরিষদ অর্থেই ব্যবহৃত হয়েছে। তাই এখানে সঙ্গম বলতে কবিদের গোষ্ঠী, সমাজ বা পরিষদ বুঝিয়েছে। সঙ্গমসাহিত্য বস্তুত দ্রাবিড় ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত তামিল ভাষার কবিদের সাহিত্যকীর্তি। সঙ্গম যুগের কবিতাগুলি আমাদের সরাসরি একটি বিশেষ ভৌগোলিক ক্ষেত্র সম্পর্কে ধারণা দেয় যা তামিলকম নামে পরিচিত। তামিলকম শব্দটি বর্তমান তামিলনাড়ু রাজ্যের সমার্থক নয়। তামিলকমের ভৌগোলিক ক্ষেত্রে তামিল ও কেরালা রাজ্য ছাড়াও কর্ণাটকের কুর্গ অঞ্চল এবং অন্ধ্রপ্রদেশে চিত্তুর অঞ্চল অন্তর্ভুক্ত ছিল।

২০.২.১ সঙ্গম সাহিত্যের সময়কাল

সঙ্গম সাহিত্যকে সময়কাল দিক থেকে বিচার করলে দেখা যাবে এটি যুগ বিবর্তনের সাক্ষী। এখানে আমরা লৌহ যুগ থেকে আদি ঐতিহাসিক যুগের রূপান্তর দেখি। আদি ঐতিহাসিক যুগ বলতে আমরা পরবর্তী বৈদিক যুগ থেকে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের সময়কে বুঝি। সঙ্গম সাহিত্যের যুগ এক সহস্রাব্দ জুড়ে পরিব্যাপ্ত। ভারতে বিশেষত উত্তর ভারতে রাজনৈতিক দিক থেকে এ সময় — যে উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটে তা হল মহাজনপদের যুগ থেকে মৌর্যদের নেতৃত্বে সর্বভারতীয় সাম্রাজ্য উত্তরণ। এ ছাড়া দ্বিতীয় নগরায়ণ, মুদ্রা অর্থনীতি, ব্যবসাবাণিজ্যের বিকাশ এবং সামাজিক স্তরে দেখা যায় বর্ণ ও জাতি বিভাজন ইত্যাদি। তবে এই সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও সাংস্কৃতিক রূপান্তর সমগ্র ভারতীয় উপমহাদেশ জুড়ে একইসঙ্গে একইভাবে হয়নি। তাই এই রূপান্তর সমগোষ্ঠীর নয়, স্থান বিশেষে এই রূপান্তরে প্রভেদ ও বৈচিত্র্য ছিল। উত্তর ভারতের তুলনায় দক্ষিণ ভারতে নগরায়ণ ধীর গতিতে হয়, এখানে লৌহ প্রযুক্তি দীর্ঘ সময় ধরে চলে।

২০.২.২ সঙ্গম সাহিত্যের প্রথম পর্যায়

প্রখ্যাত তামিল ভাষ্যকার নক্কীরের সঙ্গম সাহিত্যের তিনটি পর্যায়ের কথা উল্লেখ করেছেন। প্রথম সঙ্গম তথা কবি পরিষদ আয়োজিত হয়েছিল প্রাচীন মাদুরাই শহরে যা সমুদ্রগর্ভে বিলীন হয়ে গেছে। এই কবি পরিষদে সভাপতিত্ব করেছিলেন মহামুনি অগস্ত্য। এই পরিষদের মোট সভ্য সদস্যসংখ্যা ছিল ৫৪৯। ৪৪৯৯ জন কবির কবিতা কবিসমাজ কর্তৃক অনুমোদিত। এই সঙ্গম তথা কবি পরিষদের পৃষ্ঠপোষণা করেছিলেন ৮৯ জন পান্ড্য রাজা। পান্ড্য রাজাদের মধ্যে ৯ জন কবি ছিলেন। এই কবি পরিষদ ৪৪০০ বছর স্থায়ী হয়েছিল বলে দাবি করা হয়। এই দাবি নিঃসন্দেহে অতিরঞ্জিত এবং অবাস্তব। এই পর্বের কবি পরিষদে অনুমোদিত কবিতা সংকলনের মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল অকত্তিয়ম, পারিপদাল, মৃদুনারেই, মৃদুকুরুকু ও কলারিআরিয়ৈ।

২০.২.৩ সঙ্গম সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্যায়

সঙ্গম সাহিত্যের দ্বিতীয় পর্ব অনুষ্ঠিত হয়েছিল কপাতপুরম বা অলৈবাই শহরে। এই শহরটিও সমুদ্রগর্ভে নিমজ্জিত হয়ে আছে। এই পর্বে সঙ্গমে ৪৯ জন সভ্য ছিলেন এবং অগস্ত্য, ইরন্দয়ুর কুরুঙ্গোলিমোসি ও বেল্লুরকাপিয়েনের মতো উজ্জ্বল ব্যক্তিত্ব এই পরিষদের সদস্য ছিলেন। এই সঙ্গমে ৩৭০০ কবির কবিতা অনুমোদিত হয়। সভার পৃষ্ঠপোষণা করেছিলেন ৫৯ জন পাণ্ড্য রাজা। এই পর্বে রচিত সংকলনগুলির মধ্যে অকত্তিয়ম, তোলকাপ্পিয়ম, ভূতপুরানম, কুলিক, বেন্দালি উল্লেখযোগ্য। এই গ্রন্থগুলির মধ্যে ব্যাকরণ গ্রন্থ তোলকাপ্পিয়াম ছাড়া বাকি সব গ্রন্থ বিনষ্ট হয়ে গেছে।

২০.২.৪ সঙ্গম সাহিত্যের তৃতীয় পর্যায়

তৃতীয় সঙ্গমের কবি পরিষদ অনুমোদিত হয়েছিল উত্তর মাদুরাই শহরে। এই কবি পরিষদ স্থায়ী হয়েছিল ১৮৫০ বছর। এই পরিষদে সভ্য সদস্য সংখ্যা ছিল ৪৯ জন, একই সংখ্যক পান্ড্য রাজা এই পরিষদের পৃষ্ঠপোষণা করেছিলেন। 'কুরুল' গ্রন্থ-খ্যাত তিরুবল্লবর তাঁর গ্রন্থের শেষের দিকে তৃতীয় সঙ্গমের সদস্যের নাম উল্লেখ করেছেন। এদের মধ্যে যাঁদের নাম বিশেষভাবে উল্লেখনীয় তাঁরা হলেন নক্করীর, ইরৈয়নার, কপিলর,

পরনর, শীত্তলৈ শাত্তনর এবং পান্ড্যরাজ উগ্র। অষ্টাদশ শতকের মধ্যভাগে এক তামিল ভাষ্যে বলা হয় তামিল কবিদের তিনটি সঙ্গমের মিলিত স্থায়ীত্বকাল ৯৯৯০ বছর এবং ৮৫৯৮ জন কবি এতে উপস্থিত হয়েছিল এবং ১৯৭ জন পান্ড্য রাজার পৃষ্ঠপোষণা লাভ করেছিল। উপরোক্ত তথ্য অতিরঞ্জিত ও অবাস্তব। রামশরণ শর্মা বলেছেন যে মোট কথা সঙ্গম সাহিত্য পাণ্ড্য রাজাদের পৃষ্ঠপোষণায় মাদুরাই শহরে অনুষ্ঠিত হয়েছিল।

২০.৩ সঙ্গম সাহিত্যে প্রতিফলিত রাজনৈতিক, আর্থ-সামাজিক জীবন

সঙ্গম সাহিত্যকে আমরা সাহিত্য প্রতিভার সচেতন প্রকাশ বলতে পারি না, এখানে গীতিকবি, চারণকবিদের স্বতঃস্ফূর্ত রচনা স্থান পেয়েছে। তাই কে. কৈলাশপথি বলেছেন সঙ্গম সাহিত্যে সচেতন সাহিত্য প্রয়াসের বিন্দুমাত্র প্রকাশের প্রমাণ নেই। ("not betraying the slightest evidence of any conscious literary endeavour") তাই এই কবিতাগুলির ভাষ্য, সাহিত্য রূপ এবং সামাজিক ও সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য প্রথম দিকের রচনাগুলির থেকে ভিন্নতর, বিশেষ করে দুই তামিল মহাকাব্য সিলপ্পাদিকরম এবং মনিমেখলাই-এর ভাষার ধরণ থেকে। এই দুই তামিল মহাকাব্যের রচনাকাল ধরা হয় ৫০০ থেকে ৬০০ খ্রিষ্টাব্দ। সঙ্গম যুগের রচনাগুলি বিশেষ করে মৌখিক রচনাগুলি পরবর্তীকালে পেরুন্তেভনর সংকলিত করেন। পেরুন্তেভনর অষ্টম শতকের মানুষ ছিলেন। এই রচনাগুলির চূড়ান্ত সংকলন ত্রয়োদশ ও চতুর্দশ শতক পর্যন্ত চলেছিল। তবে কবিদের সঙ্গমে সৃষ্ট সাহিত্যের কিছু অংশ খ্রীষ্টীয় দ্বিতীয় শতকের ছিল বলে মনে হয়। সঙ্গমসাহিত্যকে আমরা মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করতে পারি (১) কাহিনীমূলক সাহিত্য এবং শিক্ষামূলক বা নীতিগর্ভ সাহিত্য। কাহিনীমূলক সাহিত্যকে বলাহত 'মেলকন্নাক্কু' বা আঠারোটি প্রধান রচনা। এই আঠারোটি রচনার মধ্যে আটটি সংকলন এবং দশটি সরল বর্ণনামূলক ক্ষুদ্র কবিতা। আটটি ছোটো কবিতার সংকলন বা অষ্টসংকলন আসলে গীতি কবিতার সংকলন। এই সংকলনে চের রাজাদের বীরত্ব ও কীর্তির কথা বর্ণিত হলেও এগুলির সামাজিক গুরুত্বও ছিল। এই সংকলনে প্রেমের কবিতাও ছিল। মোট কথা এই পর্যায়ের রচনাগুলিতে সাহিত্যিক উৎকর্ষতার সাথে সাথে প্রাচীন তামিল সমাজজীবনের ছবিও ফুটে উঠেছে। শ্রীনিবাস আয়েঙ্গার সঙ্গম সাহিত্যে উপরোক্ত দুই ভাগের সঙ্গে আরও একটি ভাগের উল্লেখ করেছেন, এটি হল অষ্টাদশ নীতিমূলক কবিতার সংকলন বা পদিনেলকীলকনক্কু। কিন্তু সাহিত্য বিশেষজ্ঞরা এই অষ্টাদশ নীতিমূলক কবিতাগুলিকে সঙ্গম সাহিত্যের অন্তর্গত মনে করেন না। তাঁদের মতে সঙ্গম সাহিত্যের মূল ভাগ দুটি অংথুপাত্তু বা বর্ণনামূলক দটি কবিতা এবং এত্তুথোকৈ বা আটটি কবিতার সংকলন। যাই হোক অষ্টাদশ নীতিমূলক কবিতা গ্রন্থে তিরুবল্লুবরের বিখ্যাত 'কুরুল' কবিতা গ্রন্থও রয়েছে। এই কবিতা গ্রন্থে মানবজীবনের আশা-আকাঙ্ক্ষা আনন্দ-বেদনা, প্রেম, রাজনীতি, নীতিকথা সব ব্যক্ত হয়েছে।

সঙ্গম সাহিত্য নিয়ে সাম্প্রতিক কালের গবেষণা দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস সম্বন্ধে আমাদের ধারণাকে সমৃদ্ধ করেছে। এ বিষয়ে কে কৈলাশপথি, জি হার্ট, জেলবিল (Zvelbil), এম সি নারায়ণন, আর. চম্পকলক্ষী, রাজন গুরুককল, কে. আর. গণেশ এবং জি. সুব্বারাইয়া আলোকপাত করেছেন। এবিষয়ে স্মরণীয় বৈচিত্র্যময় সঙ্গম সাহিত্যে অকম বা অন্তরঙ্গ প্রেমের কবিতা এবং পুরম বা বহিরঙ্গের যুদ্ধের কবিতা বা বীরগাথা এই দুই ধারা স্পষ্ট। অন্তরঙ্গ প্রেমের কবিতায় সাত ধরনের প্রেমের কথা শোনা যায় যার মধ্যে পাঁচটি বৈধ বাকি দুটি অবৈধ। পুরম কবিতাও যুদ্ধকালীন পরিস্থিতিতে বীরের সাত ধরনের গুণের কথা বলা হয়েছে। এর মধ্যে পাঁচটি বিধিসম্মত, বাকি দুটি অনুমোদিত নয়। এই কবিতাগুলিতে বীরের বীরত্ব তারিফ করা হয়েছে, বিশেষ করে যুদ্ধে যদি বীরের মৃত্যু হয়। অকম ও পুরম বিষয়বস্তু আবার আরেক জায়গায় মিলিত হয়েছে, সেটি হল কবিতা

ও গানকে চিহ্নিত করার জন্য বা গানের বিষয়বস্তু জানার জন্য পাঁচটি বাহ্যিক পরিস্থিতি বা 'তিনাই'-এর প্রকারভেদ। সঙ্গম সাহিত্যের বিশাল অঙ্গনে তামিলকমের সামাজিক-রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক দৃশ্যপট সম্পর্কে যথাযথ ধারণার জন্য এই 'তিনাই' বিষয়বস্তুর অপরিসীম গুরুত্ব রয়েছে। কৈলাশপাথির গবেষণায় 'তিনাই' বিষয়বস্তুতে শুধু কাব্যিক পরিস্থিতি ব্যক্ত হয়নি, ধরা পড়েছে ফুল, লতা, পাতা নিয়ে গড়া নিসর্গের এক জীবন্ত ছবি। তাই এই পাঁচ তিনাইকে একসঙ্গে বলা হয়েছে ঐতিনাই। এইগুলি হল (১)কুরিঞ্চি বা পাহাড়ি ক্ষতের, অকম বা প্রেমের কবিতার এটি হল যৌন মিলনের স্থান। বহিরঙ্গের কবিতা বা পুরাম এটি গবাদি পশু অভিযানের ক্ষেত্র। ২) মুলাই হল পশুচারণভূমি। প্রেমের কবিতায় স্ত্রীসুলভ ধৈর্য এবং যুদ্ধের কবিতার আক্রমণ হল এর বিষয়বস্তু। ৩) নেইতাল, উপকূলবর্তী ক্ষেত্র প্রেমের কবিতায়, শোকপ্রকাশ করা, যুদ্ধের কবিতায় তীব্র যুদ্ধ। ৪) মরুতম, উর্বর সমভূমি, প্রেমের কবিতায় স্ত্রীসূলভ ক্ষোভ প্রকাশ, যুদ্ধের কবিতার অবরোধ। ৫) পালই, শুষ্ক মরুক্ষেত্রে, প্রেমের কবিতায় বিচ্ছেদ, যুদ্ধের কবিতা, বিজয় লাভ।

সঙ্গম সাহিত্যে চের, পাণ্ড্য ও চোল রাজাদের বীরত্ব, কীর্তি, দানশীলতা, বিদ্যোৎসাহশীলতা ও তাঁদের যজ্ঞানুষ্ঠান ইত্যাদি বিবৃত হয়েছে। বৈদিক সাহিত্যের সঙ্গে সঙ্গম সাহিত্যের তুলনা করলে দেখা যাবে এগুলি ঋগ্বেদের মতো ধর্মীয় সাহিত্য নয়, এগুলি ধর্মনিরপেক্ষ সাহিত্য। ছোটো-বড়ো নানা ধরনের কবিতায় সমৃদ্ধ সঙ্গম সাহিত্য কবিদের প্রিয় নায়ক নায়িকাদের উদ্দেশ্যে স্তুতি-বন্দনা করা হয়েচে। এখানে যোদ্ধা, রাজা বা প্রধানের নাম উল্লেখ করে তাঁর সামরিক কীর্তির বিস্তৃত বর্ণনা রয়েছে। বস্তুত সঙ্গম সাহিত্যে বহুজাতিক সমাজের ছবি ফুটে উঠেছে। শিক্ষা-দীক্ষাহীন কিরাত সমাজের মানুষ কুঁড়েঘরে বাস করত। জীবিকা হিসেবে তারা গ্রহণ করেছিলেন পশু শিকার ও যুদ্ধবৃত্তিকে। তাদের ঘরে তির, ধনুক, বর্শা ইত্যাদি অস্ত্র মজুত থাকত। গ্রামের জনসংখ্যার একটি বড়ো অংশ সেনাবাহিনীতে যোগ দিত এবং জীবনসায়াহ্নে তারাই সন্ন্যাস ব্রত গ্রহণ করত। সঙ্গম সাহিত্যে আমরা দাস সমাজের পাশাপাশি সঙ্গম সাহিত্য থেকে বেদজ্ঞ ব্রাহ্মণদের কথাও জানতে পারি। ধর্মশাস্ত্র অধ্যয়ন ও যাগযজ্ঞ নিয়েই তাঁরা সময় কাটাতেন। ব্রাহ্মণীদের সম্বন্ধে জানা যায় যে তাঁরা দেবতা ও অতিথিদের উদ্দেশ্যে সুস্বাদু খাবার বানাতেন। সঙ্গম সাহিত্যে বন্দর ও উপকূলের মৎস্যজীবীদের জীবনও প্রতিফলিত হয়েছে। এছাড়া ছিল ভ্রমণশীল গায়কের দল। নৃত্যগীত পরিবেশনের জন্য তাদের মাঝে মাঝে রাজসভায় ডাক পড়ত। কবিদের জীবনেও ছিল বৈচিত্র্য। ভাগ্যবান কবিরা রাজাদের পৃষ্ঠপোষণা লাভ করতেন, কিন্তু তাঁদের বেশির ভাগই ছিলেন দরিদ্র ও বঞ্চিত। সামান্য উপহারের জন্য বহু কবিকে রাজদরবারে দীর্ঘক্ষণ অপেক্ষা করতে হত। এ ছাড়া তোন্ডি, মুশিরি ও পুহার মতো বন্দরগুলিতে বসবাসকারী ম্লেচ্ছদের কথাও জানা যায়। এঁরা মূলত বিদেশি ছিলেন, গ্রিস, ইটালি ও আরব দেশ থেকে আসা বণিক। তাঁরা তামিল জানতেন না, অঙ্গভঙ্গির দ্বারা নিজেদের মনোভাব ব্যক্ত করতেন। রাজপ্রাসাদে তাঁরা রক্ষী হিসেবে কাজ করতেন্ন এবং রারে তাঁরা রাস্তা-ঘাটে প্রহরার কাজে নিযুক্ত থাকতেন। সঙ্গম সাহিত্যে বহু উপনিবেশ বা নতুন বসতি স্থাপনের কথা জানা যায়, যেমন কাবেরিপত্তনম। এই বন্দরের অস্তিত্ব ও শ্রীবৃদ্ধির কথা প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানেও সমর্থিত হয়েছে।

বর্ণনামূলক এবং নীতিমূলক উভয় প্রকার সঙ্গম সাহিত্যগ্রন্থগুলিতে সমাজ বিবর্তনের বিভিন্ন স্তরের ছবি পাই। বর্ণনামূলক কবিতাগ্রন্থগুলি ছিল, এক ধরণের বীরগাথা, যেখানে নায়কের জীবনের গৌরবময় কীর্তি, শাশ্বত যুদ্ধের কাহিনী এবং গবাদি পশু অভিযানের কাহিনি বর্ণিত হয়েছে। এর থেকে বোঝা যায় যে আদি তামিলরা পশুচারক সমাজের মানুষ ছিলেন। প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে সঙ্গম যুগের এই সময়কে আমরা মহাশ্মীয়

(Megalithic) সংস্কৃতি আখ্যা দিতে পারি। দক্ষিণ ভারতে লোহার ব্যবহারের সূচনা মেগালিথ বা মহাশ্মীয় সমাধি প্রথার সাথে সম্পর্কিত কারণ মহাশ্মীয় সমাধিক্ষেত্রগুলিতে লৌহ যুগের অনেক নিদর্শন পাওয়া গেছে। এ প্রসঙ্গে একটি বিষয় বিশেষ করে মনে রাখতে হবে যে উত্তর ভারতে লৌহ যুগ যে রাষ্ট্রভিত্তিক তথা নাগরিক সমাজের সূচনা করেছিল দক্ষিণ ভারতে তা হয়নি। দক্ষিণ ভারতে দীর্ঘ সময় ধরে লৌহ প্রযুক্তির ব্যবহার চললেও রাজতান্ত্রিক ব্যবস্থা তথা নাগরিক জীবনযাত্রা সক্রিয় ছিল না। উত্তর ভারত যেখানে ষষ্ঠ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের আগেই আদি-ঐতিহাসিক যুগে পদার্পণ করে সেখানে দক্ষিণ ভারতে ৬০০-২০০ খ্রীষ্টপূর্বাব্দের এই সময়কালকে আদি-ঐতিহাসিক যুগ না ধরে লৌহ যুগ ধরা হয়। এর পরেই দক্ষিণ ভারতে ঐতিহাসিক যুগ ও নগর জীবনযাত্রার সূচনা হয়। শুরু হয় লিখন-শৈলী, মুদ্রা-অর্থনীতি ও দূরপাল্লার বাণিজ্য। সঙ্গম সাহিত্য দক্ষিণ ভারতের এই রূপান্তরের সাক্ষী। সঙ্গম সাহিত্য প্রত্নতাত্ত্বিক এক বিশেষ লক্ষণীয় বৈশিষ্ট্যের সমসাময়িক যাকে আমরা মহাশ্মীয় সমাধি (megalithic burials) এবং কৃষ্ণ ও লোহিত মৃৎপাত্রের (Black and Red Ware on BRW) যুগ হিসেবে জানি। মহাশ্মীয় সমাধি নানা ধরনের ছিল। মহারাষ্ট্রের বিদর্ভ থেকে তামিল নাড়ুর তিরুনেলভেলি জেলা আর দক্ষিণ কেরালা মহাশ্মের এই বিস্তীর্ণ ক্ষেত্রে বিভিন্ন ধরনের সমাধি দেখা যায়। যেমন গর্ত সমাধি বা পিট ব্যারিয়াল; কক্ষ সমাধি বা চেম্বার ব্যারিয়াল, স্মারক সমাধি ইত্যাদি সমাধিক্ষেত্র গুলিতে প্রাপ্ত লোহার জিনিসের মধ্যে রয়েছে বর্শাফলক, তির ফলক, কুঠার, ত্রিশূল, হাঁশুলি, তরবারি, তেপায়া প্রদীপ ইত্যাদি। এগুলি ছাড়া এই সমাধাগুলিতে পাওয়া গেছে কালো ও লাল মৃৎপাত্র, পাথর ও পোড়া মাটির সামগ্রী। যাই হোক এই সময় ব্রাহ্মী হরফে লেখা প্রাচীনতম তামিল শিলালেখ পাওয়া গেছে। এই লেখ ২০০খ্রীষ্টপূর্বাব্দের যা তামিল —ব্রাহ্মীলেখ নামে পরিচিত। এটি তামিলকমের আদি ঐতিহাসিক পর্যায়।

আদি মহাশ্মীয় যুগের মানুষ প্রধানত পশুপালন, শিকারি জীবনযাত্রা এবং মৎস্য শিকারের সাথে যুক্ত থাকলেও তারা চাল উৎপাদন করত। উপদ্বিপীয় ভারতের বিভিন্ন মহাশ্মীয় সমাধিক্ষেত্রে লম্বা হাতলওয়ালা কোদাল, কাস্তে ইত্যাদি পাওয়া গেলেও লাঙলের ফলা পাওয়া যায়নি। লোহার অন্যান্য সামগ্রীর মধ্যে কীলক, চওড়া তিরের ফলা, লম্বা তরবারি, বর্শার ফলা ইত্যাদি পাওয়া গেছে। এই হাতিয়ারগুলি প্রধানত যুদ্ধ ও শিকারের কাজে ব্যবহৃত হত। সঙ্গম সাহিত্যের গ্রন্থগুলিতে নিরন্তর যুদ্ধ ও গবাদি পশু অভিযানের ছবি ফুটে উঠেছে। এই সময়ের মানুষের জীবনে যুদ্ধে ন্ট্রিত সামগ্রীর গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এই সময়ের মানুষের মধ্যে দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে, একদল নায়কের মৃত্যুর পর সে পাথরে পরিণত হয়। এই কারণেই মহাশ্মীয় সমাধিকে ঘিরে তখনকার মানুষ পাথরের বৃত্ত বানাত। এর থেকেই পরবর্তীকালে যুদ্ধে শহিদ নায়কদের সম্মানে বীর পাথর (বিরাবকল) নির্মাণের রীতি চালু হয়। সঙ্গম সাহিত্যে আদি মহাশ্মীয় পর্বের সামাজিক বিবর্তনের আদি পর্যায় চিত্রিত হয়েছে।

সঙ্গম সাহিত্যের বর্ণনামূলক কবিতাগুলি থেকে আমরা রাষ্ট্র গঠন (state formation) সম্পর্কেও ধারণা করতে পারি। আদি পর্যায়ের রাষ্ট্র গঠনের সঙ্গে যুক্ত ছিল বিভিন্ন দলের যোদ্ধা শ্রেণি, কর ব্যবস্থা এবং একদম প্রাথমিক পর্যায়ের বিচার ব্যবস্থা। এই সঙ্গম সাহিত্য থেকেই আমরা বাণিজ্য, বণিক, কারিগর ও কৃষকদের কথা জানতে পারি। এই সাহিত্যে আমরা পেয়েছি কাঞ্চি, কোরকাই, মাদুরাই, পুহার এবং উরিয়ারের মতো শহরের কথা। এর মধ্যে পুহার অথবা কাবেরিপত্তনম ছিল সবচেয়ে খ্যাতনামা গুরুত্বপূর্ণ শহর। সঙ্গম সাহিত্যে উল্লিখিত নগর এবং আর্থিক ক্রিয়াকলাপ গ্রিক ও রোমান বিবরণে এবং সঙ্গম ক্ষেত্রের উৎখননে প্রাপ্ত তথ্যাদির দ্বারাও সমর্থিত হয়েছে।

সঙ্গম সাহিত্যের বেশ কিছু রচনা (নীতিমূলক রচনাগুলি নিয়ে) প্রাকৃত এবং সংস্কৃত সাহিত্যের ব্রাহ্মণ পন্ডিতদের রচিত ছিল। নীতিমূলক রচনাগুলি খ্রিষ্টীয় প্রথম শতকগুলি জুড়ে পরিব্যপ্ত ছিল। এই রচনাগুলিতে শুধু রাজা ও তাঁর রাজদরবারের নিয়মের কথাই বলা নেই, বিভিন্ন সামাজিক ও বৃত্তিগোষ্ঠীর জীবন সম্পর্কেও বিধি নির্ধারিত হয়েছে। সম্ভবত এই ধরণের পরিবর্তন সূচিত হয়েছিল খ্রিষ্টীয় চতুর্থ শতকের পরবর্তীকালে যখন পল্লবদের শাসনকালে ব্রাহ্মণদের বিপুল সংখ্যা বৃদ্ধি ঘটেছিল। সঙ্গম সাহিত্য থেকে আমরা গ্রাম দানের কথা এবং রাজাদের সূর্য ও চন্দ্র বংশোদ্ভূত তত্ত্বের কথা জানতে পারি।

২০.৪ অন্যান্য তামিল গ্রন্থ

সঙ্গম সাহিত্যের বাইরে বেশ কিছু তামিল গ্রন্থ রয়েছে যার গুরুত্ব অপরিশীম। এরকমই একটি গ্রন্থ হল 'তোলক্কাপ্পিয়ম'। এটি তামিল ব্যাকরণ এবং কাব্য সমালোচনাবিদ্যার উপর রচিত। আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ গ্রন্থ হল 'তিরুক্কল'। এটি দর্শন ও বিজ্ঞজনের বাণী, নীতি ও প্রবচনের উপর রচিত। এ ছাড়া রয়েছে দুটি তামিল মহাকাব্য যা তামিল সাহিত্যের এক বড়ো সম্পদ — ইলঙ্গো আদিগল বিরচিত "শিলাপ্পাদিকরম" এবং শীত্তলৈ শাত্তনর রচিত "মনিমেখলাই"। দুটি মহাকাব্যেই খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের কাছাকাছি সময়ে রচিত। এর মধ্যে প্রথম মহাকাব্য "শিলাপ্পাদিকরম" আদি তামিল সাহিত্যের এক উজ্জ্বলতম রত্ন। এই কাব্যের বিষয়বস্তু এক প্রেম-কাহিনী। এই কাহিনীর নায়ক কোভালন নামের এক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি যিনি তাঁর বিবাহিতা স্ত্রী সম্ভ্রান্তবংশীয় কন্নাগির পরিবর্তে কাবেরিপত্তনমের বারাঙ্গনা মাধবীকে তাঁর জীবনে প্রাধান্য দেন। এই মহাকাব্যের রচয়িতা সম্ভবত জৈন ধর্মাবলম্বী ছিলেন এবং তাঁর জীবনে কাহিনির দৃশ্যপট ও বিস্তার তামিল রাজ্যের সব রাজ-ক্ষেত্র জুড়ে। অন্য মহাকাব্য 'মনিমেখলাই'-এর রচয়িতা মাদুরাই-এর এক শস্য ব্যবসায়ী। এই মহাকাব্যের বিষয়বস্তু হল কোভালন এবং মাধবীর কন্যার দুঃসাহসিকতা। যাই হোক এই মহাকাব্যের সাহিত্যগুণের চেয়ে ধর্মীয় আবেদন বেশি। এই দুই মহাকাব্যের প্রস্তাবনায় বলা হয় যে এর রচয়িতারা একে অপরের বন্ধু ছিলেন এবং চেরবংশীয় শাসক সেনগুত্তুভনের সমসাময়িক ছিলেন চেরবংশীয় এই শাসক খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে শাসন করতেন। রামশরণ শর্মার মতে এই দুই মহাকাব্যকে এত আগের রচনা বলে ধরা যায় না, তবে এতে খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকের তামিলদের আর্থ-সামাজিক জীবনের ছবি পাওয়া যায়।

২০.৫ তামিলকম-ভৌগোলিক বিন্যাস

'তামিলকাম শব্দটি খুবই প্রাচীন যা তামিল ভুখন্ডকে চিহ্নিত করে। যেসব প্রাচীন উপাদানে এর উল্লেখ রয়েছে তার মধ্যে উল্লেখযোগ্য হল পুরুন্নুরু, পতিররুপ্পত্তু-পাতিকাম। তোলক্কাপ্পিয়ামে শব্দটি তামিল-কুরু-নাললুলাকাম বলে উল্লিখিত হয়েছে। তোলক্কাপ্পিয়ামের ভূমিকায় বলা হয়েছে, যে পুণ্যভূমিতে তামিল ভাষা বলা হয় তা উত্তরে ভেঙ্কটগিরি থেকে দক্ষিণে কুমারু পর্যন্ত বিস্তৃত। শিলাপ্পাদিকরমে প্রাচীন তামিল ক্ষেত্রের বর্ণনা দিতে গিয়ে এর অন্তর্গত চারটি পাহাড়ের কথা বলা হয়েছে। এগুলি হল মাদুরাই, উরাঙ্কুর, কাঞ্চি এবং পুহার। তামিলকাম কতগুলি রাজনৈতিক ক্ষেত্রে বা পেরনাড়ু বা মহান দেশে বিভক্ত ছিল। এগুলি হল চেরনাড়ু, চোলনাড়ু, পান্ড্যনাড়ু। এর সাথে দুটি রাজনৈতিক ক্ষেত্র যুক্ত ছিল। এগুলি হল অথিয়মন নাড়ু বা সথ্যপুথ এবং থন্ডিভরাণ নাড়ু যা পরবর্তীকালে চেরনাড়ু ও পান্ড্য নাড়ুতে যুক্ত হয়।থোন্ডাই নাড়ু চোল নাড়ুর অন্তর্গত ছিল,

পরে (খ্রীষ্টীয় ষষ্ঠ শতকে) এটি একটি স্বাধীন পল্লব নাড়ুতে রূপান্তরিত হয়। তামিলকাম আবার ১২টি সামাজিক ও ভৌগোলিক নাড়ুতে বিভক্ত ছিল যেখানে স্থানীয় তামিল ভাষা ব্যবহৃত হত। তামিল সাহিত্যে আরও কিছু নাড়ু বা দেশের উল্লেখ রয়েছে যেগুলি তামিলকামের মধ্যে পড়ে না, কিন্তু প্রাচীনকালে তারা তামিলদের সাথে বাণিজ্য করত। এই তামিললভাষী ক্ষেত্রগুলি হল এলানাড়ু বা (এলম) নাগনাড়ু (জাফনা উপদ্বীপ), ভগ্নি নাড়ু বা ভগ্নিক্ষেত্র, ভেঙিনাড়ু, চবক নাড়ু (জাভা), কলিঙ্গ নাড়ু, বহর নাড়ু, সিংঘল নাড়ু ইত্যাদি। খ্রিষ্টিপূর্ব তৃতীয় শতকে তামিল সংস্কৃতি তামিলকামের বাইরে ছড়িয়ে পড়ে। এই সময় থেকেই তামিলরা শ্রীলঙ্কায় বসতি বিস্তার করে। তামিলকাম, হিন্দু, জৈন ও বৌদ্ধরা সহাবস্থান করত। খ্রীষ্টপূর্ব ৩৫০ অব্দ থেকে খ্রিষ্টীয় ২০০ অব্দ পর্যন্ত তামিলকাম যেসব তামিল রাজবংশ দ্বারা শাসিত হয়েছে সেগুলি হল চোল বংশ, পাণ্ড্য বংশ, সত্যপুত্র বংশ এবং চের বংশ।

২০.৬ প্রত্নতাত্ত্বিক ও সাহিত্যিক উপাদানে তামিলকম

প্রত্নতাত্ত্বিক দিক থেকে বিচার করলে যাবে তামিলকমের ঐতিহাসিক সূচনা লৌহ এবং কৃষ্ণ ও লোহিত মৃৎপাত্র ব্যবহারকারী মানুষদের মধ্যে হয়েছিল, যার প্রাচীনত্ব খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতকের কাছাকাছি। এই সময়কালে তামিলকাম তথা দক্ষিণ ভারতের ইতিহাস রচনার প্রধান উপাদান হল মহাশ্মীয় সমাধি (megalithic burials), সঙ্গম সাহিত্য, তামিল-ব্রাহ্মী লেখ এবং পেরিপ্লাস অফ্ দ্য ইরিথ্রিয়াম সী, টলেমীর ভুগোল ও প্লিনির ন্যাচারাল হিস্টোরিয়া ইত্যাদি সূত্রে উল্লিখিত বিবরণ। ঐতিহাসিকদের অনুমান খ্রীষ্টপূর্ব সপ্তম শতক থেকে তামিলকম তার ভাষাগত পরিচয় এবং সাংস্কৃতিক সমরূপতা লাভ করেছিল। তবে তামিল ভাষা ও সংস্কৃতির ক্ষেত্র হিসেবে তামিলকামের অস্তিত্ব খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয় শতকের তামিল —ব্রাহ্মী লিপির ব্যবহার এবং প্রাচীন তামিল সাহিত্য দ্বারা সমর্থিত। মৌর্য সাম্রাজ্যের সীমান্তের সঙ্গে তামিলকামের সীমানা থাকায় উভয় সংস্কৃতির মধ্যে সমন্বয়ের সুযোগ আসে। এই অঞ্চলের সাংস্কৃতির সংহতি রক্ষায় তামিলসত্তা বড়ো ভূমিকা পালন করেছিল। এই সাংস্কৃতিক সমন্বয়ের বড়ো প্রয়াণ হল তামিল-ব্রাহ্মী লিখন রীতি। তামিল-ব্রাহ্মী লেখগুলি লিখিতভাবে তামিলকমের আদি ঐতিহাসিক যুগে উত্তরণের কথা প্রমাণ করে। তবে তামিলকমের ভৌগোলিক ও পরিবেশগত বৈচিত্র্য ছিল। এই ভৌগোলিক ক্ষেত্রে যেমন পাহাড়ি অঞ্চল ছিল তেমনি শুষ্ক, আধা-শুষ্ক অঞ্চল, তৃণভূমি, নদীবিধৌত সমভূমি এবং উপকূলবর্তী সীমানাও ছিল। ভৌগোলিক এবং পরিবেশগত বৈচিত্র্যের সাথে সাথে মানুষের অভিযোজনেও বৈচিত্র্য দেখা যায়। স্বাভাবিকভাবেই তামিলকামেও বস্তুগত সংস্কৃতির বৈচিত্র্য লক্ষ করা যায়।

২০.৭ বস্তুগত সংস্কৃতি

কৃষ্ণ ও লোহিত মৃৎপাত্র সংস্কৃতির লৌহ-ব্যবহারকারী মানুষেরসমাধি-ক্ষেত্রে পাওয়া জিনিসপত্র থেকে আদি পর্যায়ের তামিলকামের বস্তুগত সংস্কৃতি সম্পর্কে ধারণা করা যায়। তামিলকাম ক্ষেত্রে অন্তর্গত মহাশ্মীয় সমাধিগুলির দন্ডায়মান প্রস্তর ফলক (menhir) দন্ডায়মান পাথরের উপর চ্যাপ্টা পাথর বসানো সমাধি কক্ষ (dolmen), শবাধার, প্রস্তর-বৃত্ত ইত্যাদি পাওয়া গেছে। সমাধিস্থানে প্রদত্ত সামগ্রীগুলি শুধু পূর্বপুরুষদের শ্রদ্ধা জানানোর জন্য দেওয়া হত না, এর মধ্য দিয়ে মৃত্যুর পরের জীবনের প্রতি তাদের বিশ্বাস প্রকাশ পায়। এ ছাড়া তাঁরা আরও বিশ্বাস করত যে, একজন নায়কের মৃত্যুর পর সে পাথরে পরিণত হয়। এই কারণেই মহাশ্মীয়

সমাধিতে তারা পাথরের বৃত্ত বানাত। সমাধিক্ষেত্রে পাওয়া সামগ্রীর মধ্যে ছিল বর্শা-ফলক, কুঠার, ত্রিশূল, হাঁসুলি, তরবারি, তেপায়া প্রদীপ ইত্যাদি। এই সমাধি-সামগ্রী দেখে মনেহয় তারা শিকারী ও খাদ্য সংগ্রহকারীর জীবনের সাথে যুক্ত ছিল এবগ ধীরে ধীরে স্থায়ী কৃষিজীবনের দিকে ঝুকছিল। কিছু সমাধি ক্ষেত্র থেকে হাতলওয়ালা কোদাল, কাস্তে পাওয়ায় প্রমাণিত হয় যে, তারা কৃষির সঙ্গেও যুক্ত ছল। অনেকে এরকম যুক্তিও দেখান যে তাদের সেচের প্রযুক্তিও জানা ছিল। পরবর্তীকালে এই ধরনের কৃষি প্রগতি অসম্ভব ছিল না।

খ্রীষ্টপূর্ব তৃতীয়—প্রথম শতকে তামিল-ব্রাহ্মী লিখনশৈলীর সময়কালে আরও একটু প্রগতি লক্ষ করা যায়। এই সময় উরস-এর মতো ছোটো ছোটো কৃষি বসতি গড়ে ওঠে। কারিগরি ও হস্তশিল্পেও বিশেষীকরণ লক্ষ করা যায়। এই সময় পণ-বণিকম (স্বর্ণ ব্যবসায়ী), অরুভই—বণীকম (সুতিবস্ত্র ব্যবসায়ী), কোলু—বণিকম (লৌহসামগ্রী ব্যবসায়ী) ইত্যাদি বণিকগোষ্ঠীর নাম জানা যায়। এ ছাড়া বণিক সঙ্ঘ বা নিগমের অস্তিত্বের কথাও জানা যায়। বড়ো বড়ো গুহাগুলির বিস্তার দেখে বাজটিজ্যপথের সংযোগের কথা মনে আসে। বড়ো গুহাগুলিতে জৈন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বাস করতেন। বড়ো গুহাগুলিতে জৈন ও বৌদ্ধ সন্ন্যাসীরা বসে করতেন। তাঁরা পার্শধারী কৃষি-বসতি ও ভ্রমণকারীদের উপর বিশেষত ভ্রাম্যমাণ বণিকদের উপর নির্ভর করত। শাসক প্রধানেরা এবং বিশেষ বিশেষ পণ্যের বণিকেরা তাঁদের পৃষ্ঠপোষণা করতেন। এইভাবে তামিলকামের কিছু অংশে ধর্মীয় জীবনের ক্রমবিকাশ ঘটে। "অতিত্তানম ধম্মম" ইত্যাদি শব্দবন্ধ থেকে মুক্তমনা ধর্মীয় গোষ্ঠীর উপর পালির প্রভাব বোঝা যায়।

তামিলকামে বিনিময়ের মাধ্যম হিসেবে ধাতু মুদ্রার ব্যবহার নিঃসন্দেহে নিবিড় বাণিজ্যিক কার্যকলাপের সাক্ষ্য বহন করে। সঙ্গম সাহিত্য থেকে আমরা অকৃষি কার্যকলাপের অনেক কিছু জানতে পারি। এ ছাড়া পেরিপ্লাস অফ্ দ্য ইরিথ্রিয়াম সী, টলেমীর ভুগোল ও প্লিনির ন্যাচারাল হিস্টোরিয়া থেকে দক্ষিণ ভারতের বন্দরগুলির বাণিজ্যিক গুরুত্বের কথা জানতে পারি বিশেষ করে রোম ও ভূমধ্যসাগরের সঙ্গে দক্ষিণ এশিয়ার বিকাশশীল বাণিজ্য এবং সামুদ্রিক বাণিজ্যের বিষয়ে।

তামিলকামের সামুদ্রতিক ক্রিয়াকলাপ দেখলে বোঝা যাবে যে সঙ্গম যুগে কবি ও চারণকবিদের অভিপ্রয়াণ হয়েছিল। দূরপাল্লার বাণিজ্যের প্রমাণস্বরূপ অনেক মৃৎপাত্র, কাঁচের কাজ এবং রোমান মুদ্রা ইত্যাদি পাওয়া যায়। সমকালীন উপাদানের পাশাপাশি সঙ্গম সাহিত্যে প্রাপ্ত তথ্যাদির দ্বারা তামিলকামে বাণিজ্যিক কার্যকলাপ সমর্থিত হয়।

২০.৮ রাজনৈতিক ও সামাজিক পরিস্থিতি

প্রাচীন সঙ্গমসাহিত্যে তামিলকামের যে রাজনৈতিক ছবি পাই তা হল গোষ্ঠী প্রধানের শাসন, কোনও পূর্ণাঙ্গ ও জটিল রাজতান্ত্রিক রাষ্ট্রনৈতিক সমাজ নয়। তবে সঙ্গম সাহিত্যে তামিলকামের যে বাস্তবসম্মত ভৌগোলিক বিভাজনের ছবি পাই তা হল 'তিনাই' বিভাজন। এই 'তিনাই' বিভাজনের মধ্য দিয়ে তামিলকামের সমাজ গড়ে ওঠার ছবি স্পষ্ট হয়। এই 'তিনাই' বা ভৌগোলিক ও বাস্তববিদ্যা বিষয়ক বিভাজনগুলি হল — ১)কুরিঞ্চি তিনাই বা পাহাড়ি ক্ষেত্র; ২) মুলাই তিনাই বা পশুচারণ; ৩)নেইতাল তিনাই বা উপকূলবর্তী ক্ষেত্র; ৪) মরুতম তিনাই বা উর্বর সমভূমি; ৫) পলাই তিনাই বা শুষ্ক মরুক্ষেত্র। তামিলকামের ভৌগোলিক ক্ষেত্রে এই পঞ্চ বিভাজন কোনও কবির কল্পনা নয়, এটি বাস্তব চিত্র। কিন্তু ঐতিহাসিক এই ভৌগোলিক বিভাজনের

মধ্যেই সমাজ বিবর্তনের রূপটি ধরতে চেয়েছেন। মানুষ ও প্রকৃতির মেলবন্ধনে গড়ে উঠেছিল বৈচিত্রময় সমাজ। এক-একটি ভৌগোলিক ক্ষেত্রে এক-এক ধরনের মানুষ অভিযোজন করেছে। যেমন কুরিঞ্চি তিনাই বা পাহাড়ি এলাকায় ছিল কানভর এবং ভেতরদের বাস; মুলাই তিনাই বা পশুচারণ ক্ষেত্রে আয়র, ইদইয়ার এবং কুরবরদের বাস; নেইতল তিনাই বা উপকূলবর্তী ক্ষেত্রে পরতবর, মিনবর ভলয়র এবং উমালরদের বাস; মরুতম বা আর্দ কৃষিক্ষেত্রে তলুবর এবং উলবরদের বাস এবং পলাই বা শুষ্ক মরুক্ষেত্রে এইনর, মরবর ও কল্লরদের বাস। এক-একটি তিনাই-এর মধ্যেই অর্থনৈতিক জীবনের প্রতিফলনও আমরা পাই, যেমন কুরিঞ্চিতে শিকারি ও খাদ্যসংগ্রাহকের জীবন। মুলাইতে পশুপালন, নেইতালে মাংস ও শিকার ও লবণ তৈরী করার কাজ; মরুতমে পণ্য উৎপাদন এবং লাঙল দিয়ে চাষ, মুলাই এবং পলাইতে লুঠতরাজ ও গবাদিপশু তুলে নেবার জীবন প্রতিফলিত হয়েছে।

ড. চম্পকলক্ষ্মী বলেছেন যে সঙ্গম যুগে নগরায়ণ রাষ্ট্রের রাজনৈতিক প্রয়াসের ফলস্বরূপ ঘটেনি। কারণ এই সময়টা ছিল উপজাতি শাসন বা বড়জোর সম্ভাবনাময় রাজতন্ত্রের যুগ। তাঁর মতে কৃষিক্ষেত্র ও কর ব্যবস্থার উপর শাসকের নিয়ন্ত্রণ ছিল সীমিত। কিন্তু লিখিত উপাদান, নগরকেন্দ্র, বিশেষ হস্তশিল্প এবং দূরপাল্লার বাণিজ্য অন্য কথা বলছে। সঙ্গম সাহিত্যের কবিতায় রাজাদের স্বর্গ, রত্ন, মসলিন এমনকি হাতি ঘোড়া দান করতে দেখা যায়, যার থেকে সম্পদের উপর তাঁদের নিয়ন্ত্রনের কথা প্রমাণিত হয়। রাজারা দূরপাল্লার সামুদ্রিক বাণিজ্যের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন তাঁরা বাণিজ্যবন্দর তৈরি করে, শুল্ক আদায় করে এবং বিলাসবহুল পণ্য ব্যবহার করে এই বাণিজ্যে উৎসাহ জোগাতেন। রাজবংশের মুদ্রা প্রবর্তনেরও স্পষ্ট প্রমাণ রয়েছে তাই সমগ্র কৃষিক্ষেত্রের উপর পূর্ণ নিয়ন্ত্রণ, বিস্তারিত বা নিয়মিত কর ব্যবস্থা অথবা কেন্দ্রীভূত দমনমূলক ব্যবস্থা না থাকলেও চোল, চের, পান্ড্যদের প্রাথমিক স্তরের রাষ্ট্রীয় কাঠামো ছিল একথা নিশ্চিতভাবে বলা যায়।

২০.৯ উপসংহার

খ্রীষ্টপূর্ব ৩০০ থেকে ৩০০ খ্রীষ্টাব্দের মধ্যবর্তী কালপর্ব তামিল অঞ্চলে সভ্যতার ঊষাকাল বলা যায়। একথা ঠিক যে সমকালে উত্তরভারতের বিস্তীর্ণ অংশে যখন নগরের ধারাবাহিক বিকাশ, রাষ্ট্রনৈতিক বিকাশের এক অনন্য অধ্যায় পরিলক্ষিত হয় সুদূর তামিল অঞ্চল জুড়ে তখন এক ভিন্ন পরিস্থিতির চিত্র ফুটে ওঠে। রাজনৈতিক ক্ষেত্র চের, চোল, পাণ্ড্য রাজ্যের মত আঞ্চলিক শক্তির উথান এই পর্বের তামিল এলাকার অন্যতম বৈশিষ্ট্য ছিল। এর পাশাপাশি মানুষ ও প্রকৃতির সমন্বয়ে সামাজিক ও বস্তুগত জীবনের এক প্রাণবন্তকর ছবি ফুটে ওঠে, যেখানে বাণিজ্য, হস্তশিল্পের এক নিজস্ব জগৎ ছিল। সব মিলিয়ে আলোচ্যপর্বের তামিল অঞ্চলের ইতিহাসকে তার নিজস্ব বৈশিষ্ট্যের নিরিখেই বিচার করতে হবে।

২০.১০ নির্বাচিত প্রশ্নাবলী

১. সঙ্গম সাহিত্যের ওপর একটি সংক্ষিপ্ত প্রবন্ধ লেখো।

২. সঙ্গম সাহিত্যে সুদূর তামিল অঞ্চলের কীরূপ প্রতিচ্ছবি ধরা পড়ে?

৩. তামিলকাম' বলতে কী বোঝো? সমকালীন সাহিত্যিক ও প্রত্নতাত্ত্বিক উপাদানের আলোকে আদিপর্বের তামিল অঞ্চলের ইতিহাস আলোচনা করো?

৪. টীকা লেখোঃ 'তিনাই'।

২০.১১ নির্বাচিত গ্রন্থপঞ্জী

ভাস্কর চট্টোপাধ্যায়, দক্ষিণ ভারতের সাংস্কৃতিক ইতিহাস, গ্রন্থমিত্র, কলকাতা, পুনর্মুদ্রণ ২০১৯।

রণবীর চক্রবর্তী, ভারত ইতিহাসের আদিপর্ব (প্রথম খণ্ড), ওরিয়েন্ট ব্ল্যাকসোয়ান, কলকাতা, ২০০৯।

দিলীপকুমার গঙ্গোপাধ্যায়, ভারত-ইতিহাসের সন্ধানে, প্রথম খণ্ড, সাহিত্যলোক, কলকাতা, ২০০০।

গোপাল চন্দ্র সিনহা, ভারতবর্ষের ইতিহাস (প্রাচীন ও আদি মধ্যযুগ), প্রথম খণ্ড, প্রগ্রেসিভ পাবলিশার্স, কলকাতা, ১৯৯৭।

ড. রতন কুমার বিশ্বাস, প্রাচীন ভারতের ইতিহাস (আদিপর্ব), প্রোগ্রেসিভ বুক ফোরাম, কলকাতা, ২০১৯।

K.A. Nilakanta Sastri– The Illustrated History of South India– OUP– New Delhi– 2009.

Rajan Gurukkal– Social Formations of Early South India– OUP– New Delhi– 2010.

R. Champakalakshmi– Trade– Ideology and Urbanization– OUP– New Delhi– 1996.

Upinder Singh– A History of Ancient and Early Medieval India– Pearson– 2009.

R.S. Sharma– India's Ancient Past– OUP– New Delhi– 2005.

Romila Thapar– Early India- From The Origins to Circa A.D. 1300– London– 2002.

পরিশিষ্ট

মানচিত্র/ছবি

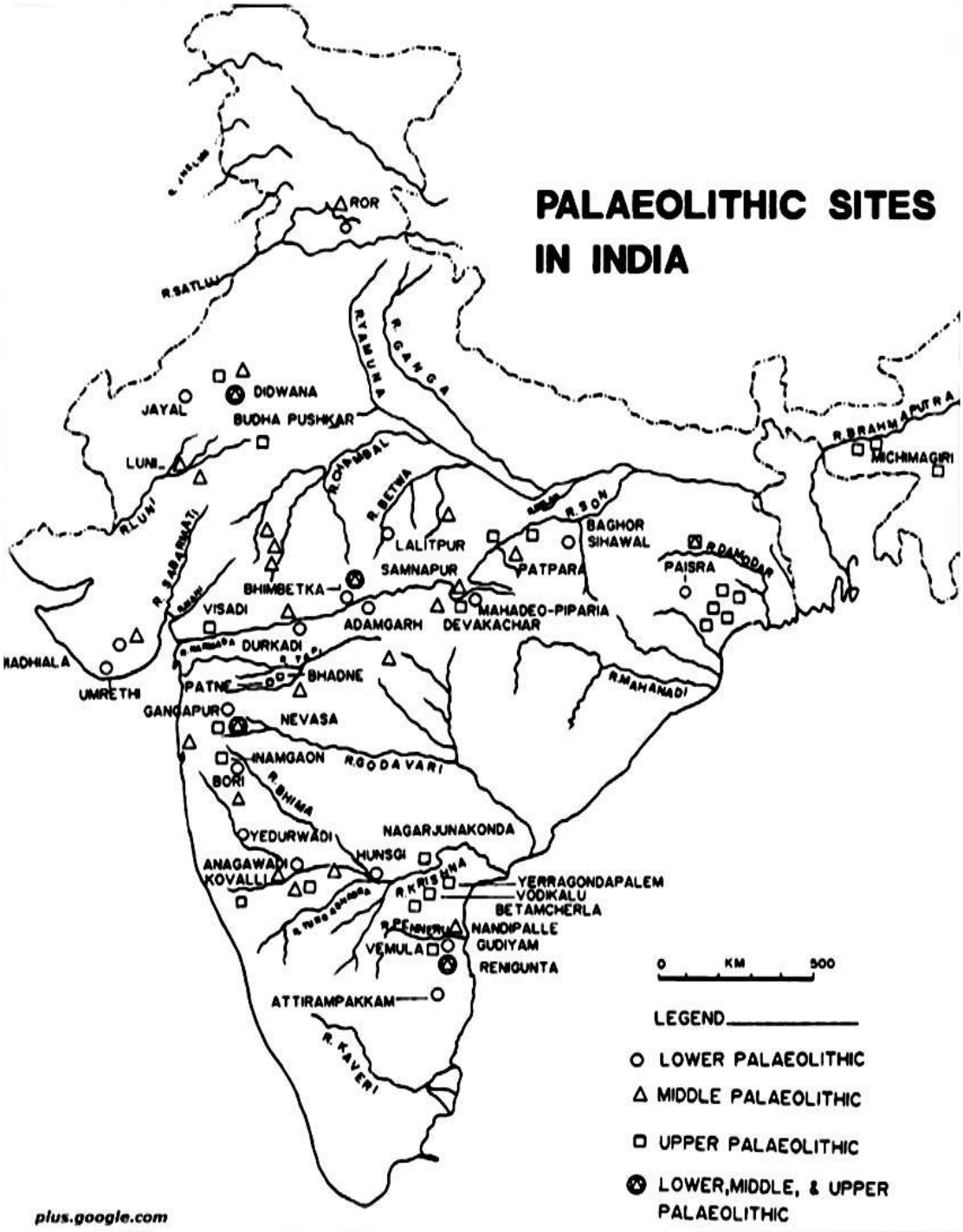

ভারতের প্রধান প্রধান পুরাপ্রস্তর কেন্দ্র

পুরাপ্রস্তর হাতিয়ার সমূহ

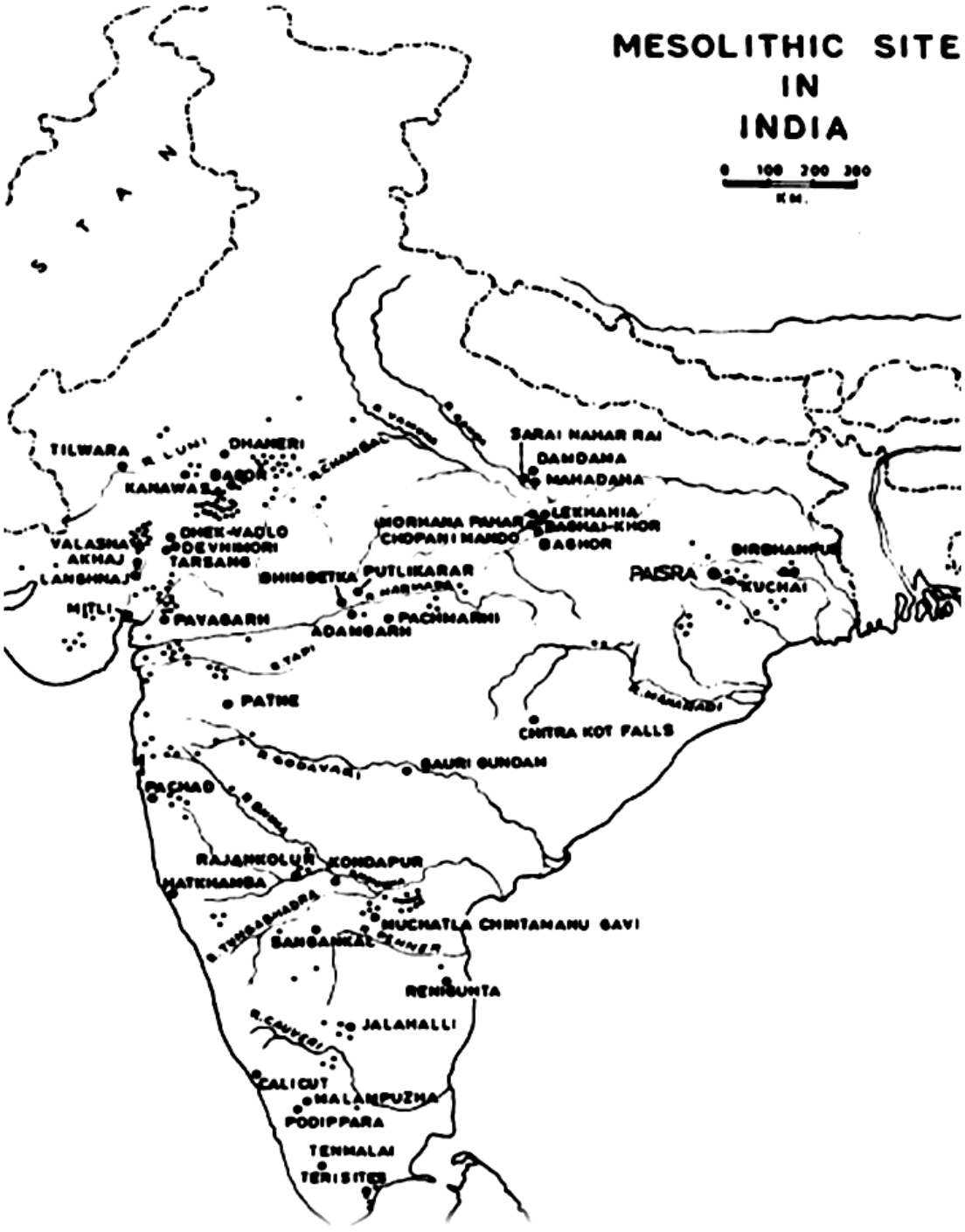

ভারতের প্রধান প্রধান মধ্যপ্রস্তর কেন্দ্র

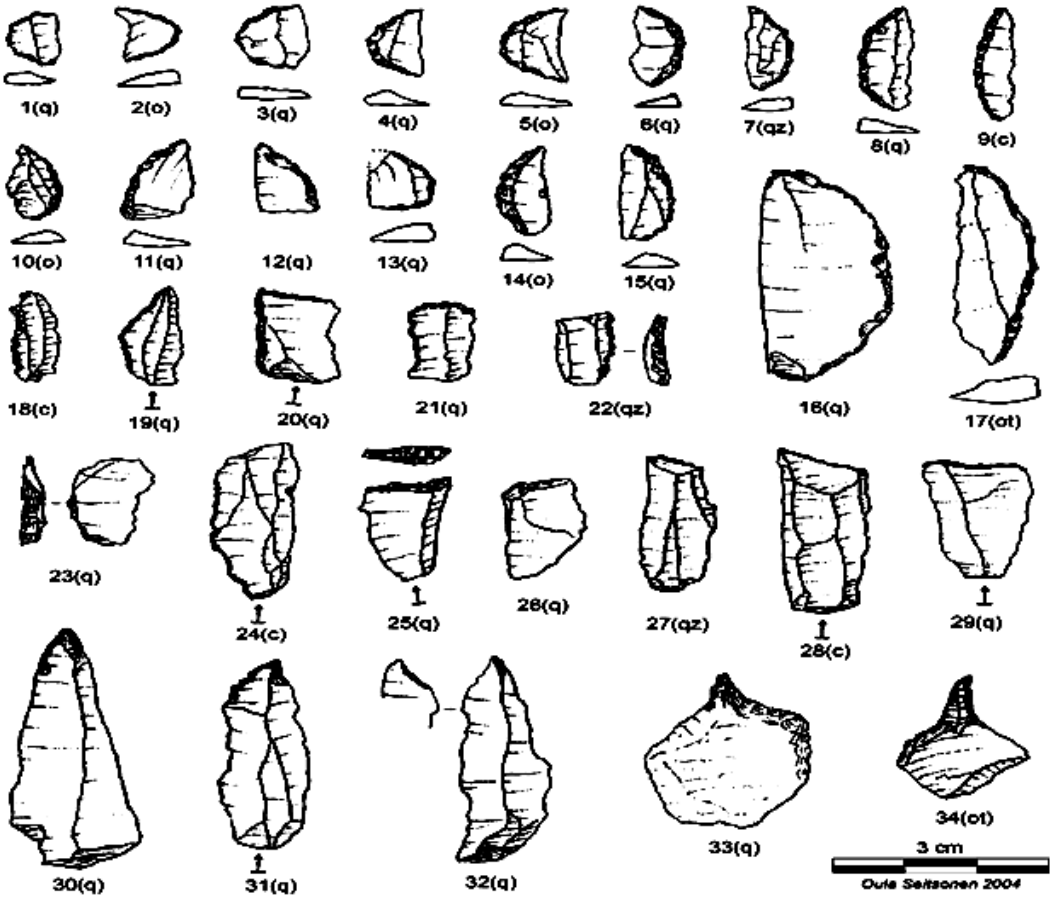
1(q)
2(o)
3(q)
4(q)
5(o)
6(q)
7(qz)
8(q)
9(c)
10(o)
11(q)
12(q)
13(q)
14(o)
15(q)
16(q)
17(ot)
18(c)
19(q)
20(q)
21(q)
22(qz)
23(q)
24(c)
25(q)
26(q)
27(qz)
28(c)
29(q)
30(q)
31(q)
32(q)
33(q)
34(ot)
3 cm
Outa Seitsonen 2004

মাইক্রোলিথ

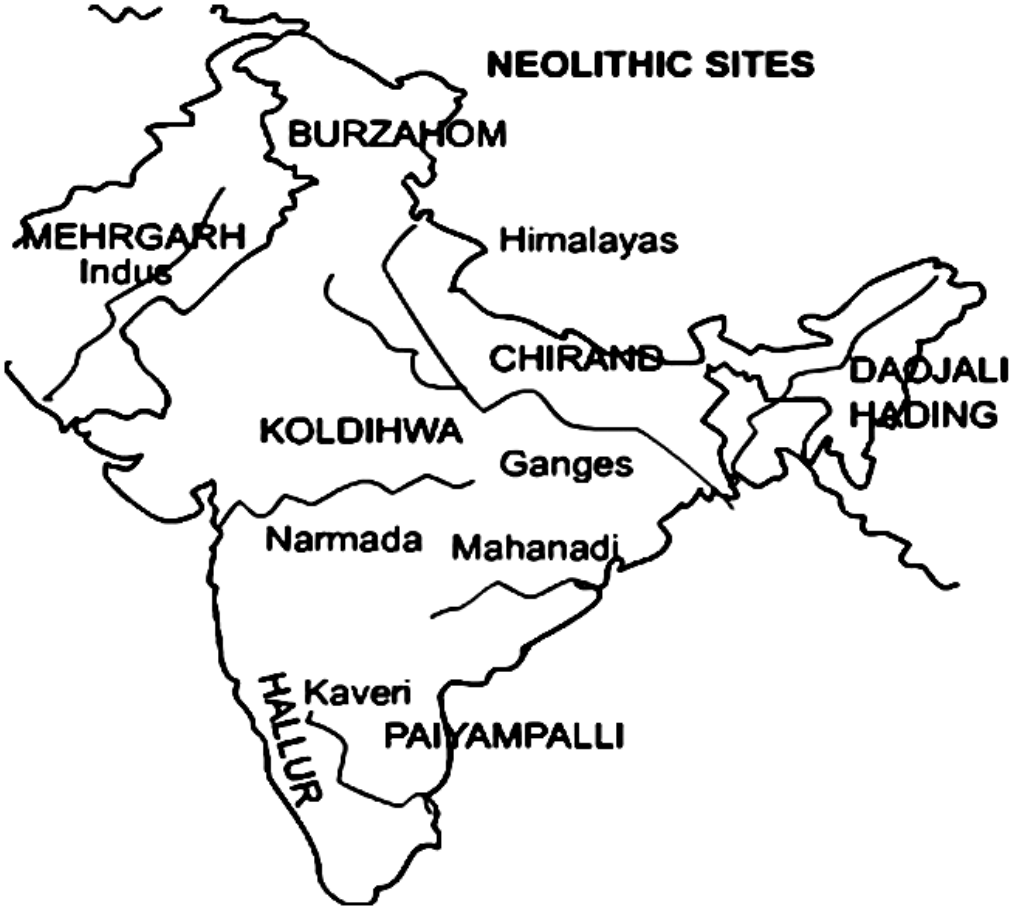

ভারতের প্রধান প্রধান নব্যপ্রস্তর কেন্দ্র

নব্যপ্রস্তর সংস্কৃতির আয়ুধ

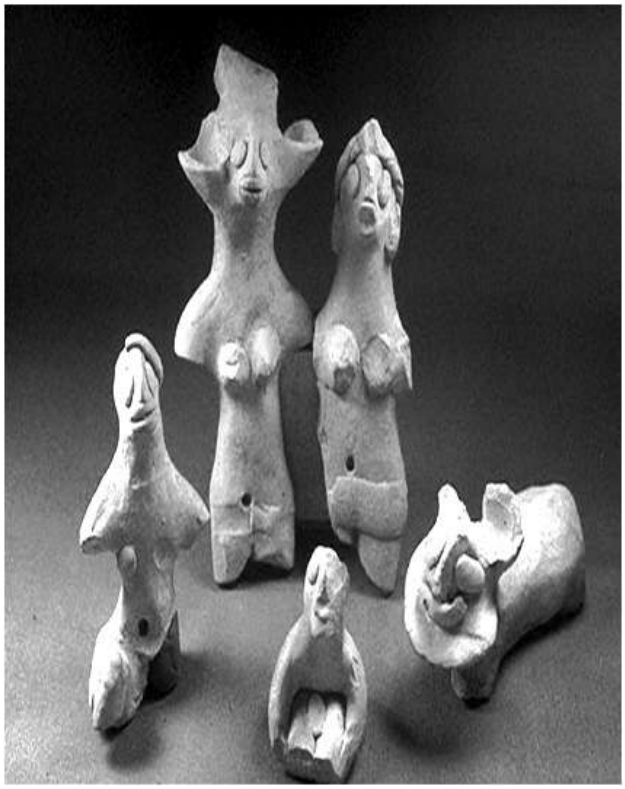

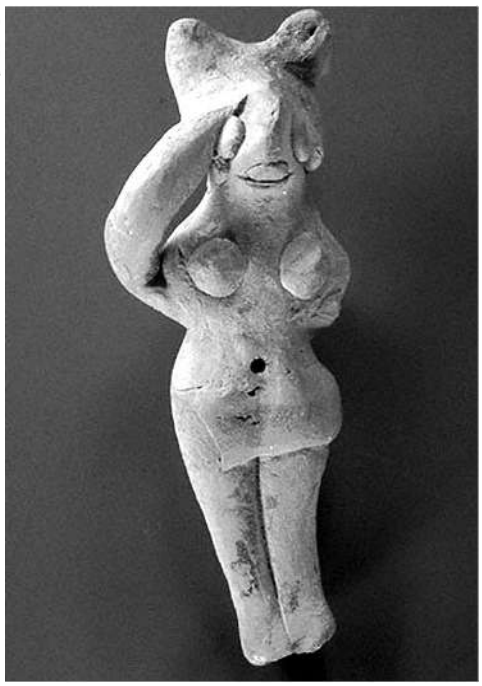

হরপ্পা সভ্যতার টেরাকোটা শিল্প

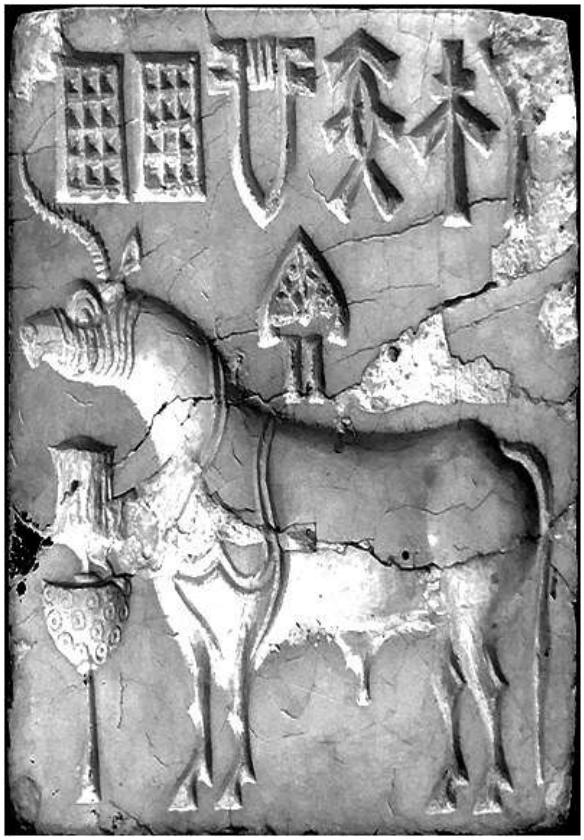

হরপ্পা সভ্যতার সীলমোহর ও মৃৎপাত্র

মধ্যপ্রস্তর যুগের গুহাচিত্র

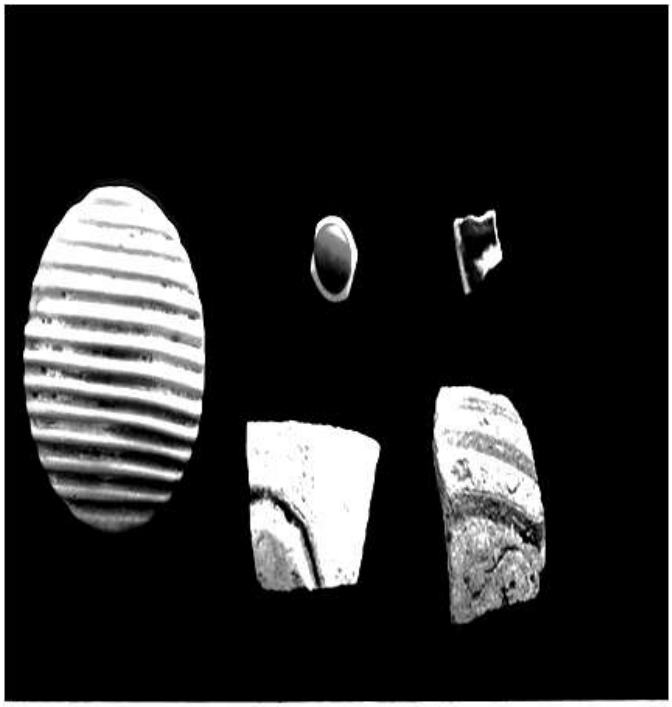

হরপ্পা সভ্যতার পুঁতি

ভারত – ৬০০ খ্রীষ্টপূর্ব
১৬ মহাজনপদসমূহ
কম্বোজ
তক্ষশীলা
গান্ধার
কুরু
হস্তিনাপুর
ইন্দ্রপ্রস্থ
পাঞ্চাল
কোশল
মল্ল
মৎস্য
শূরসেন
যমুনা নদী
গঙ্গা নদী
বারাণসী
বজ্জি
পাটলিপুত্র
বৎস
কাশী
অবন্তী
চেদী
মগধ
অঙ্গ
নর্মদা
মহানদী
গোদাবরী
অস্সক
কৃষ্ণা
উত্তর
পশ্চিম
পূর্ব
দক্ষিণ
০ ১০০ ২০০ ৩০০ মাইল
শহর
নদীসমূহ
বর্তমান সীমারেখা

ষোড়শ মহাজনপদ